# শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান

[ বি. এ. ( শিক্ষা ) পাঠক্রম ]

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর ( বীরভূম )

ঋতেন্দ্রকুমার রায়

অধ্যাপক, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫/১এ কলেজ রো,

কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ কলেজ রো
কলিকাতা ৯

তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯

—শিক্ষা ও শিক্ষণ-এর উপর কয়েকটি বই—

শিক্ষাতত্ত্ব (২য় সংস্করণ)—অধ্যাপক ঋতেন্দ্রকুমার রায়
ভারতের শিক্ষা সমস্যা (৩য় সংস্করণ)—ঐ
শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান—অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ
শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিচালন—অধ্যাপক গৌরদাস হালদার
শিক্ষণ-প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা - ঐ
শিক্ষণ-প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান—ঐ
শিক্ষণ-প্রসঙ্গে ইতিহাস—ঐ
ভারতের শিক্ষা সমস্যা ( আদি ও মধ্যযুগ ) - ঐ

মুদ্রাকর :
শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়
প্রিণ্টাস্মিথ
১১৬ বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা ৬
এবং
শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

ডক্টর ত্রিগুণা সেন

# মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 'থ্রি-ইয়ার ডিগ্রী কোর্স'-এর পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী তিন বৎসরের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'শিক্ষার' দ্বিতীয় পত্র 'শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান' রচিত হল। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার উপযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ রেখে এই পুস্তক রচনা করা হয়েছে।

বিদেশী মনোবিজ্ঞানীদের রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছে। এই প্রসঙ্গে রস্, জেম্স, গ্যাটস, স্ট্যাফোর্ড, উড্‌ওয়ার্থ, মান এবং বোরিং প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের রচিত গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত লেখকদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাছাড়া, যেসব লেখক ইতঃপূর্বে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন তাঁদের পুস্তকগুলি পাঠ করে আমরা উপকৃত হয়েছি, তাঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয় অধ্যায়ক্রমিক সাজিয়ে সরল ও সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে পরিসংখ্যান বিষয়বস্তুটির যাবতীয় বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

হেতমপুর কলেজের গণিতের অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুকুমার চন্দ, এম.এস-সি. পরিসংখ্যান অধ্যায়টি লেখায় সহায়তা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু-একটি ছাপার ভুল রয়ে গেছে, তার জন্য আমরা দুঃখিত, বারান্তরে সংশোধনের ইচ্ছা রইল। পরিশেষে, যাদের জন্য বইখানি লেখা হল তাঁরা উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

ব্যানার্জী পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী পুস্তকখানি প্রকাশের এবং শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না ও শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায় মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থে মুদ্রিত চিত্রগুলি এবং পরিচ্ছদ-পত্রটির জন্য চিত্রকর শ্রীজিতেন দাসগুপ্তকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত**
**খগেন্দ্রকুমার রায়**

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রথম সংস্করণ গেল বৎসর নিঃশেষিত হয়ে যায়। এতে সহকর্মীদের আনুকূল্য এবং শিক্ষার্থীমহলে বইখানির সাদর অভ্যর্থনা সূচিত হয়। বইখানির উন্নতিকল্পে আমাদের নিকট যে যে প্রস্তাব প্রদত্ত হয়েছে, সেগুলি যথাসাধ্য মে ন চলেছি। পাঠ্যসূচীতে নির্ধারিত নয়, কিন্তু পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ের অবতারণা করেছি। এই সংস্করণে 'সহজাত প্রবৃত্তি' সংযোজিত হয়েছে এবং বি. টি. পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে।

অনেক অধ্যায়ই আমরা পুরোপুরি পরিমার্জিত করেছি এবং সম্ভাব্য সকল দিক থেকে বিষয়বস্তুকে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি। ফলে দীর্ঘ সময় আমাদের নিতে হয়েছে এবং পরিণামে বিলম্বে বই প্রকাশিত হল। এজন্য আমরা সত্যই দুঃখিত।

আশাকরি বইখানি শিক্ষার্থীর কাজে লাগবে। সহকর্মীরা বই সম্বন্ধে কোন মতামত জানালে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হবে।

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

ঋতেন্দ্রকুমার রায়

# তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

তৃতীয় সংস্করণে 'শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান' সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জনা করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে কয়েকটি নূতন প্রশ্নোত্তর সংজোযিত হয়েছে। পরিসংখ্যান অংশে যে সব ভুল-ত্রুটি ছিল তা দূরীভূত কোরে নূতন প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে। বি. টি. শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা পৃথক পুস্তক প্রণয়ন করেছি।

বইটির ত্রুটি সংশোধনে বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাণিহাটী বালিকা বিদ্যালয়ের (উচ্চতর মাধ্যমিক) শিক্ষক বন্ধুবর শ্রীদ্বিজমোহন সরকার এম. এ., বি. টি. বইটির নানা সংশোধনকার্যে সহায়তা করেছেন। এজন্য তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

ঋতেন্দ্রকুমার রায়

## SYLLABUS FOR B. A.

# EDUCATION

## Pass Course

### Educational Psychology

*Paper* II ... ... 100 marks

Physiological Basis of mental life.

The child, its needs and the consequent process of development—maturation and learning. Different stages of individual's development and the principal and distinctive characteristics of each stage—physiological, mental (intellectual and emotional) and special with particular reference to childhood and adolescence.

Learning—kinds of learning : Skill and knowledge—imitation and habit formation, the learning process, methods of self-learning and learning in a group—co-operation and competition.

Remembering and forgetting.

Interest and attention, mental work and fatigue.

Individual differences—personality : aspects of personality and their development. Mal-adjustment and its symptoms, behaviour problems and indiscipline.

Assessment of individuals—achievement and performance abilities and interests, examinations and tests—improved types of assessment.

Interpretation of assessment, marks or scores or ratings—the principle of interpretation—the collection and preservation of data for analysis and interpretation—graphical representation—measures of central tendencies and variabilities—ranks and percentiles, concept of correlation.

# সূচিপত্র

## শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান

## চতুর্থ অধ্যায়



## পঞ্চম অধ্যায়

## ষষ্ঠ অধ্যায়



## সপ্তম অধ্যায়

## অষ্টম অধ্যায়



## নবম অধ্যায়

### দশম অধ্যায়



### একাদশ অধ্যায়



### দ্বাদশ অধ্যায়

## ত্রয়োদশ অধ্যায়



## চতুর্দশ অধ্যায়

## পঞ্চদশ অধ্যায়



## ষষ্ঠদশ অধ্যায়

## প্রথম অধ্যায়

# শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ
# ( Nature of Educational Psychology )

### ১। মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ (Nature of Psychology) :

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং মনোবিজ্ঞানের যথার্থ সংজ্ঞা সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সে কারণে প্রথমে আমরা প্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞা বিচার করে দেখব এবং তারপর মনোবিজ্ঞানের স্বরূপের যথার্থ সংব্যাখ্যা দেবার জন্য সচেষ্ট হব।

**(ক) মনোবিজ্ঞান হল আত্মা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of the soul) :** মনোবিজ্ঞানের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল '*Psychology*'; গ্রীক শব্দ '*Psyche*' এবং '*Logos*' থেকে এর উৎপত্তি। Psyche কথাটির অর্থ হল '*soul*' বা আত্মা এবং '*Logos*' কথাটির অর্থ হল *science* বা বিজ্ঞান। সুতরাং ইংরেজী Psychology কথাটির অর্থ দাঁড়াল 'আত্মা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান' (science of soul) মনোবিজ্ঞানী মাহের (*Maher*) মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'মনোবিজ্ঞান হল দর্শনের সেই শাখা যা মানুষের মন বা আত্মা নিয়ে অলোচনা করে।' বস্তুতঃ, তিনি তাঁর সংজ্ঞায় 'মন' এবং 'আত্মা' উভয়কে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। অন্যান্য মনোবিজ্ঞানী যাঁরা মনোবিজ্ঞানের উপরিউক্ত সংজ্ঞা সমর্থন করেন তাঁরাও মনে করেন যে, মনোবিজ্ঞানের কাজ আত্মার উৎপত্তি, স্বরূপ এবং পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা।

কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে মনোবিজ্ঞান আত্মা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক নয় এবং সে কারণে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেন নি। প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞাতে মনোবিজ্ঞানকে দর্শন এবং অধিবিদ্যার (Metaphysics) অংশরূপে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞান হল একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখা, সে কারণে মনোবিজ্ঞানকে দর্শন বা অধিবিদ্যার শাখারূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। এছাড়া, আত্মার যথার্থ স্বরূপ

মনোবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখা, দর্শনের অংশ নয়

সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। সে কারণে আত্মা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, মনোবিজ্ঞান *হল* বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক (empirical); *সেহেতু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের উপরই মনোবিজ্ঞান* নির্ভরশীল। মনোবিজ্ঞান যদি আত্মা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান হয়, তাহলে মনোবিজ্ঞানকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বলা চলে না; কারণ অতীন্দ্রিয় আত্মা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের বিষয়বস্তু নয়। তাহলে মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরূপেও গণ্য করা যেতে পারে না। মনোবিজ্ঞান মনের বাহ্যপ্রকাশ অর্থাৎ মানুষের আচরণ, দেহগত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া প্রভৃতি আলোচনা করে, কারণ এগুলিই পর্যবেক্ষণের ও পরীক্ষণের দ্বারা জানা যায়।

**মনোবিজ্ঞান অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক, সেহেতু মনোবিজ্ঞান আত্মা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান হতে পারে না**

**(খ) মনোবিজ্ঞান মনসম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of the mind.**—*Hoffding*)**:** এই সংজ্ঞাটিকেও মনোবিজ্ঞানের যথার্থ সংজ্ঞারূপে নিরূপণ করা যেতে পারে না। নিম্নোক্ত কারণে এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক নয়।

প্রথমতঃ, মন কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং আত্মা শব্দটিকে কেন্দ্র করে যে মতবিরোধ দেখা যায়, 'মন' শব্দটিকে কেন্দ্র করেও সেইরূপ মতবিরোধ দেখা যায়। মন বলতে মানসিক প্রক্রিয়া, মানসিক প্রক্রিয়ার অন্তরালে কোন স্থায়ী মানসসত্তার অবস্থিতি, বা এই মানসসত্তা ও মানসিক প্রক্রিয়া উভয়কেই বোঝাতে পারে। কিন্তু মনকে কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা এই সংজ্ঞাটিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। সে কারণে মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল বলেন, "মন হল দ্ব্যর্থক শব্দ, এরই সংজ্ঞা দেবার প্রয়োজন আছে।"[1]

**'মন' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক**

দ্বিতীয়তঃ, মনোবিজ্ঞান কি জাতীয় বিজ্ঞান—বিষয়নিষ্ঠ (Positive) না, আদর্শনিষ্ঠ (Normative)—এই সংজ্ঞাটিতে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। মনোবিজ্ঞান বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান; মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যেভাবে ঘটে, সেভাবে সেগুলি ব্যাখ্যা করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। কোন আদর্শের (Norm) আলোকে মনোবিজ্ঞান মানসিক ব্যাপারগুলি ব্যাখ্যা করে না।

**মনোবিজ্ঞান যে বিষয়-নিষ্ঠ এই সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয় নি**

1. "Mind is a vague word, itself in need of definition."
—McDougall : Outlines of Psychology. Eleventh Edition. Page 2

তৃতীয়তঃ, মনোবিজ্ঞানকে শুধু যদি মন সম্পর্কীয় বিজ্ঞান বলা হয় তাহলে অন্যান্য বিজ্ঞান, যেমন,—তর্কবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি থেকে মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না ; কেননা তর্কবিজ্ঞানী, নীতিবিজ্ঞানী প্রভৃতিও 'মন' নিয়ে আলোচনা করে।[1]

মনোবিজ্ঞান 'মন' সম্পর্কীয় বিজ্ঞান হলে তর্কবিজ্ঞান বা নীতি-বিজ্ঞান থেকে তাকে পৃথক করা কঠিন

চতুর্থতঃ, মনোবিজ্ঞান যে মানুষের আচরণ ও দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে—এ সংজ্ঞাতে তারও কোন উল্লেখ নেই।

এই সংজ্ঞায় মানুষের আচরণ ও দেহগত প্রক্রিয়ার কোন উল্লেখ নেই

**(গ) মনোবিজ্ঞান হল চেতনা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of consciousness—*Angell*) :** এই সংজ্ঞাটিও নিম্নোক্ত কারণে সন্তোষজনক নয়।

কি ধরনের বিজ্ঞান বলা হয়নি

প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞায় মনোবিজ্ঞান কি ধরনের বিজ্ঞান—বিষয়নিষ্ঠ না, আদর্শনিষ্ঠ, তা সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয় নি।

দ্বিতীয়তঃ, এই সংজ্ঞাতে 'মন' ও 'চেতনা'—এই উভয় শব্দকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞান চেতনার স্তর ছাড়াও অচেতন ও নির্জ্ঞান (unconscious) স্তর নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুতঃ, মনঃসমীক্ষক (Psycho-analyst) মনে করেন যে, মনের চেতনার স্তর নির্জ্ঞান স্তরেরই বাহ্য আচরণ মাত্র। আসলে নির্জ্ঞান স্তর নিয়েই মন। সেহেতু মনোবিজ্ঞানকে শুধু চেতনা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

'মন' ও 'চেতনা'কে অভিন্ন মনে করা হয়েছে

তৃতীয়তঃ, আচরণবাদীরা (Behaviourists) এই সংজ্ঞার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে মনোবিজ্ঞান হল বস্তুনিষ্ঠ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সেহেতু মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল প্রাণীর আচরণ (behaviour)। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু যদি 'চেতনা' হয় তাহলে মনোবিজ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Objective science) রূপে গণ্য করা সম্ভব হয় না, কেননা 'চেতনা' বাহ্যপ্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু নয়। তাছাড়া, ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের চেতনাকেই সোজাসুজি

আচারণবাদীদের মতে প্রাণীর আচরণই মনোবিজ্ঞানেরআলোচ্য বিষয়বস্তু, চেতনা নয়

1. এই প্রসঙ্গে ম্যাকডুগাল (McDougall) বলেন, "Secondly there are other sciences of mind than Psychology, such as logic and metaphysics and epistemology and theology, all of which claim to tell us about mind or minds." McDougall : Outlines of Psychology, P. 3

জানতে পারে, অপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার বাহ্য-আচরণের ভিত্তিতে তার চেতনাকে অনুমান করে নিতে হয়, অথচ মনোবিজ্ঞানী কতকগুলি সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেগুলি সকলের মন সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

ম্যাকডুগ্যাল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীগণ, যাঁরা আচরণবাদী বা মনঃসমীক্ষক নন, তাঁরাও এই সংজ্ঞার বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন। তাঁদের মতে মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে প্রাণী-মনোবিজ্ঞান, শিশু-মনোবিজ্ঞান এবং বিকারগ্রস্ত মনসম্পর্কীয়বিজ্ঞানকে (Abnormal Psychology) মনোবিজ্ঞানের শাখারূপে গণ্য করা যাবে না। কেননা প্রাণী, শিশু বা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্তর্দর্শনের (introspection) সহায়তায় নিজের মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন এদের আচরণ ও দেহগত প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা। সে কারণে এই সংজ্ঞার সমালোচনা করে ম্যাকডুগাল বলেছেন, 'মনোবিজ্ঞানের মনে করা উচিত নয় চেতনা প্রবাহের আত্মদর্শনমূলক ব্যাখ্যাই তার একমাত্র কাজ; এ হল কাজের প্রাথমিক অংশমাত্র। এরূপ আত্মদর্শনমূলক ব্যাখ্যা, এরূপ বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান কখনও বিজ্ঞান হতে পারে না বা ব্যাখ্যামূলক বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হতে পারে না।'[1]

*ম্যাকডুগাল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের মতে এই সংজ্ঞা প্রাণী মনোবিজ্ঞান, শিশু-মনোবিজ্ঞান ও বিকারগ্রস্ত মনসম্পর্কীয় বিজ্ঞানকে মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করে না*

তাছাড়া, মনোবিজ্ঞান যে প্রাণীর আচরণ এবং দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে—এই সংজ্ঞাতে তার কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই।

**(ঘ) মনোবিজ্ঞান হল মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of human behaviour—*Watson*) :** মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটিও সন্তোষজনক নয়। ওয়াটসন্ এবং তাঁর অনুরাগীবৃন্দের মতে 'আচরণ'ই হল মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু। আচরণবাদীরা নিছক যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই মানুষের এই আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ম্যাক্‌ডুগাল উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই মনোবিজ্ঞানকে আচরণসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে আচরণ মানুষের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়েরই বাহ্য প্রকাশ।

*ওয়াট্‌সন প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীগণ মানুষের আচরণের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন*

1. "Psychology must not regard the introspective description of the stream of consciousness as its whole task but only as a preliminary part of its work. Such introspective description, such 'Pure Psychology' can never constitute a science or at least can never rise to the level of an explanatory science."—McDougall. Outlines of Psychology, Page 7

ওয়াট্‌সন মনোবিজ্ঞান থেকে মন, চেতনা এবং মানসিক প্রক্রিয়াকে বর্জন করেছেন। তাঁর মতে অন্তর্দর্শন মনোবিজ্ঞানের যথার্থ পদ্ধতি নয়। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ যা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি, তাই মনোবিজ্ঞানের ও পদ্ধতি। এই পদ্ধতির দ্বারা আচরণের প্রকৃতি ও নিয়ম নির্ণয় করা মনোবিজ্ঞানের কাজ।

উদ্দীপক ক্রিয়া করার জন্য জীবদেহে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাই হল 'আচরণ'

আচরণ বলতে ওয়াট্‌সন কি বোঝেন তা জানা দরকার। কোন উদ্দীপক (stimulus) মানুষের দেহযন্ত্রের উপর ক্রিয়া করার জন্য দেহে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাই হল আচরণ। অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে তখন স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত হওয়ার ফলে দেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং এই প্রতিক্রিয়াই হল আচরণ। আচরণবাদ অনুসারে মনোবিজ্ঞান হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া (stimulus-response) সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। মানুষের

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ জীবদেহের প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়

সব আচরণই, এমন কি হাঁচি, কাশি থেকে দর্শনের বই লেখা পর্যন্ত সবই 'উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া'—এই সাধারণ সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ জীবদেহের প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। জীবদেহ এবং তার আচরণের

জীবের আচরণই মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু

অতিরিক্ত মন বা আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। চেতনারও কোন অস্তিত্ব নেই, মানসিক প্রক্রিয়াই আসলে দৈহিক প্রক্রিয়া। জীবের আচরণই হল মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু, কারণ এই আচরণই পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু।

উপরিউক্ত অভিমতের সমালোচনায় একথা বলা যেতে পারে যে, মনোবিজ্ঞান

আচরণবাদের সমালোচনা

কেবলমাত্র আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হতে পারে না। মানুষের আচরণ তার চেতন মনেরই বাহ্য প্রকাশ। অন্তর্দর্শনের সাহায্যেই এই অভিজ্ঞতাকে জানা যায়। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে

মানুষের আচরণ তার চেতনারই বাহ্য প্রকাশ

আমরা আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে জানি এবং এই সব মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের কোন কোন আচরণের সঙ্গে সংযুক্ত সেগুলি লক্ষ্য করি। পরে

চেতন 'মন'কে বাদ দিলে উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াকে কখনও ব্যাখ্যা করা যায় না

অপরের আচরণ দেখে তাদের মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপগুলি অনুমান করি। সুতরাং আচরণ কখনও মানসিক প্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত হতে পারে না। আচরণবাদীরা চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু দেহের আচরণকে দেহ কখনও

প্রত্যক্ষ করতে পারে না। চেতন মনকে বাদ দিলে উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াকে কখনও ব্যাখ্যা করা যায় না।

মানুষ অচেতন জড়বস্তু নয়। তার আচরণ যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। যখন কোন উদ্দীপক মানুষের উপর ক্রিয়া করে তখন কিভাবে আচরণের মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া ঘটবে, মানুষের মনই তা অনেক সময় নির্ধারণ করে। আচরণবাদীরা মনে করেন যে, ব্যক্তির আচরণ কেবলমাত্র পরিবেশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এ সত্য নয়, ব্যক্তির উপর পরিবেশের প্রভাব থাকলেও ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা, তার কর্ম পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে। উদ্দেশ্য সাধনের যে অভিপ্রায় তাকে বাদ দিয়ে মানুষের কর্মকে নিছক দেহগত প্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করা চলে না।

উদ্দীপক জীবদেহে যে প্রতিক্রিয়া ঘটায়, অনেক সময় মনই তা নির্ধারণ করে

আচরণবাদীরা 'আচরণ'কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে মানুষ একটা দেহবিশিষ্ট যন্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং আচরণের এই জাতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শারীর বিজ্ঞানের (Physiology) কোন পার্থক্য থাকে না। মনোবিজ্ঞান মনেরই ব্যাখ্যা, নিছক জীবদেহের ব্যাখ্যা নয়।

আচরণবাদীরা মানুষকে দেহবিশিষ্ট যন্ত্রে পরিণত করেছেন

**(ঙ) মনোবিজ্ঞান হল জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (Psycbology is the positive science of the behaviour of living things—*McDougall*)[1] :** ম্যাকডুগালের উপরিউক্ত সংজ্ঞাটির সঙ্গে ওয়াট্‌সন প্রমুখ আচরণবাদীদের প্রদত্ত সংজ্ঞার ভাষাগত সাদৃশ্য থাকলেও, ম্যাকডুগাল প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অন্যান্য সংজ্ঞার তুলনায় অনেকাংশে ত্রুটিমুক্ত।

প্রথমতঃ, ম্যাকডুগাল আচরণ পদটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। ওয়াট্‌সন প্রমুখ মনোবিদ্‌রা জীবের আচরণকে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে 'উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া' (stimulus-response) সূত্রের সাহায্যেই জীবদেহের আচরণ ব্যাখ্যা করা চলে। জীবদেহ যন্ত্রমাত্র এবং যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্কের (mechanical causation) মাধ্যমেই জীবের আচরণের ব্যাখ্যাই যুক্তিসংগত। যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্ক পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারাই কার্যকে ব্যাখ্যা করে, কোন উদ্দেশ্যের সহায়তা গ্রহণ করে না। ম্যাকডুগালের মতে নির্জীব জড়বস্তু সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা

ম্যাকডুগাল জীবের আচরণকে উদ্দেশ্য-মূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করেছেন

1. McDougall—Outlines of Psychology : Page 19

নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু জীবের আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-determination) ক্ষমতা আছে, জীব নিজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সচেতনভাবে অনুসরণ করে এবং নিজের সক্রিয় প্রচেষ্টার সহায়তায় সেই লক্ষ্যকে লাভ করতে চায়। সুতরাং জীবের আচরণের ব্যাখ্যার জন্য উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ সম্পর্কের (Teleological Causation) আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার। ম্যাকডুগাল বলেন, "উদ্দেশ্যর প্রকাশ বা কোন লক্ষ্য লাভ করার প্রচেষ্টাই হল আচরণের লক্ষণ; এবং আচরণই জীবের বৈশিষ্ট্য।"[1]

ম্যাকডুগালের মতে আচরণ মনেরই বাহ্য প্রকাশ

দ্বিতীয়তঃ, ম্যাকডুগাল জীবের আচরণকে মনের বাহ্য-প্রকাশরূপেই গ্রহণ করেছেন। জীবের আচরণের মাধ্যমে মনকে জানাই যে মনোবিজ্ঞানের কাজ, ম্যাকডুগালের সংজ্ঞায় তার পরোক্ষ স্বীকৃতি আছে।

বিতর্কমূলক তাত্ত্বিক আলোচনা পরিহার

তৃতীয়তঃ, 'আত্মা', 'মন', 'চেতনা' প্রভৃতি বিতর্কমূলক শব্দ পরিহার করার জন্য, এই সংজ্ঞা বিতর্কমূলক তাত্ত্বিক আলোচনার কোন অবকাশ রাখে নি।[2]

'মন' বা 'চেতনা'কে মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

চতুর্থতঃ, মনোবিজ্ঞানকে যদি 'মন' বা চেতনা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান বলা হয় তাহলে জীবের আচরণ মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একথা সুস্পষ্ট করে বলা হল না; বরং আচরণ মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু মনের বাহ্য-প্রকাশরূপে আচরণই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, একথা বলা হলে মনকে বা চেতনাকে এই সংজ্ঞার বহির্ভূত করা হয় না।

মনোবিজ্ঞান যে বিষয়-নিষ্ঠ বিজ্ঞান তার সুস্পষ্ট উল্লেখ

পঞ্চমতঃ, মনোবিজ্ঞান যে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়, বিষয়নিষ্ঠ কথাটির ব্যবহারের ফলে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনের কার্যকলাপ যেভাবে ঘটে, মনোবিজ্ঞান তাই আলোচনা করে; কোন আদর্শের আলোকে তাকে ব্যাখ্যা করে না।

---

1. "The manifestation of purpose or the striving to achieve an end is, then, the mark of behaviour, and behaviour is the characteristic of living things." —McDougall: Psychology: Page 88

2. "The definition of psychology as the positive science of behaviour seems, then, preferable to any other..... because it makes use of no ill defined and problematical notions such as mind, or soul or consciousness, but only familiar fact of observation." Ibid: Page 20

পরিশেষে, জীবের আচরণ প্রত্যক্ষগোচর, সেহেতু মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু যে অতীন্দ্রিয় কোন বিষয় নয় এবং মনোবিজ্ঞানের পক্ষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো যে সার্বিক বা সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব—এই সংজ্ঞায় তাও স্বীকার করা হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কোন অতীন্দ্রিয় বিষয় নয়

**(চ) মনোবিজ্ঞান হল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of the activities of the individual in relation to his environment—*Woodworth*)** : নিম্নোক্ত কারণবশতঃ এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক।

প্রথমতঃ, উডওয়ার্থ (*Woodworth*)-এর মতে মানুষের আচরণ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার জন্য প্রকাশ পায়, সেজন্য সেই আচরণকে বুঝতে হলে পারিপার্শ্বিককে বুঝতে হবে। তিনি মানুষের ক্রিয়াকলাপ বা আচরণের সঙ্গে পারিপার্শ্বিককে যুক্ত করে মানুষের ক্রিয়াকলাপের সঠিক ব্যাখার পথ নির্দেশ করেছেন।

উডওয়ার্থ মানুষের ক্রিয়াকলাপকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন

দ্বিতীয়তঃ, এই সংজ্ঞা স্বীকার করে নেয় যে, মনোবিজ্ঞান বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়। কোন আদর্শের আলোকে নয়, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবযুক্ত মানুষের ক্রিয়াকলাপের যথাযথ ব্যাখ্যা করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ।

মনোবিজ্ঞান যে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান তা স্বীকার করা হয়েছে

তৃতীয়তঃ, উডওয়ার্থ 'আচরণ' বা 'মন' শব্দটির প্রয়োগ না করে 'ক্রিয়াকলাপ' (activities) কথাটি প্রয়োগ করেছেন। 'ক্রিয়াকলাপ' কথাটিকে তিনি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। 'ক্রিয়াকলাপ' কথাটির মাধ্যমে মনোবিজ্ঞান যে সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপ, যেমন—জ্ঞানসম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপ, যথা—প্রত্যক্ষণ, কল্পনা, চিন্তা ; আবেগ-সম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপ, যথা—হাসা, কাঁদা ; গতিসম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপ, (motor activities), যথা—হাঁটা, কথা বলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে—এই সংজ্ঞায় তা স্বীকার করা হয়েছে। অনুভূতিও একপ্রকার ক্রিয়াকলাপ। উডওয়ার্থের মতে জীবনের যে-কোন প্রকাশই তার ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত।

'ক্রিয়াকলাপ' কথাটিকে 'ব্যাপক' অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে

চতুর্থতঃ, উডওয়ার্থ 'ব্যক্তি' (individual) কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'ব্যক্তি' বলতে কি কেবল 'দেহযন্ত্র'টিকেই বুঝব? তাহলে অবশ্য এই সংজ্ঞাটি দোষদুষ্ট হয়ে পড়ে। ব্যক্তি বলতে, আচরণবাদীদের মতন তিনি মনকে বর্জন করেন নি, অথবা কেবলমাত্র দেহযন্ত্রটিকেই বোঝেন নি। 'ব্যক্তি' বলতে তিনি শুধু দেহকে না বুঝে, দেহ ও মনের সমন্বয়ে যে ব্যক্তি তাকেই বুঝেছেন। ব্যক্তির মন তার দেহের মাধ্যমেই কাজ করে। ব্যক্তির আচরণ বা ব্যবহার তার দৈহিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং একদিকে মানসিক প্রক্রিয়া ও অপরদিকে তার দৈহিক আচরণ—এই উভয় বিষয়কেই এই সংজ্ঞায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

**'ব্যক্তি' বলতে দেহ ও মনের সমন্বয়ে যে ব্যক্তি তাকেই বোঝান হয়েছে**

সর্বশেষে, 'পারিপার্শ্বিক' (environment) কথাটি নির্দেশ করে যে, মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বহির্জগতের একটা সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ উভয়ের প্রভাবই ব্যক্তির মনের উপর ক্রিয়া করে।

**'পারিপার্শ্বিক' শব্দটি মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বহির্জগতের সুস্পষ্ট সম্পর্ক নির্দেশ করে**

## মনোবিজ্ঞানের সন্তোষজনক সংজ্ঞা (Satisfactory definition of Psychology) :

প্রশ্ন হল, মনোবিজ্ঞানের পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে কোন্‌টিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি? পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলির প্রত্যেকটির কিছু না কিছু দোষত্রুটি আছে সত্য, তাহলেও কোনটিই একেবারে ভ্রমাত্মক নয়। এক একটি সংজ্ঞা এক একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য প্রত্যেকটি সংজ্ঞার মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে। কিন্তু কোন সংজ্ঞাই পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে নি। পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের অভিমতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আমরা এইবার মনোবিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করতে পারি। এই সংজ্ঞাটি হল, "**মনোবিজ্ঞান জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান যা জীবের আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভাগ, গতি-প্রকৃতি, নিয়ম, কারণ ও পরিণাম নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করে এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত যে দেহগত প্রক্রিয়া সেগুলি বর্ণনা করে।**"

**মনোবিজ্ঞানের সন্তোষজনক সংজ্ঞা**

নিম্নোক্ত কারণে এই সংজ্ঞাটিকে মনোবিজ্ঞানের একটি সন্তোষজনক সংজ্ঞারূপে গণ্য করা যেতে পারে :

প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (Positive science) আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Normative science) নয় ; কেননা, মনোবিজ্ঞান কোন আদর্শের আলোকে তার আলোচ্য বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে না।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের অভিমতানুযায়ী মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব ঘটনা হওয়া উচিত অর্থাৎ সে ঘটনা যেন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের বিষয়বস্তু হতে পারে। আচরণ মনের বাহ্যপ্রকাশ এবং এই আচরণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের বিষয়বস্তু। এই সংজ্ঞাতে মনোবিজ্ঞান জীবের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে—এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, এই সংজ্ঞায় 'আচরণ'কে আচরণবাদীরা (Behaviourists) যে অর্থে গ্রহণ করেছেন সেই অর্থে গ্রহণ করা হয় নি। আচরণের মাধ্যমে জীবের 'মন'কে জানাই যে মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং সেহেতু মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা যে মনোবিজ্ঞানের কাজ, তাও এই সংজ্ঞায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ, 'জীব' কথাটি বলতে এখানে 'পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত' যে জীব তাকেই বুঝতে হবে এবং 'আচরণ' বলতে পরিবেশ ও জীবের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ফলে জীবের মধ্যে যে আচরণের উদ্ভব ঘটে তাকে বুঝতে হবে।

পঞ্চমতঃ, জীবের 'আচরণ' (behaviour) যে মনেরই প্রকাশ এই সংজ্ঞায় তারও উল্লেখ আছে।

সর্বশেষে, মনোবিজ্ঞান যে 'দেহগত প্রক্রিয়া' নিয়ে আলোচনা করে এই সংজ্ঞাতে তারও উল্লেখ রয়েছে।

## ২। শিক্ষার স্বরূপ (Nature of Education) :

ইংরেজী '*Education*' শব্দ ল্যাটিন *educere* শব্দ থেকে উদ্ভূত। '*educere*' কথার অর্থ হচ্ছে কোন কৌশল আয়ত্ত করা বা তথ্য সংগ্রহ করা।

**শিক্ষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ**

আদিমকালে মানুষ জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য যে তথ্য আহরণ করত তাকেই বলা হত শিক্ষা। শিক্ষার এই প্রাচীন ব্যাখ্যাকে বর্তমানে সাধারণ অর্থে শিক্ষার যথার্থ স্বরূপ বলে গণ্য করা

হয়। 'শিক্ষা' বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে বিদ্যালয়ে বা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান। অর্থাৎ মানুষের যে অভিজ্ঞতা আমরা পুঁথিপত্রের সাহায্যে লাভ করি সে অভিজ্ঞতা বা তথ্যই হচ্ছে শিক্ষা। এ অর্থে শিক্ষাদ্বারা আমরা শিক্ষার্থীকে বিশেষ কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত করে তুলি। বলা বাহুল্য, এ হল শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ। এ শিক্ষা মানুষের জীবনের বিশেষ স্তরে সীমাবদ্ধ।

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ

শিক্ষার এই সংকীর্ণ অর্থ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের জাতিভেদ। যারা লিখতে পড়তে শিখেছে, গ্রন্থাধ্যয়ন যারা অভ্যাস করেছে তারাই শিক্ষিত। আর অন্য দিকে, যারা লিখতে পড়তে শেখেনি তারা অশিক্ষিত। শিক্ষা এখানে আক্ষরিক জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা লিখতে পড়তে শিখে বিশেষ বিদ্যাভ্যাস করেছে তারা জানে শিক্ষা তাদের অধিকার, অন্যদিকে যারা এ আক্ষরিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত তারা শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ

কিন্তু শিক্ষার স্বরূপ এ সংকীর্ণ অর্থের মধ্যে নিহিত নেই। শিক্ষা জীবনের সমপর্যায়ভুক্ত। শিক্ষার পরিধি সমগ্র জীবনব্যাপী। শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত বা ব্যাপক অর্থ হল জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনে। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তিবিশেষের বা জীবনের বিশেষ স্তরে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি মানুষের জীবনে চলেছে শিক্ষার অন্তহীন, বিরামহীন প্রক্রিয়া। শিক্ষা প্রতি মানুষের জন্মগত অধিকার। অক্ষর জ্ঞান না থাকলেও, শিক্ষিত হতে দোষ নেই। তাই ব্যাপক অর্থে, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বলে কোন ভেদ মানুষের মধ্যে নেই। বিশ্বপ্রকৃতিই একমাত্র শিক্ষক এবং প্রতিটি মানবসন্তান জীবনভর শিক্ষার্থী।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা মানুষের জীবন-বিকাশের সংগে সমার্থক। পৃথিবীতে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই তার জীবনে চলে বিকাশের লীলাখেলা, আর শেষ হয় মৃত্যুতে। শিক্ষারও শুরু জন্ম থেকেই আর শেষ মৃত্যুতে।

সকল আচরণই শিক্ষা নয়

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আচরণের পরিবর্তন যদি অবাঞ্ছিত হয়, তবে সে পরিবর্তন শিক্ষা নয়। যে অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম সে অভিজ্ঞতাই শিক্ষা। কিন্তু সে পরিবর্তন যেন নীতিশাস্ত্র-সম্মত হয়, মানুষের জীবনে বাঞ্ছনীয় হয়, সামাজিক আদর্শ লাভের পক্ষে সহায়ক হয়। মিথ্যা বলা, চুরি করা, প্রবঞ্চনা করা প্রভৃতি

অপরাধমূলক অভিজ্ঞতাও আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনে, আচরণে সহায়তা করে, বাস্তবে কাজে লাগে। তা-বলে এ ধরনের অসামাজিক, অনৈতিক আচরণগুলিকে আমরা 'শিক্ষা' বলে অভিহিত করতে পারি না।

আসল কথা, ব্যক্তির ও সমাজের অস্তিত্ব সংরক্ষণই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তির ও সমাজের প্রগতিও শিক্ষার অন্যতম কাজ। ব্যক্তির আচরণকে ব্যক্তি ও সমাজের আদর্শ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করার প্রশ্নও এসে পড়ে। সুতরাং এ দুয়ের অস্তিত্ব এবং অগ্রগতির প্রয়োজনে সমাজ-স্বীকৃত আচরণকে গ্রহণ করাই শিক্ষা।

## ৩। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ (Nature of Educational Psychology) ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলি প্রয়োগের ফলে পৃথক বিষয় রূপে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা-বিশেষ। 'শিক্ষা' বলতে আমরা মানবের আচরণের সার্থক ও সংহত পরিবর্তন বুঝি, আর মনোবিজ্ঞানকে আমাদের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলে অভিহিত করি। উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে, বস্তুনিষ্ঠভাবে (objectively) মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা আচরণের স্বরূপ, গতি ও নীতি আলোচনা করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলিকে প্রয়োগ করে শিক্ষাদানে সহায়তা করা এবং শিক্ষাদান প্রসূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়-বস্তুর পরিধি মনোবিজ্ঞানের চাইতে সংকীর্ণ। মানবমনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনার সুযোগ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে নেই। শিক্ষাদানপদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত কিনা বা শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবমনের আচরণের মৌলিক নীতিকে লঙ্ঘন করে কিনা, শিক্ষাকে কিভাবে আকর্ষণীয়, আয়াসহীন করে তোলা যায়—এসব বিষয়েই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচনা সীমাবদ্ধ। যদিও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা এতে করতে হয়, তবুও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে শিক্ষামূলক আচরণের আলোচনাই প্রধান। তাছাড়া, দৃষ্টিভঙ্গীর (angle of vision) দিক থেকেও মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের মধ্যে

**মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞানের শাখা বিশেষ**

পার্থক্য বিদ্যমান। মনোবিজ্ঞান আচরণের গতি-প্রকৃতি ও মৌলিক নিয়ম আবিষ্কারেই ব্যস্ত। কিন্তু শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, কিভাবে নতুন আচরণ সম্পাদন করা যায়, কিভাবে স্বল্প সময়ে দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা প্রদান করা যায় ইত্যাদি। সুতরাং একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তার আলোচ্য বিষয়বস্তুর আলোচনা করে।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞানের নিছক প্রয়োগশাস্ত্র নয়। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একমাত্র কর্তব্য নয়। একথা সত্য যে মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে শিক্ষায় বিশেষভাবে প্রয়োগ (application) করা থেকেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলাদা শাস্ত্র হিসেবে জন্ম লাভ করেছে। কিন্তু তবুও তা মনোবিজ্ঞানের নিছক ফলিত (applied) রূপ নয়। কারণ মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করার সময় শিক্ষার যেসব বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি হয়, শিক্ষণের (learning) যে বিচিত্র গতিপ্রকৃতি ধরা পড়ে, তার সমাধান এবং সংব্যাখ্যানও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রগুলিকেই নির্ভর করে গড়ে ওঠে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গবেষণার গভীর ও ব্যাপক ক্ষেত্র, নিজস্ব গঠন (structure) এবং কর্মের পরিধি (Scope)।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিস্তৃত গবেষণা ক্ষেত্র

## ৪। শিক্ষাতত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞান ( Education and Psychology ) :

**(ক) শিক্ষাতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation between Education & Psychology) :** আমরা শিক্ষার স্বরূপ আলোচনা করেছি। শিক্ষার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি, যে অভিজ্ঞতা কোন-না-কোন ভাবে আমাদের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম, সে অভিজ্ঞতাই শিক্ষা। আর মনোবিজ্ঞান হল, মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। অর্থাৎ মানুষের আচরণের মাধ্যমে মানসিক ক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি বা সূত্র নির্ধারণই মনোবিজ্ঞানের কাজ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ দুটি শাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক শুধু নিবিড় তা নয়, উভয় শাস্ত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানবসন্তানকে সুন্দর এবং সার্থক আচরণে অভ্যস্ত

করা শিক্ষাতত্ত্বের উদ্দেশ্য। সুতরাং আচরণের ব্যবহারিক বা প্রয়োগমূলক দিক হল শিক্ষাতত্ত্বের বিষয়বস্তু। এজন্য শিক্ষাতত্ত্বকে আচরণের প্রয়োগশাস্ত্র বলা হয়। অর্থাৎ আচরণের মৌলিক সূত্রের জ্ঞান শিক্ষাতত্ত্ব মনোবিজ্ঞান থেকেই গ্রহণ করে এবং নতুন আচরণ সৃষ্টি করতে বা আচরণে অভিপ্রেত পরিবর্তন আনতে প্রয়োগ করে। এ দিক থেকে শিক্ষাতত্ত্ব মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। আবার মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে শিক্ষাতত্ত্ব মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলির যাথার্থ্য বিচার করে। এদিক থেকে শিক্ষাতত্ত্বের কাছে মনোবিজ্ঞান ঋণী।

**(খ) শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Psychology in Education)ঃ** মনোবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির জ্ঞান প্রতি শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদের কাছে অপরিহার্য। কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানই শিক্ষাদান কার্যে যথেষ্ট নয়। প্রাচীনপন্থী শিক্ষকগণ নিজেদের পাণ্ডিত্য বা গ্রন্থ-জ্ঞানের উপরই গুরুত্ব দিতেন, অর্থাৎ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের গভীরতাকেই যথার্থ শিক্ষার মাপকাঠি রূপে গণ্য করা হত। কিন্তু যে শিক্ষা গ্রহণ করবে তার কোন বিবেচনা তাঁদের শিক্ষাতত্ত্বে ছিল না। অ্যাডাম্‌স (*Adams*) একটি সুন্দর কথা বলেছেনঃ 'The teacher teaches John Latin'—এই বাক্যটিতে শিক্ষাক্রিয়ার দুইটি কর্ম রয়েছে। একটি 'জন', অন্যটি 'লাটিন'। শিক্ষকের লাটিন ( শিক্ষার বিষয়বস্তু ) সম্বন্ধে যেমন গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনি 'জন' সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার। জনের সম্পর্কে জ্ঞান থাকা মানে জনের মানসিক গঠন, প্রকৃতি, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকা। সুতরাং শিক্ষাদানকার্যে শিক্ষকের 'লাটিন' জানাই একমাত্র কথা নয়, তার সঙ্গে 'জনকে'ও জানতে হবে। আর এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের তথ্যই তাকে সহায়তা করবে।

শিক্ষাকে আমরা তিনটি দিক থেকে বিবেচনা করিঃ শিক্ষার লক্ষ্য (aims of education), শিক্ষার বিষয়বস্তু (subject-matter of education), শিক্ষার পদ্ধতি (methods of teaching)। শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে শিক্ষাতত্ত্ব বা শিক্ষাদর্শন আলোচনা করে। মানুষের জীবনদর্শনই তখন শিক্ষার উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। জীবন ও বিশ্ব সম্বন্ধে দার্শনিকগণ যে আলোচনা করেন, সে আলোচনা শিক্ষার আদর্শ নিরূপণ ও পথ পরিক্রমা নির্দেশে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপঃ ভাববাদ বিশ্বাস করে, এই বিশ্ব এক পরমসত্তার

প্রকাশ। সে সত্তা ভাবমূলক এবং অবিনশ্বর, সত্য ও অনন্ত। পরমসত্তার সঙ্গে অভেদত্ব উপলব্ধি করাই জীবনের লক্ষ্য ও মুক্তি। আর শিক্ষার উদ্দেশ্যও এই পরমসত্তার জ্ঞান লাভ করা। অন্যদিকে জড়বাদ এই দৃশ্যমান জড়জগৎকেই মৌলিক সত্তা বলে গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে যে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে এনে ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলে নিয়োজিত করাই আমাদের লক্ষ্য। আর শিক্ষা এ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে দর্শনশাস্ত্র প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করে।

কিন্তু তা বলে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের কি কোন বক্তব্য নেই ? একথা স্বীকার্য যে প্রত্যক্ষভাবে মনোবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে না। কিন্তু পরোক্ষভাবে মনোবিজ্ঞানের উপর শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়টি নির্ভরশীল। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করাই শিক্ষাতত্ত্বের একমাত্র সমস্যা নয়, তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা তার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে একমাত্র সহায়ক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। কিভাবে শিক্ষার্থী এসব উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করবে তা মনোবিজ্ঞানই আলোচনা করে। তাছাড়া, দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত আদর্শগুলি মানবমনের মৌলিক নীতিকে লঙ্ঘন করে কিনা এসব মনোবিজ্ঞানই স্থির করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন ইউরোপে বিশ্বাস করা হত যে পাপ থেকেই আমাদের জন্ম, অতএব শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে পাপমোচন, তাই মানব-শিশুকে কঠিন শাসন ও রূঢ় শৃঙ্খলায় রাখা চাই। আমাদের দেশে ধারণা ছিল মানবের শত্রু হচ্ছে ষড়রিপু, অতএব ইন্দ্রিয়নিচয়কে দমন করা চাই। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এ ধরনের মানসিক গতি ও প্রকৃতিবিরোধী বক্তব্যকে বাতিল করে দিয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানেরও এক ভূমিকা রয়েছে যদিও তা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ।

শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে ? কি কি আমরা শিখব, এটা নির্ভর করে কোন্ উদ্দেশ্য আমরা শিক্ষায় চরিতার্থ করতে যাচ্ছি। যদি ভাববাদী আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকি, তবে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিই হবে আমাদের প্রধান পাঠ্য বিষয়। আবার জড়বাদী দর্শন যদি অনুসরণ করি তবে জড়জগতের বিষয়গুলিই হবে আমাদের পাঠ্যবিষয়। সুতরাং শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণে দর্শনই প্রধান সহায়ক। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানেরও বক্তব্য রয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু মানসিক বিকাশে কতটুকু সহায়ক, শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী কোন্ কোন্ বিষয় তাকে শেখাতে হবে, এসব বিষয়ে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানই আলোচনা করে।

কিন্তু শিক্ষা-পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও স্বতন্ত্র অধিকার। প্রতিটি শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি যে বিষয় শিক্ষা দিতে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে তাঁর নিজস্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করে না। কেননা, শিক্ষার্থীকে কিভাবে মনোযোগী করে তোলা যায়, কি ভাবে তার আগ্রহের সঞ্চার করা যায়, তার গ্রহণ-ক্ষমতা কতটুকু, অর্থাৎ স্বল্পতম সময়ে কিভাবে শিক্ষাদান করা যায়, আর সে শিক্ষা শিশু-মনে কিভাবে দীর্ঘস্থায়ী হবে—এসব প্রশ্ন প্রত্যেক শিক্ষককেই বিব্রত করে। আর সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতির উদ্ভাবন এখানে সহায়ক। শিক্ষামনোবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এই শিক্ষাদান পদ্ধতিকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

শুধু তাই নয়, নানাদিক থেকে মনোবিজ্ঞানের গবেষণা আজ শিক্ষাকে সার্থক, আয়াসহীন, প্রাণবন্ত ও কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা করছে। আমরা এক্ষণে সংক্ষিপ্তভাবে শিক্ষার সহায়ক মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি গবেষণার উল্লেখ করছি। শিক্ষাতত্ত্ব এ গবেষণাগুলির উপর নিভরশীল।

**(১) ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতি (Principle of individual difference) :** গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক পার্থক্যের কোন বিবেচনা করা হত না। গ্রহণ-ক্ষমতা, আবেগ, আগ্রহ এসব দিক দিয়ে বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন। শিশুদের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতিগত বৈষম্য। আর সে বৈষম্য অনুযায়ী শিক্ষাকে আজ ব্যক্তিমুখী (individualised) করে তোলা হচ্ছে।

**(২) শিক্ষণের নিয়মাবলী (Principle of learning) :** আধুনিক মনোবিজ্ঞান দেখিয়েছে, শিক্ষার বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা শিক্ষা লাভ করি। গতানুগতিক শিক্ষায় আমাদের ধারণা ছিল বক্তৃতার দ্বারাই সব বস্তুকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষাদানের একটি পূর্ব শর্ত হল শিক্ষণের নিয়মাবলী জানা।

**(৩) ব্যক্তির ক্রমবিকাশের নিয়ম (Developing or Genetic method) :** শিক্ষা ব্যক্তির জীবন বিকাশের সঙ্গে সমার্থক। আর ব্যক্তির জীবনে বিকাশের বিভিন্ন স্তর (stages) বর্তমান। শিক্ষা এই বিভিন্ন স্তরেরই অনুগামী হবে। আমরা যদি শিশুর মধ্যে পরিণত মানুষের বুদ্ধিশীলতা আশা করি এবং সেভাবে শিক্ষাদান করি তবে শিক্ষা সেখানে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং শিশুর শৈশব স্তরে শিশুকে ইন্দ্রিয়ানুশীলনের শিক্ষা দেওয়াই সঙ্গত।

**(৪) বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ (Nature & Measurement of Intelligence) :** শিশুর শিক্ষা গ্রহণ নির্ভর করে তার বুদ্ধির উপর। সুতরাং শিক্ষাদান কালে বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ জানা দরকার। শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের ক্ষিপ্রতা তার বুদ্ধির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণা বুদ্ধির প্রকৃতি এবং পরিমাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদের উপহার দিয়েছে। আর এসব তথ্য অবলম্বন করে বুদ্ধি পরিমাপের নানা পন্থা ও যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকের শিক্ষাদানের জন্য এগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

**(৫) সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct), প্রক্ষোভ (Emotion,) বংশধারা (Heredity) এবং পরিবেশ (Environment) ইত্যাদি :** শিক্ষা অনেকাংশে ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, বংশধারা এবং পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ, শিক্ষা শুধু একদিক থেকেই ব্যক্তির উপর প্রতিক্রিয়া করে না, ব্যক্তির প্রক্ষোভ, প্রকৃতি, পরিবেশ ও বংশধারা ইত্যাদিও শিক্ষার উপর প্রতিক্রিয়া করে ও প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এসব তথ্য আলোচনার দ্বারা শিক্ষার পথকে সার্থক করে তুলেছে।

**(৬) মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিমাপ পদ্ধতি (Psychological Testing) :** আধুনিক মনোবিজ্ঞান শুধু বুদ্ধির পরিমাপের পন্থা আবিষ্কার করেনি। তার অন্তহীন গবেষণার ফলে আমরা মানব মনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বস্তুগতভাবে অনেক তথ্য জেনেছি। শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণে কতটুকু সার্থকতা লাভ করল, অর্থাৎ, তার শিক্ষাগ্রহণ সফল হল কিনা এসব পরিমাপ করার ব্যবস্থা করেছে আধুনিক মনোবিজ্ঞান। একে বলা হয় লব্ধশিক্ষার পরীক্ষা (Educational Testing)। তাছাড়া, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার লক্ষণ, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদিও মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিমাপ করা যায়। এসব গবেষণা কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন দ্বার খুলে দেয়নি, শিক্ষকের কাছেও উদ্ঘাটিত করেছে শিক্ষার নতুন দিগন্ত।

এসব বিষয় ছাড়াও শিক্ষার সহায়ক বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজ করে তুলেছে। 'মনোযোগ দেওয়া (Attending), মনে রাখা (Remembering), ভুলে যাওয়া '(Forgetting) প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া এবং নানা আচরণগত সমস্যার (Behaviour

**Problems)** গতি-প্রকৃতি আলোচনার দ্বারা মনোবিজ্ঞান শিক্ষান্তরের পরম সহায়ক হয়ে উঠেছে।

উপসংহারে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষার সহায়করূপে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একক হিসেবে কাজ করে না। মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলি শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে সহায়তা করে। শিশু-মনোবিজ্ঞান (Child Psychology) শিক্ষাতত্ত্বে যে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল তারই ফলস্বরূপ শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার আবির্ভাব হয়েছে। তাছাড়া, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology), প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞান (Applied Psychology), চিকিৎসামূলক মনোবিজ্ঞান (Clinical Psychology), প্রভৃতি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরম সহায়ক এবং শিক্ষাপদ্ধতিকে সংশোধিত ও সার্থক করে তুলতে এদের দান অনস্বীকার্য।

## ৫। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি (Scope of Educational Psychology):

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান পরিধি বলতে বুঝি এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বা আলোচিত বিষয়বস্তুর পরিসর। কোন বিষয় সম্বন্ধে স্বল্পতম সময়ে সহজভাবে সার্থক শিক্ষা কিভাবে প্রদান করা যায় এবং সেই শিক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীর মন কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে, তার সংব্যাখ্যানই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচী শিক্ষাদানের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই বিস্তৃত। এবার আমরা এই সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তার আলোচনা নীচে লিপিবদ্ধ করছি :

(ক) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান প্রথমতঃ শিশু-মনের আলোচনা করে। শিশু-মনের নমনীয়তা (Plasticity), তার উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। কেননা, শিশুকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার পরিধি ও সার্থকতা দুই-ই ব্যাপ্ত হয়।

(খ) শিক্ষাদানকালে দেখা যায় শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মধ্যে কতকগুলি সহজাত (innate) আবার কতকগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ (acquired)। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীর অন্যান্য মানসিক ক্রিয়া, যেমন— বুদ্ধি, অনুভূতি ইত্যাদির সম্পর্ক নির্ণয় করাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ।

(গ) শিক্ষাদানের সার্থকতা নির্ভর করে প্রধানতঃ প্রকৃষ্ট শিক্ষা-পদ্ধতির উপর। এজন্য শিক্ষা-পদ্ধতিই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষণের (learning) মূলনীতিগুলিও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচনা করা অপরিহার্য। শিক্ষণের অন্তরায় হল ক্লান্তি বা অবসাদ (fatigue) এবং বিরক্তি (irritability)। এগুলিকে কিভাবে দূর করে শিক্ষা প্রদান কাজকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়, তাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পবিধির অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) সব রকম অভিজ্ঞতা আহরণের পথ হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়। কাজেই শিক্ষাদানের প্রধান সহায়ক এই ইন্দ্রিয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়ানুশীলনকে কিভাবে শিক্ষায় প্রয়োগ করা যায় ইত্যাদি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

(ঙ) মানব-মনের প্রক্ষোভ, সহজাতবৃত্তি বা অন্যান্য আবেগ বা অনুভূতি যদি যথাযথভাবে প্রকাশপথ খুঁজে না পায় তবে শিশুর চরিত্রে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় এবং তার মধ্যে একটি অসমঞ্জস (maladjusted) ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

(চ) শিশুর বুদ্ধি ও ব্যক্তিসত্তার (Personality) ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, তার আগ্রহ, মনোভাব ইত্যাদির বিবেচনা করে শিক্ষার বিষয়বস্তু কিভাবে নির্ধারিত হয় এবং কিভাবে শিক্ষাদান করতে হয় এসব বিষয়ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

(ছ) যে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সে হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাবী নাগরিক। সুতরাং বৃহত্তর সমাজ-জীবনে জীবিকা নির্বাহ করে যাতে দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে সে নিজেকে গঠন করতে পারে, সে শিক্ষাও তাকে প্রদান করা উচিত। এজন্য কোন্ বৃত্তি সে গ্রহণ করবে, কোন্ বৃত্তিতে তার স্বাভাবিক অনুরাগ আছে বা কোন্ বৃত্তি তার পক্ষে গ্রহণ করা উচিত হবে—এসব ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এজন্য বৃত্তি-নির্ধারণে নির্দেশদান (Vocational guidance) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

(জ) এসব ছাড়াও শিক্ষার সহায়ক অন্যান্য আনুষঙ্গিক মানসিক প্রক্রিয়া, যেমন—চিন্তন, কল্পনা, মনোযোগ, স্মৃতি ইত্যাদিও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান গভীর

অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে। তাছাড়া, মানসিক জীবনের দৈহিক ভিত্তি অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

## ৬। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Short account of the origin of Educational Psychology) ঃ

মনোবিজ্ঞান বিশেষভাবে তিনটি লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক তার বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করে—প্রথমতঃ, পরিবেশের সঙ্গে মানব আচরণের বর্ণনা এবং এ পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিসাধন করার প্রচেষ্টা প্রক্রিয়া অধ্যয়ন ; দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ পরিবেশে বা বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সমাজ কি প্রতিক্রিয়া করে তা পূর্ব থেকে অনুমান করা ; তৃতীয়তঃ, উপরিউক্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও তার পরিবেশে অভিপ্রেত পরিবর্তন সাধন।

শিক্ষাকে আমরা মানব-আচরণের সার্থক ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন বলে ব্যাখ্যা করে থাকি। অতএব দেখা যাচ্ছে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। এখানে 'মনোবিজ্ঞান' অর্থে আমরা 'শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান' বোঝাচ্ছি ; শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্র প্রয়োগ করে থাকে। ইহা একটি ফলিত মনোবিজ্ঞান (Applied Psychology)।

প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল, শিক্ষা মনোবিজ্ঞাননির্ভর ছিল না। শিশু-মনোবিজ্ঞান শিক্ষকের কাছে ছিল অজ্ঞাত—পাঠ্যসূচী ছিল সামাজিক চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—আর সে চাহিদা ছিল গতানুগতিক। শিক্ষক এধরনের পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীর উপর আরোপ করতেন—তার মানসিক চাহিদা, ক্ষমতা, কোন কিছুই শিক্ষক বিবেচনা করতেন না।

মনোবিজ্ঞানের মন ও আচরণ সম্বন্ধে নিত্যনতুন গবেষণা এবং বহুবিধ আবিষ্কার শিক্ষাপ্রদানে, পাঠ্যসূচী প্রণয়নে বিপ্লবাত্মক প্রভাব ও পরিবর্তন এনেছে। মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে আজ আমরা জেনেছি শিক্ষা শিশু-কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীকে ইচ্ছানুসারে রূপ দেওয়া যায় না। তার প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, প্রবণতা, সামর্থ্য, গ্রহণ-ক্ষমতা প্রভৃতি অনুসারে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়।

একথা ঠিক যে প্রাচীন চিন্তাবিদদের চিন্তাধারায় শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছিল। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে গ্রীক দার্শনিক প্লাটো (*Plato*)

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক সংব্যাখ্যানে বলেন, শিক্ষাকে চরিত্র গঠনের উপায় স্বরূপ মেনে নিলে, মানব-প্রকৃতির জ্ঞান ব্যতিরেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে না। তাঁর 'Republic' গ্রন্থে তিনি মানব-প্রকৃতির একটি ব্যাখ্যা এবং সে প্রসঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। প্লাটোর ব্যাখ্যা অনুসারে শিক্ষকের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থীর প্রকৃতি সম্বন্ধে সমানভাবে জ্ঞান থাকা উচিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রাচীন শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কোন প্রভাব স্বীকৃত হয় নি। আসলে মনোবিজ্ঞান ছিল সেদিন দর্শনের কুক্ষিগত এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল সীমিত। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ মূলতঃ আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দান।

সর্বপ্রথম রুশো (*Jean Jaques Rousseau*) শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেন। শিক্ষাকে মানব প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার মূলে রুশোর অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবহেলা মোটেই সমর্থন করেন নি। কিন্তু আধুনিক যুগে শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের আন্দোলনের যিনি পুরোহিত বলে খ্যাত তিনি হলেন পেস্টালৎসী (*Pestalozzi*) শিক্ষাকে তিনি মানব প্রকৃতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ বলে ব্যাখ্যা করলেন এবং শিশুর মনকে জানা এবং মনোবিজ্ঞানের মৌলিক নিয়মগুলিকে অনুসরণ করা সার্থক শিক্ষার শর্ত বলে ঘোষণা করলেন। ফ্রয়েবেলও (*Froebel*) এ মত অনুসরণ করে তাঁর 'শিশু-উদ্যান' (Kindergarten) পরিকল্পনা করেন।

এঁদের পর যার উল্লেখযোগ্য অবদান তিনি হলেন য়োহান ফ্রেডরিক হরেবার্ট (*John Friedrich Herbert*)। হরেবার্টের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল সংপ্রত্যক্ষ (apperception)। আমাদের প্রাক্তন বা পূর্ব অভিজ্ঞতায় সংশ্লিষ্ট নতুন অভিজ্ঞতা বা সংবেদন সৃষ্ট হয়। সংবেদন শুধু সংবেদনেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার সঙ্গে ব্যক্তিমনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটে। তিনি তাঁর সমগ্র শিক্ষণ প্রণালীকে সংপ্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করে রচনা করেছেন।

এসব শিক্ষাবিদদের চিন্তাধারার প্রভাবে শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শিক্ষাকে আমরা আজ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে থাকি। প্রতিটি শিশুর জীবন বিকাশের নির্দিষ্ট গতি-প্রকৃতি বর্তমান, এবং শিক্ষা তার অনুগামী হয়ে জীবন বিকাশে সহায়তা করে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# মানসজীবনের দৈহিক ভিত্তি

# ( Physiological Basis of Mental Life )

## ১। মানসজীবনের দৈহিক ভিত্তি (Physiological Basis of Mental Life) :

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, বাইরের জগতের বিভিন্ন বস্তু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের মনের উপর ক্রিয়া করে এবং বিভিন্ন ধরনের সংবেদন সৃষ্টি করে। বহির্জগতের আলোক বা বর্ণ আমাদের চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে, ফলে আমরা দৃষ্টিগত সংবেদন পাই; অনুরূপভাবে আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় উদ্দীপিত হলে শ্রবণগত, নাসিকা উদ্দীপিত হলে ঘ্রাণগত, জিহ্বা উদ্দীপিত হলে স্বাদগত এবং ত্বক উদ্দীপিত হলে স্পর্শগত সংবেদন পাই। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের সংবেদন ইন্দ্রিয়গুলির উদ্দীপনের উপর নির্ভরশীল। রাগ, ভয় ইত্যাদি আবেগের ক্ষেত্রেও দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে এবং দেহের কতকগুলি বাহ্যপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। দৈনন্দিন জীবনেও আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, মন পেশীর মাধ্যমে বাইরের জগতের বস্তুর উপর ক্রিয়া করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেহ ও মন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত।

*বাইরের জগতের বিভিন্ন বস্তু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের মনের উপর ক্রিয়া করে*

*মন পেশীর মাধ্যমে বাইরের জগতের বস্তুর উপর ক্রিয়া করে*

বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরও বিশেষভাবে প্রকাশ করছে যে, দেহের একটি বিশেষ অংশ, স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System), দেহের অন্যান্য অংশের তুলনায় মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। আবার এই স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত যে মস্তিষ্ক তার সঙ্গে মানসিক ক্রিয়ার সম্পর্ক এতই গভীর যে মনের সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে অনুষঙ্গী হিসেবে কোন-না-কোন মস্তিষ্কের ক্রিয়া (brain process) সম্পর্কযুক্ত হয়ে আছে। এই জন্যই মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের গঠন, তার বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন এবং একেই আমরা মানসজীবনের দৈহিক ভিত্তি বলে অভিহিত করতে পারি।

*স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক*

*স্নায়ুতন্ত্রই মানবজীবনের দৈহিক ভিত্তি*

## ২। স্নায়ুতন্ত্রের বিভাগ (Division of the Nervous System) :

স্নায়ুতন্ত্র হল মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় অংশ। দেহের সমস্ত অংশই স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের বিভিন্ন কাজের মধ্যে যোগসাধন করে, তাদের নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে এই স্নায়ুতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় আমরা বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি এবং পেশীর সাহায্যে বাইরের জগতের উপর ক্রিয়া করি। ইন্দ্রিয় ও পেশীগুলির মধ্যে সংবেদন স্থাপন করা, তাদের পরিচালনা করা এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা স্নায়ুতন্ত্রের কাজ।

মানবদেহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ; যথা—(ক) **প্রধান স্নায়ুতন্ত্র** (Central Nervous System), (খ) **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র** (Autonomic Nervous System) এবং (গ) **প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্র** (Peripheral Nervous System)।

স্নায়ুতন্ত্রের তিনটি বিভাগ

**(ক) প্রধান স্নায়ুতন্ত্র :** এই স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্গত হল মস্তিষ্ক (Brain) এবং সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord)। এদের একত্রে মস্তিষ্ক মেরবিক চক্র ও (The Cerebro-Spinal Axis) বলা হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের আবার বিভিন্ন অংশ আছে ; যেমন—সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla Oblongata), সেতু মস্তিষ্ক (Pons Varolli), লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum), মধ্যমস্তিষ্ক (Mid-brain) এবং গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum)।

প্রধান স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্ক মেরবিক চক্র

**(খ) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র :** এর দুটি বিভাগ ; যথা—সমবেদী (Sympathetic) এবং পরা-সমবেদী (Para-sympathetic)।

**(গ) প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্র :** মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড থেকে নির্গত স্নায়ু (Nerves) এই বিভাগের অন্তর্গত। এই স্নায়ু দু রকমের—মস্তিষ্ক-স্নায়ু (Cranial nerves) এবং সুষুম্না-স্নায়ু (Spinal nerves)। এক কথায় এদের বলা হয় 'Cerebro Spinal Nerves.'

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সর্বপ্রথমে স্নায়ুতন্ত্রের যে ক্ষুদ্রতম অংশ 'নিউরন' তার সম্পর্কে আলোচনা করব :
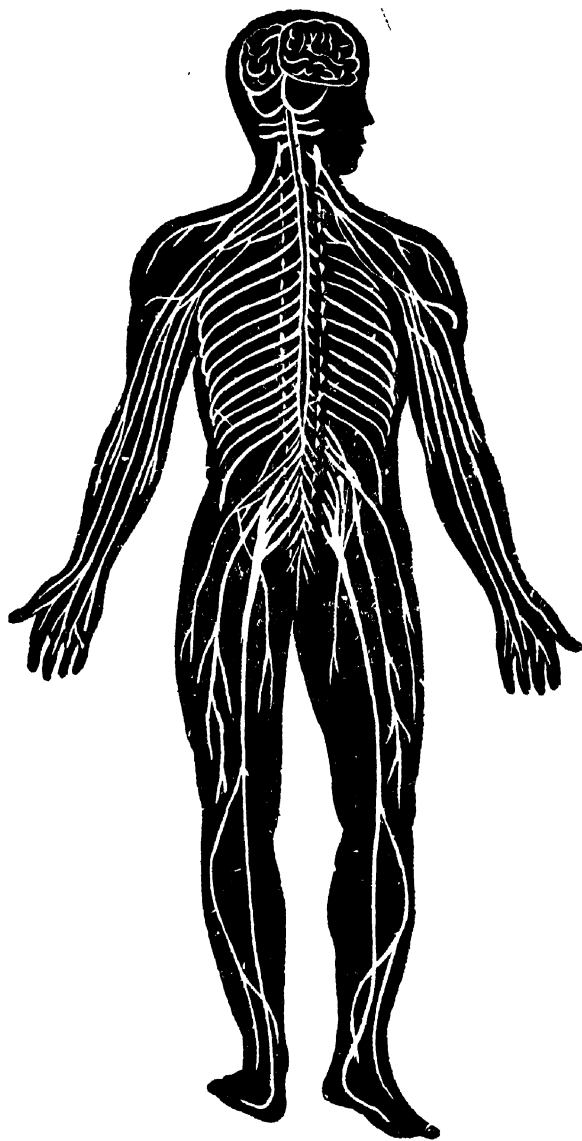
মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

### ৩। নিউরনের গঠন ও কার্যকলাপ (The Structure and Function of a Neurone) :

(ক) **নিউরনের গঠন** (The Structure of Neurone) : একটি পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্র বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য নিউরনের দ্বারা গঠিত।

**নিউরন হল** স্নায়ুতন্ত্রের **একক**

এই নিউরন সংখ্যায় বার মিলিয়ান অর্থাৎ বার লক্ষ কোটি বলে ধারণা করা হয়। নিউরন স্নায়ুতন্ত্রের ন্যূনতম বিভাজ্য অংশ। 'নিউরন হল স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম অংশ বা একক (Unit)।' মনোবিদ উড্ওয়ার্থের ভাষায় 'নিউরন হল আনুষঙ্গিক শাখা সমন্বিত কোষদেহ' (A neurone is a nerve cell including its branches)। দুটি নিউরন সংযুক্ত না হলে স্নায়ুতন্ত্র ক্রিয়া করতে পারে না। নিউরনের জটিল সংগঠনকে বুঝে নিতে হলে তার বিভিন্ন অংশগুলিকে বুঝে নিতে হবে। যথা—
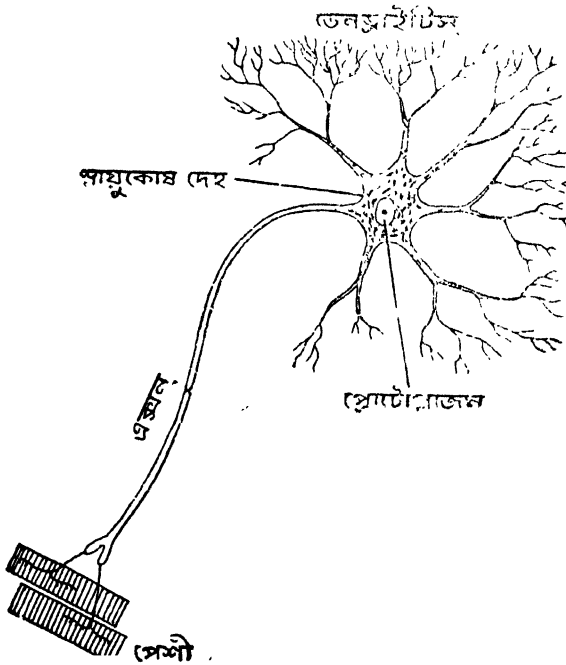
একটা শক্তিবাহী নিউরনকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে খুব বড় করে দেখান হচ্ছে

(i) **কোষদেহ** (Cellbody) : এই কোষদেহের চারটি অংশ আছে ; যথা—(১) একটি কঠিন বহিরাবরণ, যাকে বলা হয় **cell wall** বা **কোষ**

**প্রাচীর** ; (২) এই আবরণের মধ্যে ডিমের সাদা অংশের বা অ্যালবুমেন-এর মতো একটা তরল পদার্থ আছে, যাকে বলা হয় **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm) বা **প্রাণ-কোষ**। এই প্রোটোপ্লাজমই প্রাণীর জীবনী শক্তিকে ধারণ করে থাকে। (৩) কোষদেহের কেন্দ্রস্থলে ঐ তরল পদার্থের মধ্যে রয়েছে একটা ঘন পিণ্ড যাকে বলা হয় স্নায়ুকেন্দ্র (Nucleus)। এই স্নায়ুকেন্দ্রটিই কোষদেহের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি নির্ধারণ করে। (৪) ঐ স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি ভাসমান পদার্থ থাকে, যাদের বলা হয় **অণুস্নায়ু** (Nucleoli)।

কোষদেহের গঠন

(ii) **স্নায়ুশাখা** (Nerve branches) : অধিকাংশ কোষদেহের দুপ্রকারের শাখা আছে। যথা—(১) **অ্যাকসন** (Axon এবং (২) **ডেনড্রনস** বা **ডেনড্রাইটিস** (Dendrons or Dendrites)।

স্নায়ু-শাখা
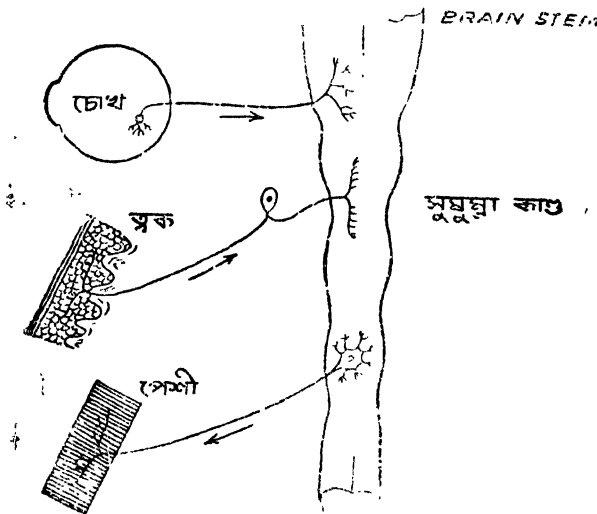
সংবেদনবাহী এবং শক্তিবাহী অ্যাকসন এবং তাহার স্নায়ুকোষ। তীরগুলি নির্দেশ করে কোন্ দিকে অ্যাকসনের গতি

(১) **অ্যাকসন** (Axon) : প্রত্যেকটি নিউরনের একটি করে অ্যাকসন (axon) থাকে কিন্তু কোন কোন নিউরনে ডেনড্রন নাও থাকতে পারে। অ্যাকসন কোন রকম উদ্দীপনা প্রেরণ করে না, এক কোষদেহ

থেকে অন্য কোষ দেহে উদ্দীপনা প্রেরণ করে। অ্যাকসন স্নায়ুকোষদেহ থেকে নির্গত একটি শাখা। অ্যাকসন খুব সূক্ষ্ম, এটি সরু এবং কখনও কখনও দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। অ্যাকসন সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুর দ্বারা গঠিত। একটি স্নায়ু (Nerve) এই জাতীয় কতকগুলি স্নায়ুতন্তুর সমষ্টি। অ্যাকসন আকারে লম্বা। এর কোন শাখা-প্রশাখা নেই। এর শেষ প্রান্তটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এর আকৃতি দেখে একে প্রান্তগুচ্ছ (end brush) বলা হয়। অপর কোন নিউরনের ডেনড্রাইটিসের মধ্যে বা কোন পেশী, গ্রন্থি বা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে গিয়ে এই শাখা-প্রশাখা শেষ হতে পারে।

অ্যাকসনের গঠন ও কার্য

(২) **ডেনড্রাইটিস** (Dendrites): এগুলি কোষদেহ থেকে নির্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বিশেষ। এরা উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং দূরে অবস্থিত কোষদেহে তাকে প্রেরণ করে। এগুলি দেখতে গাছের শাখার মতো। অ্যাকসনের তুলনায় ডেনড্রাইটিসগুলির দৈর্ঘ্য কম এবং এরা সংখ্যায় বহু। অ্যাকসন মসৃণ, কিন্তু এগুলি অমসৃণ। ডেনড্রাইটিসগুলি কোষদেহের কাছাকাছি বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে একটি গুচ্ছ রচনা করে।

**(iii) নিউরনের শ্রেণীবিভাগ: (ক) গঠনের দিক থেকে নিউরনকে দুশ্রেণীতে ভাগ করা হয়,** যথা—**একশাখা সমন্বিত** (unipolar) এবং **বহুশাখা সমন্বিত** (multipolar)। একশাখা সমন্বিত নিউরন হল যার একটিমাত্র শাখা আছে। একটি অ্যাকসন কোষদেহ থেকে কিছু দূরে দুটি শাখায় নিজেকে বিভক্ত করেছে। বস্তুতঃ, মনুষ্যদেহে এই নিউরন দ্বিশাখা বিশিষ্ট (bipolar), কারণ কোষদেহ থেকে এককভাবে নির্গত হওয়া সত্ত্বেও কিছু দূরে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। বহুশাখা সমন্বিত নিউরন হল, যে নিউরনের একাধিক শাখা, অর্থাৎ একটি অ্যাকসন এবং একাধিক ডেনড্রন আছে।

একশাখা সমন্বিত ও বহুশাখাসমন্বিত নিউরন

(খ) **কার্যের দিক থেকে নিউরনগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে;** যথা—(১) **অন্তর্মুখী** (afferent) **নিউরন,** (২) **বহির্মুখী** (efferent) **নিউরন** এবং (৩) **সংযোজক নিউরন** (Central or Associative or Correlative neurone)।

(১) **অন্তর্মুখী নিউরন:** অন্তর্মুখী নিউরনের কোষদেহ কোন-না-কোন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থিত। অন্তর্মুখী নিউরন ইন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে বহন করে নিয়ে যায়। এই ধরনের নিউরনগুলি

সংবেদন কেন্দ্র এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সংযোগসাধন করে। এগুলিকে সংবেদক (sensory) নিউরন নামেও অভিহিত করা হয়। অন্যান্য নিউরনের সঙ্গে এদের পার্থক্য হল যে, এগুলি সাধারণতঃ একশাখা সমন্বিত হয়।

(২) **বহির্মুখী নিউরন:** বহির্মুখী নিউরনের কোষাদেহ মস্তিষ্কের বা সুষুম্নাকাণ্ডের কোন কেন্দ্রে অবহিত। বহির্মুখী নিউরনগুলি মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড থেকে উদ্দীপনা মাংসপেশীতে বহন করে নিয়ে আসে। এই ধরনের নিউরনগুলি শক্তিকেন্দ্র (Motor Area) এবং মাংসপেশীর মধ্যে সংযোগসাধন করে।

(৩) **সংযোজক নিউরন:** সংযোজক নিউরনের কাজ অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী নিউরণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা।

(iv) **সন্নিকর্ষ (Synapse):** একটি নিউরনের শেষ প্রান্তের সঙ্গে অপর একটি নিউরনের প্রথম প্রান্তের মিলন স্থল বা সংযোগ স্থলকে সাইন্যাপ্‌স বা সন্নিকর্ষ বলা হয়। যদিও স্নায়বিক উদ্দীপনা একটি নিউরন থেকে আর একটি নিউরনে চালিত হতে পারে তবু গঠনের দিক থেকে দুটি নিউরনের মধ্যে কোন দেহগত সংযোগ নেই। অর্থাৎ একটি নিউরনের অ্যাকসনের প্রান্তভাগের শাখা-প্রশাখার কাছে রয়েছে আর একটি নিউরনের ডেনড্রাইটিস, অথচ এরা কেউ কাকে স্পর্শ করছে না; উভয়ের মাঝে একটু সামান্য ফাঁক আছে। এই ফাঁককেই সন্নিকর্ষ (synapse) বলে। স্নায়বিক উদ্দীপনাকে যখন একটি নিউরন থেকে আর একটি নিউরনে যেতে হয় তখন মাঝের এই ফাঁকটুকু এক রকম লাফ দিয়েই পার হতে হয়। তবে এই ফাঁক এতই সামান্য যে, স্নায়ুপ্রবাহের একটি থেকে আর একটিতে

দুটি নিউরনের মিলন স্থলকে সন্নিকর্ষ বলা হয়

সন্নিকর্ষের স্বরূপ

চালিত হবার পথে কোন বাধার সঞ্চার হয় না। এই ফাঁক থাকার জন্যই স্নায়ুপ্রবাহ, একটি নিউরন থেকে অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটিসের মাধ্যমে অন্য আর একটিতে সঞ্চালিত হতে পারে। এই সন্নিকর্ষের জন্যই একই উদ্দীপক বিভিন্ন

মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা যায়। যদি দুটি নিউরনের মধ্যে এই ফাঁক না থাকত তাহলে স্নায়ুপ্রবাহ প্রয়োজনবোধে ভিন্ন পথে চালিত হতে পারত না। ফলে, মানুষের আচরণ হতো যান্ত্রিক। দুটো গাছ পাশাপাশি থাকলে তাদের শাখা-প্রশাখাগুলি পরস্পরের সংগে জড়াজড়ি করে থাকে; দূর থেকে দেখলে মনে হয় যে, শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্নতার সম্বন্ধ রয়েছে: অথচ এদের সম্বন্ধ নিরবচ্ছিন্নতার সম্বন্ধ নয়; নৈকট্যের সম্পর্ক। একটি নিউরনের সঙ্গে অপর নিউরনের সম্পর্কও হল নৈকট্যের সম্পর্ক। এদের মধ্যে কোন আঙ্গিক সংযোগ নেই।

স্নায়বিক উদ্দীপনা যখন অ্যাকসন থেকে ডেনড্রাইটিসের দিকে যেতে থাকে তখন সন্নিকর্ষ ওর গতিবেগকে বাধা দিয়ে থাকে। তবে এই বাধার পরিমাণ বা মাত্রা অবস্থানুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। তবে এই গতিবেগের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, স্নায়ু-উদ্দীপনা যতবার সন্নিকর্ষকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়, ওর বাধা সেই পরিমাণে হ্রাস পেতে থাকে।

**(খ) নিউরনের কার্যকলাপ** (The functions of neurones): উদ্দীপন (Irritability) এবং পরিবহন (Conduction)—এই দুটি হল নিউরনের বিশেষ কাজ। উদ্দীপনা গ্রহণ ও প্রেরণ করা এবং দেহের একাংশ থেকে অপরাংশে উদ্দীপনাকে পরিবাহিত করার ব্যাপারে নিউরনগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিউরনগুলি স্নায়ুকোষ (Nerve-cell) এবং স্নায়ুতন্তুর (Nerve-fibres) দ্বারা গঠিত। এই স্নায়ুকোষগুলি এবং স্নায়ুতন্তুগুলি একটুতেই উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। বহির্জগতের যে কোন সামান্য উদ্দীপক এগুলিকে উত্তেজিত করে ক্রিয়াশীল করে তুলতে পারে। সুতরাং সামান্য কিছুতেই উদ্দীপিত হবার যে প্রবণতা (irritability) তা হল এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পরিবহন (conduction) ক্ষমতা। নিউরনগুলি দেহের একাংশ থেকে আরেকাংশে উদ্দীপনা বহন করে নিয়ে যেতে পারে। সময় সময় এই নিউরনগুলির কাজ হয়ে ওঠে স্বয়ংক্রিয়। বাইরের কোন রকম উদ্দীপকের সহায়তা ছাড়াই এরা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। নিউরনের কোষদেহ সমগ্র নিউরনের পুষ্টিসাধন করে। উদ্দীপনার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করা সন্নিকর্ষের কাজ। উদ্দীপনা এবং পরিবহনের ফলে নিউরনের অবসাদ দেখা দেয়, তখন কোন উদ্দীপকই নিউরনকে উদ্দীপিত করতে পারে না। এই অবস্থাকে বলা হয়

**উদ্দীপন এবং পরিবহন হল নিউরনের প্রধান কাজ**

অবসাদ-কাল (Refractory period), সন্নিকর্ষের প্রতিকূলতাই এই অবসাদের কারণ মনে করা হয়।

স্নায়ু প্রবাহের একটি প্রধান নিয়ম, সম্মুখ পরিবহন নীতি (Law of Forward Conduction)। স্নায়ু-প্রবাহের গতি সব সময়ই একদিকে—প্রথম নিউরনের অ্যাকসন থেকে সন্নিকর্ষের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় নিউরনের ডেনড্রাইটিসের দিকে অর্থাৎ সংবেদনবাহী নিউরন থেকে শক্তিবাহী নিউরণের দিকে; এর বিপরীত দিকে, অর্থাৎ শক্তিবাহী নিউরন থেকে সংবেদনবাহী নিউরনের দিকে নয়। সন্নিকর্ষ স্নায়ু প্রবাহের এই বিপরীত গতিকে সব সময় বাধা দিয়ে থাকে। একে **সম্মুখ পরিবহন নীতি** (Law of Forward Conduction) বলা হয়। সন্নিকর্ষ উদ্দীপনার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোন গতি সন্নিকর্ষের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে; আবার সন্নিকর্ষ কোন উদ্দীপনাকে ভিন্ন পথে চালিত করতে পারে।

সম্মুখ পরিবহন নীতি

সন্নিকর্ষের কার্য

## ৪। স্নায়বিক শক্তির স্বরূপ (Nature of Nerve Impulse):

স্নায়ুতন্তু উদ্দীপিত হলে একটা শক্তি সঞ্চারিত হয়; এই শক্তিই হল স্নায়ুবিক শক্তি (Nerve impulse) যা স্নায়ুপথে পরিবাহিত হয়। বাহ্য উদ্দীপকের দ্বারা অন্তর্মুখী নিউরন উদ্দীপিত হয়। কিন্তু আসলে উদ্দীপক থেকে কোন শক্তি দেহের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না; 'স্নায়বিক শক্তি' দেহের মধ্যে উৎপাদিত হয়।

স্নায়ুতন্তু উদ্দীপিত হলে যে শক্তি সঞ্চারিত হয় তাকে স্নায়বিক শক্তি বলে

সব স্নায়বিক শক্তিই (Nerve impulse) একপ্রকারের। সংবেদনবাহী স্নায়ু একই প্রকারের স্নায়বিক শক্তিকে স্নায়ুপথে বহন করে, এদের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই।

স্নায়বিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। স্নায়বিক শক্তি তড়িত রাসায়নিক তরঙ্গের (elctro-chemical nerves) সগোত্রীয়। এই তরঙ্গ অত্যন্ত ক্ষীণ, খুব কম শক্তিই এতে ব্যয়িত হয়, তাহলেও যে-কোন পেশী বা ইন্দ্রিয়কে এ শক্তি সক্রিয় করে তুলতে পারে।

স্নায়বিক শক্তি তাড়িত রাসায়নিক তরঙ্গের সগোত্রীয়

1. "We call it the nerve current or nerve impulse, and as far as known it consists of electro-chemical waves in the nerve fibre, very weak, consuming very little energy, but capable of arousing a muscle or a nerve centre to action." —Woodworth : Psychology (Twelvth Edition), Page 253

স্নায়ুগুলি সহজে ক্লান্ত হয় না। যদি ক্লান্ত হয়, সেই ক্লান্তি সহজেই তারা কাটিয়ে উঠতে পারে। স্নায়ু-প্রবাহের অবসাদ বা ক্লান্তি স্নায়ুর জন্য নয়, সন্নিকর্ষের প্রতিকূলতাই তার কারণ।

এই প্রসঙ্গে একটি নিয়মের কথা মনে রাখতে হবে; সেটিকে বলা হয় 'পূর্ণ বা শূন্য' (All-or-None Law) নিয়ম। উদ্দীপনার তীব্রতার একটা সবনিম্ন সীমারেখা আছে যেটা অতিক্রম করতে পারলেই একটা উদ্দীপক স্নায়ুতন্তুকে উদ্দীপিত করে স্নায়বিক শক্তি সঞ্চার করতে পারবে। তারপর আর উদ্দীপকের তীব্রতা বাড়িয়ে স্নায়ুতন্তুর প্রতিক্রিয়ার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটান সম্ভব হবে না। উদ্দীপক যদি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সেই বিশেষ মুহূর্তে স্নায়ুতন্তুটির পক্ষে যতটুকু প্রতিক্রিয়া করা সম্ভব, ততটুকু করবে, অর্থাৎ পূর্ণভাবে করবে। উদ্দীপনাকে কমান বা আংশিক-ভাবে পরিবাহিত করা সম্ভব নয়। বারুদকে পোড়াবার জন্য আগুনের প্রয়োজন। বেশী আগুন লাগালে বেশী বারুদ পুড়বে তা নয়। উদ্দীপকের পরিমাণের পার্থক্যের উপর প্রতিক্রিয়ার তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে না; একেই বলা হয় **পূর্ণ** বা **শূন্য নিয়ম**।

'পূর্ণ বা শূন্য' নিয়ম

প্রতিক্রিয়াকারী নিউরনের সংখ্যার উপরই সংবেদনের বা প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা নির্ভর করে। একটি তীব্র উদ্দীপক একসঙ্গে একাধিক নিউরনকে উদ্দীপিত করে এবং এই নিউরনগুলির সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তীব্রতা দেখা দেয়। এই বিষয়টিকে **যোগ নিয়ম** (The Law of Summation) বলা হয়।

প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা নিউরনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে

## ৫। প্রধান স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও ক্রিয়া (Structure and function of the different parts of the Central Nervous System):

প্রধান স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্ক-মেরুবিক চক্রের দুটি অংশ আছে; যথা—(ক) **সুষুম্নাকাণ্ড** (Spinal Cord) এবং (খ) **মস্তিষ্ক** (Brain)।

**(ক) সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord):** আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যেই সুষুম্নাকাণ্ডের অবস্থান। আমাদের পিঠের মাঝামাঝি নীচ থেকে উপর পর্যন্ত কতকগুলি খণ্ডাস্থি, মোটের উপর তেত্রিশ অথবা চৌত্রিশ খানি, পরস্পর

সাজানো। অস্থিগহ্বর থেকে আরম্ভ করে উপরের দিকে ক্রমশঃ মোটা হয়ে এই অস্থিমালা অধঃমস্তিষ্কে গিয়ে প্রবেশ করেছে, এটিই হল মানুষের মেরুদণ্ড। এটির আকার দণ্ডের মতো, তাই একে মেরুদণ্ড বলা হয়। যে খণ্ডাস্থি দিয়ে আমাদের মেরুদণ্ডটি

সুষুম্নাকাণ্ডের গঠন
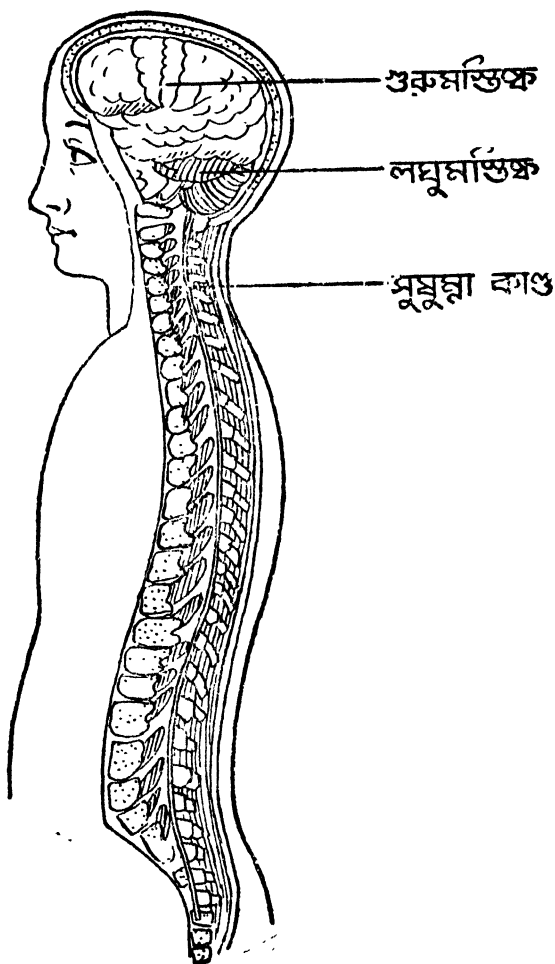
গঠিত, সেই খণ্ডাস্থিগুলির ভেতরটা ফাঁপা। তার ফলে মেরুদণ্ডের নীচের প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে অধঃমস্তিষ্ক পর্যন্ত একটি নালীর সৃষ্টির হয়েছে। এই নালী বা ফাঁপা পথ ধরে একটা সাদা রঙের নরম রজ্জুর (cord) মতো পদার্থ

মস্তিষ্ক থেকে অস্থিমালার সব চেয়ে নীচের অস্থি পর্যন্ত চলে গেছে। একেই সুষুম্নাকাণ্ড বা মেরুমজ্জা (Spinal Cord) বলে। সুষুম্নাকাণ্ডটি ধূসর এবং সাদা পদার্থ দ্বারা গঠিত। ধূসর পদার্থটি স্নায়ুকোষ (Nerve Cells) দ্বারা গঠিত। সাদা পদার্থটি স্নায়ুতন্তু (Nerve Fibres) দ্বারা গঠিত; এটি ধূসর পদার্থকে আবরকের মতো আবৃত করে রেখেছে। সুষুম্নাকাণ্ডের দুপাশে কিছুটা ব্যবধান রেখে সুষুম্না স্নায়ুগুলি (Spinal Nerves) অবস্থিত। প্রতি পাশে একত্রিশটি স্নায়ু অর্থাৎ মোট একত্রিশ জোড়া বা বাষট্টিটি সুষুম্না স্নায়ু আছে।

সুষুম্নাকাণ্ড হল পরিবহন পথ

সুষুম্নাকাণ্ড মস্তিষ্ক এবং দেহের ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল। অসংখ্য বহির্মুখী স্নায়ু মস্তিষ্ক থেকে নির্গত হয়ে এই সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই দেহের পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে; আবার অসংখ্য অন্তর্মুখী স্নায়ু এই সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই মস্তিষ্কের বিভিন্ন সংবেদন কেন্দ্রে গিয়ে পৌছেছে। সুতরাং সুষুম্নাকাণ্ড হল সেই পরিবহণ পথ (Conduction Path), যার মধ্য দিয়ে শক্তি মস্তিষ্ক থেকে দেহের বিভিন্ন অংশ বা দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে মস্তিষ্কে বাহিত হয়।

সুষুম্নাকাণ্ডের পাঁচটি ভাগ—গ্রীবাদেশ (cervical region), বক্ষোদেশ (thorasic region), কটিদেশ (lumbar region), ত্রিকাস্থিদেশ (sacral region) এবং অনুত্রিকাস্থিদেশ (coccygeal region)। গ্রীবাদেশে আট জোড়া, বক্ষোভাগে বার জোড়া, কটিদেশে পাঁচ জোড়া, ত্রিকাস্থিদেশে পাঁচ জোড়া এবং অনুত্রিকাস্থিদেশে এক জোড়া সুষুম্না স্নায়ু আছে।

সুষুম্নাকাণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল

সুষুম্নাকাণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (Reflex action) নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। বহির্জগতের কোন উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের দেহের উপর ক্রিয়া করলে এবং তার ফলে স্নায়ু উদ্দীপিত হওয়ার জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া দেহে সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলা হয়; যেমন—গরম পাত্রে হাত লাগা মাত্র হাত সরিয়ে নেওয়া। এখানে আমাদের ইচ্ছা কোন কাজ করার সুযোগ পায় না। সংবেদনবাহী স্নায়ু (Sensory Nerves) এবং শক্তিবাহী স্নায়ুর (Motor Nerves) মধ্যে সংযোগটি মেরুদণ্ডেই সংঘটিত হয়, মস্তিষ্কে সংঘটিত হয় না। সংবেদনবাহী স্নায়ু বাইরের জগৎ থেকে সংবাদ সুষুম্নাকাণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে এবং শক্তিবাহী স্নায়ুর মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ড তার যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়ে শারীরিক

ক্রিয়া সম্পাদন করে। নীচের চিত্রটি লক্ষ্য করা যাক: একটি জ্বলন্ত কাঠি আচমকা আমার আঙ্গুলে এসে লাগলো। লাগা মাত্রই আমি আঙ্গুলটি সরিয়ে নিলুম। কারণ কি? জ্বলন্ত কাঠিতে আঙ্গুল লাগা মাত্রই যে উদ্দীপনা অনুভব করলাম, সেই উদ্দীপনাকে আঙ্গুলটির সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ডে বহন করে নিয়ে গেল।

**সংবেদনবাহী স্নায়ু ও শক্তিবাহী স্নায়ুর সংযোগ মেরুদণ্ডে সংঘটিত হয়**
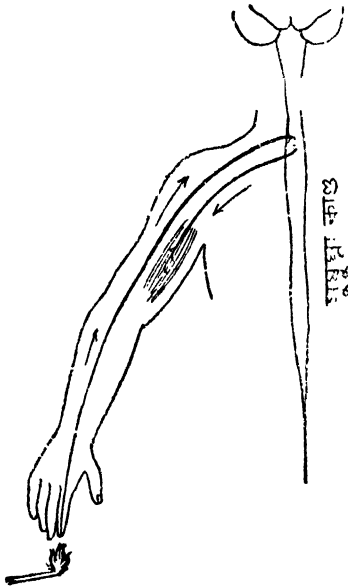
সুষুম্নাকাণ্ড সেই সংবাদ পাওয়া মাত্র কিছু শক্তি প্রেরণ করল। বহির্মুখী বা শক্তিবাহী স্নায়ু সেই শক্তি যথাস্থানে বহন করে এনে আঙ্গুলের পেশীগুলিকে ক্রিয়াশীল করে তুলল, সঙ্গে সঙ্গে আমি আঙ্গুল সরিয়ে নিলুম। সুষুম্নাকাণ্ড যে সংবাদ পাওয়া মাত্রই পেশীগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে তার কারণ সংবেদনবাহী এবং শক্তিবাহী নিউরনগুলি খুব কাছাকাছি অবস্থিত। প্রতিবর্ত ক্রিয়া ছাড়াও আরও কতকগুলি ক্রিয়া সুষুম্নাকাণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হাঁটা, সাঁতারকাটা, সাইকেল চালান প্রভৃতি ঐচ্ছিক ক্রিয়া যেগুলি বারংবার অনুশীলনের বা শিক্ষার ফলে অভ্যাসে পরিণত হয় সেই ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল সুষুম্নাকাণ্ড।

(খ) **মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ** ( Different Parts of the Brain): মস্তিষ্কের পাঁচটি প্রধান অংশ আছে। যথা (i) **সুষুম্নাশীর্ষক** বা **অধঃমস্তিষ্ক** **(Medulla Oblongata)**: সুষুম্নাকাণ্ড ঘাড়ের কাছে একটু স্ফীত হয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে, এই স্ফীত অংশটুকুকেই **সুষুম্নাশীর্ষক** বলা হয়। এই অংশটি ধূসর এবং সাদা রঙের পদার্থ দ্বারা গঠিত। ধূসর রঙের পদার্থকে সাদা রঙের পদার্থটি আবৃত করে রেখেছে। এ বিষয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। এই অংশটি সুষুম্নাকাণ্ড এবং মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। এরই মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ড এবং মস্তিষ্কের মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব হয়। যে সব স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ড থেকে মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে সেগুলির গমনপথ এই সুষুম্নাশীর্ষক। শ্বাস-ক্রিয়া, রক্ত-সঞ্চালন, গলাধঃকরণ, বমন,

**সুষুম্নাশীর্ষক বা অধঃমস্তিষ্ক**

হাঁচি, কাসি, লালা-নিঃসরণ, পরিপাক প্রভৃতি কাজ এই অংশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

(ii) **সেতুমস্তিষ্ক** (Pons-varollii): এই অংশটিকে সেতুমস্তিষ্ক বলার কারণ, এর আকৃতি অনেকটা সেতুর মতো। সুষুম্নাশীর্ষকের সামনে এই নলাকৃতি স্ফীতাংশ সেতুর মতো আড়াআড়িভাবে চলে গেছে। লঘুমস্তিষ্কের (Cerebellum) দুটি অংশকে যুক্ত করাই এর কাজ, সে কারণে একে যোজক নামেও অভিহিত করা হয়। গুরুমস্তিষ্ক থেকে যেসব স্নায়ু নির্গত হয়ে দেহের নিম্নাংশে ছড়িয়ে পড়েছে, এই সেতুমস্তিষ্কের মধ্য দিয়েই সেগুলির গমনপথ।
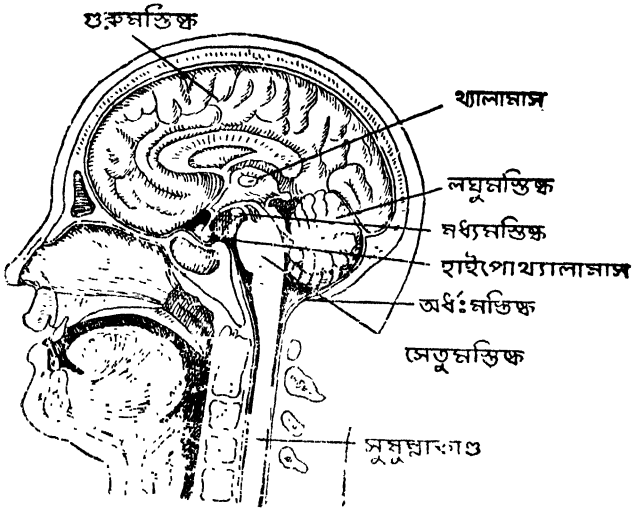
মানুষের মস্তিষ্কের ছবি

(iii) **লঘুমস্তিষ্ক** (Cerebellum, Hind-Brain or Little Brain): গুরুমস্তিষ্কের পেছনের দিকের যে অংশ, তাকেই লঘুমস্তিষ্ক বলা হয়। সুষুম্নাশীর্ষকের ঠিক উপরিভাগে এর অবস্থিতি। এর দুটি অংশ আছে। প্রতি অংশের সাদা স্নায়ুতন্তুর (White Nerve Fibres) গুচ্ছগুলি ধূসর রঙের কোষের দ্বারা আবৃত। এর দুটি অংশ সেতুমস্তিষ্কের দ্বারা যুক্ত, দৈহিক সংগতি বিধানই এর প্রধান কাজ। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং পেশীসমূহ সঞ্চালিত করার সময় তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা এর কাজ। আমাদের অভ্যাসসিদ্ধ (habitual) কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে লঘুমস্তিষ্ক। হাঁটা, চলা, বসা প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজগুলি

করার সময় শরীরের যে ভারসাম্য তা লঘুমস্তিষ্কের দ্বারাই রক্ষিত হয়। এই অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলে গতি বা চলন শক্তি, লেখা, দেখা, কথা বলার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। আমাদের দেহ সঞ্চালন কাজটি যাতে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় লঘুমস্তিষ্ক সেদিকে লক্ষ্য রাখে। বস্তুতঃ, লঘুমস্তিষ্কের কল্যাণেই আমাদের চলা-ফেরার মধ্যে একটা শ্রী খুঁজে পাওয়া যায়।

(iv) **মধ্যমস্তিষ্ক** (Mid-Brain or Inter Brain or Basal Ganglia): লঘুমস্তিষ্কের উপরিভাগে এবং সম্মুখ দিকে এর অবস্থান; মধ্যমস্তিষ্ক হল মস্তিষ্কের মূলদেশ (base), এর দুটি প্রধান অংশ আছে; যথা—(১) থ্যালামাস (thalamus) এবং হাইপোথ্যালামাস (hypothalamus)। থ্যালামাসের কাজ হল বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে আগত স্নায়ু তরঙ্গকে গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন সংবেদন কেন্দ্রে (Sensory centres) পৌঁছে দেওয়া। হাইপো-থ্যালামাসকে 'আবেগের কেন্দ্র' বলে অভিহিত করা হয়, কারণ এটি হল আবেগজাত প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করার কেন্দ্রস্থল। এই অংশ পরিপাকক্রিয় ও পেশীয় ক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

(v) **গুরুমস্তিষ্ক** (Cerebrum): মস্তিষ্কের অংশগুলির মধ্যে বৃহত্তম, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অংশ হল গুরুমস্তিষ্ক। এই গুরুমস্তিষ্ক দুটি 'সমান অর্ধাংশে' বা গোলার্ধে (Hemisphere) বিভক্ত। দক্ষিণ অর্ধাংশ বা দক্ষিণ গোলার্ধ শরীরের বামদিকের সঙ্গে এবং বাম অর্ধাংশ বা বাম গোলার্ধ শরীরের ডানদিকের সঙ্গে যুক্ত। এই দুটি অংশ একগুচ্ছ শুভ্র স্নায়ুতন্তুর দ্বারা সংযুক্ত, এগুলিকে বলা হয় 'Corpus callosum'. গুরু-মস্তিষ্কটি ধূসর পদার্থ (Grey matter) এবং শ্বেতবর্ণের পদার্থ (White matter) দ্বারা গঠিত। শ্বেতবর্ণের পদার্থটি স্নায়ুতন্তুর (Nerve fibres) দ্বারা গঠিত এবং ধূসর পদার্থটি স্নায়ুকোষ (Nerve-cells) দ্বারা গঠিত। মস্তিষ্কের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সাদা পদার্থ এবং পঞ্চাশ ভাগ ধূসর পদার্থ। সমস্ত গুরুমস্তিষ্কটি একটি ধূসর পদার্থের আবরণের দ্বারা আবৃত, এটিকে বলা হয় **মস্তিষ্ক-আবরণ** (Cerebral Cortex)। এই আবরণের ভিতরে থাকে সাদা রঙের স্নায়বিক পদার্থ। এই মস্তিষ্ক-আবরণ বা কর্টেক্সে অনেক গভীর বলিরেখা বা ফাটল (Fissure) আছে এবং অনেক ভাঁজ (Convolutions) আছে। এই ভাঁজের সংখ্যা যত অধিক হয় মানুষের বুদ্ধির মাত্রাও সেই পরিমাণে বেড়ে যায়। গুরুমস্তিষ্কের প্রধান দুটি ফাটলের নাম রোলাণ্ডো ফিসার (Rolando Fissure) বা কেন্দ্রীয় ফিসার এবং সিলভিয়াস ফিসার (Sylvius

গুরুমস্তিষ্কের গঠন

Fissure)। এই দুটি ফাটল গুরুমস্তিষ্কের প্রধান দুটি অংশকে চারটি ভাগে ভাগ করেছে; যথা—সম্মুখভাগ বা ললাট অঞ্চল (Frontal Lobe), (২) মধ্য ভাগ বা শিরকুম্ভ অঞ্চল (Parietal Lobe), (৩) পশ্চাৎভাগ বা শিরনিম্ন অঞ্চল (Occipital Lobe) এবং (৪) নিম্নভাগ বা রগ অঞ্চল (Temporal Lobe)।
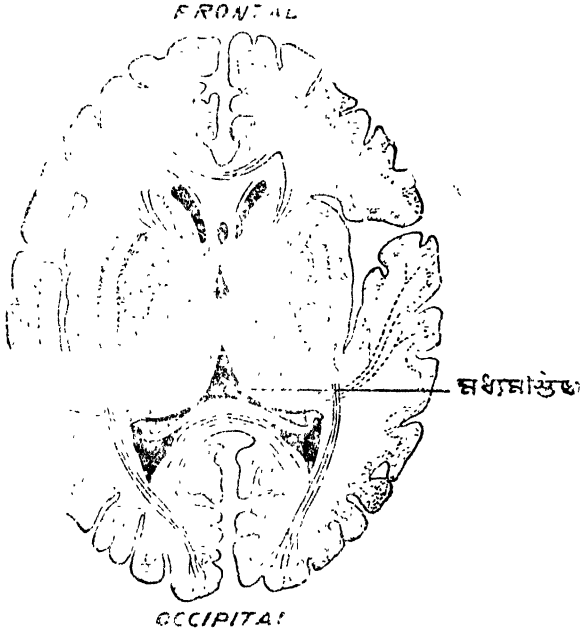
মস্তিষ্কের আড়াআড়িভাবে ফেলা ছবি

সংবেদন, চিন্তা, কল্পনা, ইচ্ছা, বিচারবুদ্ধির কাজ, আবেগ, সবগুলিরই কেন্দ্রস্থল হল গুরুমস্তিষ্ক। *Stout* বলেন, "সুষুম্নাকাণ্ড, মস্তিষ্কবৃন্ত, লঘুমস্তিষ্ক এবং অন্যান্য নিউরনগুচ্ছের মধ্যে যেসব ক্রিয়া ঘটছে গুরুমস্তিষ্ক সেগুলিকে আরম্ভ করে, বাধা দেয়, সংযুক্ত করে বা পৃথক করে।"[1] কোন একটি লোক আগুনে হাত রাখার জন্য জ্বালা অনুভব করছে, তবু হাতটি সরিয়ে নিচ্ছে না। তার কারণ সুষুম্নাকাণ্ডে উদ্দীপনা পৌঁছনমাত্র সে

গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়া

1. ......the Cerebrum initiates, or arrests, combines or separates processes occurring in the spinal cord, the bulb, the cerebellum and other groups of neurones." —Stout: Manual of Psychology, Page 68

হাত সরিয়ে নিত কিন্তু গুরুমস্তিষ্ক সেই প্রক্রিয়াতে বাধা দেওয়াতে সে হাত সরিয়ে নিচ্ছে না। মনোবিদ্ উডওয়ার্থ গুরুমস্তিষ্ককে সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। গুরুমস্তিষ্ক হল প্রধান সেনাপতির মতো
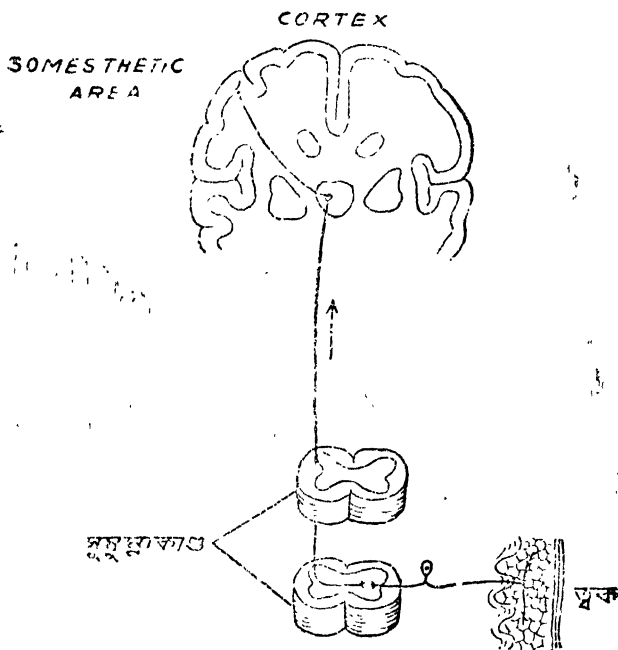
সংবেদন পথ (Sensory path)

এই পথ, ত্বক থেকে সুষুম্নাকাণ্ডে সুষুম্নাকাণ্ড থেকে মধ্যমস্তিষ্ক এবং সেখান থেকে মস্তিষ্ক আবরণের স্পর্শকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছেছে

অধঃস্তন কর্মচারীর সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় পরোক্ষভাবে। সে কারণে, ইন্দ্রিয়গুলি, থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দীপনা গ্রহণ করা গুরুমস্তিষ্কের কাজ নয়। অপরের মারফত এ কাজ সাধিত হয়। এই গুরুমস্তিষ্কের তিনটি প্রধান অংশ আছে—(১) **সংবেদনকেন্দ্র** (Sensory Area), (২) **শক্তি-কেন্দ্র** (Motor Area)। এবং (৩) **সমন্বয় কেন্দ্র** (Association Area)।। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে অসংখ্য অন্তর্মুখী স্নায়ু গুরুমস্তিষ্কের সংবেদনস্থলে এসে পৌঁছেছে এবং শক্তিকেন্দ্র থেকে অসংখ্য বহির্মুখী স্নায়ু নির্গত হয়ে ইন্দ্রিয়মূল ও দেহের বিভিন্ন মাংসপেশীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা,

নাসিকা ও ত্বক—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় থেকে সংবেদন গুরুমস্তিষ্কের সংবেদনস্থলে এসে পৌঁছেছে, তার ফলে নানা ধরনের সংবেদন আমরা পাচ্ছি। আমাদের সংকল্প কার্যে পরিণত করতে হলে দেহের পেশীগুলিতে শক্তি বহন করে এনে সেগুলিকে সঞ্চালিত করা প্রয়োজন। গুরুমস্তিষ্কের শক্তিকেন্দ্র থেকে শক্তি মাংসপেশীগুলিতে এসে সেগুলিকে সক্রিয় করে তুলছে, ফলে দেহগত ক্রিয়ার মাধ্যমে সংকল্প কার্যে পরিণত হচ্ছে। গুরুমস্তিষ্কের সমন্বয় কেন্দ্র (Association Area) মস্তিষ্কের নিম্নাংশ এবং সুষুম্নাকাণ্ডের ক্রিয়াগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।

প্রধান শক্তিবাহী পথ (The Principle Motor Path)

শক্তিবাহী কেন্দ্র থেকে অ্যাকসনগুলি মস্তিষ্ক-বৃন্তের মধ্য দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের কোন অংশে নেমে এসে শক্তিবাহী নিউরন এবং পেশীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে

## ৬। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার আঞ্চলিকতা বা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কেন্দ্র নিরূপণ (Localisation of Functions of the Brain):

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum)। সংবেদন, চিন্তা, কল্পনা, স্মৃতি, বিচার-বিবেচনা প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার কেন্দ্রগুলি গুরুমস্তিষ্কেই স্থাপিত। একেই মস্তিষ্কের ক্রিয়ার আঞ্চলিকতা বলা হয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে এবার সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক:

মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র

(ক) **সংবেদনকেন্দ্র** (Sensory Area): সংবেদনকেন্দ্র মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে মস্তিষ্কের বাইরের আবরণের (Cortex) কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। মধ্যমস্তিষ্কের কাছাকাছি

কতকগুলি কেন্দ্রের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। গুরুমস্তিষ্কের নিম্নভাগে এই মধ্যমস্তিষ্ক অবস্থিত। চোখ, কান এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় থেকে স্নায়ু (Nerves) নির্গত হয়ে মধ্যমস্তিষ্কে পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে আবার স্নায়ু নির্গত হয়ে মধ্যমস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্ক আবরণের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছে। এক হিসেবে মধ্যমস্তিষ্ককে মধ্যবর্তী সংযোগস্থল বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ, ইন্দ্রিয়গত সংবেদন সৃষ্টি করার ব্যাপারে মধ্যমস্তিষ্কের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি ইন্দ্রিয় মধ্যমস্তিষ্কের মারফত তার সংবাদ প্রেরণ করে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই মধ্যমস্তিষ্কের কোন একটি অংশের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন সংবেদনকেন্দ্রগুলি এবার আলোচনা করা যাক :

মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন বিভাগ
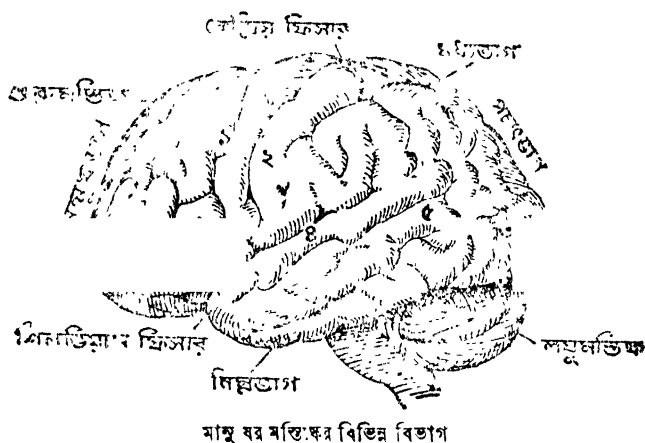
(১) শক্তিগ্রাহীকেন্দ্র, (২) স্পর্শকেন্দ্র, (৩) দর্শনকেন্দ্র, (৪) শ্রবণকেন্দ্র (৫) সমন্বয়কেন্দ্র

(i) **শ্রবণকেন্দ্র (Auditory Area) :** গুরুমস্তিষ্কের নিম্নভাগের বা রগ অঞ্চলের (Temporal Lobe) ঊর্ধ্বাংশে এবং শিলভিয়াস ফিসারের পাশে এই শ্রবণকেন্দ্রের অধিষ্ঠান। মস্তিষ্কের এই অংশই শ্রবণগত উদ্দীপনা গ্রহণের কেন্দ্রস্থল। সংবেদনবাহী স্নায়ু শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে মধ্যমস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মধ্যমস্তিষ্ক থেকে স্নায়ু এই অঞ্চলে এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

(ii) **দর্শনকেন্দ্র (Visual Area) :** চোখের অক্ষিপট থেকে স্নায়ু মধ্যমস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশে গিয়ে পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে সংবেদন-বাহী স্নায়ু গুরুমস্তিষ্কের পশ্চাদ্‌ভাগের বা শিরনিম্ন অঞ্চলের (Occipital lobe) নির্দিষ্ট অংশে গিয়ে পৌঁছেছে। গুরুমস্তিষ্কের এই অংশই দৃষ্টিগত উদ্দীপনা গ্রহণের কেন্দ্রস্থল।

(iii) **ঘ্রাণ এবং স্বাদকেন্দ্র** (Smell and Taste Areas): গুরুমস্তিষ্কের নিম্নভাগে বা রগ অঞ্চলে (Temporal Lobe) এই কেন্দ্রগুলির অধিষ্ঠান।

(iv) **স্পর্শকেন্দ্র** (Somesthetic Area): রোলাণ্ডো ফিসারের পিছনদিকে অবস্থিত গুরুমস্তিষ্কের মধ্যভাগের বা শিরকুম্ভ অঞ্চলের (Parietal Lobe) নির্দিষ্ট অংশকে স্পর্শকেন্দ্রের অধিষ্ঠান বলে মনে করা হয়। এই অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ত্বক বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সম্পর্কীয় সংবেদন পাওয়া যায় না।

(খ) **শক্তিকেন্দ্র** (Motor Area): রোলাণ্ডো ফিসারের ঠিক সামনে, মস্তিষ্ক আবরণের (Cortex) এক টুকরো অংশ আছে যাকে বলা হয় 'প্রি-সেণ্ট্রাল জাইয়ার' ('*Pre-central gyre*')। সেইটিই হল শক্তিকেন্দ্র। এখানে বড় বড় কোষ আছে এবং কোষ থেকে ছোট বড় নানা আকারের অ্যাকসন (Axon) মধ্যমস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছে গুচ্ছাকারে দেহের বিভিন্ন পেশীর কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই কেন্দ্রের কোন অংশ উদ্দীপিত হলে সেই অংশের সঙ্গে যুক্ত দেহের বিভিন্ন অংশগুলিও উদ্দীপিত হয়। এই কেন্দ্রের একেবারে ঊর্ধ্বভাগ উদ্দীপিত হলে আমাদের পা চলাফেরা করে। তার কিছু নীচের অংশ উদ্দীপিত হলে আমাদের বাহু নাড়াচাড়া করা সম্ভব হয়। এই '*Pre-central gyre*'-এর তলদেশের কাছের অংশটিই মাথা, মুখ, মুখমণ্ডলের নড়াচড়ার সঙ্গে যুক্ত। এই মণ্ডলের কোন অংশ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে দেহের কোন অংশে স্থায়িভাবে, নয়ত সাময়িকভাবে পক্ষাঘাত দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মস্তিষ্কের দক্ষিণ অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে শরীরের বামদিকটি বিকল হয় এবং যদি বাম অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে দক্ষিণ অংশটি বিকল হয়। এই কারণে মস্তিষ্ক-আবরণের (Cortex) এই সরু অংশটিকে শক্তিবাহী কেন্দ্র বলা হয়।

অবশ্য পুরোপুরি শক্তিকেন্দ্রটি (Motor Area) আরও কিছু বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে। শক্তিবাহীকেন্দ্রের সংলগ্ন গুরুমস্তিষ্কের সম্মুখভাগের কিছুটা অংশকে '*Pre-motor Area*' বলা হয়। এই '*Pre-motor Area*'-ও শক্তিকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। এই অংশের কাজ মস্তিষ্কের বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র ও পেশীর ক্রিয়াগুলির সংযোগ ও সমন্বয়সাধন।

(গ) **সমন্বয়কেন্দ্র** বা **নীরবকেন্দ্র** (Association or Silent Area): গুরুমস্তিষ্কের মধ্যভাগ, পশ্চাদ্‌ভাগ ও নিম্নভাগের উপরস্থ আবরণের একটা বড় অংশকে সমন্বয়কেন্দ্র বা নীরবকেন্দ্র বলা হয়। এই কেন্দ্র অন্যান্য অংশগুলির

সঙ্গে নিউরনের দ্বারা নানাভাবে সংযুক্ত। এটা হল সংযোগসাধন ও সামঞ্জস্য-বিধানের কেন্দ্রস্থল। সুষুম্নাকাণ্ড, সুষুম্নাশীর্ষক এবং লঘুমস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়সাধন করা এর কাজ। তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের সংবেদন গ্রহণ করা, ব্যাখ্যা করা, অন্যান্য সংবেদনের সঙ্গে এর সমন্বয়সাধন করার কেন্দ্রস্থলও এই সমন্বয় কেন্দ্র। 'সংবেদনকেন্দ্রের' সন্নিহিত এই 'সমন্বয়কেন্দ্রটি' যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সংবেদন সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেই সংবেদনের অর্থ বোঝা যায় না। যেমন, 'অ্যাফেসিয়া' (Aphasia) রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অপরের কথা শুনতে পায় কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারে না।

গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কর্মের কেন্দ্রস্থল, একেই বলা হয় **গুরুমস্তিষ্কের আঞ্চলিক ক্রিয়াবাদ** (**Doctrine of the Localisation of the Brain**)।

কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শারীর বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার আঞ্চলিকতার সমর্থনে কতকগুলি নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হল। প্রথমতঃ, গুরুমস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশ অপসারিত করলে প্রাণিদেহের কোন বিশেষ অংশের কর্মশক্তি বিনষ্ট হয়; দ্বিতীয়তঃ, মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রয়োগ করলে দেহের অংশবিশেষ স্পন্দিত হয়; তৃতীয়তঃ, অস্ত্রোপচারের সাহায্যে মস্তিষ্কের কোন্ অংশ কোন্ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত জানা যায়; এবং চতুর্থতঃ, স্নায়ুগুলির গমনপথ অনুসরণ করে মস্তিষ্কের কোন্ অংশ কোন্ ধরনের ক্রিয়াকেন্দ্র তা জানা যায়। এই সব নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ বিশেষ বিশেষ কার্যের অধিষ্ঠান কেন্দ্র।

মস্তিষ্কের ক্রিয়ায় আঞ্চলিকতার সমর্থনে যুক্তি

কিন্তু ফ্রাঞ্জ (*Franz*) বিড়াল ও বানরের উপর, পাভলভ (*Pavlov*) কুকুরের উপর এবং ল্যাশলে (*Lashley*) ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন যে, গুরুমস্তিষ্কের কোন অংশ যদি নষ্ট হয়ে যায় বা অপসারিত করা হয় তাহলে দেহের বিভিন্ন ক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে, কিন্তু তা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় মাত্র। কারণ কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, মস্তিষ্কের অন্য একটি কেন্দ্র সেই বিকল কেন্দ্রটির কার্যভার গ্রহণ করেছে এবং দেহের যে শক্তিটি ব্যাহত বা বিনষ্ট হয়েছিল সেটির আবার আবির্ভাব ঘটেছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে একটা সামগ্রিক ঐক্য আছে এবং গুরুমস্তিষ্ক সমগ্রভাবে

মস্তিষ্কের কোন অংশ বিকল হলে অন্য কোন অংশ তাহার কাজ করে

ক্রিয়া করে। এটিকে বলা হয় **সামগ্রিক ক্রিয়া মতবাদ** (Doctrine of Mass Function)।

**মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা স্বীকৃত হলেও মস্তিষ্কের সামগ্রিক ঐক্যকে অস্বীকার করা যায় না**

সিদ্ধান্তে বলা যেতে পারে যে গুরুমস্তিষ্কের এক একটি অঞ্চল এক একটি বিশেষ ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল এ যেমন অস্বীকার করা চলে না, তেমনি অপর দিকে এই সব বিভিন্ন ক্রিয়ার পশ্চাতে মস্তিষ্কের সামগ্রিক ঐক্যের বিষয়টিকেও উপেক্ষা করা চলে না।[1]

## ৭। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System) :

ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করে বলেই এই স্নায়ুতন্ত্রকে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বলা হয়। আসলে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র প্রধান স্নায়ুতন্ত্রেরই একটি অংশ কিন্তু এই স্নায়ুতন্ত্র প্রধান স্নায়ুতন্ত্রের (Central Nervous System) উপর নির্ভর না করে অনেকটা স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুগুলি মস্তিষ্ক-বৃন্ত (Brain stem) এবং মেরুদণ্ডের কোষদেহ থেকে নির্গত হয়ে দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পেশী, গ্রন্থি, অন্ত্র প্রভৃতিতে গিয়ে পৌঁছেছে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুগুলির সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের, ফুসফুস ও অন্ত্রের অনৈচ্ছিক পেশীর (involuntary muscles)

**স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের গঠন**

এবং সনালী গ্রন্থি, বিশেষ করে দুগ্ধক্ষরাগ্রন্থি, লালাগ্রন্থি, স্বেদগ্রন্থি এবং কতকগুলি অনালী গ্রন্থির সংযোগ আছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন উত্তেজনা, রাগ, ভয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডে অন্ত্রে ও গ্রন্থিতে যেসব পরিবর্তন ঘটে, সেগুলি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্নায়ুগুলি খুব সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুর (Nerve Fibres) দ্বারা গঠিত। খাদ্য পরিপাক-ক্রিয়া, শ্বাসক্রিয়া, রক্ত চলাচল প্রভৃতি এর নিয়ন্ত্রণাধীন।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দুটি প্রধান বিভাগ আছে; যথা—(১) সমবেদী (Sympathetic) এবং পরাসমবেদী (Parasympathetic)। 'সমবেদী' বক্ষোদেশ ও কটিদেশের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু নিয়ে গঠিত এবং 'পরাসমবেদী'

---

1. ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে গল্ (Gall) সর্বপ্রথম প্রচার করেন যে, মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র বিশেষ বিশেষ মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্ফীতি লক্ষ্য করে তিনি অনুমান করেছিলেন যে জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, দয়া, ভালবাসা বা অন্যান্য গুণের জন্য মস্তিষ্কে এক একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র আছে। মানুষের মস্তিষ্কের গঠন দেখলেই তার চরিত্র অনুমান করে নেওয়া যায় কিন্তু যেহেতু এই মতবাদ কোন পরীক্ষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি, সেহেতু এই মস্তিষ্ক বিজ্ঞান (Phrenology) শেষ পর্যন্ত ভ্রান্ত বলে পরিত্যক্ত হয়।

গ্রীবাদেশ, ত্রিকাস্থিদেশ (sacral division) এবং অনুত্রিকাস্থিদেশের (coccygeal division) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু দ্বারা গঠিত। এই দুটি বিভাগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সমবেদী (sympathetic) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত স্নায়ুগুলি হল উত্তেজক (excitatory),

সমবেদী বিভাগ ও পরাসমবেদী বিভাগ
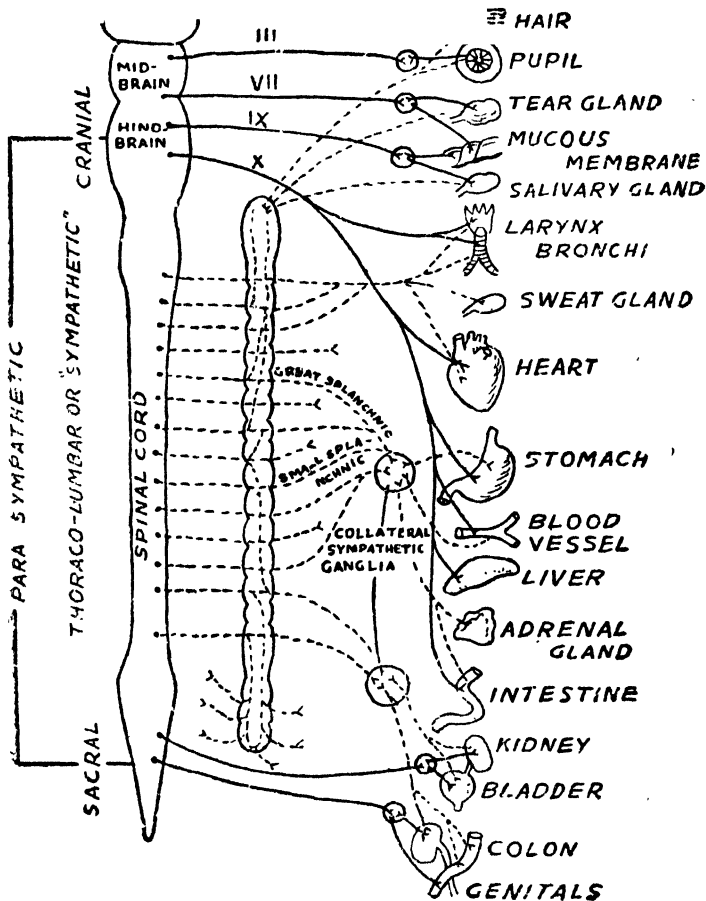
স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কল্পিত রেখাচিত্র

কিন্তু অপরদিকে পরাসমবেদী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত স্নায়ুগুলি হল 'বাধক' (Inhibitory)। পরাসমবেদী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত স্নায়ুগুলি যখন ক্রিয়া করে, তখন যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেগুলি হল হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ কমে যাওয়া, চোখের মণি স্ফীত হওয়া, দৈহিক উত্তাপের হ্রাস, পাকস্থলীর হজমের

কাজটির জন্য প্রয়োজনীয় রসক্ষরণ, পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য, যৌনগ্রন্থির ক্রিয়াবৃদ্ধি ইত্যাদি। মনে যখন আনন্দের সঞ্চার হয় তখন 'পরাসমবেদী' বিভাগ কাজ করে। 'সমবেদী' বিভাগের কাজ হল এর বিপরীত। এর কাজ হল হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ বৃদ্ধি করা, রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেওয়া, পরিপাক ক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করা ইত্যাদি। সমবেদী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত স্নায়ুগুলির সক্রিয়তার সঙ্গে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির রসক্ষরণের বিশেষ সংযোগ আছে।

মনে যখন ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি আবেগের সঞ্চার হয় এবং তার ফলে মনে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার হয়, তখন সমবেদী বিভাগ কাজ করে এবং এই সব আবেগের বেলায় যে দৈহিক উত্তেজনা দেখা দেয়, তার কারণ অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির রসক্ষরণের প্রভাব।

যদিও দুটি বিভাগের নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে তবু ক্ষেত্র বিশেষে 'সমবেদী' বিভাগ অবদমনের বা প্রশমনের কাজও করে থাকে। দেহ-মনের সুস্থতার জন্য এই দুটি বিভাগের ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি বা সুসমন্বয় থাকা একান্তই প্রয়োজন।

## ৮। প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous System) :

প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্রের দুটি ভাগ—মস্তিষ্ক স্নায়ু (Cranial Nerves) এবং সুষুম্না-স্নায়ু (Spinal Nerves)।

অসংখ্য স্নায়ু (nerves) আমাদের দেহের সবত্র ছড়িয়ে আছে। এই স্নায়ুগুলি খুব সূক্ষ্ম সাদা রঙের সুতোর মতো। একটি স্নায়ু আবার অনেকগুলি সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুর (Nerve Fibre) সমষ্টি। কতকগুলি স্নায়ু সোজাসুজি মস্তিষ্ক থেকে নির্গত হয়েছে। এগুলিকে বলা হয় **মস্তিষ্ক-স্নায়ু** (Cranial Nerves)। মস্তিষ্ক-স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কে অবস্থিত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়; যেমন—চোখ, কান, নাক, জিভের সঙ্গে সংযুক্ত। সবশুদ্ধ বার জোড়া মস্তিষ্ক-স্নায়ু আছে। কতকগুলি স্নায়ু নির্গত হয়েছে সুষুম্নাকাণ্ড থেকে, এগুলিকে বলা হয় **সুষুম্না-স্নায়ু** (Spinal Nerves)। সুষুম্না স্নায়ুগুলি ত্বক, অন্ত্র, পেশী প্রভৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বসমেত একত্রিশ জোড়া সুষুম্না-স্নায়ু আছে।

মস্তিষ্ক স্নায়ু ও সুষুম্না-স্নায়ু

এই স্নায়ুগুলিকে কার্যের দিক থেকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা—(১) **সংবেদনবাহী, অন্তর্মুখী** বা **অন্তর্বাহী স্নায়ু** (sensory or Afferent or In-carrying Nerves) এবং (২) **শক্তিবাহী,**

**বহির্মুখী** বা **বহির্বাহী স্নায়ু** (Motor or Efferent or Out-Carrying Nerves)। প্রথমোক্ত স্নায়ুগুলি বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে সংবেদন বা উদ্দীপনা সুষম্নাকাণ্ডে এবং মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায় এবং দ্বিতীয় ধরনের স্নায়ুগুলি সুষুম্নাকাণ্ড এবং মস্তিষ্কের শক্তিকেন্দ্র (Motor Centres) থেকে স্নায়বিক উদ্দীপনাকে বহন করে নিয়ে আসে। আমি পথ দিয়ে চলেছি, হঠাৎ কেউ আমায় ডাকলো; বুঝলাম আমার এক পরিচিত বন্ধু। আমি বন্ধুটির দিকে অগ্রসর হলাম। যখন বন্ধুটি আমার নাম ধরে ডেকেছিল তখন শব্দতরঙ্গ আমার কর্ণেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করল এবং সেখানে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করল অন্তর্মুখী স্নায়ুগুলি তা মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে গেল। মস্তিষ্ক নির্দেশ দিল বন্ধুর দিকে অগ্রসর হবার জন্য। সেই নির্দেশ-উদ্দীপনা বহির্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মাংসপেশীতে শক্তির সঞ্চার করে পেশীগুলিকে সঞ্চালিত করায় আমি বন্ধুটির দিকে অগ্রসর হলাম।

অন্তর্মুখী স্নায়ু ও বহির্মুখী স্নায়ু

## ৯। অনালী বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Ductless or Endiocrine glands) :

আমাদের দেহের অভ্যন্তরে এমন কতকগুলি গ্রন্থি আছে যেগুলি দেহের গঠন, বুদ্ধির বিকাশ, দেহের সুস্থতা ও কার্যক্ষমতা এবং আমাদের ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই গ্রন্থিগুলির বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি থেকে এক ধরনের রাসায়নিক তরল পদার্থ ক্ষরিত হয় এবং আমাদের দেহের উপরে এই তরল পদার্থের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থিগুলিকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে; যথা, (১) **সনালী গ্রন্থি** (Duct glands) এবং (২) **অনালী গ্রন্থি** (Ductless glands)। সনালী গ্রন্থিগুলির সঙ্গে নালিকা থাকে এবং এই নালিকা বেয়ে গ্রন্থিরস শরীরের বিভিন্ন অংশে এসে পতিত হয়। এই গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ রক্তস্রোতে হয় না, এদের ক্ষরণ হয় দেহের ভিতরে এবং দেহের বাইরে। লালা গ্রন্থি (Salivary gland), স্বেদ গ্রন্থি (Sweat gland), মূত্র গ্রন্থি (Kidney), অশ্রু গ্রন্থি (Tear gland), পাচক গ্রন্থি (Gastric gland), দুগ্ধক্ষরা গ্রন্থি (Mammary gland), প্রভৃতি হল সনালী গ্রন্থির উদাহরণ। এই সব গ্রন্থি আমাদের দেহের অনেক প্রয়োজনীয় কার্য সাধন করে। লালাগ্রন্থি

সনালী গ্রন্থির রসক্ষরণ

খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে, স্বেদ গ্রন্থি ও মূত্র গ্রন্থি শরীরের দূষিত পদার্থকে দেহ থেকে নিষ্কাশিত করে দেহকে সুস্থ রাখে এবং দুগ্ধক্ষরা গ্রন্থি স্তন্য দিয়ে নবজাত শিশুর জীবন রক্ষা করে।
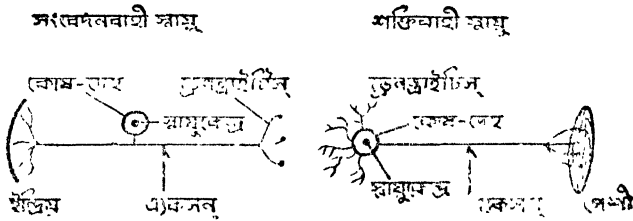
এ ছাড়া, আর এক ধরনের গ্রন্থি আছে যেগুলির সঙ্গে কোন নালিকা সংযুক্ত নেই, যার মধ্য দিয়ে ওদের ক্ষরিত রস শরীরের বাইরে নিঃসৃত হতে পারে। এইগুলিকে বলা হয় 'অনালী গ্রন্থি' (Ductless glands)। এই সব গ্রন্থি থেকে যে রস নিঃসৃত হয়, তা শরীরের বাইরে নির্গত হবার কোন পথ না পেয়ে সোজাসুজি রক্তস্রোতে পতিত হয় এবং দ্রুত দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই গ্রন্থিগুলি থেকে নিঃসৃত রসকে **হর্মোন** (Hormone)[1] বলা হয়। এই গ্রন্থিগুলি ছোট ছোট রাসায়নিক কারখানার মত কাজ করে। এরা রক্ত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, সেই উপাদানের সাহায্যে হর্মোন তৈরী করে এবং সেই হর্মোন রক্তস্রোতে ক্ষরণ করে। অনালী গ্রন্থিগুলিকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endrocrine glands) বলা হয় কারণ, এরা এদের ক্ষরিত রস দেহ থেকে বাইরে নির্গত না করে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

অনালী গ্রন্থির স্বরূপ

আমাদের দেহের ক্ষেত্রে এই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থিগুলি দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে কাজ করতে সহায়তা করে এবং দেহের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে। এই সমন্বয় সাধনের ক্রিয়া ছাড়াও শরীরের বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজ এই গ্রন্থিগুলির দ্বারা সাধিত হয়। অনালী গ্রন্থিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থি হল—থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland), অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal

প্রধান অনালী গ্রন্থিগুলির নাম

1. 'Hormone' from Greek hormao, excite.

gland), পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary gland), প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland), পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland) এবং গোনাড বা যৌন গ্রন্থি (Gonad or Sex gland)।

এইবার আমরা প্রধান প্রধান অনালী গ্রন্থিগুলির বিস্তৃত আলোচনা করছি ঃ

(ক) **থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland) ঃ** গলদেশে শ্বাসনালীর (Wind pipe) দুপাশে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত। এই গ্রন্থি থেকে যে
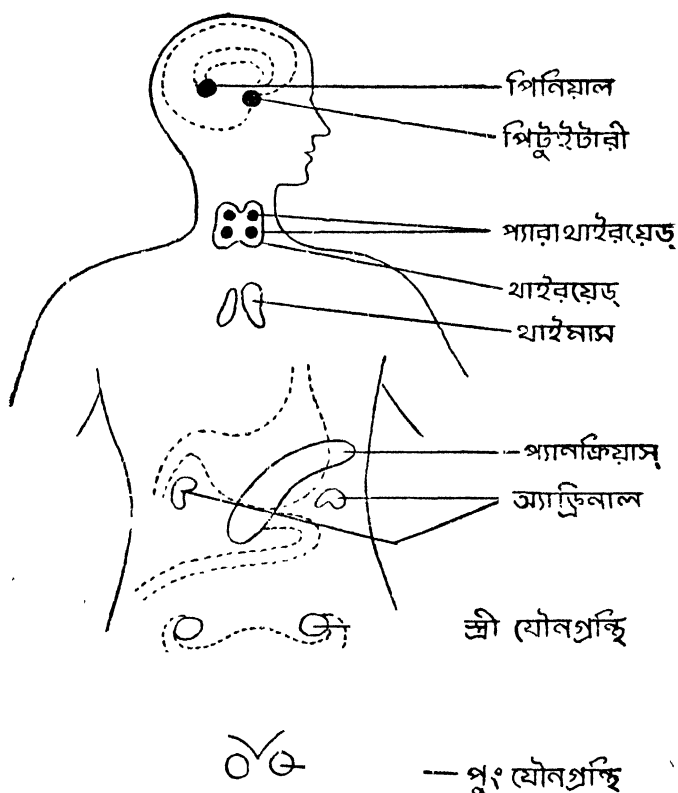
রস ক্ষরিত হয় তার নাম **থাইরকসিন** (Thyroxin)। দেহের সামগ্রিক বিকাশের কাজে এই গ্রন্থিটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে প্রয়োজনীয় রস ক্ষরিত না হলে শিশুর শারীরিক এবং

মানসিক বৃদ্ধি বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং এক প্রকার রোগ দেখা দেয় যার নাম ক্রেটিনিজম (Cretinism)। এই রোগে শিশু খর্বাকৃতি, ক্ষীণ দেহ, স্ফীতোদর এবং ক্ষীণবুদ্ধি হয়। পরিণত বয়সে যদি এই গ্রন্থির ক্ষরণ কম হয় তাহলে মিক্সেডেমা (Myxedema) নামক রোগের আবির্ভাব ঘটে। এই রোগে রক্তের চাপ কমে যায়, দেহের চামড়া শুষ্ক ও কুঞ্চিত হয়ে যায়, মাথার চুল উঠে যায়, দেহের রাসায়নিক কাজ (Metabolism or Chemical activity) ব্যাহত হয়, মুখ ও হাত স্ফীত হয়ে ওঠে, চেহারার লাবণ্য কমে যায় এবং কাজে আলস্য ও উদ্যমের অভাব দেখা দেয়। আবার এই গ্রন্থির ক্ষরণ যদি অতিরিক্ত মাত্রায় ঘটে, তাহলে ব্যক্তির রক্তের চাপ বেড়ে যায় ও নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত হয়। ব্যক্তি অত্যন্ত বেশী মাত্রায় উত্তেজিত, অস্থির, চঞ্চল ও মানসিক উদ্বেগগ্রস্ত হয়; ক্ষুধা বেড়ে যায়, শরীরের ওজন কমে যায় এবং ব্যক্তি স্নায়ুদৌর্বল্য, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে ভোগে। অর্থাৎ, থাইরক্সিন রসের আধিক্য ঘটলে গলগণ্ড দেখা দেয়। এই গ্রন্থিটি যদি নষ্ট হয়ে যায় ব্যক্তি অলসপ্রকৃতি, জড়বুদ্ধি ও বেশীমাত্রায় ভুলোমনা হয়।

**থাইরয়েড গ্রন্থির স্বরূপ ও কার্য**

থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর দেহের ও মনের বিকাশ নির্ভর করে; মুখের চেহারায় বুদ্ধি ও লাবণ্যের ছাপ পড়ে, ব্যক্তি বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও অনুভূতিপ্রবণ হয়। সুতরাং ব্যক্তির বুদ্ধিগত (intellectual) ও মেজাজগত (temperamental) বৈশিষ্ট্যের উপর এই গ্রন্থির বিশেষ প্রভাব আছে।

**(খ) প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid Gland):** এই গ্রন্থিগুলি সংখ্যায় চারটি। থাইরয়েড গ্রন্থির প্রত্যেকটির পাশে দুটি করে এদের অবস্থান। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির কাজ থাইরয়েড গ্রন্থির কাজের বিপরীত। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে যে রসের ক্ষরণ হয়, সে রস উত্তেজক কিন্তু প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে যে রসের ক্ষরণ হয়, তাহল বাধক। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করাই এর কাজ। এই গ্রন্থিটির প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্ষরণের জন্য স্নায়বিক উত্তেজনার তীব্রতা, অনুভূতি প্রবণতা প্রভৃতি দেখা দেয়। এই গ্রন্থিটির সাধারণ ক্ষরণের অভাব হলে অস্থিরতা, অবসাদ, পেশীয় দুবলতা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। এই গ্রন্থিগুলি দেহের ক্যালসিয়াম ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে।

**(গ) অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal Gland):** অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি সংখ্যায় দুটি। প্রতিটি মূত্রাশয়ের (Kidney) উপরে একটি করে অ্যাড্রিনাল

গ্রন্থির অবস্থান। প্রতিটি গ্রন্থির দুটি করে অংশ আছে, এর বাইরের অংশটির নাম অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স (Adrenal Cortex), এর ভিতরের অংশের নাম অ্যাড্রিনাল মেডুলা (Adrenal Medulla)। এর দুটি অংশ থেকে দুটি পৃথক রস বা হর্মোন ক্ষরিত হয়—বাইরের অংশ থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তার নাম কর্টিন (Cortin) এবং ভিতরের অংশ থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তার নাম অ্যাড্রেনিন বা অ্যাড্রেনালিন (Adrenin বা Adrenalin)। কর্টিন আমাদের দেহের পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এই রস বা হর্মোন যদি দেহে একেবারেই না থাকে, তাহলে মৃত্যু ঘটতে পারে। এই রসটি স্বাভাবিক উত্তেজকের (general stimulant) কাজ করে। এই রসটির ক্ষরণ যদি কম হয় তাহলে রক্তচাপের হ্রাস, দৈহিক দুর্বলতা, কাজে আগ্রহ এবং উদ্যমের অভাব, ক্লান্তিবোধ, পরিপাক-সম্পর্কীয় গোলোযোগ, যৌন বিষয়ে আগ্রহের অভাব দেখা দেয়। আবার এই রসটির যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্ষরণ হয় তাহলে পুরুষের ক্ষেত্রে নারীসুলভ ভাব এবং নারীর ক্ষেত্রে পুরুষালী ভাবের সৃষ্টি হয়। নারীর গলার স্বর গম্ভীর হয়ে যায়, গণ্ডদেশ স্ফীত হয়।

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির গঠন

কর্টিনের কার্য

অ্যাড্রিনাল মেডুলা থেকে যে রসের ক্ষরণ হয় তাকে বলা হয় অ্যাড্রিনিন। এই গ্রন্থিরস অত্যন্ত উত্তেজক। এই রস যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষরিত হয় তাহলে হৃৎস্পন্দনের গতি বৃদ্ধি পায়, রক্তের চাপ বেড়ে যায়, চক্ষুর তারকা (Pupil) দুটি স্ফীত হয়, পরিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফুসফুসের মধ্য প্রসারিত হওয়ার জন্য রক্তে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন সঞ্চারিত হয়। এই রস ক্ষরণের ফলে যকৃৎ থেকে শর্করা নির্গত হয়, ফলে পেশীর ক্লান্তি দূরীভূত হয় এবং অত্যধিক কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়। আবেগের (Emotion) সঙ্গে এই গ্রন্থি-রসের নিবিড় সম্পর্ক আছে। অত্যধিক ভয়, ক্রোধ, উদ্বেগ প্রভৃতি আবেগের ক্ষেত্রে রসটি অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষরিত হয়। আবেগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সক্রিয়তা ও শারীরিক শক্তি এই রসই যুগিয়ে দেয়। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে লড়াই করার জন্য বা আত্মরক্ষা হেতু ভয়ে ভীত হয়ে পলায়নের জন্য উপযুক্ত শক্তি সৃষ্টির কাজে এই গ্রন্থি সহায়তা করে। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ব্যক্তিকে বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত করে। সে কারণে ক্যানন (*Canon*) অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিকে জরুরী বা আপৎকালীন গ্রন্থি বলে অভিহিত করেছেন। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়, ব্যক্তি রোগ-সংক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা

অ্যাড্রিনালের কাজ

ক্ষরার শক্তি হারিয়ে ফেলে, দেহের রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়, কাজকর্মে আগ্রহের অভাব দেখা যায়, পরিপাক ক্রিয়া ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং দেহের চামড়া তাম্রবর্ণ ধারণ করে।

**(ঘ) পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary Gland)ঃ** অনালী গ্রন্থিগুলির মধ্যে পিটুইটারী গ্রন্থির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গ্রন্থি বিশেষ করে থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল ও যৌন গ্রন্থিগুলিকে কিছুমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এই গ্রন্থিকে 'মুখ্য গ্রন্থি' (master gland) বলা হয়। মাথার মাঝামাঝি জায়গার মস্তিষ্কের নীচে এই গ্রন্থিটির অবস্থান। এটি আকারে একটি ডিমের এবং পরিমাণে একটি মটর দানার মতো। এর দুটি অংশ আছে—সম্মুখ অংশ (Anterior Lobe) এবং পশ্চাৎ অংশ (Posterior Lobe)। এই গ্রন্থির ক্ষরিত রসের নাম পিটুইটিন। সম্মুখ অংশ থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তা শরীরের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে। যদি এই রস প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষরিত হয় তাহলে শরীরের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটে। সময় সময় এই বৃদ্ধি এতই অস্বাভাবিকভাবে ঘটে যে, একটি অল্পবয়স্ক কিশোরকেও সাত থেকে নয় ফুট লম্বা একটা দৈত্য বলে মনে হয়। অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য, বিরাট আকৃতির হাত, পা, অনাবশ্যক ভাবে দীর্ঘ দেহ হওয়া প্রভৃতি অস্বাভাবিকতা এই রসের ক্ষরণেরই ফল। আবার এই রস যদি অল্পমাত্রায় ক্ষরিত হয় তাহলে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, দেহ খর্ব হয়, হাত, পা ও দেহের অন্যান্য অংশ অস্বাভাবিকভাবে ছোট হয়। শরীরের কাজ কমে যায় ও চলনে অস্থিরতা দেখা দেয়।

পিটুইটারী গ্রন্থির গঠন ও বিভাগ

সম্মুখ অংশের ক্রিয়া

কি শারীরিক, কি মানসিক উভয় দিক থেকেই পিটুইটারী গ্রন্থির পশ্চাৎ অংশ, তার সম্মুখ অংশ থেকে কম প্রয়োজনীয়। পশ্চাৎ অংশ থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তা অন্যান্য গ্রন্থিকে উদ্দীপিত কোরে, অন্ত্র, মূত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্রগুলিকে সক্রিয় করে তোলে, দেহের চলন ভঙ্গিমাকে নিয়ন্ত্রিত করে, প্রসব কালে স্ত্রীলোকের জরায়ুর পেশীকে সঙ্কুচিত কোরে সন্তান প্রসব-ক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং যৌন ক্রিয়াশক্তিকে প্রভাবিত করে। এই গ্রন্থিই হল একমাত্র গ্রন্থি যার সঙ্গে মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। এই গ্রন্থির ক্ষরণ মধ্য মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস (hypothalamus) অংশের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

পশ্চাৎ অংশের ক্রিয়া

(ঙ) **পিনিয়াল গ্রন্থি** (Pineal Gland)**:** এটি একটি অন্তঃক্ষরা বা নালিকাবিহীন গ্রন্থি। মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে এর অবস্থান। এই গ্রন্থিটি শৈশবকালেই সক্রিয় থাকে এবং যৌবনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থির ক্ষরণ জননযন্ত্রের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর সম্পর্কে অল্প খবরই জানা গেছে এবং এর প্রয়োজনীয়তা খুবই গৌণ।

(চ) **যৌন গ্রন্থি** (Gonads or, Sex Glands)ঃ শৈশবে এই গ্রন্থিগুলি সক্রিয় থাকে না,, বয়ঃসন্ধিকালেই এগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। অনালী এবং সনালী দুভাবে যৌন গ্রন্থি কাজ করে থাকে। সনালী গ্রন্থি হিসেবে যৌন গ্রন্থি প্রজনন কোষ (Reproductive cells) উৎপাদন করে। অনালী গ্রন্থি হিসেবে যে রস ক্ষরণ করে তাতে জননেন্দ্রিয়ের বিকাশে এবং যৌন বিকৃতির প্রকাশে সহায়তা করে। পুরুষের যৌনগ্রন্থি বলতে বোঝায় অণ্ডকোষ এবং নারীর যৌনগ্রন্থি বলতে বোঝায় ডিম্বাশয়। উভয় ক্ষেত্রেই এগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। পুরুষের অণ্ডকোষ এবং স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয় থেকে যেমন প্রজনন কোষ নির্গত হয়, তেমনি রসও ক্ষরিত হয়। এই রস যে কেবলমাত্র পুরুষ ও নারীর যৌন বিকাশেই সহায়তা করে, তা নয়, এই রস দেহের গঠনে, বিকাশে ও সুস্থ স্বাভাবিক ক্রিয়াতে সহায়তা করে। পুরুষের গ্রন্থি থেকে যে হর্মোন বা রস ক্ষরিত হয়, তার নাম অ্যানড্রোজেন : এই হর্মোন পুরুষের লক্ষণ ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্ত্রীলোকের গ্রন্থি থেকে যে হর্মোন বা রস ক্ষরিত হয়, তার নাম এস্টোজেন এবং তা স্ত্রীলোকের লক্ষণ ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। পুরুষ-দেহে যদি স্ত্রী হর্মোনের 'আধিক্য ঘটে, তাহলে পুরুষের মধ্যে মেয়েলীভাব এবং স্ত্রীদেহের মধ্যে পুরুষ হর্মোনের আধিক্য ঘটলে স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষালিভাব দেখা যায়। যৌন হর্মোনের পরিমাণ কমে গেলে, পরিণত বয়সে পুরুষের পুরুষসুলভ আচরণ ও স্ত্রীলোকের স্ত্রীসুলভ আচরণ যথার্থভাবে প্রকাশ পায় না।

(ছ) **প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি** (Pancreas Gland)ঃ প্যানিক্রিয়াস যদিও সনালী (**duct**) গ্রন্থি, তবু এটি অনালী গ্রন্থির মতো কাজ করে। এর থেকে যে প্রয়োজনীয় হর্মোন ক্ষরিত হয়, তার নাম **ইনসুলিন** (Insulin)। রক্তের মধ্যে যে শর্করা আছে, সেই শর্করা যাতে দেহকোষ ব্যবহার করতে পারে এই গ্রন্থিরস তাতে সহায়তা করে। ইনসুলিনের অভাব-বশতঃ রক্তে শর্করার পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যায়, যার ফলে ব্যক্তি বহুমূত্র (diabetes) রোগে আক্রান্ত হয়। এইরূপ ব্যক্তির প্রস্রাবের সঙ্গে

প্যানক্রিয়াস গ্রন্থির কার্য

শর্করা নির্গত হতে থাকে। ফলে শারীরিক ও মানসিক শক্তি দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে, অধিকমাত্রায় ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, কাজে অবসাদ ও আগ্রহের অভাব দেখা দেয় এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ব্যাহত হয়। আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত ইনসুলিনের অবস্থিতির জন্যে রক্তে শর্করার পরিমাণ এমনভাবে হ্রাস পায় যে, প্রধান স্নায়ু তন্ত্রের মধ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণা, উদ্বেগ, অস্থিরতা, প্রলাপ ও সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। প্যানক্রিয়াস থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তাকে শোধন করে বহুমূত্র রোগের অতি পরিচিত ওষধ 'ইনসুলিন' তৈরী হয়। মানসিক রোগ নিরাময়ের জন্যও ইনসুলিন ব্যবহৃত হয়।

(জ) **থাইমাসগ্রন্থি (Thymus Gland)ঃ** এটি একটি অন্তঃক্ষরা বা নালিকাবিহীন গ্রন্থি। এটির অবস্থান গলার নীচে। থাইমাস গ্রন্থির ক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছুই জানা যায়নি। সম্প্রতি জানা গেছে যে, এই গ্রন্থিটির স্বাভাবিক ক্রিয়া যখন ব্যাহত হয় তখন এটি এমন একটি পদার্থ ক্ষরণ করে, যেটি স্নায়বিক উত্তেজনা, যে স্থানে পেশীকে সক্রিয় করে তোলার কথা, সেইস্থানে বাধার সঞ্চার করে। এই রোগের নাম 'mysathenia gravis' এবং এই রোগের চিকিৎসাক্ষেত্রে থাইমাস গ্রন্থিটিকে অপসারিত করে রোগীর যন্ত্রণার উপশম করা হয়। এই গ্রন্থির রসক্ষরণের উপর শরীর ও মনের বিকাশ নির্ভর করে।

থাইমাস গ্রন্থির কার্য

(ঝ) **যকৃত (Liver)ঃ** যকৃত থেকেও এক ধরনের রস ক্ষরিত হয়, যা পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

**গ্রন্থিগুলির পরস্পর সাপেক্ষতাঃ** পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির ভূমিকা আমাদের দেহের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেহের গঠন ও বিকাশ, পেশীগুলির সঞ্চালন শক্তি, পরিপাক ক্রিয়া, হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তের চাপ, মানসিক শক্তির বিকাশ, কাজে উৎসাহ ও আগ্রহ, দৈনন্দিন কাজের জন্য শক্তি রক্ষা করা, জরুরী অবস্থায় দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি বৃদ্ধি করে আত্মরক্ষা করা, সহনশক্তি, বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলা এবং যৌন বাসনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর অনালী গ্রন্থিগুলির বিশেষ প্রভাব আছে। আমাদের মানসিক প্রকৃতির উপর অনালী গ্রন্থিগুলির বিশেষ প্রভাব থাকলেও মানসিক প্রকৃতির কোন একটি লক্ষণ দেখে, যেমন অত্যধিক চঞ্চলতা বা অস্থিরতা বা যৌন বাসনার তীব্রতা লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে না যে কোন

দেহের ক্ষেত্রে অন্তঃক্ষরা বা অন্তঃস্রব গ্রন্থির ভূমিকা

একটি বিশেষ গ্রন্থি স্বাভাবিক ভাবে কাজ করছে না। তাছাড়া ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক অস্বাভাবিকতার বাহ্যপ্রকাশ, সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক উপাদানের উপরেও নির্ভর করে।

এইসব অন্তঃক্ষরা বা অন্তঃস্রব গ্রন্থিগুলি যদিও বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে এবং সময় সময় এদের কার্যের মধ্যে একটা বিরোধের ভাব দেখা যায়, তবু এদের মধ্যে, একটা সহযোগিতার ভাব আছে। যেমন, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থির কাজে সহায়তা করে, আবার পিটুইটারী গ্রন্থির পশ্চাদবর্তী অংশ যৌন ক্রিয়াশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করার ব্যাপারে যৌন গ্রন্থির সঙ্গে সহযোগিতা করে। এইভাবে গ্রন্থিগুলির কাজের স্বাতন্ত্র্য থাকলেও একেবারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা কাজ করে না, তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া বা একতাবোধ আছে। একেই **অন্তঃক্ষরা** বা **অন্তঃস্রব** গ্রন্থির **ভারসাম্য** (Balance of Endrocrine Glands) বলা হয়।

**অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ভারসাম্য**

## ১০। প্রতিবর্ত পথ বা প্রতিবর্তক বৃত্তাংশ ( Reflex Arc ) :

প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য স্নায়বিক উদ্দীপনাকে একটি নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ স্নায়ুপথ অতিক্রম করতে হয়। সংবেদনবাহী স্নায়ু, সুষুম্নাকাণ্ডের অংশ-বিশেষ এবং শক্তিবাহী স্নায়ু এগুলি নিয়েই এই প্রতিবর্ত পথ রচিত। এই পথকে 'প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ'ও বলা হয়; কারণ এই পথ আকারে একটি বৃত্তের চাপের (Arc) মতো। প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের পাঁচটি বিভাগ আছে, (১) গ্রাহক স্নায়ুপ্রান্ত —এটি কোন ইন্দ্রিয়ের যেমন চোখ, কান, নাক, ত্বক, জিভের বহিঃপ্রান্তে অবস্থিত থাকে। (২) অন্তর্মুখী বা সংবেদীয়স্নায়ু—উদ্দীপকের দ্বারা এর বহিঃপ্রান্ত উত্তেজিত হলে এতে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, যা সুষুম্নাকাণ্ডে পরিচালিত হয়। (৩) সুষুম্নাকাণ্ড—সংবেদীয় স্নায়ুর অন্তঃপ্রান্ত এতে অবস্থিত, ফলে সংবেদীয় স্নায়বিক উদ্দীপনা এখানে পৌছায়। (৪) বহির্মুখী বা শক্তিবাহী স্নায়ু—এর অন্তঃপ্রান্ত সংবেদীয় স্নায়ুর অন্তঃপ্রান্তে সংলগ্ন থাকে, ফলে সংবেদীয় স্নায়ু—উদ্দীপনা শক্তিবাহী স্নায়ুতে পরিচালিত হয়। (৫) সম্পাদক যন্ত্র—যেমন পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতি। শক্তিবাহী স্নায়ুর মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পেশী বা গ্রন্থিতে সঞ্চালিত হয় যার ফলে পেশীগুলি ক্রিয়াশীল এবং গ্রন্থিগুলির রস ক্ষরণ হয়।

**সংবেদনবাহী স্নায়ু, সুষুম্নাকাণ্ডের অংশ বিশেষ এবং শক্তিবাহী স্নায়ু এই নিয়ে প্রতিবর্ত পথ রচিত**

প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি সেই জাতীয় ক্রিয়া যা আমাদের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বহির্জগতের কোন উদ্দীপকের ক্রিয়ার ফলে আমাদের স্নায়ু উদ্দীপিত হওয়ার জন্য যে, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া দেহে সৃষ্ট হয় তাকেই প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলা হয়; যেমন জ্বলন্ত কাঠিতে হাত লাগা মাত্র আমরা হাত সরিয়ে নিই, উজ্জ্বল আলোক চোখে

প্রতিবর্ত ক্রিয়া
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
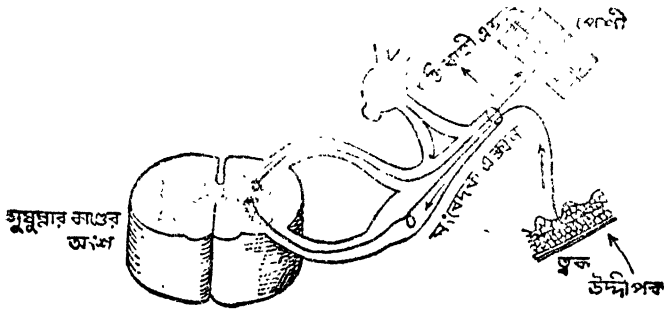
প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ

পড়তেই চোখ বুজি, চোখের মধ্যে ধুলোবালি পড়ার উপক্রম হলেই, চোখের পাতা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়।

এখন দেখা যাক, এই জাতীয় কাজ কিভাবে ঘটে। জ্বলন্ত কাঠি হল বাইরের জগতের উদ্দীপক যা আমার ত্বকের সংস্পর্শে এসে ত্বকের সংবেদীয় বা অন্তর্মুখী স্নায়ুর বহিঃপ্রান্তকে উদ্দীপিত করল, ফলে স্নায়বিক উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। একটি সংবেদনবাহী নিউরনের মাধ্যমে সেই স্নায়বিক উদ্দীপনা সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত সংবেদীয় স্নায়ুর অন্তঃপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছল। সংবেদীয় স্নায়ুর অন্তঃপ্রান্তের পাশেই রয়েছে শক্তিবাহী স্নায়ুর অন্তঃপ্রান্ত। ঐ স্নায়বিক উদ্দীপনা এবার শক্তিবাহী স্নায়ুর অন্তঃপ্রান্তকে উত্তেজিত করল। শক্তিবাহী বা ক্রিয়াজ নিউরনের (motor neurone) মাধ্যমে স্নায়ুপ্রবাহ এসে পৌঁছল শক্তিবাহী স্নায়ুর বহিঃপ্রান্তে যা পেশীতে বা গ্রন্থিতে (Glands) অবস্থিত, যার ফলে পেশীগুলিতে শক্তি সঞ্চালিত হল ও পেশীগুলি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল এবং আমিও চটপট হাত সরিয়ে নিলুম। একটি সন্নিকর্ষের (Synapse) মাধ্যমেই সংবেদনবাহী নিউরন এবং শক্তিবাহী নিউরন পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া
কিভাবে ঘটে

এই সংযোগের কাজটি সংঘটিত হয় সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর পদার্থের পশ্চাদংশে, মস্তিষ্কে নয়। সাধারণতঃ, যে ক্রিয়া বিচার বিবেচনার সাহায্যে

সম্পাদিত হয়, সে ক্রিয়ার স্নায়বিক উদ্দীপনা, অন্তর্বাহী স্নায়ু পরিবাহিত হয়ে সুষুম্নাকাণ্ড, লঘুমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক অতিক্রম করে গুরুমস্তিষ্কে পৌঁছয় এবং গুরুমস্তিষ্ক থেকে কোন বহির্বাহী স্নায়ুর মাধ্যমে পেশীতে শক্তি সঞ্চালিত হলে ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়। এ জাতীয় ক্রিয়া সময়সাপেক্ষ। কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়া মানুষের আত্মরক্ষায় সহায়তা করে, সে কারণে প্রতিক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হওয়া দরকার। এইজন্য সুষুম্নাকাণ্ডই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উৎস। সুষুম্নাকাণ্ডই প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং কাজটি যান্ত্রিকভাবেই সম্পন্ন হয়। প্রাণীর অন্যান্য ক্রিয়ার তুলনায় প্রতিবর্ত ক্রিয়া অনেক সরল ও দ্রুত, উদ্দীপকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

**সুষুম্নাকাণ্ডই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উৎস**

পরীক্ষণের সাহায্যে কুকুরের সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের সংযোগ ছিন্ন করার পরও দেখা গেছে যে, প্রতিবর্ত ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হচ্ছে এবং সেটি কোন ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে না। সে কারণে সুষুম্নাকাণ্ডকেই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উৎস মনে করা হয়।[1]

## প্রশ্নাবলী

1. Write a short essay on the Physiological basis of mental life (C. U. 1965, 1967)

Ans. (**তিনটি স্নায়ুতন্ত্র, প্রধান স্নায়ুতন্ত্রের গঠন, মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত-ভাবে লিখ।**)

2. Describe with the help of a diagram the principal parts of the central nervous system. (C. U. 1970)

Ans. (পৃঃ ৩৩—পৃঃ ৪১)

3. Describe with the help of a diagram the different parts of the human brain and briefly state their functions. (C. U. 1969)

Ans. (পৃঃ ৩৬ (খ)– পৃঃ ৪১)

4. Write short notes on :

(a) Endocrine Glands (C. U. 1964) ; (b) Synapse (C. U. 1966) ; (c) Cerebrum (C. U. 1968) ; (d) Reflex Action (C. U. 1969) ; (e) Reflex Arc. (f) Neurones.

1. যে সন্নিকর্ষটি শক্তিগ্রাহী এবং সংবেদন নিউরনের মধ্যে সংযোগসাধন করে, তার সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ থাকে বলে আমরা জ্বলন্ত কাঠিতে হাত লাগামাত্র বেদনা অনুভব করি। তবে বেদনা অনুভব করার বিষয়টি প্রতিক্রিয়াজনিত কাজ থেকে ভিন্ন।

# তৃতীয় অধ্যায়

# শিশুর শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক বিকাশ ও শিশুর জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর

# (Physical, Mental, Emotional and Social Development of Child and Different Stages of Child's Development)

## ১। ভূমিকা (Introduction) ঃ

যদি প্রশ্ন করা হয়, বিশ্বে কোন্ বস্তুটি সবচেয়ে পুরাতন, তবে তার জবাব হবে 'শিশু'। মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু পরিবর্তন তার প্রতিফলন আমরা পরিণত মানুষের মনের এবং আচরণের উপর লক্ষ্য করি। কিন্তু শিশু এসব প্রভাব থেকে মুক্ত। তার নিজস্ব জগতে সে বাস করে, আপন প্রকৃতিতে সে আত্মভোলা। নিজেকে কেন্দ্র করেই এ পৃথিবীতে চলে তার পদক্ষেপ। খেয়াল ও কল্পনা নিয়ে তার জীবন। এই যে-শিশু তার দেশ ও কাল অনুসারে কোন পার্থক্য নেই। যে কৌতূহল এবং অবাক দৃষ্টি নিয়ে আদিম যুগের শিশু পৃথিবীর এই আকাশ ও আলোককে প্রত্যক্ষ করে উৎফুল্ল হয়েছিল, বর্তমান বিংশ শতাব্দীর পারমাণবিক যুগে মানবশিশুর মনে সেই কৌতূহল, সেই অবাক দৃষ্টি লক্ষ্য করি।

*শিশু পৃথিবীতে পুরাতন বস্তু*

পুরাতন বলেই শিশুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে বেশী। তার মন নিয়ে অনুধাবন করার অবসরও আমরা পাইনি, প্রয়োজনও বোধ করিনি। যা কিছু আমরা শিশুর সম্বন্ধে সুপ্রাচীন অতীতে বলে জেনে এসেছি, তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা বা গবেষণার ফল নয়, তা ছিল শিশুর সম্বন্ধে আমাদের অন্ধ বিশ্বাস বা মনগড়া অভিজ্ঞতা।

কিন্তু আধুনিককালে বিশেষ করে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে আজ আমরা পুরাতন শিশুকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। আজ আমরা জেনেছি শিশু-মন বলে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। শিশুর খেয়াল, আবদার, আবেগ, রাগ, দ্বেষ, কল্পনা ইত্যাদি পরিণত বয়সের মানুষের কাছে যতই অর্থহীন হোক না কেন, শিশুর কাছে এসব মূল্যহীন নয় এবং তার জীবন-বিকাশে এসব প্রক্রিয়ার

*শিশু-মনের আবিষ্কার ও শিশু-মনোবিজ্ঞান*

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই শিশু-মনের আচরণ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের অন্তহীন জিজ্ঞাসা এবং তারই ফলস্বরূপ শিশু-মনোবিজ্ঞান (Child Psychology) বলে মনোবিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার আবির্ভাব হয়েছে।

## ২। শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ (Theories of Child-nature) :

শিশু-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। বলা বাহুল্য, মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এ বিষয়ে আলোচনা ঊনবিংশ শতাব্দীতেই শুরু হয়েছে। সুতরাং অনেক প্রাচীন অভিমতই বিজ্ঞানসম্মত নয়। যুক্তিবিচারে এই সব অভিমত অনেকাংশেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।

শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সব চেয়ে প্রাচীন মত হল শিশুরা পাপী। প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য দেশে সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করে বলা হত, আমাদের আদি মাতা হলেন 'ইভ' এবং আদি পিতা আদাম। ইভের প্ররোচনায় আমাদের আদি পিতা আদাম স্বর্গোদ্যানে জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল পেড়েছিলেন। এ অপরাধে আমাদের আদি জনকজননী পৃথিবীতে নির্বাসিত হলেন। আর তাদের কৃত পাপের পরিণাম অগণিত মানবসন্তান। এ মতবাদের প্রভাব বহুশতাব্দী ধরে চলেছে। তাই শিশুর জীবন পাপ-পরিপূর্ণ, সে অপরাধপ্রবণ।

শিশু-প্রকৃতি পাপপূর্ণ

আমাদের দেশে এ ধরনের পাপ সম্পর্কিত মতবাদ নেই। কিন্তু আমাদের দেশেও বিশ্বাস করা হত যে শিশুর জীবনে ষড়রিপুর প্রভাব বেশী। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদীর সর্বনাশী প্রতিক্রিয়া থেকে শিশুকে রক্ষা করতে হবে।

অতএব শিশুকে কঠিন শাসন ও রূঢ় হস্তে দমন করা চাই। কঠিন শৃঙ্খলা আর অনুশাসনে শিশুর জীবন হল নিপীড়িত। শিশু-শিক্ষায় শিশুর স্বতন্ত্র সত্তা হল অস্বীকৃত। পাপমোচন আর রিপু দমনই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

শিশু-প্রকৃতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতবাদ হল শিশুরা দেবতুল্য। স্বর্গের সুষমাই তাদের চরিত্রে বিরাজমান। ফরাসী দার্শনিক রুশো (*Rousseau*) এবং ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (*Wordsworth*)-এ মতের প্রধান প্রবক্তা। তাঁদের বিশ্বাস মানুষের স্বাভাবিক প্রভাব, সভ্যতার কৃত্রিম পরিবর্তন শিশুর সরল ও সৎ জীবনকে কলুষিত করে তোলে। রুশো সর্বপ্রকার সামাজিক প্রভাবমুক্ত মানুষের অস্তিত্বকে প্রাকৃতিক মানুষ (natural man) বলে অভিহিত করেছেন। আর শিশুর জীবনেই প্রাকৃতিক মানুষের চরিত্র ধরা পড়ে। কেননা, শিশু সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত। এজন্য

শিশু-প্রকৃতি দেবতুল্য

রুশো শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাকেই মানবমুক্তির একটি প্রধান শর্ত বলে ঘোষণা করেন।

রুশোর এ মতবাদকে ব্যাখ্যা করে পরবর্তী স্তরে শিশু-চরিত্রকে উদ্দাম স্বাধীনতা প্রিয় বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিশু-প্রকৃতি তার আপন খেয়াল-ধর্মী—তার নিজস্ব ইচ্ছা, আচরণ ও চিন্তার স্বাধীনতা আছে।

শিশু-প্রকৃতি সম্বন্ধে তৃতীয় মত হল, শিশু আত্ম-কেন্দ্রিক (ego-centric) এবং স্বার্থপর। এ মতবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা হলেন ইংরেজ দার্শনিক হবস (*Hobbes*)। তাঁর মতে একমাত্র সামাজিক শাসন ও কঠোর শৃঙ্খলা শিশুকে তার আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তি দেয়; প্রাকৃতিক শিশুর সংশোধিত ও মার্জিত রূপ হল সামাজিক শিশু।

শিশুরা স্বার্থান্বেষী

শিশুর প্রকৃতি নির্ণয়ে আর একটি মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মতবাদ হল স্ট্যানলি হল (*Stanley Hall*) প্রবর্তিত **পুনরাবর্তন মতবাদ** (Recapitulation Theory)। এ মতবাদ অনুসারে শিশুর প্রকৃতি হল মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। অর্থাৎ শিশুর প্রকৃতিকে বিচার করতে হলে আদিম মানবের সহজ সরল জীবন থেকে শুরু করে বর্তমান আণবিক যুগের জটিল ও সমস্যাসংকুল জীবন পর্যন্ত আলোচনা করা চাই। শিশু-প্রকৃতি মানবজাতির ক্রমবিকাশের স্তরগুলি বহন করে। স্ট্যানলি হল শিশুর খেলার মধ্যেও মানবের অতীত কাহিনীর পরিচয় পেয়েছেন। পুনরাবর্তন মতবাদের আর একটি অনুগামী মতবাদ হচ্ছে হারবার্ট (*Herbert*) প্রবর্তিত কৃষ্টি যুগতত্ত্ব (Culture-epoch Theory)। ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে মানবজাতি যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে শিশুর জীবনে তারই পুনরাবৃত্তি এবং শিশুর জীবন বিকাশের সহায়ক। বলা বাহুল্য, এ ধরনের মতবাদে শিশু-প্রকৃতির স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়নি। শিশুর প্রকৃতি অতীতের সাক্ষী বহন করে বটে কিন্তু ছককাটা পথে তার প্রকৃতি সীমায়িত নয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত দুটি মতবাদ শিশু-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছে; এই দুটির একটি হল **বংশধারাবাদ** (Herditarianism) এবং অন্যটি **পরিবেশবাদ** (Environmentalism)। প্রথম মতবাদ অনুসারে শিশুর জীবনে বংশধারার প্রভাবই বেশী। শিশুর দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী প্রকৃতিপ্রদত্ত এবং শিশুর জীবনে প্রকৃতিপ্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্যের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়াই বেশী। আর শিশুর প্রকৃতিকে বিচার করতে গেলে তার বংশধারাকে জানা উচিত।

অন্যদিকে পরিবেশবাদীরা বলেন, শিশুর জীবনে পরিবেশের মূল্য বেশী। মানব-শিশুর আচরণ প্রধানতঃ তার পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু-প্রকৃতি বিচার করতে হবে, বংশধারার কোন মূল্য নেই শিশু-প্রকৃতিতে।

শিশু-প্রকৃতি বিচারে এই দুই আপাতবিরোধী মতবাদ নানা জোরালো তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে এ দুই মতবাদের সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করা হয়। পরিবেশকে বংশধারার পরিপূরক বলে গণ্য করা হয়। স্যাণ্ডিফোর্ড (*Sandiford*) তাঁর '*Educational Psychology*' গ্রন্থে বলেন: "পরিবেশ বংশধারার পরিপূরক, বংশধারার কোন্ লক্ষণ কতটুকু বিকশিত হবে পরিবেশ তা নির্ধারণ করে। বংশধারার মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে তার বিকাশ সাধনই শিক্ষার কাজ। আর শিক্ষা পরিবেশেরই একটি অঙ্গ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার কাজ সীমায়িত—শিক্ষার দ্বারা উন্নতি সম্ভব নয়, যদিও শিক্ষা একটি যুগের মানব-জাতিকে প্রভাবিত করতে পারে।"

বংশধারা এবং পরিবেশ

আধুনিক মনোবিজ্ঞান শিশু-প্রকৃতিকে বিশেষ কোন ধর্মীয়, মিষ্টিক (mystic) বা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে না। বংশধারা এবং পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমেই শিশু-চরিত্রকে বিশ্লেষণ করা হয়।

## ৩। শিশুর প্রয়োজনের তাড়না (Child's needs):

শিশু-মনোবিজ্ঞানের অক্লান্ত গবেষণার ফলে শিশু-মনের বিচিত্র লীলাখেলা সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য অবগত হয়েছি। শিশুও তার সমস্যা নিয়ে পৃথিবীতে আসে এবং সে সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করে। তার কতকগুলির পিছনে প্রয়োজনের তাড়না আছে। আমরা নিম্নে শিশু-মনের প্রয়োজনের তাগিদ এবং শিশু-মনকে অধ্যয়ন করার পদ্ধতিগুলিও (methods) আলোচনা করছি:

শিশু তার জন্মের পর মুহূর্তেই নানা আচরণের মধ্য দিয়েই তার জীবনসত্তার পরিচয় দিতে শুরু করে। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং পরিবর্তনশীল আচরণের মধ্য দিয়ে শিশু বিকশিত হতে থাকে। ম্যাকডুগাল বলেন: শিশুর আচরণের পেছনে সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) ক্রিয়াশীল। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিকে মানবের সকল আচরণের মূল বলে গ্রহণ করা যায় না। নিম্নতর প্রাণীর ক্ষেত্রে অন্ধ যান্ত্রিক সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণের প্রভাবই আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু মানুষ উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। প্রয়োজনমত পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যস্ত আচরণকে

পরিহার করে নতুন আচরণকে সে গ্রহণ করতে অথবা তার আচরণে অভিপ্রেত পরিবর্তন আনতে পারে। আচরণ পরিবর্তনের ক্ষমতাকে বলা হয় নমনীয়তা (plasticity)। একমাত্র মানবই এ ক্ষমতার অধিকারী।

নমনীয়তা

নিম্নতর প্রাণীর আচরণকে ছক্‌কেটে ব্যাখ্যা করা যায় বা তাদের আচরণেরও একটি তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। শিশুর কতকগুলি আচরণের একটি তালিকা তৈরী করা যায়, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জীবনে দেখা দেয় আচরণের অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য; এবং তার আচরণ সহজ এবং থেকে জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে।

নিম্নতর প্রাণীর সকল আচরণের মূলে রয়েছে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি বা দৈহিক তাড়না। কিন্তু মানুষ আচরণ করে কেন? এ প্রশ্নের কোন সহজ জবাব নেই। তবে এ সম্বন্ধে একটি সাধারণ মন্তব্য করা যেতে পারে: মানব যখন কোন আচরণ করে তখন সে কোন-না-কোন অভাববোধ করে, আর সেই অভাব দূর করার জন্যই তার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। কিন্তু অভাবের অপসারণ ও লক্ষ্যবস্তুর চিন্তা করেই মানবমন ক্ষান্ত নয়, সে তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রয়োজনের একটি তাড়নাও অনুভব করে। এ তাড়নার ফলে তার পরিবেশে পরিবর্তন সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণও পরিবর্তিত হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রযোজনের কোন শ্রেণীবিভাগ (classification) করা যায় কিনা। আসল কথা, শিশুর জন্ম-মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার দেহমনে অফুরন্ত প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে যার তর্কশাস্ত্র-সম্মত কোন পরিসংখ্যান বা তালিকা প্রদান করা যায় না। ব্যাপক এবং সাধারণভাবে শিশুর প্রয়োজন কেন এবং কি তা আমরা আলোচনা করি মাত্র।

কেন শিশুর মধ্যে প্রয়োজনের তাড়না জাগে এবং তার কি প্রয়োজন? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, শিশুর প্রয়োজন জীবনে টিকে থাকা (survival)। তার জন্য সে চায় নিরাপত্তা, (security), আর বিরক্তিজনক, অসুবিধাজনক পরিস্থিতি সে পরিহার করে চায় পরিতৃপ্তি (satisfaction)। এ জন্য প্রয়োজন নতুন উদ্দীপনার বা অভিজ্ঞতার (stimulation)।

**(ক) শিশুর দৈহিক প্রয়োজন (Physiological needs):** শিশু জীবনে বাঁচতে চায় এবং এজন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাস-প্রশ্বাস, নিদ্রা প্রভৃতি দৈহিক প্রয়োজন তার রয়েছে। শিশু তার জৈবিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত হলে তার

পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ক্ষুধা বা তৃষ্ণার প্রয়োজন উপস্থিত হলে শিশু উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ তার প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি চায়। তখন সে কান্নায় ফেটে পড়ে। তারপর যখন তার খাবার উপস্থিত হয়, তখন তার কান্না থেমে যায়।

জৈবিক প্রয়োজন

জৈবিক প্রয়োজনের সঙ্গে শিশু মনে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, যৌনসুখ প্রভৃতির প্রয়োজন দেখা যায়। অতি শৈশবেই স্নেহ, ভালবাসা এবং ভয়কে কেন্দ্র করে তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি জেগে ওঠে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মাকে আশ্রয় করেই শিশুর প্রথম জীবনে এসব আবেগ আশ্রয় খোঁজে এবং শিশু-মনে নিরাপত্তা বোধের সৃষ্টি হয়। ডক্টর সুটি (*Suttie*) বলেন, শিশুর জীবনের পরবর্তী সামাজিক বিকাশের মূল, শিশু ও তার মায়ের গভীর ভালবাসার মধ্যে নিহিত। শিশুর পরিণত জীবনের ঘৃণা, উদ্বেগ বা ভয়ের কারণ শৈশবের এই আবেগজনিত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির অভাব। অতি শৈশবেই শিশুর যৌন-অনুভূতি হয় কিনা এ নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা বলেন, জন্মের মুহূর্ত থেকেই যৌনচেতনা বা 'লিবাইডো'র (Libido) প্রবাহ চলে। অতি শৈশবেই লিবাইডোর স্থান থাকে মুখে। এই সময় শিশু আঙুল চোষা, কামড়ান প্রভৃতির দ্বারা লিবাইডোর তৃপ্তি পায়। এটাকে বলে মৌখিক রতি (Oral-erotic)। শৈশবের পরবর্তী স্তরে মাকে ভালবাসার মধ্যেই তার লিবাইডো পরিতৃপ্তি খোঁজে।

ইন্দ্রিয় তৃপ্তি

শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের সবচেয়ে বড় কথা তার দেহকে রক্ষা করা এবং দৈহিক নিরাপত্তা রক্ষা করা। শৈশবে শিশু অত্যন্ত অসহায়। অন্যান্য ইতর প্রাণী জন্মের পর থেকেই আত্মনির্ভর হতে শেখে এবং মানব শিশুর মতো প্রকৃতির কোলে সে অসহায় নয়। কিন্তু শিশুর সবচেয়ে প্রয়োজন বিপদ থেকে রক্ষা এবং নিরাপত্তা বোধ। এই জৈবিক বা দৈহিক প্রয়োজনই শিশুকে পরনির্ভর করে তোলে। ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনঃসমীক্ষণবাদীরা বলেন, শিশুর নিরাপত্তার অভাব এবং অবদমিত আকাঙ্ক্ষাই তার পরিণত বয়সে মানসিক বিকার সৃষ্টি করে। এজন্য শিশুর আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ প্রয়োজন এবং স্নেহ-ভালবাসা দ্বারা তার মনে নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি করতে হবে। হাডফিল্ড (*Hadfield*) বলেন, শিশুর জৈবিক প্রয়োজন কেবলমাত্র জৈবিক নয়, মানসিকও। কেননা, শিশুর প্রয়োজন শুধু নিরাপত্তা নয়, সে যে রক্ষিত হচ্ছে তার মধ্যে এ অনুভূতিরও প্রয়োজন।

দৈহিক নিরাপত্তা

**(খ) শিশুর পরিবেশগত প্রয়োজন (Environmental needs) :** শিশু জন্মেই যে-পরিবেশে আসে তার সঙ্গে তার সঙ্গতি সাধন করতে হয়। ইতর প্রাণীরা অনুকূল পরিবেশেই জন্মে। তাই এদের প্রসঙ্গে পারিবেশিক প্রয়োজনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। পরিবেশকে আমরা মোটামুটি দু ভাগে ভাগ করতে পারি, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ। অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই সামাজিক প্রয়োজন। কে তার আপন জন, কে তার আপন জন নয়, এসব শিশু ভাবতে শেখে। এজন্য সে বিশেষ করে নিজের পরিজনকে ঘিরেই থাকতে চায়। এ সময়ে তার একটা অধিকারবোধও জন্মে। শিশু তখন মা-বাবা ও অন্যান্য পরিজনকে কেন্দ্র করেই সেই অধিকার লাভ করতে চায়। সে যেমন সকলের স্নেহ ভালবাসা পেতে চায়, তেমনি সেও সকলকে ভালবাসতে চায়। তার পরিবারের মধ্যেই এ চাহিদা পরিতৃপ্তি খোঁজে। এজন্য শিশুর জীবনে পরিবারের প্রভাব ও দান অপরিসীম। পরিবার থেকেই শিশু বিদ্যালয় বা বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করে। অপরের সাহচর্য ও সম্পর্ক এবং যৌথ জীবন যাপনের প্রয়োজন জীবনের শুরুতে নানাভাবে দেখা দেয়। সুষ্ঠুভাবে তখন শিশুকে পরিচালনা না করলে শিশুর পক্ষে সামাজিক চাহিদা ও তার নিজস্ব চাহিদার সার্থক সমন্বয় সাধন অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য এই সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়। পরিণত জীবনে শিশু যাতে সমাজধর্মী হয়ে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন করে, সে যাতে অসামাজিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে না ওঠে, এ হল শিশুর শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

**সামাজিক প্রয়োজন**

প্রাকৃতিক পরিবেশেও শিশুর নিরাপত্তার প্রয়োজন জড়িত। যা ভয়ংকর বা বিরক্তিকর, যা শিশুর মনে ভয়ের উদ্রেক করে শিশু সর্বদা তা পরিহার করে। কিন্তু সে নতুন উদ্দীপকের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। এ সময়ে তার প্রধান আবেগ হল ঔৎসুক্য। প্রতিটি ঘটনা সম্বন্ধে শিশু-মনে কৌতূহলের সীমা নেই। হাডফিল্ড বলেন, "শিশুই বৈজ্ঞানিক, প্রকৃতির সব কিছুকেই সে বুঝতে চায়। তার ইন্দ্রিয়বোধ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রশ্নব্যাকুল হয়ে ওঠে, নতুনকে জানার ও আবিষ্কার করার প্রয়োজন সে অনুভব করে।"

**প্রাকৃতিক প্রয়োজন**

শিশুর এ চাহিদা বা প্রয়োজনের গুরুত্ব অসীম। শিশুর জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি না হলে, তার আবেগ অবদমিত হয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে, নতুন

উদ্দীপনের মধ্যে শিশুর প্রশ্নব্যাকুল যে-মন আত্মপ্রকাশের সুযোগ খোঁজে, সে-মনের তখন অপমৃত্যু হয়। এজন্য আধুনিক শিশু-শিক্ষায় প্রকৃতিবীক্ষণ (Nature study) এবং ইন্দ্রিয়ানুশীলনের (Training of Senses) প্রচুর ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে শিশুর প্রাকৃতিক পরিবেশগত প্রয়োজন পরিতৃপ্তি লাভ করে।

**(গ) শিশুর আত্মসম্বন্ধীয় বা মানসিক প্রয়োজন (Mental needs) :** তিন চার বছর বয়সেই শিশুর মধ্যে অহংভাবের (Ego-Consciousness) সৃষ্টি হয়। এ সময়ে শিশু তার নিজের উপর খুব গুরুত্ব প্রদান করে। সব কিছু যেন তার নিজের। নিজেকে প্রকাশ করতে, নিজের কথা শোনাতে সে সদা ব্যস্ত। তার মধ্যে আত্মপ্রকাশের (Self-Exhibition) এক প্রচণ্ড তাগিদ উপস্থিত হয়। তার আত্মসম্মানবোধ তখন খুব প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয়। সে তখন খুব জেদী। শিশুর এ আত্মসম্মান এবং অহংবোধকে কেন্দ্র করেই তার ব্যক্তিসত্তার অন্যান্য গুণাবলী এবং নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ জেগে ওঠে। এজন্য শিশুকে তার আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। তা না হলে সে নিজেকে অবহেলিত মনে করবে, ভবিষ্যতে সে আত্মপ্রকাশ লাভ করতে পারবে না। সে দুর্বল এবং অসমঞ্জস (Mal-adjusted) ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে পড়বে।

**মানসিক প্রয়োজন**

সুতরাং শিশু-শিক্ষায় শিশুর স্বাধীন ইচ্ছার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের প্রয়োজন। খেলাভিত্তিক শিক্ষায় (Playway-in-education) খেলার উপর প্রচুর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কারণ, খেলার মধ্যে শিশুর আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।

এযাবৎ আমরা শিশুর চাহিদা বা প্রয়োজনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করেছি এবং শিশু-জীবনের পরবর্তী বিকাশধারায় এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করেছি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে দুটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, প্রয়োজনের এ শ্রেণীবিভাগ তর্কশাস্ত্রসম্মত নয়। অর্থাৎ জৈবিক প্রয়োজনের সঙ্গে পারিবেশিক বা মানসিক প্রয়োজন জড়িয়ে আছে বা মানসিক প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জৈবিক প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, এ শ্রেণীবিভাগ সর্ববাদীসম্মত নয়। কেউ কেউ প্রয়োজনকে শুধু জৈবিক বা দৈহিক (Physiological or Physical) এবং মানসিক (Mental)—এই দু শ্রেণীতে ভাগ করেন। আবার কেউ কেউ

**প্রয়োজনের শ্রেণীবিভাগ**

প্রয়োজনকে সহজাত (innate) বা শিক্ষা-নিরপেক্ষ (unlearned) এবং শিক্ষালব্ধ (learned)—এই দু ভাগে ভাগ করেন। আর একদল প্রয়োজনকে ব্যক্তিগত (individual) এবং সামাজিক (social)—এই দু শ্রেণীতে ভাগ করেন। আসল কথা, শিশুর প্রয়োজনের তাগিদকে তর্কশাস্ত্রসম্মতভাবে এরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না ; কারণ তার অজস্র উৎস এবং বিচিত্র প্রকাশপথ। আমরা কেবল আলোচনার সুবিধার্থে এই শ্রেণীবিভাগ করেছি।

## ৪। শিশুর পরিপক্কতা এবং শিক্ষণ (Maturation and Learning) :

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ-মনে নানা প্রয়োজনের তাড়না এসে উপস্থিত হয়। আর এসব প্রয়োজনের সার্থক ও সুসংহত পরিতৃপ্তির মাধ্যমে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে, শিশু পরিপক্কতা (maturation) লাভ করে।

পরিপক্কতা শব্দের অর্থ হল পরিণতি লাভ। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে যে-কোন পরিণতি লাভ করাকেই পরিপক্কতা বুঝায় না। পরিপক্কতা বলতে আমরা শিশুর দৈহিক বিকাশ বা দৈহিক বিকাশের প্রক্রিয়া বুঝি। মানব শিশু হঠাৎ প্রাপ্তবয়স্কতে পরিণত হয় না। ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে তার পরিপক্কতার ক্রিয়াকলাপ। এ কথা সত্য যে, তার দৈহিক বিকাশে নতুন কিছুই সৃষ্টি হয় না। সকল শক্তি, সকল সম্ভাবনাই সহজাত। কিন্তু এগুলি ধীরে ধীরে শিশুর জীবনে প্রকাশিত হয়। শিশুর হাত, পা, মাথার দৈর্ঘ্য ও ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার স্নায়ুতন্ত্র বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিশু বসতে, উঠতে, চলতে শেখে। চার বছরের পর শিশুর পেশীগুলি পুষ্টিলাভ করে এবং শিশু অনেক দৈহিক নৈপুণ্য (Skill) লাভ করে। এভাবে শিশুর জীবনে চলে শরীরের যন্ত্রগুলির বৃদ্ধি। কিন্তু মেয়েরা এ সময় ছেলেদের চাইতে বেশী বর্ধিত হয়। কিন্তু পরে দেখা যায়, মেয়েরা ছেলেদের চাইতে কম বৃদ্ধি পাচ্ছে। যৌবন আগমনের কিছু পূর্বে শরীরের বৃদ্ধির হার খুব বেড়ে যায়। শরীরের ওজনও বাড়ে কিন্তু শরীরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় কম। যৌবন আগমনের পরে দৈহিক বৃদ্ধির হার আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং শেষে থেমে যায়। যৌবনই পরিপক্কতার পূর্ণ স্তর। এ সময়ে দেহে নানা পরিবর্তন ঘটে। আর এসব দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যেই সংঘটিত হয় শিশুর পরিপক্কতা।

পরিপক্কতার অর্থ

মনোবিজ্ঞানে আচরণ পরিবর্তনে সক্ষম যে-কোন অভিজ্ঞতাকেই শিক্ষা বলা হয়। অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানই শিক্ষা। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা আমাদের যে পরিবর্তন আনি, তা শিক্ষণলব্ধ কার্য (learned activity)।[1] জন্মের পর থেকেই শিশুকে কোন-না-কোন ভাবে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করতে হচ্ছে। পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল এবং শিশুকে নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার আচরণকে পরিবর্জন বা পরিবর্তন করতে হয়। তাই শিক্ষণের দ্বারা আমরা নতুন পরিবেশের সঙ্গে প্রতিযোজনের ক্ষমতা আয়ত্ত করি ; ফলে, আমাদের আচরণ দ্রুত সম্পাদিত হয় এবং উন্নততর হয়।

শিক্ষা

পরিপক্কতা এবং শিক্ষণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শিশুর জীবনে পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রয়োজনের তাড়না উপস্থিত হয়। পরিবেশ এবং শিশুর প্রয়োজনের মধ্যে চলে প্রতিক্রিয়াশীল লীলাখেলা। ব্যাপক অর্থে আমাদের সকল অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান, সকল নৈপুণ্য, সকল অভ্যাস, মানুষ ও বস্তুর সঙ্গে প্রতিন্যাস (acquaintance) সবই শিক্ষণলব্ধ। অতএব শিশুর জীবনে প্রতিনিয়ত যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তার দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রয়োজনের তাগিদ উপস্থিত হচ্ছে, সেই অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের তাগিদের ফলে সে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে যাচ্ছে। উহাই শিক্ষণ। শিক্ষণ ও পরিপক্কতার সঙ্গে সম্পর্ক তাই গভীর।

শিক্ষণ ও পরিপক্কতা

মানুষ এবং ইতর প্রাণীর উপর পরীক্ষণ করে দেখা গেছে এদের শিক্ষণ-ক্ষমতা অনেকটা পরিপকতার উপর নির্ভর করে। অসংঘটিত বা অপুষ্ট দেহে যেমন সুষ্ঠ মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়, তেমনি শিক্ষণ-কাজেও এরূপ অপরিপক্ক-দেহসম্পন্ন ব্যক্তি অপটু। পরীক্ষণ দ্বারা আরও প্রমাণিত হয়েছে, শিশুর গুরুমস্তিষ্কের (Cerebrum) পরিপকতার উপর তার বুদ্ধি ও শিক্ষণ-ক্ষমতা নির্ভর করে।

কিন্তু পরিপক্কতা ও শিক্ষণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমতঃ, শিশু তার স্বাভাবিক এবং জীবনধর্মী পরিবেশে প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিপক্কতা লাভ করে। এর মূলে শিশুর নিজস্ব কোন আয়াস বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। প্রাকৃতিক নিয়মেই শিশু কৈশোরে, যৌবনে উপনীত হবে। এই বিষয়টি শিশুর ইচ্ছা

উভয়ের পার্থক্য

1. "Learning is profiting by past experience."
"Learning is a change in performance."

বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। প্রাকৃতিক নিয়ম এখানে যান্ত্রিকভাবে শিশুকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং পরিবেশের প্রভাব পরিপক্কতার উপর খুব বেশী নয়। শিক্ষণ ছাড়াও পরিপক্কতা প্রক্রিয়া চলতে পারে। কিন্তু শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবেশের মূল্য খুব বেশী। পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আচরণে পরিবর্তন আসে। তা ছাড়', শিক্ষণের মূলে শিশুর প্রচেষ্টা, সক্রিয়তা, অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানর আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। কিন্তু পরিপক্কতার ক্ষেত্রে এসবের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

## ৫। শিশুমনকে অধ্যয়ন করার পদ্ধতি বা আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি (Methods used in the Study of Children *or* Methods of Modern Educational Phychology):

মনোবিজ্ঞান দীর্ঘদিন দর্শনশাস্ত্রের (Philosophy) কুক্ষিগত ছিল। তার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হবার পরেও মনোবিজ্ঞানের বিশেষ প্রগতি সম্ভব হয় নি। তার কারণ মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব কোন পদ্ধতি ছিল না। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। ফলে মনোবিজ্ঞানের গবেষণা কার্যে অভাবনীয় উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। শিশু-মনকে অধ্যয়ন করার বিভিন্ন পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানে গৃহীত হয়। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মূলতঃ এবং প্রধানতঃ মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিকে আশ্রয় করেই নিজস্ব অধিকার লাভ করে।

আমরা নিম্নে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে গৃহীত প্রধান পদ্ধতিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি ঃ

(ক) **অন্তর্দর্শন (Introspection):** ব্যক্তি যখন নিজের মানসিক অবস্থার ও প্রক্রিয়ার স্বরূপ, তার গতি, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তখন তাকে বলা হয় অন্তর্দর্শন। অন্তর্দর্শন হল অন্তঃপ্রত্যক্ষকরণ। কিন্তু যে-কোন অন্তঃ-প্রত্যক্ষণই অন্তর্দর্শন নয়। কোন ব্যক্তি যখন নিজের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করে, তখন তা অন্তঃপ্রত্যক্ষণ হলেও অন্তর্দর্শন নয়। আবার যখন কোন লোক সকাল বেলায় জলখাবারে কি কি খাবার খেয়েছিল তা স্মরণ করতে গিয়ে সেই খাদ্যের একটি প্রতিরূপ বা মানস প্রতিচ্ছবি (Image) মনের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করে তখনও মন অন্তর্মুখী, কিন্তু তা অন্তর্দর্শন নয়। মনোবিজ্ঞানী স্টাউট (*Stout*)-এর ভাষায় অন্তর্দর্শন হল, নিজের অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগী হওয়া (to introspect is to attend to one's own

experience)। কোন কারণে হয়ত আমি ক্রুদ্ধ হয়েছি, আমি নিজে অন্তর্দর্শনের সহায়তায় আমার ক্রোধের কারণ কি, কিভাবে ক্রোধ শুরু হল, কিভাবে ধীরে ধীরে তা প্রবলতর হতে লাগল এবং তারপর কিভাবে স্তিমিত হয়ে এল—এই সব কিছুই পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে যেমন আমরা বাইরের বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি ঠিক তেমনিভাবে অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্রে মন অন্তঃ-ইন্দ্রিয়ের রূপ ধারণ করে নিজের কার্যকলাপ নিজেই প্রত্যক্ষ করে। স্টাউট-এর ভাষায় অন্তর্দর্শন হল সুস্পষ্ট আত্মচেতনার একটি বিশেষ অবস্থা।

অন্তর্দর্শন পদ্ধতি হল ব্যক্তিনিষ্ঠ (Subjective) পদ্ধতি, বস্তুনিষ্ঠ (Objective) নয়। বাইরের জগতে বস্তুর সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। ব্যক্তি বাইরের জগৎ থেকে মনকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে একাগ্রচিত্তে মনোযোগের সঙ্গে নিজের মনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে।

**(i) অন্তর্দর্শনের গুণ (Merits of Introspection) :** অন্তর্দর্শন মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতি। যদিও মনোবিজ্ঞানকে পর্যবেক্ষণ (Observation) ও পরীক্ষণের (Experiment) সহায়তা গ্রহণ করতে হয়, তবুও মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষভাবে জানার এবং তাদের স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করার একমাত্র উপায় অন্তর্দর্শন।

অন্তর্দর্শনের সহায়তায় মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ, সুনিশ্চিত, যথাযথ জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। ব্যক্তি তার নিজের অবস্থা ও ক্রিয়াকলাপকে প্রত্যক্ষভাবে ও যতখানি সঠিকভাবে জানতে পারে বাহ্য-পর্যবেক্ষণের আশ্রয় গ্রহণ করে অন্য ব্যক্তির পক্ষে তাকে ততখানি সঠিকভাবে জানা সম্ভব নাও হতে পারে এবং জানলেও জানতে হয় পরোক্ষভাবে।

**(ii) অন্তর্দর্শনের ত্রুটি (Demerits of Introspection) :** অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমরা যে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে পর্যবেক্ষণ করি সেগুলি অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর বিষয়কে বর্জন করে যে মানসিক প্রক্রিয়াটিকে জানতে চাই, তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করাও কঠিন। সে কারণে পদ্ধতি হিসেবে অন্তর্দর্শন সহজসাধ্য পদ্ধতি নয়।

মানসিক প্রক্রিয়াগুলি চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। আমাদের চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ, কামনা প্রভৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। কোন একটি মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ জানার জন্য সচেষ্ট হতেই দেখা গেল সেটি বিলীন হয়ে গেছে। কোন

ব্যক্তি যখন তার কাজের স্বরূপটিকে জানতে চায়, তখনই দেখা গেল রাগ একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে।

যেহেতু মানসিক প্রক্রিয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সেহেতু দুজন মনোবিজ্ঞানী একই মানসিক প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করতে কখনই সক্ষম হবে না। ধরা যাক, দুজন মনোবিজ্ঞানী 'ভয়' এই মানসিক প্রক্রিয়াটিকে জানতে চায়। কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে এই মানসিক আবেগ ভিন্ন এবং একই আবেগকে তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অর্থাৎ অন্তর্দর্শনের সহায়তায় একই মানসিক প্রক্রিয়াকে জানা সম্ভব নয়।

এটি অন্তর্দর্শনের স্বভাবগত ত্রুটি; সম্পূর্ণভাবে এর থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য একাধিক বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর সমবেত সহযোগিতায় এই ত্রুটি অনেকাংশে দূর করা যেতে পারে।

সুতরাং অন্তর্দর্শনকে মনোবিজ্ঞানের একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অন্তর্দর্শনের পরিপূরক হিসেবে পর্যবেক্ষণকে গ্রহণ করা একান্তই প্রয়োজন এবং এজন্য আচরণবাদীরা (Behaviourists) পর্যবেক্ষণকে মনোবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু পর্যবেক্ষণ অন্তর্দর্শনের উপরই নির্ভরশীল।

(খ) **পরীক্ষণ-পদ্ধতি (Experimental Method):** কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে কোন মানসিক প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করার যে পদ্ধতি তাকে পরীক্ষণ পদ্ধতি বলা হয়। স্টাউট বলেন: "পরীক্ষণ হল সেই অবস্থায় পর্যবেক্ষণ যে অবস্থা আমরা নিজেরাই পূর্ব থেকে তৈরী করে রেখেছি।" পরীক্ষাগারে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় মধ্যে ব্যক্তির আচরণ আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

মনোবিজ্ঞানে এই পরীক্ষা পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করা হয় তার একটা সাধারণ নিয়ম আছে। যে অবস্থাগুলির মধ্যে কোন একটি মানসিক প্রক্রিয়াকে পরীক্ষক পর্যবেক্ষণ করেন, সেগুলি পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। তিনি পূর্ববর্তী অবস্থাগুলির মধ্যে মাত্র একটি অবস্থার পরিবর্তন ঘটান ও অন্যান্য অবস্থাগুলিকে অপরিবর্তিত রাখেন এবং তারপর ফলাফল লক্ষ্য করেন।

মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ-কার্যে দুজন পর্যবেক্ষকের প্রয়োজন হয়। একজন পরীক্ষক (Experimenter) এবং দ্বিতীয়জন হল পরীক্ষণ-পাত্র (Subject)। পরীক্ষক সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সৃষ্ট এক কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে পরীক্ষণ-পাত্রের উপর একটি উদ্দীপক প্রয়োগ করেন এবং তার প্রতিক্রিয়ার বাহ্যপ্রকাশ লক্ষ্য

করেন। আর পরীক্ষণ-পাত্র অন্তর্দর্শনের সাহায্যে নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। সুতরাং পরীক্ষণ পদ্ধতিতে অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ উভয়েরই সহায়তার প্রয়োজন।

কখনও কখনও পরীক্ষণ-কার্য চালাবার জন্য যাদের উপর পরীক্ষণ-কার্য চালান হয়, তাদের দুদলে ভাগ করা হয়। যেমন, কোন কাজ করার উপর ছাত্রদের আগ্রহের অভাব আছে কিনা পরীক্ষক তা নির্ধারণ করতে চান। পরীক্ষক দু দল ছাত্র নির্বাচন করলেন। উভয় দলই শারীরিক উপযুক্ততা ও কর্মদক্ষতার দিক দিয়ে অভিন্ন। উভয়কে একই পরিবেশে, একই পদ্ধতিতে একই কাজ করতে বলা হল। কেবলমাত্র একটি দলের মধ্যে কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি করা হল, অপর দলটির ক্ষেত্রে তা হল না। যে দলটির মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা হল তাদের বলা হয় **'পরীক্ষণমূলক দল'** (Experimental Group) এবং যাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয় নি তাদের বলা হয় **নিয়ন্ত্রিত দল** (Control Group)। এই পরীক্ষণের ফলে যদি দেখা যায় যে যাদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা হয়েছে তারা অপর দলটির তুলনায় কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে, তাহলে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করবার বিষয়টির উপর আগ্রহের প্রভাব আছে।

**পরীক্ষা-পদ্ধতির সুবিধা (Merits of Experiment):** প্রথমতঃ, আমাদের প্রয়োজনমত কৃত্রিম অবস্থাগুলি আমরা বার বার সৃষ্টি করতে পারি এবং যে মানসিক প্রক্রিয়াকে আমরা জানতে চাই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। পরীক্ষণ-কার্য আমাদের সময়ের সুযোগ এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী সম্পন্ন হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষণের ক্ষেত্রে যেহেতু অবস্থা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে, সেহেতু আলোচ্য বিষয়টিকে অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বিষয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত ও স্বতন্ত্র করে নিতে পারি।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানী স্টাউট-এর মতে পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হল, প্রাকৃতিক পরিবেশে বা স্বাভাবিক অবস্থায় মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যতখানি সহজ ও সরলভাবে নিজেদের প্রকাশ করে, পরীক্ষাগারের কৃত্রিম পরিবেশে প্রক্রিয়াগুলি ততখানি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের প্রকাশ করে না। স্বাভাবিক ভাবে কোন লোক ভয় পেলে তার ভাবাবেগটিকে যেভাবে জানা যাবে, কৃত্রিম পরিবেশে, কৃত্রিমভাবে তার মনে ভীতি সঞ্চারিত করে মানসিক প্রক্রিয়াটিকে ঠিক সেভাবে জানা যায় না।

**(গ) উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি (Genetic Method) :** '*Genesis*' শব্দটির অর্থ জন্ম বা উৎপত্তি। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে মনের জন্ম বা উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে তার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা হয় তাকেই 'উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি' বলে। দেহের মতো মনেরও ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবৃদ্ধি আছে। এ পদ্ধতির সাহায্যে শিশু-মনের ক্রমবিকাশ শৈশব থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত লক্ষ্য করা হয়। মনের বিকাশ বলতে পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত গুণগুলির বা ক্ষমতাগুলির বিকাশ বোঝায়। অর্থাৎ, বংশধারা সূত্রে প্রাপ্ত গুণ ও ক্ষমতা এবং পরিবেশের প্রভাব—এ দুয়ের সংঘাতে ব্যক্তি-মনের ক্রমবিকাশ ঘটে।

এ পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশু-মনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর প্রত্যক্ষ এবং লিপিবদ্ধ করা হয়। মনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বংশধারা এবং পরিবেশ —এই উভয়ের প্রভাব মানুষের মনের উপর কি ভাবে কাজ করছে, এসব প্রয়োজনীয় তথ্য 'উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়। শিশুর ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতা কিভাবে বিকাশ লাভ করে এই পদ্ধতির সাহায্যে তা জানা যায়।

একই শিশুকে তার শৈশবাবস্থা থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে, তার শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু এ জাতীয় পর্যবেক্ষণ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, সেহেতু একই শিশুকে সুদীর্ঘকাল ধরে পর্যবেক্ষণ না করে, বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি শিশুকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এক বয়স থেকে অপর এক বয়সের শিশুর আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনামূলক ভাবে বিচার করে শিশু-মনের ক্রমবিকাশের মূল সূত্রগুলি এ পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায়। শিশু-মনে বিভিন্ন প্রত্যয় বা সামান্য ধারণার (general ideas) উৎপত্তি কি ভাবে ঘটে, শিশুর আবেগ, অনুভূতি কিভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলি শিশুর জীবনে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে—শিশু-মন সম্পর্কীয় এসব প্রয়োজনীয় তথ্য এ পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায়।

**(ঘ) চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (The Clinical Method) :** বিভিন্ন প্রকারের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতির সহায়তায় ব্যক্তির মানসিক ব্যাধির স্বরূপ ও কারণ জানা যায় এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্ভব হয়। ব্যক্তি যদি তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা

করে চলতে না পারে তাহলে তার বাহ্যিক আচরণের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় এবং এই অস্বাভাবিক আচরণ অস্বাভাবিক মনেরই প্রকাশ বলে মনে করা হয়। এ পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক।

বর্তমান যুগে মানসিক ব্যাধি-চিকিৎসার শাস্ত্র (Psychiatry) মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। ফ্রয়েড, ইয়ুঙ, অ্যাডলার প্রমুখ খ্যাতনামা মানসিক ব্যাধি-চিকিৎসকদের গবেষণামূলক তথ্যাদির আবিষ্কারের ফলে এই চিকিৎসাশাস্ত্র জনহিতকর কার্যে উল্লেখযোগ্য সুফল প্রদানে সমর্থ হয়েছে।

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis), ফ্রয়েডের অবাধ সংসর্গ বা মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালী (Free association) পদ্ধতি, প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Test), প্রশ্ন-তালিকা (Questionnaire); ব্যক্তিত্ব নির্ণেয়ক প্রশ্নাবলী (Personality inventory) প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্রের পদ্ধতি বর্তমানে মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(ঙ) **ক্রমবিকাশ-ইতিহাস সংগ্রহণ-পদ্ধতি (The Case History Method):** 'উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি' এবং 'চিকিৎসামূলক পদ্ধতির' সহকারী পদ্ধতিরূপে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা হয়। মনের ক্রমবিকাশের পথে কোন একটি বিশেষ অবস্থাকে জানতে হলে তার পূর্ববর্তী অতীত অবস্থাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে জানা সম্ভব নয়। 'ক্রমবিকাশ-ইতিহাস সংগ্রহণ-পদ্ধতির' সাহায্যে অতীত অবস্থার ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়।

অস্বাভাবিক, অসুস্থ বা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করার জন্যই এই পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়। যেসব ব্যক্তির মন বিকারগ্রস্ত এবং যাদের বাহ্য আচরণ অস্বাভাবিক, এরূপ ব্যক্তি-মনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়। ব্যক্তির খোলাখুলি কথাবার্তা, যে পরিবেশে সে বাস করে এবং তার সামাজিক জীবন থেকে এই ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত ঘটনাগুলি একত্র করে সুবিন্যস্ত করার পর মোটামুটি একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। ব্যক্তির অসুস্থতার কারণ দৈহিক, মানসিক না সামাজিক তা নির্ধারণ করার পর তার মানসিক সুস্থতা কিভাবে আসতে পারে তাও নির্ণয় করা যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, ব্যক্তির এই মানসিক অসুস্থতার কারণ কেবলমাত্র তার নীতিজ্ঞানহীনতা বা দুশ্চরিত্রতা নয়, পরিবেশের প্রভাবও এজন্য দায়ী।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদের দুষ্কর্মের কারণ অনুসন্ধান করা হয়। হয়ত কোন ভদ্রপরিবারজাত শিশু চুরি করেছে। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী এই ঘটনার প্রয়োজনীয় বিবরণী সংগ্রহ করার জন্য সচেষ্ট হন। মনোবিজ্ঞানীকে শিশুর বিশ্বাস অর্জন করতে হয়, তারপর খোলাখুলি কথাবার্তার মাধ্যমে তার পিতামাতা, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির সহায়তায় তার এই দুষ্কর্মের উৎসগুলি অতীত জীবন থেকে অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করতে হয় এবং তারপর সেগুলিকে সমাজসম্মত পথে পরিচালিত করতে হয়।

এই পদ্ধতি যখন মনোবিজ্ঞানী প্রয়োগ করবেন তখন তাকে খুব সতর্ক হতে হবে। কেননা, ঘটনার ইতিহাস যাতে সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা যায় তার দিকে নজর দিতে হয়। অতীতে যেসব ঘটনা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি বা যার সঠিক ব্যাখ্যা করা হয়নি এমন সব ঘটনার উপরও এই পদ্ধতিকে নির্ভর করতে হয়।

(চ) **পরিসংখ্যানভিত্তিক পদ্ধতি (Statistical Method) ঃ** পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরিসংখ্যান পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রভেদ তা নির্ধারণ করার জন্য, ব্যক্তির বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতি, যোগ্যতা, সামর্থ্য প্রভৃতি পরিমাপ করার জন্য, মানসিক শক্তির যথার্থ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার জন্য এবং বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার গতি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণের জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

## ৬। শিশুর বিকাশ—শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক (Development of child—Physical, Social, Emotional and Intellectual) :

প্রতিটি শিশুই জন্মের মুহূর্ত থেকে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও বিকাশপ্রাপ্ত হচ্ছে। গতকাল শিশুকে যেমন দেখেছি আজকে তার থেকে পৃথক দেখছি। আবার আগামীকাল হয়ত সে আরও পৃথক হয়ে যাবে। এই পার্থক্যের সঠিক স্বরূপ নির্ধারণ করা না গেলেও, একে অস্বীকার করার উপায় নেই। একথা ঠিক যে, শিশুর এই পরিবর্তনের মধ্যেও তার ব্যক্তি-অভিন্নতা অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু তাহলেও তার আকর্ষণীয় বস্তু, খেলাধূলা, সঙ্গী এবং যেসব বস্তু তার

সংবেদনশীল মনে সাড়া জাগায়, অনবরতই পরিবর্তিত হচ্ছে। যে উদ্দীপক কোন এক বিশেষ সময়ে তার মনে সাড়া জাগায়, সেই উদ্দীপক হয়ত অন্য সময়ে তার মনে সাড়া জাগাতে পারে না।

শিশুর ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ কিভাবে ঘটে, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে সে সম্পর্কে অবহিত হইয়া প্রয়োজন এবং এই সবাঙ্গীন বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে শিশুর শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক বিকাশের যথাযথ জ্ঞানলাভ করা দরকার।

(ক) **শিশুর শারীরিক বিকাশ (Physical Development of the child) :** শিশু জন্মগ্রহণ করার পরই তার শারীরিক বিকাশ সাক্ষাৎ-ভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমরা লাভ করি, কিন্তু শিশুর শারীরিক বিকাশ ভূমিষ্ঠ হবার দশমাস আগে তার মাতৃগর্ভকালীন অবস্থা থেকেই শুরু হয়। কাজেই শিশুর শারীরিক বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে শিশুর মাতৃগর্ভকালীন বা জন্ম-পূর্ব বিকাশ (Pre-natal Development)-এর জ্ঞান থাকা দরকার। পুং জনন-কোষ স্ত্রীজনন-কোষের সঙ্গে মিলিত হলে গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভসঞ্চারের সময় মাতৃগর্ভে যে ডিম্বকোষ (fertilised egg) গঠিত হয় সেটি নিজধর্ম অনুসারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। একটি কোষ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দুটি কোষে, দুটি কোষ আবার দ্বিধা বিভক্ত হয়ে চারটি কোষে, এইভাবে বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয়। এই কোষ বিভাজনের ফলে আদি কোষটি ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবদেহের আকার লাভ করে। সাধারণ অবস্থায় শিশু মাতৃগর্ভে ২৮০ দিন অবস্থান করার পর ভূমিষ্ঠ হয়। প্রথম দুসপ্তাহ প্রস্ফুটিত ডিম্বকোষের (fertilised egg বা zygote) বিকাশের ক্ষেত্রে কোন বাহ্য-পরিবর্তন ঘটে না, শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে। দু সপ্তাহের পর থেকে তার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই সময় বিকশিত ও বর্ধিত ডিম্বটি যাকে ভ্রূণ (embryo) নামে অভিহিত করা হয়, মাতৃদেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। প্রায় তিনমাসের পর থেকেই কোষগুলি মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার লাভ করে। গর্ভসঞ্চারের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অষ্টম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কে ভ্রূণের আদি বা প্রাথমিক পর্যায় (embryonic stage) এবং নবম সপ্তাহ থেকে ভূমিষ্ঠ বা জন্ম হওয়ার সময় পর্যন্ত অবস্থাকে

শিশুর শারীরিকবিকাশ শুরু হয় মাতৃগর্ভে তার জন্মমুহূর্ত থেকে

কোষ-বিভাজনের ফলে আদিকোষ পূর্ণাঙ্গ মানবদেহের আকার লাভ করে

জন্মের তিনমাস পর থেকেই কোষগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার লাভ করে

পরিপুষ্ট ভ্রূণের অবস্থা (fatal period) বলা হয়। ৩০ সপ্তাহ ধরে এই ভ্রূণ ধীরে ধীরে মানব-শিশুর আকৃতি ধারণ করতে থাকে। এই সময় বিভিন্ন কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় পেশী, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হয়। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন শিশুর উদ্দীপকের প্রতি বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া (specific reaction) করার ক্ষমতা থাকে না; দেহের সাহায্যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া (mass activity) করার ক্ষমতা থাকে মাত্র।

জন্মের পরে শিশু যেমন বড় হতে থাকে তার উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন অনুপাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে শিশুর জন্মের শুরুতে এই বৃদ্ধি যত দ্রুতভাবে ঘটতে থাকে, শিশু যত পরিণতির (maturity) দিকে এগিয়ে চলে, ততই এই বৃদ্ধির হার কমে যেতে থাকে। তবে বয়ঃসন্ধিকালে (Adolescence) এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। জন্মের সময় শিশু প্রাথমিক ইন্দ্রিয়-ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রথম সপ্তাহে ইন্দ্রিয়-ক্ষমতার বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। ক্রমশঃ তীব্র আলো ও শব্দ তার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং শিশু গতিশীল বস্তু প্রত্যক্ষ করতে সচেষ্ট হয়। নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে শ্রবণগত সংবেদনের তুলনায় দৃষ্টি সংবেদনের ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে। নবজাত শিশু মিষ্টি, তিক্ত ও লবণাক্ত স্বাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শিশু ত্বক সংবেদনের মধ্যে, বেদনাদায়ক উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা লাভ করে। নবজাত শিশু কিছু কিছু প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সে চোখ বন্ধ করতে পারে, এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাতে পারে। নবজাত শিশুর প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ারও ক্ষমতা থাকে, তবে তা খুব সুস্পষ্ট নয়। শিশু যতই বাড়তে থাকে ততই সে তার হাত, পা, পেশী সঞ্চালনের ক্ষমতা লাভ করে। এই অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে। শিশু যতই নতুন নতুন বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে ততই তার কৌতূহল পরিতৃপ্তি লাভ করে। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সে জ্ঞানলাভ করে। পেশীগুলিকে প্রয়োজনমত সঞ্চালিত করার ক্ষমতা নবজাত শিশুর থাকে না। দুমাসের শিশু মাটি থেকে মুখ তুলতে পারে। চার মাসের শিশুকে ধরলে বসতে পারে। সাত মাসের শিশু একা একা বসতে

*জন্মের পরে শিশুর উচ্চতা ওজন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি হতে থাকে*

*শিশু যত বাড়তে থাকে ততই সে হাত-পা ও পেশী সঞ্চালন করার ক্ষমতা লাভ করে*

পারে, নয়-দশ মাসের শিশু কোন কিছু ধরে দাঁড়াতে পারে। এগার মাসে কোন কিছু অবলম্বন করে চলতে পারে। চৌদ্দ মাসে বিনা অবলম্বনে হাঁটতে পারে। তারপর ক্রমশঃ শিশু জটিল কার্য করার ক্ষমতার অধিকারী হয়। সে লাফাতে, দৌড়তে, উঠতে, নামতে প্রভৃতি নানা প্রকারের কার্য করার ক্ষমতা লাভ করে।

**পেশী সঞ্চালনের বিভিন্ন স্তর**

নবজাত শিশুর প্রথম দিকের আচরণ বিশেষধর্মী নয়, সামগ্রিক। নবজাত শিশুর প্রথম দিকের আচরণ সমগ্র দেহের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন প্রথম দিকে কোন লক্ষ্য সিদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে ঘটে না। সেকারণে এই সঞ্চালন সুনিয়ন্ত্রিত, সুসমঞ্জস ও সুসংহত নয়। ধীরে ধীরে, অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত অসমঞ্জস অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত হয়ে ওঠে। শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে শিশু প্রথমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সাধারণভাবে সঞ্চালিত করে, তারপরে ধীরে ধীরে প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য পৃথক পৃথক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালিত করতে শেখে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু পেশীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করতে শিক্ষা করে। চোখ ও হাতের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে শেখে, কোন জিনিস দেখে তাকে হাতে করে তুলে ধরতে শেখে। কাজেই শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করার ও পেশী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। শিশুর প্রথম দিকের আচরণ থাকে সাধারণ; কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার বা কোন সুনির্দিষ্ট কাজ করার ক্ষমতা শিশুর থাকে না। কিন্তু ক্রমশঃ যতই সে বড় হতে থাকে ততই তার সাধারণ আচরণগুলি বিশেষ ধরনের আচরণে পরিণত হয়। তারপর এই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র বিশেষ আচরণগুলিই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও জটিলতর আচরণে রূপান্তরিত হয়। যেমন, প্রথম শিশু লাফ দেওয়া এই বিশেষ আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল, তারপর দৌড়ান এই বিশেষ আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল। তারপর দৌড়তে দৌড়তে লাফ দেওয়া এই বিশেষ জটিল আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল। শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা এসে পড়ে। প্রথম দিকে হাত পা

**ধীরে ধীরে অনিয়ন্ত্রিত অসংহত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গসঞ্চালন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত হয়ে ওঠে।**

**শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ধীরে ধীরে বিশেষধর্মী হয়ে ওঠে**

**শিশু যতই বড় হতে থাকে তার সাধারণ আচরণগুলি বিশেষ ধরনের আচরণে পরিণত হয় এবং বিশেষ আচরণগুলি ক্রমশঃ জটিলতর আচরণে রূপান্তরিত হয়**

নাড়াতেই শিশুর খেলা সীমাবদ্ধ থাকে। ক্রমশঃ দৌড়ান, লাফান, ঠেলাঠেলি, এবং আরও পরে কপাটি খেলা, ফুটবল, ক্রিকেট, প্রভৃতি নানা ধরনের খেলা এসে পড়ে। তবে শিশুর শারীরিক বিকাশের প্রথম দিকে খেলাধূলার মধ্যে যত রকম বৈচিত্র্য দেখা যায়, ক্রমশঃ বয়স বাড়তে থাকলে, খেলাধূলার প্রকৃতিগত পার্থক্য বা বৈচিত্র্য হ্রাস পেতে থাকে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নধরনের খেলাধূলায় শিশু যোগদান করে

ছেলে ও মেয়ের শারীরিক বিকাশ একই গতিতে ঘটে না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের বিকাশের ব্যাপারে সমবয়সী মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ক্ষেত্রে এই বিকাশ বেশী মাত্রায় দেখা যায়। তবে বয়ঃসন্ধিক্ষণের শুরুতে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় তাড়াতাড়ি দৈহিক পরিপক্কতা লাভ করে। বিশেষ কতকগুলি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার জন্য শারীরিক শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ব্যাপারে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের শ্রেষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। তবে যেসব জটিল সঞ্চালন-মূলক ক্রিয়া কেবলমাত্র দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করে না, সেসব ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অধিকতর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়।

ছেলে ও মেয়ের শারীরিক বিকাশের পার্থক্য

সাধারণতঃ, শৈশবে ছেলেমেয়েরা সমান শক্তিশালী থাকে কিন্তু যৌবন-সমাগমে ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে। যৌবনের শুরুতে ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটতে থাকে এবং পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার নতুন পথ তাদের শিক্ষা করতে হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃস্বৃষ্টিই তাদের যৌবন-সমাগমের নির্দিষ্ট প্রতীক। ছেলেদের ক্ষেত্রে এইরকম নির্দিষ্ট কোন প্রতীক নেই। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ক্ষেত্রে এই যৌবনের সমাগম একটু দেরীতেই ঘটে থাকে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা তাই অনেক বেশি যৌন-সচেতন হয়ে ওঠে। যৌবন-সমাগমে ছেলেমেয়েদের উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি ঘটে। যৌবন সমাগমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আরও কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন, ছেলেমেয়েদের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে কেশোদ্গম হয়। পুরুষের স্বর মোটা ও মেয়েদের স্বর সরু হয়। পুরুষের স্কন্ধদেশ ও বক্ষোদেশ বিস্তৃত হয়। নারীর স্তনযুগল পরিবর্ধিত হয় ও নিতম্ব গুরুভার হয়। ছেলেমেয়েদের যৌন-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের

যৌবন সমাগমে ছেলে মেয়ের শারীরিক পরিবর্তন

আচরণের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময় যৌন-বিষয়ে উভয়ের মনে গভীর কৌতূহল এবং কতকগুলি চাহিদা বা প্রয়োজন দেখা দেয়। ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হলে তাদের এই সময়কার চাহিদা বা প্রয়োজনের দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া দরকার। এইসব চাহিদা স্বাভাবিক ভাবে পরিতৃপ্ত হবার সুযোগ না পেলে অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মনের স্থিরতা নষ্ট হয়, যার ফলে তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ব্যাহত হয়। সেই কারণে উপযুক্ত যৌন-শিক্ষার দ্বারা ছেলেমেয়েদের যৌন কৌতূহলের পরিতৃপ্তি সাধন একান্ত প্রয়োজন। এই সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌন-উত্তেজনা দেখা যায়। যাতে ছেলেমেয়েদের মন সব সময় কামচিন্তায় ভরপুর না থাকে সেজন্য খেলাধূলা, সাহিত্য পাঠ, শিক্ষামূলক আলোচনা, শারীরিক ব্যায়াম এবং অন্যান্য নির্দোষ চিত্তাকর্ষক বিষয়কে তাদের শিক্ষা-সূচীর অন্তর্গত করে তাদের মন থেকে কামভাব যতদূর সম্ভব দূর করা উচিত। এর ফলে ছেলেমেয়েরা তাদের মনের স্থিরতা ফিরে পাবে। ছেলে-মেয়েদের এই সময়কার চাহিদাগুলিকে একটু উদারতার সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করলে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

শিশুর শারীরিক বিকাশের প্রতি পিতা-মাতার ও বিদ্যালয়ের কর্তব্য

শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশী সঞ্চালনের ক্ষমতা যাতে ধীরে ধীরে বিকশিত হয় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলার আয়োজনের মাধ্যমে সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্তরে যেসব কাজের মাধ্যমে শিশুর পেশীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপিত হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। শিশু যাতে দৌড়ান, লাফান, ছোটাছুটির মাধ্যমে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ সাধন করতে পারে সে দিকেও পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার সকলের দৃষ্টি রাখা দরকার। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ পরিপুষ্টি না ঘটলে সেগুলি নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম হয় না। ফলে ছাত্রজীবনে অনেক শিশুর মধ্যেই দৃষ্টি-শক্তির ও শ্রবণ-শক্তির দুর্বলতা ও নানা ধরনের শারীরিক ত্রুটি দেখা দেয়। অনেক শিশুর মধ্যে উচ্চারণের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। অনেকে অল্পবয়সে নানাধরনের শারীরিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশী সঞ্চালনের যথাযথ বিকাশ না ঘটার জন্যই এসব দোষত্রুটি দেখা দেয়। যেহেতু শিশুর মানসিক বা বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশ শারীরিক বিকাশের উপর অনেকাংশে নির্ভর, সেহেতু শিশুর শারীরিক বিকাশ যাতে কোন ভাবে ব্যাহত

না হয় সেদিকে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলের একান্ত দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

**(খ) শিশুর মানসিক বিকাশ (Mental Development of the Child) :**

নবজাত মানবশিশু জন্মসময়ে অত্যন্ত অসহায় ও পরনির্ভর থাকে। অপরের সহায়তা ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। নবজাত শিশুর মধ্যে হাঁচা, কাশা, চক্ষু বন্ধ করা প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে। এছাড়াও নবজাত শিশুর মধ্যে কতকগুলি আবেগজ প্রতিক্রিয়ার ও সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণ করার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এগুলিই শিশুর বেঁচে থাকার বা বাহ্যজগতের সঙ্গে প্রতিযোজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তার জন্য দরকার শিশুর নতুন আচরণ শিক্ষা করার। নতুন আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে শিশু জন্মায় এবং এই ক্ষমতার ক্রমবিকাশই শিশুকে বাহ্যজগতের সঙ্গে প্রতিযোজনে সমর্থ করে।

শিশুর মানসিক বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কিভাবে শিশুর মধ্যে শিক্ষণের ক্ষমতার ক্রমবিকাশ ঘটে। শিশুর মানসিক ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে দেখি সংবেদনের সংব্যাখ্যান বা অর্থনির্ণয়ের প্রচেষ্টা। শৈশবে শিশু বিভিন্ন সংবেদনগুলিকে পৃথক করে তাদের অর্থ নির্ণয় করতে সমর্থ হয় না, সংবেদনগুলি একটি অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতারূপে তার কাছে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ক্রমশঃ শিশু একটি সংবেদনকে অন্য সংবেদন থেকে পৃথক করতে শেখে, অর্থাৎ কিনা শিশু প্রত্যক্ষ করতে শেখে। সংবেদনের সংব্যাখ্যান হল প্রত্যক্ষণ। শিশু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে। নিজের মাতাকে শিশু অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তি থেকে পৃথক করতে পারে। এই ভাবে শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বর্ধিত হতে থাকে। ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা যতই বাড়তে থাকে, শিশুর অভিজ্ঞতাও সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত রূপ লাভ করে। শিশু পূর্ব ও পরবর্তী অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় এবং অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন কার্য ও ঘটনার তাৎপর্য নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়। যেমন, মায়ের হাতে দুধের বাটি দেখলেই শিশু মনে করে এবার তার ক্ষুধার উপশম হবে। প্রথম প্রথম শিশু বিভিন্ন ধরনের রঙ বা শব্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, ক্রমশঃ সে তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণে সমর্থ হয়।

সংবেদনের সংব্যাখ্যানের প্রচেষ্টা

শিশু ক্রমশঃ পুরাতন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তার আচরণের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করতে সক্ষম হয়। কোন বিষয় সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা যদি সুখপ্রদ হয় তাহলে শিশু তাকে পেতে চায়, যদি দুঃখজনক হয় তাকে পরিহার করে। এই ভাবে শিশুর শিক্ষণ শুরু হয়। ছয় থেকে বার বছর বয়সে শিশু তার অতীত অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পারে এবং তার সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এই বয়সে তার প্রশ্নের ধরন হল, এটা কি এ ধরণের নয়, বরং এটা কিভাবে ঘটেছে। কেন এটা এরকম ? এটি শিশুর মানসিক বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তর, কারণ, শিশুর কৌতূহলের মধ্যে জ্ঞান লাভের স্পৃহা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক শিশুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যুগিয়ে তার এই জ্ঞান-স্পৃহাকে বলবতী করে তুলতে পারেন। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ করে। সে অপরকে অনুকরণ করতে শেখে। সে পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে প্রতিযোজন করতে সমর্থ হয়, এবং কিছু কিছু দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য অর্জন করে।

**স্মৃতিশক্তির বিকাশ**

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় তার স্মৃতিশক্তির বিকাশ। স্মৃতিশক্তির জন্যই উদ্দীপকের অভাবেও শিশু বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম হয়। খুব শৈশবে শিশু তার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে বর্তমান অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাকে কাজে লাগাতে পারে না। কিন্তু বয়স যেই বাড়তে থাকে, শিশু কিছু কিছু অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে এবং জানা বিষয় চিনতে অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞার **(recognition)** পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। শিশু তার নির্দিষ্ট স্থানটিতে খাদ্যের অনুসন্ধান করে, নির্দিষ্ট সময়ে সঙ্গীর আগমন প্রত্যাশা করে ; যে ব্যক্তিকে ভালবাসে তার কাছে ছুটে যায় এবং যে ভয় দেখায় তাকে দেখলে দূরে পালিয়ে যায়।

**মনঃসংযোগের ক্ষমতার বিকাশ**

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি লক্ষণ হল মনঃসংযোগের ক্ষমতার বিকাশ। অতি শৈশবে শিশুর মন থাকে অস্থির ও চঞ্চল। কিন্তু মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশু কোন একটি বিষয়ের উপরে মনঃসংযোগ করতে শেখে। উদ্দীপক চিত্তাকর্ষক হলে শিশু সেই বিষয়ে সহজেই মনঃসংযোগ করতে পারে। যে ধরনের গল্প শুনতে শিশু আগ্রহী হয়, সেই ধরনের গল্পেতে শিশু সহজেই মনঃসংযোগ করতে পারে। অবশ্য পরে শিশুর চিন্তনশক্তির ক্ষমতা যখন বর্ধিত হয় তখন সে নিরস বিষয়ে মনঃসংযোগে সমর্থ হয়। তবে মনঃসংযোগের ব্যাপারে

শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ক্রিয়া করে, যার জন্য কোন কোন শিশু সহজেই কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করতে পারে, যা অপর শিশু পারে না।

শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতীকের (Symbol) প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। যেমন, যে পরিচারিকা রোজ দুধের বোতল নিয়ে আসে তাকে দেখেই শিশুর কান্না থেমে যায়। পরিচারিকা প্রতীক মাত্র, যে দুধ নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু দুধের অনুপস্থিতিতে শুধু মাত্র পরিচারিকাকে দেখে শিশু প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। প্রতীকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা বা প্রতীক ব্যবহারের ক্ষমতা শিশুর মানসিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

**প্রতীকের প্রতি প্রতিক্রিয়া**

শিশু মূর্ত (concrete) বস্তু ছাড়াও অমূর্ত (abstract) বস্তু নিয়ে চিন্তা করতে শেখে। শিশু গল্পে শোনা দৈত্য বা পরীর একটা কাল্পনিক অবয়ব মনের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করে। কোন সঙ্গীকে কিভাবে জব্দ করবে মনে মনে তার পরিকল্পনা করে। শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি উল্লেখযোগ্য স্তর হল ভাষায় ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করা। শিশুর ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার বিকাশে কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ছয় মাসের শিশু অস্ফুটভাবে কয়েকটি বর্ণ উচ্চারণ করতে পারে। দু বছরের শিশু বয়স্কদের ব্যবহৃত শব্দ বলতে পারে। আবার তিন বছরের শিশু বেশ ভালভাবেই কথা বলতে পারে, বয়স্কদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে নিজের কৌতূহল প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে পারে। চার বছরে শিশু অনর্গল কথা বলতে পারে এবং সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করতে পারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু জটিল বাক্য বলতে পারে, প্রবাদের ব্যবহার করতে পারে এবং সুযোগমত শব্দ নির্বাচন করে তার ব্যবহার করতে পারে। শিশু সাধারণতঃ পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকে পড়তে এবং সাত-আট বয়স থেকে লিখতে শেখে। তবে শিশুর জীবনে ভাষা শিক্ষার ক্ষমতা নানারকম উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তি, কার্যক্ষমতা, বুদ্ধি, আগ্রহ, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ, সমাজের প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতি, প্রভৃতি শিশুর ভাষা-শিক্ষার ক্ষমতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

**অমূর্ত বস্তুকে নিয়ে চিন্তন**

**ভাষার ব্যবহার**

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল তার মধ্যে প্রত্যয় (concept) বা সাধারণ ধারণার (general notion) বিকাশ। 'প্রত্যয়'

কোন একটি জাতির সাধারণ গুণ নির্দেশ করে, যেমন, 'মানুষ', 'গরু' ইত্যাদি। মানুষ বলতে আমরা বিশেষ কোন মানুষের কথা চিন্তা করি না। 'মানুষ' বলতে মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি মানুষকেই বুঝি। প্রত্যয় বলতে আমরা একটা জাতির বা শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝি বা তাদের যে সাধারণ গুণাবলী আছে তাদের বুঝি। প্রত্যয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ না থাকার জন্য, প্রত্যয় সংবেদনের বিষয়বস্তু নয়। প্রত্যয়ের সাহায্যে অতীত অভিজ্ঞতার সংক্ষেপণ সম্ভব হয় এবং প্রত্যয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষণ-লব্ধ পরস্পর বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা চলে। প্রত্যয়ের মাধ্যমেই চিন্তার মিতব্যয়িতা সংগঠিত হয়। প্রত্যয় মানসিক পরিশ্রম লাঘব করে। প্রত্যয় চিন্তার প্রয়োজনীয় বাহন। আমাদের অভিজ্ঞতাকে প্রত্যয়ের সহায়তায় শ্রেণীবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ করা সহজ হয়। প্রত্যয় বা সাধারণ ধারণা চিন্তাকে বর্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অতীত ও ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তাকে প্রসারিত করে। যুক্তি বা অনুমান গঠন করতে হলে প্রত্যয় অবশ্যই প্রয়োজনীয়। উন্নত চিন্তনক্রিয়ার জন্য প্রত্যয়ের ব্যবহার অপরিহার্য। প্রত্যয় গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় পৃথকীকরণ (abstraction) ও সামান্যীকরণ (generalisation) প্রক্রিয়া। শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই ক্রিয়াতেও শিশু দক্ষ হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ

প্রত্যয় বা সাধারণ ধারণার বিকাশ

শিশু আরও জটিল ধারণা গঠন করতে শিক্ষা করে এবং দেশ, কাল ও কার্যকারণের ধারণা শিশুর মনে গঠিত হয়। খুব ছোটবেলা থেকেই শিশুর মধ্যে দেশ বা স্থানের ধারণার সৃষ্টি হয়। যেদিন থেকে শিশু চলাফেরা করতে শেখে সেদিন থেকে তার মধ্যে স্থানের ধারণার সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ শিশু শূন্য স্থান ও পূর্ণ স্থানের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে। সময় নির্দেশক শব্দ, যেমন, 'এখন', 'তখন', 'আগে,' 'পরে', প্রভৃতি শিশুর মনে সময়ের ধারণা সৃষ্টি করে। এই সব শব্দের সাহায্যেই শিশু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করে। তবে ঐতিহাসিক সময় সম্পর্কে ধারণা গঠন করা শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় নয়-দশ বছর বয়সে।

জটিল ধারণা গঠন

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সর্বপ্রাণবাদমূলক (animistic) ধারণা বর্জন করে প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে সমস্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে শিক্ষা করা। শিশু-মন শৈশবে সমস্ত বস্তুকেই প্রাণবান বা

সজীব মনে করে। বই, খেলনা, চন্দ্র, সূর্য, সব কিছুরই প্রাণ আছে বলে সে মনে করে। কিন্তু পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকে শিশু আর সব বস্তুকেই প্রাণবান মনে করে না। এই বয়স থেকে প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে জাগতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা তার মধ্যে দেখা যায়।

প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে সব ঘটনা ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা

শিশুর প্রাথমিক চিন্তন হল প্রতিরূপমূলক এবং কল্পনাধর্মী। শিশু প্রতিরূপ-এর (image) সাহায্যে চিন্তা করে অতি শৈশব থেকেই। প্রতিরূপ হল মূর্ত বস্তুর মানসিক চিত্র। কোন শিশু কুকুর, বাড়ী, বা তার কোন সঙ্গীর কথা চিন্তা করার সময় তার একটা মানসিক ছবি মনের সামনে তুলে ধরে। এ ব্যাপারে শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের মানসিক বিকাশের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোখে পড়ে। শিশু বস্তু-প্রতিরূপের ব্যবহার করে বেশী, প্রাপ্তবয়স্করা শব্দ-প্রতিরূপের ব্যবহার করে বেশী। কোন প্রাপ্তবয়স্ক উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে শব্দের সাহায্যেই চিন্তা করে। শিশুর অধিকাংশ জ্ঞান আসে সংবেদনের মাধ্যমে। কাজেই তার চিন্তন বস্তুর মানসিক ছবির সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। প্রাপ্তবয়স্করা পুস্তক এবং ভাষার মাধ্যমেই তাদের অধিকাংশ জ্ঞান অর্জন করে, কাজেই বস্তুর জন্য তারা শব্দ-প্রতীকের ব্যবহার করে। শৈশবে শিশু দিবাস্বপ্নে মশগুল থাকে, শিশু অলীক কল্পনার জগতে বিচরণ করে। শিশু তার অলীক কল্পনার মাধ্যমে বহু অপরিতৃপ্ত কামনাকে পরিপূর্ণ করতে চেষ্টা করে। অনেক সময় শিশু বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। কোন শিশু হয়ত কুকুর দেখে ভয় পায়। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে, সে দেখল একটা কুকুর তার দিকে ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে রয়েছে। বাড়িতে এসে সে গল্প ফেঁদে বসল যে তাকে অনেকগুলি কুকুর তাড়া করেছিল। শৈশবে শিশুরা স্মৃতি এবং কামনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তারা কল্পনার সাহায্যে অনেক গল্প তৈরী করে এবং সেগুলিকে সত্য বলে মনে করে। তবে শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে। যুক্তিতর্ক করার, বিচার করার বা সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা শিশুর মধ্যে আসে যখন তার সাধারণ চিন্তনের ক্ষমতা বেশ পরিণতি লাভ করে।

শিশুর কল্পনাধর্মিতার বিকাশ

যুক্তিতর্ক করার, বিচার করার ও সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা

সাত-আট বছরের আগে শিশুর মধ্যে এই ক্ষমতা সাধারণতঃ দেখা দেয় না। চিন্তন, প্রত্যয় গঠন, যুক্তিতর্ক করা, সমস্যা সমাধান করা, জটিল চিন্তনের ক্ষমতা,

ধারণার সাহায্যে অভিজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা, এই সবই বিশেষ করে নির্ভর করে শিশুর বুদ্ধির উপর। শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটে, তবে ষোল বছরের পর শিশুর বুদ্ধি আর তেমন বাড়ে না। সব শিশুই সমান বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় না। বুদ্ধির দিক থেকে শিশুতে শিশুতে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়।

**(গ) শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development of the Child) :**

শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে সঠিকভাবে বুঝে নিতে হলে, একদিকে যেমন তার বৌদ্ধিক বিকাশের প্রকৃতি জানা প্রয়োজন, তেমনি তার প্রক্ষোভ বা আবেগজ বিকাশকেও জানা দরকার। শিশুর চিন্তনশক্তির পূর্ণ বিকাশের বহু আগেই তার মানসিক জীবন প্রক্ষোভ বা আবেগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। প্রক্ষোভের বিকাশের প্রতি উদাসীন থেকে শিশুর শিক্ষার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, মানসিক সংগঠন, শিক্ষার অগ্রগতি সবই নির্ভর করে শিশুর প্রক্ষোভ বা আবেগের সুষ্ঠু প্রকাশের উপর। যদি কোন শিশুর মনে সব সময়ই ভয় বাসা বাঁধে, যদি সে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়, যদি সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ না হয়, যদি তার মন সব সময়ই নৈরাশ্য ও বেদনায় ভরপুর থাকে, যদি কাজে সে আনন্দ না পায়, যদি তার মনে সব সময়ই ক্রোধ সঞ্চিত থাকে, তাহলে সেই শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও তার শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। শিশুর প্রক্ষোভ বা আবেগগুলি যদি সুষ্ঠু প্রকাশের সুযোগ লাভ না করে, সেগুলি যদি সুসংযত ও সুসংবদ্ধ না হয়, তাহলে শিশুর মানসিক সংগঠনে বাধা দেখা দেয়।

শিক্ষায় প্রাক্ষোভিক বিকাশের গুরুত্ব

প্রক্ষোভ বা আবেগ হল এমন এক ধরনের জটিল অনুভূতি যার মূলে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান; কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণা একে জাগরিত করে এবং দেহের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য এমন কতকগুলি বিশেষ ধরনের দৈহিক প্রকাশ ঘটে যার জন্য আমরা নানারকম কাজে প্রবৃত্ত হই। ভয়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি আবেগের উদাহরণ। প্রক্ষোভের দুটি দিক আছে, একটি মানসিক অপরটি শারীরিক বা দৈহিক। মানসিক দিক থেকে

প্রক্ষোভ হল একটি জটিল অনুভূতি, যেমন, সুখ, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি। দৈহিক দিক থেকে কতকগুলি আন্তর (internal) ও বাহ্য (external) পরিবর্তন দেখা যায়। প্রক্ষোভের সময় হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পরিপাক যন্ত্র এবং অন্যান্য আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। বাহ্য-পরিবর্তনের অর্থ পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, চোখের মণি স্ফীত হওয়া ইত্যাদি। প্রক্ষোভের সময় দেহের অভ্যন্তরে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় তার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়স্নায়ুতন্ত্র এবং অনালী গ্রন্থিগুলির ক্রিয়া প্রক্ষোভের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

প্রক্ষোভের প্রকৃতি—তার মানসিক ও শারীরিক দিক

প্রক্ষোভের বিকাশের আলোচনায় যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সেটা হল আদিম বা মৌলিক প্রক্ষোভের সংখ্যা কয়টি? এই বিষয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। দার্শনিক ডেকার্ট (*Descartes*)-এর মতে বিস্ময়, ভালবাসা, ঘৃণা, কামনা, আনন্দ ও দুঃখ এই ছয়টি আদিম বা মৌলিক প্রক্ষোভ। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানসম্মত নয়। মনোবিদ্ ওয়াটসন (*Watson*)-এর মতে মৌলিক প্রক্ষোভ হল তিনটি—ভয়, ক্রোধ এবং আনন্দ। শিশু তিনটি প্রক্ষোভ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। উচ্চ শব্দ শুনলে শিশু ভয় পায়। হঠাৎ পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলেও শিশু ভয় পেয়ে থাকে। শিশুর চলাফেরায় যদি বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহলে সে ক্রুদ্ধ হয়। আবার তার গায়ে যদি হাত বুলানো যায় বা তাকে আদর করা হয় তাহলে সে আনন্দ পায়। সারমেন (*Sherman*) ওয়াটসনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন যে শিশুর প্রক্ষোভমূলক বাহ্য আচরণ এতই সাধারণ যে তাই দেখে প্রক্ষোভের প্রকৃতি নিরূপণ করা শিশুর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন। কোন শিশুর কান্না দেখে সে ভয়ে কাঁদছে বা ক্রোধবশতঃ কাঁদছে, নির্ধারণ করা কঠিন। ক্যাথারিন ব্রিজেস (*Katherine Bridghes*)-এর মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ হল উত্তেজনা (excitement)। মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল (*McDougall*)-এর মতে মানুষের মৌলিক প্রক্ষোভের সংখ্যা সতেরোটি।

শিশুর ক্ষেত্রে আদিম প্রক্ষোভের সংখ্যা

ওয়াটসনের অভিমত

সারমেন ও ব্রিজেস-এর অভিমত

বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে যে প্রক্ষোভের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তা খুবই সাধারণ প্রকৃতির। শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে তার মধ্যে প্রক্ষোভের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকার ক্যাথারিন ব্রিজেসের গবেষণা থেকে জানা যায় যে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ হল সাধারণ উত্তেজনা।

শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রক্ষোভ বিশেষধর্মী হয়ে পড়ে

এই প্রক্ষোভ প্রথমতঃ দুটি পৃথক প্রক্ষোভে রূপান্তরিত হয়, অস্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ। শিশুর বয়স যখন তিন সপ্তাহ মাত্র তখনই এই অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেয় এবং তিনমাস বয়সেই আনন্দ দেখা দেয়। শিশুর যখন ছয়মাস বয়স তখন আনন্দ উচ্ছ্বাসের রূপ নেয়। অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে ৪ মাস বয়সে রাগ, ৫ মাস বয়সে বিরক্তি ও ৭ মাস বয়সে ভয় দেখা দেয়। ১১ মাস বয়স থেকে শিশুর আনন্দ বড়দের প্রতি অনুরাগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৫ মাস বয়সে ছোটদের প্রতি অনুরাগের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ১৫ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে, শিশুর মধ্যে ঈর্ষা বা অসূয়া (jealousy) দেখা দেয়। এই প্রক্ষোভটি অস্বাচ্ছন্দ্যের একটি বিশেষ রূপ।

**ব্রিজেস-এর অভিমত**

শিশুর প্রক্ষোভের বিকাশ সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা দরকার। প্রথমতঃ, নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের সাধারণ রূপটাই ধরা পড়ে, প্রক্ষোভগুলির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য করা যায় না। বয়স যতই বাড়তে থাকে ততই প্রক্ষোভগুলির পার্থক্য বোঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ, শৈশবে প্রক্ষোভের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি তেমন সংযত থাকে না, প্রকাশের মধ্যে তীব্রতা ও প্রাবল্য দেখা যায়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তীব্রতা ও প্রাবল্য তিরোহিত হয়। প্রক্ষোভের বাহ্য-প্রকাশের মধ্যে যথেষ্ট সংযম দেখা দেয়। শিশু ক্রুদ্ধ হলে চীৎকার করে কাঁদে, হাত-পা ছোঁড়ে, অপরকে আক্রমণ করে, জিনিসপত্র নষ্ট করে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে। কিন্তু শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন ক্রুদ্ধ হলেও তার বাহ্য-আচরণ সাধারণতঃ সংযত ও ভদ্র হয়। শিক্ষা, সামাজিক প্রভাব অর্থাৎ কিনা সমাজের লোকের নিন্দা, প্রশংসা এবং অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাবের জন্যই তার আচরণে এই পরিবর্তন দেখা দেয়। ৮ ৯ বছরের ছেলেমেয়েরাও তাদের প্রক্ষোভের প্রকাশকে অনেক সময় বেশ ভালভাবেই দমন করতে পারে, যার জন্য এই বয়সের শিশুদের মধ্যে কখন কি প্রক্ষোভ দেখা দেয় সব সময় নিরূপণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রক্ষোভের বাহ্য-প্রকাশের ক্ষেত্রে সংযমের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা না গেলেও, সব সময় বাহ্য-অভিব্যক্তি দমন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করলে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। দুঃখের সময় মন খুলে কাঁদতে পারলে দুঃখভার লাঘব হয়. ক্রোধ

**শিশুর প্রক্ষোভের বিকাশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য**

প্রকাশিত হলে ক্রোধ প্রশমিত হয়। দুঃখ, ক্রোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভকে যদি দমন করা যায় তাহলে এই অবদমনের ফলে মনের ভারসাম্য ব্যাহত হয়ে এমন এক অস্থিরতার সৃষ্টি করে যার ফলে শিশুর মানসিক সুস্থতা নষ্ট হয়ে যায়। শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে প্রক্ষোভ সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার অবহিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। গুরুজনদের তিরস্কার ও নিন্দার ভয়ে অনেক সময় শিশুরা তাদের প্রক্ষোভের প্রকাশকে এমনভাবে অবদমিত করে যে এই অবদমিত প্রক্ষোভ শিশুর মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে তার স্বাভাবিক আচরণকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া প্রক্ষোভের সুষ্ঠু প্রকাশের পথ অবরুদ্ধ হওয়াতে শিশুর মনে এক গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যা তার স্বাভাবিক আচরণকে বিপর্যস্ত করে, তার ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশের পথে বাধা সঞ্চার করে। উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি কোন শিশু ভীত বা ক্রুদ্ধ হয় বা দুঃখ বোধ করে, সেই সময় প্রক্ষোভের বিষয়টি অপরের কাছে প্রকাশ করলে, প্রক্ষোভ অনুভব করার মিথ্যা কারণটি সম্পর্কে সে অবহিত হতে পারে। কাজেই সব সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে শিশুর প্রক্ষোভ প্রকাশের সুষ্ঠু পথ খুঁজে পায়। তৃতীয়তঃ, শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভ-অনুভবের মূলে থাকে বর্তমানের কোন উদ্দীপক। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতীত বা ভবিষ্যতের অর্থাৎ কি না বর্তমানে উপস্থিত নেই, এমন উদ্দীপকও প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। চতুর্থতঃ, শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভ অনুভব করার গণ্ডী থাকে খুবই সংকীর্ণ, কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দীপক তার মনে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে, কিন্তু যতই বয়স বাড়তে থাকে তার বোধশক্তি, চিন্তনশক্তি, মানসিক ক্ষমতার উন্নতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতার জন্য প্রক্ষোভের গণ্ডীও বেড়ে যায়। যে কোন উদ্দীপক তখন তার মনে বিশেষ কোন প্রক্ষোভ জাগিয়ে তুলতে পারে। যেমন, শৈশবে যে চিত্র দেখে তার মধ্যে কোন প্রক্ষোভ জাগেনি, বড় হবার পর সেই চিত্র দেখেই তার মধ্যে বিস্ময়-ভাবের উদ্রেক হয়। পঞ্চমতঃ, শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভের মূলে থাকে শিশু নিজে, তার স্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। কিন্তু শিশু যত বড় হতে থাকে ততই তার প্রক্ষোভের ব্যাপকতা চোখে পড়ে। তখন নিজেকে ছাড়াও অপরকে কেন্দ্র করে তার প্রক্ষোভ জাগে। পঞ্চমতঃ, খুব শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভ অধিক সময় স্থায়ী হয় না, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভের স্থায়িরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ষষ্ঠতঃ, অমূর্ত আদর্শের যেমন সত্য,

প্রক্ষোভের বাহ্য-প্রকাশকে সংযত করা প্রয়োজন

শিশুকে প্রক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া দরকার

শিব ও সুন্দরের চিন্তা করে বয়স্ক ব্যক্তিদের মনে যে রসের (sentiment) উদ্ভব হয়, শিশুদের ক্ষেত্রে তা হয় না।

যেহেতু প্রক্ষোভ অনেক ক্ষেত্রে চিন্তা ও আচরণের গতি নির্ণয় করে সেহেতু প্রক্ষোভকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করার একান্ত প্রয়োজন। একটুতেই যারা রেগে যায় বা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বা সামান্য ব্যর্থতাতেই নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়ে, সামান্য বিপদের সম্ভাবনায় ভীত হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে যে সংযমের একান্ত অভাব, স্বীকার করতেই হয়। প্রক্ষোভকে সংযত করার ব্যাপারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিশেষ বৈষম্য দেখা যায়। শিশুদের শেখাতে হবে কিভাবে তারা তাদের প্রক্ষোভকে সংযত করে মানসিক স্থিরতার পরিচয় দেবে এবং ভদ্রসমাজে নিজেদের আচরণকে সুন্দর ও মার্জিত করে তুলবে। আবার লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিশুর প্রক্ষোভ মাত্রই যেন অবদমিত না হয়, যা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে এবং তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশকে ব্যাহত করবে। প্রক্ষোভের প্রকাশ মাত্রকেই রুদ্ধ করা হলে জীবন হয়ে পড়বে নীরস। ছাত্রদের মধ্যে যখন কোন প্রক্ষোভের তীব্র প্রকাশ ঘটছে তখন শিক্ষককে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার তীব্রতা কমে যায়। প্রক্ষোভের প্রকাশসময়ে ছেলেদের কঠিন সমালোচনা বা উপহাস করে তাদের আত্মমর্যাদায় ঘা দেওয়া সব সময় যুক্তিযুক্ত নয়। শিশুর অনেক আচরণের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন তার আচরণের মূলে কোন্ ধরনের প্রক্ষোভের ক্রিয়া রয়েছে, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। তা না হলে অনেক সময় শিশুর আচরণের ভুল ব্যাখ্যা করা হবে এবং শিশুর সুশিক্ষার পথে বাধা দেখা দেবে।

**(ঘ) শিশুর সামাজিক বিকাশ (Social Development of the Child):** সামাজিক বিকাশ বলতে বোঝায় সমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তি, সঙ্ঘ, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ক্রমবিকাশ। মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। মানুষ যে সমস্ত সহজাত প্রবণতা ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সমাজের মধ্যে থেকেই তার সেই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিণতি লাভ করে।

সামাজিক বিকাশের অর্থ

সমাজস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধের মাধ্যমে, শিল্প-মূলক, কৃষ্টিমূলক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলে শিশুর পক্ষে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে ও

সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু প্রতিযোজন সম্ভব হয়। একেই বলা হয় শিশুর সামাজিকীকরণ বা সামাজিক জীব হিসাবে বসবাস করার যোগ্যতা অর্জন।

জন্মের মুহূর্ত থেকেই শিশুর সব সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয় না। ধীরে ধীরে সে যতই বড় হতে থাকে ততই সে তার চারপাশের বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসে। ছোটবড় নানা দলের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ লাভ করে, নানারকম সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে অনেক বৃহত্তর সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। এইভাবে তার সমাজ-চেতনার বিকাশ ঘটে এবং শিশু সমাজের সঙ্গে প্রতিযোজনের যোগ্যতা অর্জন করে। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে শিশু সামাজিক প্রবৃত্তি নামে একটি সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে এবং শিশুর সামাজিকীকরণের মূলে রয়েছে এই প্রবৃত্তির প্রভাব। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই জাতীয় কোন সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করলেও সামাজিক জীবনযাপনের জন্য একটা সহজাত প্রবণতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই সহজাত প্রবণতাই ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে শিশুকে একটি পূর্ণ সামাজিক মানুষে পরিণত করে, তার সামাজিক চেতনাকে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সামাজিক আচরণের উপযোগী কতকগুলি প্রলক্ষণ (traits) যেমন, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, দয়া, সঙ্ঘবদ্ধভাবে ক্রিয়া করার প্রবণতা, পারস্পরিক নির্ভরতাবোধ প্রভৃতি শিশুর মানসিক সংগঠনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে সেগুলি অভিব্যক্ত হয়।

শিশুর মধ্যে সামাজিক আচরণের ক্ষমতা সুপ্ত থাকে, উপযুক্তপরিবেশে তার বিকাশ ঘটে

সমাজের রীতিনীতি, আদর্শ, ভাবধারা, আচরণ, ছাঁদ প্রভৃতি যে পরিমাণে শিশু আয়ত্ত করতে পারে তার উপরই শিশুর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে। যে শিশু সমাজের মধ্যে লালিতপালিত হয় না, সে সামাজিক আচরণ শেখে না। বন্য বালক, নেকড়ে পালিত বালক প্রভৃতির সুপরিচিত কাহিনী এই সত্য প্রমাণ করে। কাজেই শিশুর সামাজিকীকরণ এক হিসাবে এক ধরনের শিক্ষণ-প্রক্রিয়া—কতকগুলি সামাজিক অভ্যাস গঠনের প্রচেষ্টা। শিশু প্রথমে থাকে অহং-ভাবাপন্ন (egoist) এক আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর জীব। ধীরে ধীরে সামাজিকীকরণের ফলে তার আত্মকেন্দ্রিকতা অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে সমাজ-চেতনার বিকাশ ঘটে। 'আমি', 'আমার' এই ধারণা থেকে 'তুমি', 'তোমার' এই ধারণায় সে উত্তীর্ণ হতে পারে।

শিশুর সামাজিকীকরণ সামাজিক অভ্যাস গঠনের প্রচেষ্টা

তবে সামাজিকীকরণের (Socialisation) সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ (Individualisation) প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। একদিকে যেমন পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে শিশুর সমাজ-চেতনার বিকাশ ঘটে, তেমনি শিশুর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে এই দুটি প্রক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পর বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া নয়। শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশ ও অহংবোধের বিকাশ একই সঙ্গে চলতে থাকে। একদিকে শিশু যেমন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজকর্ম করতে, অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শিক্ষা করে, তেমনই অপর দিকে নিজের মতামত বা নিজের স্বার্থরক্ষা করার, অপরের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হয়।

*শিশুর সামাজিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে*

সদ্যোজাত শিশু জন্মের পরে প্রথম কয়েক মাস অপরের প্রতি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। সামাজিক প্রভাব গ্রহণের ব্যাপারে তার মধ্যে কোন রকম সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ৫।৬ মাস বয়স হলেই শিশু পিতামাতা ও অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তি যাদের শিশু সব সময় দেখে, তাদের প্রতি মনোযোগী হয়। শিশু তাদের দেখে হাসে, অস্ফুট শব্দ করে, তাদের শব্দ ও ভঙ্গীর অনুকরণ করে। নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। বোধ হয় এই সময় থেকেই শিশুর সামাজিক চেতনা বিকশিত হতে শুরু করে। প্রথম প্রথম শিশুর মনোযোগ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু একবছর বয়স থেকেই তার মনোযোগ অন্য শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

*জন্মের ৫।৬ মাস পর থেকেই শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশ*

কিন্তু দুবছর আড়াই বছরের আগে শিশু অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলাধূলা করতে পারে না। অর্থাৎ তিন বছর বয়সের আগে পর্যন্ত শিশুর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার ভাব এতই প্রবল থাকে যে শিশু অপরের সঙ্গে মিলেমিশে কোন কাজ করতে পারে না। কাজেই আড়াই বছর না হওয়া পর্যন্ত শিশুর সামাজিক মনোভাবের যথাযথ আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর শিশুর সামাজিক আচরণের সুষ্ঠু প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই সময় শিশুরা ছোট ছোট দল গড়ে এবং একই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শেখে। দলের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা প্রবলভাবে দেখা যায়। তাছাড়াও এই সময় শিশুরা ক্লাব, বা অন্যান্য বড়

*বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিশুর সামাজিক আচরণের সুষ্ঠু প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়*

বড় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়। বড় বড় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়েও অনেক সময় সেই সংগঠনের শাখা-স্বরূপ কোন ছোট দলের নেতৃত্ব করার সুযোগ লাভ করে। শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধেরও বিকাশ ঘটতে থাকে। শিশু অনেক সময় তার পছন্দ অনুযায়ী সঙ্গী নির্বাচন করে, কোন দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে নিজেই বিবেচনা করে, এবং বিশেষ বিশেষ খেলা-ধূলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ৮।১০ বৎসর বয়স থেকে শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশে আরও অগ্রগতি ঘটে। শিশু সঙ্ঘবদ্ধ কার্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, বৃহত্তর দল গঠন করে তার নেতৃত্ব করতে ইচ্ছুক হয়, এবং গোষ্ঠী-চেতনার ধারণা তার মধ্যে জাগ্রত হয়। শিশু অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, দল সম্পর্কে মর্যাদাবোধ ও আনুগত্যবোধ তার মধ্যে দেখা দেয় এবং শিশুর আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের স্থান দখল করে সমাজের প্রতি অনুরাগ। এই সময় শিশু খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রমোদানুষ্ঠান, প্রদর্শনী, দলগত ভ্রমণ প্রভৃতি বৃহত্তর সঙ্ঘবদ্ধ কার্যে যোগদানের জন্য উৎসাহিত হয়। এর ফলে শিশুর মধ্যে দলের প্রতি আনুগত্য, সহযোগিতা, সহানুভূতি, আত্মত্যাগ, দয়া, মায়া, মমতা, পারস্পরিক প্রীতি প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলির বিকাশ ঘটে। সাধারণতঃ ৯।১০ বছর বয়সে ছেলেরা মেয়েদের প্রতি বা মেয়েরা ছেলেদের প্রতি তেমন আকর্ষণ বোধ করে না। কাজেই ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে, মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে দল বাঁধে, কিন্তু যৌবনের শুরুতে ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে, এবং মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে মিশে খেলাধূলা বা সঙ্ঘবদ্ধ কাজ করতে উৎসাহী হয়।

৮।১০ বছর বয়সে সামাজিক চেতনার বিকাশে অগ্রগতি

শিশুর সামাজিকতার বিকাশের গতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রথম প্রথম শিশু নিজদল বা অন্তর্গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে। পরে বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে অপর দলের বা বহির্গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করে। যে গোষ্ঠীর সঙ্গে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে প্রাথমিক গোষ্ঠী বলে। পরিবার হল একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী। পরিবারস্থ সভ্যদের আচরণ শিশুর সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে। সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিরা সামাজিক আচরণের যে মান শিশুর সামনে উপস্থাপিত করে তার দ্বারা, শিশুর সামাজিক আচরণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। শিশু যেমন দেখে, তেমনই শেখে।

শিশুর সামাজিক বিকাশের মূলে একাধিক বিষয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, বয়সের পরিণতি। বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। তার ফলে শিশু সেই বয়সের উপযোগী সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, উন্নত বুদ্ধি শিশুর সামাজিকীকরণকে সহজতর করে তোলে। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর পক্ষে সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে না। উন্নত বুদ্ধির ছেলেমেয়েরা সহজেই তাকে আয়ত্ত করতে পারে। যারা জড়ধী তারাই এ ব্যাপারে অসুবিধা ভোগ করে। তৃতীয়তঃ, শিশুর জন্মগত প্রবণতা, মেজাজ, প্রক্ষোভ প্রভৃতির উপরও শিশুর সামাজিক বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভরশীল। চতুর্থতঃ, সামাজিক পরিবেশের প্রভাব। যে ছেলেমেয়ে যে রকম পরিবেশে লালিত-পালিত হয়, তার সামাজিক আচরণও সে রূপ হয়। সেই পরিবেশের রীতিনীতি, আচরণ, ছাঁদ, কৃষ্টি, প্রথা, শিশুর সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। দুটি ভিন্ন সমাজের ছেলে, যেমন একজন রুশ দেশীয় এবং একজন ভারতীয় ছেলের সামাজিক আচরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবার একই সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের মধ্যে থেকেও ভিন্ন প্রথা ও রীতিনীতির মধ্যে বেড়ে ওঠা দুটি ছেলেমেয়ের সামাজিক আচরণের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যাবে। পঞ্চমতঃ, সামাজিক আচরণের বিকাশ শিক্ষণের (Learning) দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক আচরণ কে কতখানি শিখতে পারল তার উপরে সামাজিক আচরণের বিকাশ নির্ভর করে। আবার সামাজিক পরিবেশ, শিশুর দেহ ও মনের বিকাশ, এগুলির উপর এই শিক্ষণ নির্ভর করে। ষষ্ঠতঃ, সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী শিশুর সামাজিক আচরণে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।

**শিশুর সামাজিক বিকাশের মূলে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব**

শিশুর পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থাও (socio-economic status) সামাজিক আচরণের বিকাশকে প্রভাবিত করে। নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের কোন শিশু উচ্চবিত্তসম্পন্ন সমাজের কোন ব্যক্তির সঙ্গে স্বাভাবিক সামাজিক আচরণ করতে সক্ষম হয় না। তার আচরণে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ও হীনমন্যতাবোধ দেখা দেয়। উচ্চবিত্তসম্পন্ন সমাজের ছেলেমেয়েদের সামাজিক আচরণে অনেক সময় উন্নাসিকতা, আত্মম্ভরিতা, ঔদ্ধত্য, অবহেলা, অমনোযোগিতা, অমিতব্যয়িতা, আত্মমুখীতার ভাব দেখা যায়। আবার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাবলম্বিতা, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, বিনয়, উদারতা

প্রভৃতি গুণগুলির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবে এর ব্যতিক্রম অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। কাজেই পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা শিশুর সামাজিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রলক্ষণ (social traits) আছে যেগুলি সামাজিকতাবাদের ভিত্তিস্বরূপ। তার মধ্যে প্রথমেই সহানুভূতির (sympathy) উল্লেখ করা চলে। অপরের দুঃখে দুঃখবোধ, অপরের সুখে সুখবোধই হল সহানুভূতি। সমাজ-জীবনের সংগঠনে সহানুভূতির স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সহানুভূতির প্রবণতা নিয়ে সব শিশুই জন্মায়। অনুকূল পরিবেশেই সহানুভূতি বিকশিত হয়। শিশুর মধ্যে এই সহানুভূতি উদ্রেকের একান্ত প্রয়োজন। খুব শৈশবে শিশুর মধ্যে সহানুভূতির প্রকাশ তেমন লক্ষ্য করা যায় না, কারণ অভিজ্ঞতার অভাবে শিশু বুঝে উঠতে পারে না, কোন কোন অবস্থায় অপরের দুঃখে তার দুঃখ বোধ করা উচিত। কিন্তু যতই তার অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে, ততই সে বুঝে উঠতে শেখে কোন কোন অবস্থায়, অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে। তখনই অপরের দুঃখের সঙ্গে সে নিজের একাত্মতা অনুভব করে। এই একাত্মতাবোধ যত প্রবল হয়, ততই সহানুভূতির মাত্রা তীব্র হয়। শিশুর মধ্যে সহানুভূতির যথাযথ বিকাশ ঘটলেই সামাজিক জীবনের সঙ্গে তার সঙ্গতিবিধানের বিষয়টি সহজতর হয়। কাজেই শিশুর মধ্যে যাতে সহানুভূতি সুবিকশিত হয় সেদিকে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

সামাজিক প্রলক্ষণের স্বরূপ ও ব্যাখ্যা

সহানুভূতি

শিশুর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে এই সহানুভূতি জাগ্রত করা কঠিন। বয়স্কব্যক্তিরা যদি শিশুদের সামনে সহানুভূতিমূলক আচরণ করেন তাহলেই শিশুরা সহানুভূতি-মূলক আচরণ শিক্ষা করতে পারে। তাছাড়া সহানুভূতিবিরোধী প্রক্ষোভগুলি, যেমন নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, ক্রোধ, স্বার্থপর মনোভাব প্রভৃতি যাতে শিশুর মধ্যে অত্যধিক মাত্রায় জাগ্রত না হয় সেদিক লক্ষ্য রাখা যেতে পারে।

শিশুর সামাজিকতা বিকাশের মূলে রয়েছে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার আগ্রহ। ২।৩ বছর বয়স থেকেই শিশুরা অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের গণ্ডী ব্যাপকতর হতে থাকে। অপরের সঙ্গে দৈহিক উচ্চতা, বুদ্ধি, খেলাধুলা, পড়াশোনা, শখ প্রভৃতির মিলের দিকে লক্ষ্য রেখেই শিশুরা প্রথমতঃ তাদের বন্ধু নির্বাচন

বন্ধুত্ব

করে। তবে এগুলিই সব সময় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার একমাত্র কারণ তা নয়। একই দলভুক্ত হওয়ার জন্য, একই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কোন কোন বিষয়ে সাহায্যের ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং তার *উপরেই বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।*

শিশুদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাবও শিশুদের সামাজিক চেতনা জাগিয়ে তোলে। পরিবারের মধ্যে শিশুকে পিতামাতার প্রশংসা লাভের জন্য অন্য ভাইবোনের সঙ্গে অনেক সময় প্রতিযোগিতা করতে হয়। পিতামাতাও ভাইবোনের কার্যের তুলনামূলক আলোচনা করে এই প্রতিযোগিতার ভাব জাগিয়ে তোলেন। এই প্রতিযোগিতার ভাব বিশেষ করে দেখা দেয় যখন শিশু বিদ্যালয়ে তার শিক্ষাজীবন শুরু করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার মনোভাব বেড়ে চলতে থাকে।

প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা-মনোভাবের দোষ-গুণ উভয়ই বর্তমান। প্রতিযোগিতার মনোভাব যেমন এক দিকে শিশুর পূর্ণ কর্মশক্তিকে জাগ্রত করে তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিশুকে উৎসাহিত করে তেমনই অপরদিকে শিশুর মনে ঈর্ষা, ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি অসুস্থ উত্তেজনা সৃষ্টি করে তার মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। আবার প্রতিযোগিতায় পরাজয় অনেক সময় শিশুর মনে ব্যর্থতার গ্লানি ও আশাভঙ্গের বেদনা ও লজ্জার সৃষ্টি করে। এর ফলে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়। তাই পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার উচিত শিশুর মনে সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগ্রত করা এবং প্রতিযোগিতায় পরাজিত হলে যাতে শিশুর মনে লজ্জা বা আত্মগ্লানি না জাগে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবের পরিবর্তে সহযোগিতার মনোভাব জাগ্রত করাই ভাল। সহযোগিতার মনোভাব শিশুদের সামাজিকতাবোধের বিকাশে সহায়ক হয়।

সহযোগিতা

জন্মের প্রথম দুটি বছর শিশু আত্মকেন্দ্রিক থাকে, তখন তার মনে সহযোগিতার ভাব তেমন থাকে না। এর পর তার চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে সে আগ্রহী হয়, তখন তার মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব জাগ্রত হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুর ব্যক্তিগত সফলতার প্রশ্নই বড়, সহযোগিতার ক্ষেত্রে দলগত সফলতার প্রশ্নই বড়, কাজেই শিশুর মধ্যে সুশিক্ষার সাহায্যে যদি এই সহযোগিতার ভাব জাগ্রত করা যায় তাহলে শিশুর সামাজিক চেতনা

বিকাশের পক্ষে তা একান্তভাবে সহায়ক হয়। তাছাড়া প্রতিযোগিতার যা কিছু দোষত্রুটি, যেমন, ঈর্ষা, ঘৃণা, রেষারেষি, অসুস্থ উত্তেজনা প্রভৃতি সহযোগিতার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে। সহযোগিতার মনোভাব পারস্পরিক প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ঐক্যের ভাব সৃষ্টি করে সমাজ জীবনকে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করে।

**শিশুর মধ্যে প্রতিরোধ করার ও আক্রমণাত্মক মনোভাব**

খুব শৈশব থেকে শিশুর মধ্যে প্রতিরোধের মনোভাব জাগ্রত হয়। শিশুর ইচ্ছার প্রকৃতি ঠিকমত বুঝে না নিয়ে, তার ইচ্ছাবিরোধী কার্য করতে গেলে, শিশুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে, তার পক্ষে কষ্টসাধ্য এমন কোন কার্য করার জন্য তাকে বাধ্য করলে, সে প্রতিরোধ করে। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই তার মধ্যে এই প্রতিরোধের ভাব কমে আসে, এবং সহযোগিতার মনোভাবই তার মনে বেশী করে জাগ্রত হয়। এর একাধিক কারণ আছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক চেতনা বাড়তে থাকে, তার বুদ্ধি ও বোধশক্তির বিকাশ ঘটে, কর্মকুশলতা বাড়ে, এবং প্রতিরোধ সৃষ্টি করে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রবণতা হ্রাস পায়। তাছাড়া সহযোগিতার মনোভাব বেশী মাত্রায় দেখা দেওয়াতে যতদূর সম্ভব প্রতিরোধ না করে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কার্য করার দিকেই তার প্রবণতা থাকে বেশী।

শৈশবে শিশুদের মধ্যে আক্রমণের মনোভাবও জাগ্রত হয়। ক্রোধ থেকেই এই মনোভাবের সৃষ্টি। শৈশবে ঝগড়া, মারামারি প্রভৃতির মাধ্যমে এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু শিশু যতই বড় হতে থাকে তখন এই আক্রমণাত্মক মনোভাব অনেকটা মার্জিত রূপ গ্রহণ করে। দৈহিক স্তর অতিক্রম করে সেটি ব্যঙ্গ, শ্লেষ, সমালোচনা, বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে অপরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতি-নীতি, আচার-আচরণের একটা ভদ্রোচিত মান তাকে অসামাজিক পথে এই আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ করা থেকে বিরত করে। পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে শিশুর আক্রমণাত্মক মনোভাব অসামাজিক পথে আত্মপ্রকাশ না করে। কিছু মাত্রায় প্রতিরোধ করার ও আক্রমণাত্মক মনোভাব ব্যক্তির মধ্যে থাকা ভাল। প্রতিরোধের মনোভাব থাকলে কোন বিষয় বিনা বিচারে গ্রহণ না করে, তাকে বিচার করে দেখার প্রবণতা জাগ্রত হয়। প্রতিযোগিতামূলক আচরণে সংযত মাত্রায় আক্রমণাত্মক মনোভাব সফলতা লাভের জন্য প্রয়োজন।

**৭। ব্যক্তির জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর (Different stages of individual's development) :** শিশু তার জন্মের সময়েই *প্রকৃতিদত্ত কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে আসে। এসব সম্ভাবনার সাহায্যেই শিশু* পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে এবং নিত্য নতুন আচরণ করে। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণও পরিবর্তিত হয়।

কিন্তু শিশু যে সম্ভাবনা বা প্রকৃতিদত্ত উপকরণ নিয়ে জন্মায়, সেগুলি নবজাতকের (neonate) মধ্যে অত্যন্ত অপরিণত এবং অবিকশিত। কিন্তু নবজাতকের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তার দৈহিক ও মানসিক সম্ভাবনাগুলি বিকশিত হতে থাকে তার আপন গতিতে। তারপর একদিন মানবাঙ্কুর আপন সত্তার বিকশিত রূপ নিয়ে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। নবজাতক হয় প্রাপ্তবয়স্ক। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে এই যে বিকাশের লীলাখেলা, তার মূলে রয়েছে প্রকৃতি স্বয়ং। সে সদাব্যস্ত, অদৃশ্য ফল্গুনদীর ধারার মতো প্রতিটি মুহূর্তে চলেছে তার বিকাশপ্রক্রিয়া। সুতরাং ব্যক্তির জীবন-বিকাশে বয়স অনুসারে কোন স্তরভেদ করা চলে না। এই বিকাশ নিরবচ্ছিন্ন, তার গতিপ্রবাহ সদা চঞ্চল। এজন্য রেমণ্ট (*Raymont*) বলেন : "বিকাশ একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, তার মধ্যে কোন বিরতি নেই। যে সমস্ত মানসিক এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্য পর্যায়-ক্রমে ব্যক্তির জীবনে উপস্থিত হয়, তারা পরিপক্কতা লাভ করেই অন্য একটি বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়।"[1]

সুতরাং জীবন-বিকাশের স্তরভাগকে আমরা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি না এবং বিভিন্ন পণ্ডিত এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। বিশেষভাবে কোন্ বয়সে কতটুকু বিকাশ ঘটে এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। তবুও ব্যক্তিসত্তার বিকাশের শ্রেণীবিভাগ অর্থহীন নয়। বিকাশের একটি স্তর বা অবস্থা থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হবার মধ্যে কোন ফাঁক নেই বটে তবুও ব্যক্তিকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে অন্য স্তরে পৌঁছতে হয়। মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তি-সত্তার সমগ্র বিকাশকেই বোঝাবার জন্য মানুষের জীবন বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেন : যেমন, শৈশবকাল, বাল্যকাল বা কৈশোরকাল, বয়ঃসন্ধি, বয়স্ক অবস্থা ইত্যাদি। আমরা বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ

1. "Development is a continuous process : there are no gaps. The various physical and mental functions, as they successively appear, ripen and pass into higher functions."

করেছি : শৈশব, বাল্যকাল এবং বয়ঃসন্ধি। এখানে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে শিশুর বিভিন্ন বয়সের পরিবর্তন একই ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ, সুতরাং এক এবং অবিভাজ্য। একটি পরিবর্তনের সঙ্গে আর একটি পরিবর্তন যুক্ত হয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং একই ব্যক্তিসত্তাকে বিকাশের চরম-সীমায় নিয়ে চলে।

**(ক) শৈশব (Childhood)—এক থেকে ছয় বছর :** নবজাতকের জন্মের পূর্বেই মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তার বিকাশের অনেকটা অংশ সম্পন্ন হয়ে যায়। মাতৃগর্ভেই শিশুর হৃদ্‌স্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য শুরু হয় এবং তার দেহের গঠন, স্নায়ুতন্ত্র, ইন্দ্রিয়নিচয় সৃষ্টি হয়।

জন্মের এক বছরে নবজাতকের মধ্যে মানসিক গুণাবলীর বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ইন্দ্রিয়ানুভূতির তারতম্য বিশেষ বোঝা যায় না। তবে তীব্র আলো ও শব্দ তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু এ সময় তার দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে চলে যদিও দিনে পনর থেকে বিশ ঘণ্টা সে নিদ্রাবস্থায় কাটায়।

দু বছরের মধ্যেই শিশু চলাফেরা করতে শেখে, দৌড়াতে পারে—অবশ্য মাটিতে পড়ে, আবার ওঠে (Period of toddlerhood)। প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই সে অস্পষ্ট অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ আরম্ভ করে। এক বছরের পরেই শিশু নানা কথা বলার চেষ্টা করে যদিও এগুলির বেশীর ভাগ শব্দ বা উচ্চারণের সমষ্টি মাত্র। ত্রুটিপূর্ণ অস্পষ্ট শব্দোচ্চারণই এ সময়ের বৈশিষ্ট্য। তিন বছরের মধ্যেই শিশু সর্বনাম শব্দ, বিশেষভাবে 'আমি,' 'আমার' ইত্যাদি বেশ উচ্চারণ করতে পারে।

শিশু যখন মায়ের কোল ছেড়ে হাঁটতে শেখে তখন সে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। সব কাজ সে নিজে করবার চেষ্টা করে। এ সময় সে স্বহস্তে খেতে চায়, গেলাস ধরবার চেষ্টা করে, নানাপ্রকার খেলনা নিয়ে খেলতে ভালবাসে। কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিজিবিজি আঁকতে বসে।

তিন বছরের পরই শিশুর জীবনে আসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সংকটময় অধ্যায়। এ সময়ে যদিও সে পরিপূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না এবং তাকে পরনির্ভর থাকতে হয়, তবুও শিশু-মনে স্বাধীন হবার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা সে সময়ে দেখা দেয়। কান্না-কাটির দ্বারা নানা রকম জেদ সে প্রকাশ করে। সকলের স্নেহ-ভালবাসা তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হোক, শিশু এরূপ আশা করে। তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য, তার প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সে অনবরত কথা

বলে যায়—গোলমাল চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। কোনভাবে যদি সে বুঝতে পারে যে তাকে অবহেলা করা হচ্ছে তবে তার রাগের আর সীমা থাকে না।

তিন বছরের পরেই শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি বেশ পুষ্ট হয়ে ওঠে। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শ সবই শিশু-মনে তখন আবেদনের ঢেউ তোলে; সীমাহীন ব্যাকুলতা নিয়ে এ পৃথিবীকে শিশু প্রত্যক্ষ করে। প্রত্যেকটি ঘটনা তার মনে কৌতূহল সঞ্চার করে। সব কিছুকে জানবার এবং বোঝবার জন্য শিশু প্রশ্নব্যাকুল হয়ে ওঠে। হ্যাডফিল্ড (*Hadfield*) বলেন যে, এই অল্প বয়সের শিশুরাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক যেভাবে প্রতিটি ঘটনা বা বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন করেন শিশুও সেভাবে 'এটা কি', 'এটা কেন' প্রশ্ন করে যায়।

অতি শৈশবে শিশু পরনির্ভর। অত্যন্ত অসহায় সে। সে সময় তার জীবনে প্রয়োজন নিরাপত্তার এবং ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তির। এ পরনির্ভর শিশু ধীরে ধীরে দু-তিন বছরের মধ্যেই যখন চলাফেরা করতে শিখল, তখন আপন স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এটা সত্য যে শিশুকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া যায় না, তবুও তার স্বাধীনতার মনোভাবকে আমাদের সম্মান দেখান উচিত। শিশু-মনে যদি স্নেহ, ভালবাসার দ্বারা নিরাপত্তা বোধের সৃষ্টি করতে পারা না যায়, তবে পরিণত বয়সে সে শিশু নিজেকে অসহায় মনে করে। আর অন্যদিকে শিশুর মধ্যে যে স্বাধীনতার স্পৃহা দেখা দেয় তারও যথোচিত মর্যাদা দিতে হয়। তা না হলে পরিণত বয়সে শিশু-মনে আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব দেখা দিতে পারে, যার ফলে সে হবে দুর্বল ও অসহায় প্রকৃতির মানুষ।

শিশুর শৈশবকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে অভিহিত করার আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল এই যে, এ সময়ে শিশু-মনে অহং (Ego) ভাবের উদয় হয়। শিশুর সকল ভাব, সকল চিন্তা, সকল কর্ম, সকল আচরণ এই অহংকে কেন্দ্র করেই বর্ধিত হয়। শিশু তখন সর্বত্র 'আমি' এই উত্তমপুরুষকে খুঁজে বেড়ায়, আত্মপ্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। শিশুর এই অহং ভাব ত্রিধারায় বর্ধিত হয়। প্রথমতঃ, শিশু তার পরিবেশ অনুযায়ী নিজের আচরণকে পরিবর্তিত করতে শেখে যদিও এ পরিবর্তন অনেকটা তার অজ্ঞাতসারেই সম্পন্ন হয়। অপরের আচরণের ইঙ্গিতময়তা (Suggestibility) তার আচরণকে প্রভাবিত করে। পরিবারের পরিজনদের বিশেষভাবে মাতাপিতার আচরণকে সে গ্রহণ করে। সে মা-বাবাকে অনুসরণ করেই তার আচরণকে পরিবর্তিত করে অর্থাৎ তাদের আচরণের ইঙ্গিত শিশুর চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করে। এর পরের অবস্থায়

শিশু কিছুটা সচেতন ভাবে অনুকরণ করতে শিখে। সে তার কল্পনা-মন নিয়ে বাবার টেবিলে বসে কাজ করতে ভালবাসে, মায়ের সঙ্গে সমযোগী হয়ে আচরণ অভ্যাস করার প্রয়াস পায়। তারপর তার অহংভাব অন্য পথে প্রবাহিত হয়। এ অবস্থায় শিশু গল্প শুনতে ভালবাসে—যাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাদের প্রত্যেককে সে নিখুঁতভাবে বিবেচনা করে, যারা তার কাছে বীরপুরুষ তাদের সঙ্গে সে একাত্মবোধ (identification) করে। অর্থাৎ অহং ভাবের একটি আদর্শ (ideal) সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে ওঠে। শিশুর এই অহং বোধ থেকেই তার জীবনে নানা মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। পরিবেশের প্রভাব, বিশেষ ভাবে পরিবারের প্রভাব শিশুর জীবনে বেশী। সুতরাং শিশুর জীবনে অভিপ্রেত প্রতিফলন বা তার আচরণের সার্থক পরিবর্তন করতে হলে পরিবারকে দায়িত্ব নিতে হবে। মাতাপিতার ও অন্যান্য পরিজনদের সংযত ও সুন্দর আচরণ, নৈতিকভাব, পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ পরিবেশ শিশুর জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজন।

চার বছর পরেই শিশুর ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা খুব বৃদ্ধি পায়। ভাষার উপরেও তার বেশ অধিকার দেখা দেয়। এ সময়ে শিশুর জীবনে বুদ্ধির বিকাশ হয় কিনা এ নিয়ে মতানৈক্য বর্তমান। রুশো বলেছেন, এ সময়ে আমরা যেন শিশুকে বেশী কথা বলতে না দেই। কারণ শিশু বেশী কথা বললে তার চিন্তাশক্তির বিকাশ ব্যাহত হবে। কিন্তু ভাষাও যে চিন্তার বাহন এবং চিন্তা ও ভাষার মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক বর্তমান, এ মনস্তাত্ত্বিক সত্যটি সম্ভবতঃ রুশোর জানা ছিল না। অনেকে বলেন, এ সময়ে শিশু-মনে যুক্তিপূর্ণ কোন চিন্তার বিকাশ ঘটে না, অমূর্ত বস্তু সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করতেও সে পারে না। মনোবিজ্ঞানী পিয়াজঁ (*Piaget*) বলেন, শিশু এ সময় ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক (ego-centric), তার সকল আচরণে তার অহং বোধের প্রতিফলন। এর মধ্যে চিন্তার কোন স্পর্শ নেই, সবই আবেগজনিত। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী সুজান আইজ্যাক্স (*Susan Isaacs*) বলেন, শিশুর চিন্তাকে বয়স্কদের চিন্তনপ্রণালী দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বয়স্কদের চিন্তায় বিমূর্ত ধারণা (abstract idea) বর্তমান, কিন্তু শিশুর চিন্তায় অহংভাবই প্রধান। এ অহংভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সে কল্পনা করে জড় বস্তু নিয়ে তার পরিবেশের সকল বস্তুতেই প্রাণ বর্তমান। তার খেলনা থেকে শুরু করে আশপাশের সব কিছুই প্রাণবন্ত। শিশুর এ মানসিক বৈশিষ্ট্যকে সর্বপ্রাণবাদ (animism) বলা হয়। কিন্তু আইজ্যাক্স এবং অন্যান্যরা মনে করেন, শিশুর চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধির বিকাশ এ সময়েই শুরু হয়। তার

চিন্তা প্রতীকধর্মী, কল্পনাধর্মী। অলীক কল্পনা এবং দিবাস্বপ্নই শিশুর চিন্তার প্রধান আশ্রয়।

এ সময়ে শিশুর মধ্যে সমাজ-চেতনা ও সামাজিক বুদ্ধির বিকাশ লক্ষণীয়। শিশু ধীরে ধীরে আত্ম-পর ভাবতে শেখে। অন্যের প্রতি সে হিংসা ও বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু এ সময়ে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা তার মধ্যে দেখা দেয়। শিশু যখন কাউকে আপন করে নিচ্ছে বা কারো প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছে তখন তার মধ্যে সমাজ-চেতনার বিকাশই হচ্ছে। যখন সে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয় তখন তার আত্মবোধের বিস্তার ঘটে, অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে সে তার আত্মীয়তা খোঁজে।

এ সময়ে শিশু খেলাধূলায় মত্ত থাকতে ভালবাসে। শিশুরা যে কেন খেলে, এ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। কিন্তু শিশুরা যে খেলে এটাই সত্য কথা। শিশুর কাজ মানে তার খেলা। এই খেলাই তাদের সক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। এই স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের মধ্যেই শিশুর কল্পনা বিস্তার ঘটে, সে তার মানসিক সমস্যার সমাধান করে এবং দেহ-মনের ভারসাম্য বজায় রাখে। এজন্য কাল্ডওয়েল কুক (*Caldwell Cook*) শিশুর শিক্ষায় খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা (**Playway in education**) প্রবর্তন করতে চেয়েছেন এবং আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় এ নীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শৈশবেই শিশুর মনে যৌন ভাব দেখা দেয়। আমাদের প্রাচীন মনোবিজ্ঞানে বিশ্বাস করা হত যে শিশু-মনে কোন যৌনভাবের স্পর্শ নেই। কিন্তু আধুনিক ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ (**Psycho-analysis**) এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ফ্রয়েড বলেন, 'পরিণত মানুষের যৌনতা (**sexuality**) এবং শিশুর যৌনভাবের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। পরিণত মানুষের যৌনতা বলতে বুঝি প্রজনন (**reproduction**) ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতা বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আসক্তিতে তৃপ্তি খোঁজে। কিন্তু শিশুর যৌনবোধ তার নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেন্দ্র করেই তৃপ্তি খোঁজে। একে ফ্রয়েড স্বরতিমূলক (**Auto-erotic**) যৌন বলেছেন। আঙ্গুল চোষা, কোন কিছু কামড়ান এবং নানা অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে সে যৌন তৃপ্তি পায়। ধীরে ধীরে এই যৌনতা তার নিজের দেহ থেকে দেহান্তরে বিস্তার লাভ করে। এ সময় পুরুষ-শিশু তার মাকে বেশী ভালবাসে, মেয়ে-শিশু ভালবাসে তার বাবাকে। মার প্রতি যে আসক্তি তাকে কেন্দ্র করে বাবার সঙ্গে পুরুষ-শিশুর, আর বাবার প্রতি যে আসক্তি তাকে কেন্দ্র

করে মায়ের প্রতি মেয়ে-শিশুর একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে ওঠে। এই যৌনমূলক ভাবকে ফ্রয়েড বলেছেন, ইডিফাস কমপ্লেক্স (Oedipus Complex)। ফ্রয়েডের মতে এ ধরনের যৌনভাব শিশুদের জীবনে সাত-আট বছর পর্যন্ত থাকে, তারপর এটা বিলীন হয়ে যায়।' একে তিনি বলেছেন, যৌনতার নিদ্রিত অবস্থা (Latent Period)। যৌবন আগমনের সাথে সাথেই পরিণত বয়সের যৌন আচরণ স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে।

মনঃসমীক্ষণবাদীরা বলেন, শিশুর জীবনে এই যৌনবোধ (libido) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মাতার প্রতি যৌনাকর্ষণ থেকেই শিশুর মনে এক ভয় মিশ্রিত আনুগত্য দেখা দেয়। ধীরে ধীরে এ আনুগত্যই ব্যক্তির জীবনে নীতিবোধ, বিবেকবোধ এবং সামাজিকতাবোধে রূপান্তরিত হয়।

শিশুর জীবনের এ বিচিত্র বিকাশ ধারা সম্বন্ধে আমরা প্রাচীনকালে বিশেষ অবহিত ছিলাম না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশোই সর্বপ্রথম মানব-বিকাশের স্তর সম্বন্ধে তাঁর 'এমিল' গ্রন্থে আলোচনা করেন। রুশোই সবপ্রথম এ সত্যটিকে অনুধাবন করেছিলেন যে শিশুর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে যে বিচিত্র আচরণ আবির্ভূত হয় এগুলি শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক এবং তার জীবনে মূল্যহীন নয়। তাছাড়া শিশুর বিকাশ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় আছে। বিভিন্ন স্তরের গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী শিশুর শিক্ষাধারা ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। জীবনের পরিণত স্তর হল শৈশব বা কৈশোরের পরিসমাপ্তি বা পূর্ণতা। সুতরাং জীবনের বিভিন্ন স্তরকে ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক বিকাশের মূল্যায়নে বিচার করতে হবে।

কাজেই শিশুর জীবনের কাঠামো তার শৈশবেই রচিত হয়। আমাদের দেখা উচিত শিশু যেন পরিবার, পরিবেশ বা বিদ্যালয়ে তার বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশ করতে পারে এবং একটি সুসংহত ও বলিষ্ঠ জীবনের অধিকারী হয়।

**(খ) বাল্যকাল (Boyhood)—ছয় থেকে বার বছর :** শৈশবে শিশু-চরিত্রে যে উদ্দামশীলতা এবং চঞ্চলতা লক্ষ্য করি বাল্যকালে তা মোটামুটি একটি সংহত রূপ ধারণ করে। দৈহিক, মানসিক, বিশেষভাবে আবেগ ও প্রক্ষোভগত দিক থেকে শৈশব এক সংকটপূর্ণ অবস্থা। নবজাতকের জীবন-বিকাশে শৈশব দেহ মনে পরিবর্তনের বন্যা নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু সাত-আট বছরের একটি ছেলেমেয়ের মধ্যে জীবনবন্যার কোন তাণ্ডব স্রোত লক্ষ্য করা যায়

না। তার আচরণকে লক্ষ্য করলে মনে হয় বিকাশের স্রোত যেন তার দু কুলের গণ্ডীর বাঁধ মেনে চল্‌ছে। তার মধ্যে অস্থিরতা নেই, সে যেন স্থিতধী। পরিণত জীবনের ব্যক্তির আচরণমূলক অনেক সাদৃশ্য বাল্যকালে লক্ষ্য করে আর্নেস্ট জোন্স বাল্যকালকে প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পুনরাবর্তন মতবাদ অনুযায়ী জোন্স প্রাপ্তবয়সকে (Adulthood) বাল্যকালের পুনরাবৃত্তি বলে ঘোষণা করেছেন; মনঃসমীক্ষণবাদীরা বলেন, শিশুর শৈশবে যৌনভাবের যে লীলাখেলা প্রবল হয়ে দেখা দেয় বাল্যকালে তা ঘুমিয়ে থাকে। শিশু নিজ লিঙ্গ (Sex organ) সম্বন্ধে সচেতন হয় বটে কিন্তু কোন যৌন আকর্ষণ শিশুর মধ্যে দেখা যায় না।

বাল্যকালকে শিশুর সমাজ-চেতনা এবং বুদ্ধি-বিকাশের কাল বলে অভিহিত করা হয়। পিয়াজেঁর (*Piaget*) মতে শিশুর সমাজ-চেতনাবোধের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। শৈশবে শিশু প্রধানতঃ আত্মকেন্দ্রিক, তার অহং এত প্রচণ্ড যে অন্যকে নিয়ে ভাববার তার সময় নেই। কিন্তু সাত-আট বছর বয়স থেকেই শিশু অন্যের প্রতিও মনোযোগী হয়ে ওঠে, তাদের মতামতের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করে। তার মন তখন অনেকটা সমাজ-মণ্ডিত (Socialised)। বন্ধুপ্রীতি, দলগঠনের আকাঙ্ক্ষা তাকে অনেকটা সামাজিক করে তোলে। অপরের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর তার শ্রদ্ধা এত বেড়ে যায় যে, সময় সময় শিশু পিতামাতা বা শিক্ষকের মতামতের চেয়ে বন্ধুবান্ধব বা দলের সহযোগীর মতামতকে বেশী মূল্য দেয়। এজন্য এ বয়সকে দল গড়বার বয়স (gang age) বলা হয়। ম্যাকডুগ্যাল (*McDougall*) এ দল-প্রীতিকেই যৌথ-প্রবৃত্তি (gregarious instinct) বলে অভিহিত করেছেন। পারিবারিক গণ্ডীর সীমাকে অতিক্রম করে শিশু-মন তখন বাইরের জগতে ব্যাপ্ত হতে চায়। সে তখন সামাজিক আচার-আচরণ অনুকরণ করে। সে তখন বুঝতে পারে তার খেয়ালখুশীমত তার কাল্পনিক ইচ্ছা নিয়ে এ পৃথিবীতে চলা যায় না। তাই সমাজের রীতিনীতি, অনুশাসন ও শৃঙ্খলা সে মেনে নেবার চেষ্টা করে।

শৈশবে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ মূর্ত কোন বস্তুর মাধ্যমেই ঘটে থাকে। তার বুদ্ধি তখন থাকে কল্পনার সঙ্গে মিশ্রিত এবং আবেগধর্মী। কিন্তু বাল্যকালে শিশু যুক্তিপূর্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তার স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ দেবার ক্ষমতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। অমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা এই বাল্যকালেই দেখা দেয়, কিন্তু ঠিক পরিণত মানুষের মতো যুক্তিপূর্ণ নয়। অর্থাৎ পরীক্ষণের

সাহায্যে দেখা গেছে বাল্যকালে শিশু কোন প্রতীক বা প্রতিরূপের (image) সাহায্যেই বেশী চিন্তা করে।

বাল্যকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এ বয়সে শিশুর মন সঞ্চয়ী হয়ে ওঠে। সে সবকিছুই সংগ্রহ করে রাখার চেষ্টা করে। একে অনেকে শিশুর মালিকানাবোধের (Sense of proprietory) জাগরণ বলেছেন। সুজান আইজ্যাক্স বলেন: এ বয়সে শিশু তার নিজের ডেস্ক বইপত্র ইত্যাদির জন্য বেশ গর্ব বোধ করে। শিক্ষার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এটি খুব সহায়ক। অর্থাৎ শিশুর মালিকানাবোধ অতৃপ্ত থাকলে বা অনাদৃত হলে তার মনের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। আর অবদমিত এই ক্ষোভ চৌর্যবৃত্তি, অপরের সম্পত্তির প্রতি প্রতিহিংসা প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

এ সময়ে শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তার মনের সৃজনশীলতা। নতুন কিছু সৃষ্টি করার এক প্রবল তাড়না শিশু অনুভব করে। সে দল গঠন করে, কাঠের, মাটির নানা দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করে। খেলাধূলা এবং সকলপ্রকার গঠনমূলক কাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত এবং জাহির করার প্রয়াস পায়। এজন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী এ সময়কে প্রভুত্ব এবং সংগঠনের বয়স (the age of mastery and achievements) বা জীবনের প্রস্তুতির স্তর (Preparation Stage) বলে বর্ণনা করেছেন।

বাল্যকালের মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিশুর জীবনে পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষাসূচী নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। শিশুর মধ্যে যাতে সমাজ-চেতনা বাস্তবরূপ পেতে পারে এজন্য তাকে সমবেত কর্মানুষ্ঠানের সুযোগ দিতে হবে। শিশুরা এ সময় অনুকরণ করতে এবং দুঃসাহসিকতাপূর্ণ রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে। সুতরাং শিশু যাতে অসঙ্গত আচরণ অনুকরণ না করে, সমাজবিরোধী ও নীতিবিরোধী রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়ে কুসঙ্গে মিশে বাজে আড্ডা না দেয়, এ সম্বন্ধে সমাজ ও শিক্ষক, অভিভাবক সকলের দায়িত্ব রয়েছে। এ সময়ে শিশুকে গঠনধর্মী কাজে প্রচুর উৎসাহ দিতে হয়। সাজ-পোশাক পরে নিজেকে তারা জাহির করতে চায়। সুতরাং এদের এমন সব কাজের সুযোগ দিতে হবে যাতে তাদের আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এ সময় বিদ্যালয়ে সঙ্গীত আসর বা নাচ-গান, বাজনা, অভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা প্রয়োজন। খেলাধূলা, সমাজসেবা, এন. সি. সি. প্রভৃতি গঠনমূলক ও শিক্ষামূলক কাজের মধ্যে শিশুকে সদা ব্যস্ত রাখা চাই। শিশুর সঞ্চয়ী মনকেও

অবহেলা করতে নেই। এ সময়ে শিশুকে দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে, দেশপ্রেমিক নেতাদের ছবি সংগ্রহ করতে, ফুলের বাগানে নানাজাতের ফুলগাছ সংগ্রহ ইত্যাদি নানা সংগ্রহণমূলক কাজে উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। আসল কথা, নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সহপাঠ্য সূচীর প্রবর্তন এ সময়ে খুব প্রয়োজন।

***(গ) বয়ঃসন্ধি (Adolescence)—বার থেকে আঠারো বছর :*** শিশু-জীবন-বিকাশে বাল্য এবং যৌবনের মধ্যবর্তী দ্রুত পরিবর্তন কালকে আমরা বয়ঃসন্ধি কাল (Adolescence) বলে থাকি। ইহা একটি দৈহিক ও মানসিক বিকাশের বিচিত্র পরিবর্তনের কাল। বাল্যকাল থেকে যৌবনে অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়স্কের স্তর থেকে প্রাপ্তবয়স্কের স্তরে উন্নীত হওয়ার কালই বয়ঃসন্ধি। শিশুর দেহে এবং মনে তখন অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। এর ফলে সে নতুন করে তার জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে প্রশ্নব্যাকুল হয়ে ওঠে, অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, সময় সময় মানসিক ভারসাম্য (mental equilibrium) হারিয়ে ফেলে। এখন আমরা বয়ঃসন্ধিকালের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন আলোচনা করছি :

**(i) বয়ঃসন্ধিকালের দৈহিক পরিবর্তন (Physiological Characteristics of Adolescence) :** (ক) বয়ঃসন্ধিকালে দেহের সর্বাঙ্গে নানা পরিবর্তন উপস্থিত হয়। শরীরের মাংসপেশী, হাড়, গ্ল্যাণ্ড, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়। শরীরের ওজন ও দৈর্ঘ্যের হার বৃদ্ধি পায়। তবে শরীরের দৈর্ঘ্য ও ওজন সমান অনুপাতে বাড়ে না। তাছাড়া ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে এই দৈহিক বৃদ্ধির হার সমান নয়। মেয়েরা প্রথম দিকে ছেলেদের চাইতে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সের পরই সাধারণতঃ ছেলেরা মেয়েদের চাইতে অধিক দীর্ঘ ও সবল হয়ে ওঠে। যৌবনাগমনের পর এ বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে এবং একটি স্তরে এসে দৈহিক বৃদ্ধির অর্থাৎ উচ্চতা থেমে যায়। (খ) বয়ঃসন্ধিকালে রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস ও পাকস্থলীর ক্রিয়ার ক্ষমতা ও গতি বৃদ্ধি পায়। তার ফলে ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, দৈহিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। (গ) বয়ঃসন্ধিকালের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল দেহাকৃতির—বিশেষভাবে মুখমণ্ডলের পরিবর্তন। এ সময়ে ছেলেদের মুখের উপর একটা কাঠিন্যের ছাপ পড়ে। দেহের অন্যান্য অংশের মতো মুখের মাংসও দৃঢ় এবং উজ্জ্বল হয়। আর মেয়েদের

মুখ কোমল, লাবণ্যময় এবং গোলগাল হয়ে ওঠে। (ঘ) বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের গলার স্বরেরও পরিবর্তন হয়। এ সময়ের ছেলেদের স্বরনালী দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের গলার স্বর কর্কশ ও ভারী হয়। মেয়েদের এ রকম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হলেও তাদের স্বর অনেকটা তীক্ষ্ণ এবং মিহি হয়। (ঙ) বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের দেহে রোম বৃদ্ধি পায় এবং ছেলেমেয়েদের শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে রোমোদ্গম হয়। বিশেষ করে ছেলেদের এ সময় দাড়ি গোঁফ গজায়। (চ) বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের রসক্ষরা গ্রন্থির পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তনের ফলে দেহের যৌন হরমন্ নিঃসৃত হয় এবং যৌন অংশের ও দেহের পরিবর্তন লক্ষিত হয়। (ছ) বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের যৌন-অঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে। ফলে শিশুর জীবনে যৌনপরিণতি (Puberty) দেখা দেয়। যৌনপরিণতি বা যৌবনাগম বলতে ছেলেদের বেলা বীর্যোৎপাদন ক্ষমতা এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃসৃষ্টি বা প্রথম ঋতু হওয়া বোঝায়।

**(ii) বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তনঃ (Mental Characteristics of Adolescence):** (ক) বয়ঃসন্ধি কালকেই অনেকে বুদ্ধির চরম বিকাশের কাল বলে অভিহিত করেন। তবে এ সম্বন্ধে সকল মনোবিজ্ঞানী এক মত নন। কেউ কেউ ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতি (Principle of individual difference) অবলম্বন করে বলেন যে, বুদ্ধি-বিকাশের ক্ষেত্রে গতি ও প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য বিদ্যমান। দৈহিক বিকাশের উপর বুদ্ধির কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। অনেক সময় দুর্বল দেহধারী ব্যক্তিও প্রতিভার অধিকারী হয়, আবার অনেক সময় সুস্থ ও পূর্ণ বিকশিত দেহধারী ব্যক্তির মধ্যেও বুদ্ধি-বিকাশের অপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বুদ্ধি-বিকাশের একটি চরম সীমা আছে। বড় জোর আঠার বৎসর পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ চলে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকাল এগার-বার বছর থেকে শুরু হয়ে কুড়ি-একুশ বছর বয়স পর্যন্ত চলতে পারে।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল, বয়ঃসন্ধিকাল বুদ্ধির চরম বিকাশের কাল না হলেও এ সময় যে বুদ্ধি-বিকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বয়সেই শিশু-মনে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও আগ্রহ দেখা দেয়। ফলে স্মৃতি-শক্তি, মনঃসংযোগ করা ও গ্রহণ-ক্ষমতা, ভাষার উপর দখল ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় এবং বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট বিকাশ ঘটে।

(খ) বয়ঃসন্ধিকালের প্রধান মানসিক পরিবর্তন লক্ষিত হয় ব্যক্তির অনুভূতির রাজ্যে। দেহের পরিবর্তন, ইন্দ্রিয়শক্তির পূর্ণতালাভ এবং যৌন-পরিণতি এ সময় মানসিক স্তরে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। বয়ঃসন্ধি-কালের এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে হলিংওয়ার্থ (*Hollingworth*) বলেন, এ বয়সে ব্যক্তি নানা কৌতূহল, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার তাড়না অনুভব করে সকল কাজে সাহস ও বীরত্ব দেখায় এবং গুরুজনদের বিরক্তিকর শাসনের প্রতি কিছুটা অবজ্ঞা দেখায়।

বয়ঃসন্ধিকালের শিশুর আত্মসচেতনতা প্রবল আকার ধারণ করে। তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সে সদা জাগরূক। আত্মসম্মানবোধ এত প্রচণ্ড যে, সে সকল ব্যাপারেই নিজের প্রাধান্য এবং স্বকীয়তা বজায় রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে চলাফেরা, কথাবার্তা, মেলামেশা প্রভৃতি আচরণে ব্যক্তি তার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করার জন্য ব্যগ্র হয়।

অনুভূতির দিক থেকে ব্যক্তি তখন ভাবালু, আবেগপ্রবণ এবং কল্পনাবিলাসী হয়। সে এ সময়ে নানা আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং মনে মনে কোন বীরের আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করে। যে কোন আদর্শে জীবন বলি দেওয়ার জন্য সে উদ্যত হয়।

এ সময়ে ব্যক্তির সামাজিক চেতনার বিকাশও লক্ষণীয়। বহির্বিশ্বের প্রতি, সমাজের প্রতি ব্যক্তির তখন প্রবল আকর্ষণ। সমাজের অনুশাসন, শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধ (Values) সম্বন্ধে তাকে সঙ্গতিসাধন করতে হয়। কিন্তু এ সঙ্গতিসাধন সহজভাবে শিশুর জীবনে চলে না। সে তখন নিয়ম লঙ্ঘন করার, প্রচলিত অনুশাসনকে অপসারিত করার, তার নিজস্ব আদর্শ ও নীতিবোধ অনুসারে সমাজের নতুন কাঠামো সৃষ্টি করার প্রবণতা প্রদর্শন করে। এজন্য বাউলি (*Bowley*) বলেন, বয়ঃসন্ধিকালের তরুণদের সঙ্গে বাস করা খুব কঠিন ব্যাপার। তারা চিন্তাশীল; তবে খুব আবেগপ্রবণ। অন্যের ত্রুটি ধরতে ব্যগ্র এবং বাক্‌পটু।

শিশুর যৌন-পরিণতি তার অনুভূতি ও প্রক্ষোভের মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সময়ে শিশুর যৌন-চেতনা তার আবেগ ও আচরণে অভাবনীয় পরিবর্তন আনে। একথা উল্লেখযোগ্য যে যৌন-চেতনা বয়ঃসন্ধিতেই জেগে ওঠে না। মনঃসমীক্ষণবাদীরা বলেন, ব্যক্তির শৈশবেই যৌন-চেতনা থাকে তবে তা স্বরতিমূলক। শিশু নিজের দেহকে আশ্রয় করেই প্রধানতঃ যৌন-আনন্দ লাভ করে। বাল্যকালে শিশুর এ যৌনভাব স্তিমিত

থাকে এবং শিশুর আকর্ষণ প্রধানতঃ সমলিঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই নিহিত থাকে। অর্থাৎ ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে, মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে মেশে। কিন্তু *বয়ঃসন্ধিকালে শিশুরা বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ* অনুভব করে। অর্থাৎ ছেলেরা মেয়েদের প্রতি, মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এ সময়ে ছেলেমেয়েরা দিবাস্বপ্নে বিভোর। বাস্তবে যা সম্ভব হয়নি তার পরিতৃপ্তি সে দিবাস্বপ্নে লাভ করে। স্বপ্নেই আত্মগৌরবের অধিকারী হয়, তার বাঞ্ছিত প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে সে লাভ করে।

শিশু-মনে যৌন-পরিণতি বহুমুখী চাহিদা নিয়ে উপস্থিত হয়। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার, কোন কিছু সৃষ্টি করার, সর্বকাজে দক্ষতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করার, প্রশংসা অর্জন করার একটা তীব্র তাড়না সে অনুভব করে। নানা সক্রিয় কাজের মধ্যে সে একদিকে যেমন গভীর আনন্দলাভ করে তেমনি অন্যদিকে সে মনে করে তার পরিবার, সমাজ তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান বা মর্যাদা প্রদান করছে না। এই আত্মকেন্দ্রিকতা থেকেই তার মনে অনেক সময় হীনমন্যতার ভাব জেগে ওঠে।

বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর যৌন-চেতনা শিশুর দেহমনে এক পুলক সঞ্চার করে। অহেতুক কথাবার্তায়, সামাজিক মেলামেশায় সে এক অনাস্বাদিত আনন্দের সন্ধান পায়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এ সময়ে সত্যিকার কোন যৌন-চাহিদা দেখা যায় না। যৌন-কৌতূহলই তখন প্রধান, সে তখন প্রেম বা প্রণয়মূলক ব্যাপারকেই মূল্য দেয়, দৈহিক যৌন-পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাকুল হয় না।

**(iii) বয়ঃসন্ধি যৌবনের পুনরাবৃত্তি (Adolescence is a recapitulation of Childhood) :** আর্নেস্ট জোন্স পুনরাবর্তনবাদ (Theory of recapitulation) অনুসরণ করে বলেন, বয়ঃসন্ধি শৈশবের পুনরাবৃত্তি মাত্র। শৈশবে শিশুর দেহ যেভাবে দ্রুত বৃদ্ধি হয়, তার মানসিক জগতে যেভাবে নানা আলোড়ন এসে উপস্থিত হয়, এসব কিছুর সাদৃশ্য তিনি বয়ঃসন্ধিকালে খুঁজে পেয়েছেন। শৈশবে শিশুর দেহ ও মনে যে উদ্দাম গতি লক্ষ্য করা যায়, বয়ঃসন্ধিকালে যেন তারই আবির্ভাব ঘটে। শৈশবের ভাবপ্রবণতা, কল্পনা, যৌন-আচরণ ইত্যাদি শিশুর জীবনে যে মানসিক অসংহতির সৃষ্টি করে, বাল্যকালে তা স্তিমিত হয়ে যায়। বাল্যকালে প্রাপ্তবয়স্কদের মতো শিশুর জীবনে স্থৈর্য এবং ভাব-সংহতি দেখা দেয়। পরিবেশের সঙ্গে সে সঙ্গতিসাধন করে নেয়, কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর দেহে এবং মনে আবার শৈশবের দৈহিক ও

মানসিক পরিণতি দেখা যায়। যে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপন করে শিশু তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, আকস্মিক পরিবর্তনে, পরিবেশের সঙ্গে তার আবার শৈশবের মতো বিরোধ উপস্থিত হয়। তাকে আবার নতুন করে আচরণ ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করতে হয়। ফলে, শিশু তখন আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠে। পরিবেশ, সমাজ, পরিবার সকলের সঙ্গে তার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শৈশবের মতো আবার তার মধ্যে পরনির্ভরশীলতা ও নিরাপত্তার চাহিদা জাগে। বীরপূজা, দলপ্রীতি ও বন্ধুপ্রীতির উপর গভীর আস্থাভাব, গৃহের বন্ধন ছিন্ন করার মনোভাব, প্রচলিত প্রথা ও পরিবেশকে অতিক্রম করার দুঃসাহসী প্রেরণা দেখা দেয়। যৌন-চেতনা যা শৈশবে স্তিমিত ছিল সেটা আবার জেগে ওঠে এবং আবেগ ও প্রক্ষোভজনিত নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। সুতরাং বয়ঃসন্ধির কাল শৈশবের পুনরাবির্ভাব ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু এ মতবাদ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তির জীবন-বিকাশে শৈশবের বহু পরে বয়ঃসন্ধির উপস্থিতি। কাল (Time) যে পরিবর্তনের বিচিত্র রূপ এ স্তরে নিয়ে আসে তার সঙ্গে শৈশব-স্তরের অবস্থাগুলির প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। বয়ঃসন্ধি শৈশবের পুনরাবৃত্তি নয়, পুনর্জাগরণ, নতুন অবস্থা। নতুন পরিবর্তনের মাঝে দৈহিক, মানসিক, বিশেষভাবে প্রক্ষোভ বা আবেগজনিত যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বয়ঃসন্ধিকালে আমরা লক্ষ্য করি, শৈশবে তার অবস্থিতির কল্পনা করার অর্থ নতুন সম্ভাবনাকে পুরাতনকে দিয়ে ব্যাখ্যা করা, ছক কেটে শিশুর জীবনকে দেখা।

**(iv) বয়ঃসন্ধিকাল এবং যৌবনাগম (Adolescence & Puberty) :** কোন কোন লেখক যৌবনাগম এবং বয়ঃসন্ধিকালকে ব্যক্তির জীবন-বিকাশের একই স্তর বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু আসলে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান এবং এ পার্থক্য পরিমাণগত এবং গুণগত দুই-ই। পরিমাণগত দিক থেকে বয়ঃসন্ধি যৌবনাগমের চাইতে ব্যাপক এবং গুণগত দিক থেকে যৌবনাগমের মতো বয়ঃসন্ধি শুধু দৈহিক পরিবর্তন সূচিত করে না, মানসিক পরিবর্তনও সূচিত করে। নিম্নের আলোচনা থেকে এ পার্থক্য আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে।

যৌবনাগমের অর্থ হল ব্যক্তির প্রজনন বা সন্তান উৎপাদন-ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। ছেলেদের ক্ষেত্রে তার প্রধান লক্ষণ বীর্যোৎপাদন আর মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃসৃষ্টি বা প্রথম মাসিক ঋতু। এ যৌন-পরিণতি মেয়েদের বেলা আট-নয়

*বছর বয়সে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে বার-তের বছর বয়সেও আসতে পারে, যদিও* সাধারণ ক্ষেত্রে তা অনেক পরে আসে। সুতরাং দৈহিক পরিবর্তন বা শারীরিক ক্রিয়ার মধ্যেই যৌবনাগম কথার তাৎপর্য নিহিত। কিন্তু বয়ঃসন্ধি এ দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার সামাজিক, মানসিক এবং ব্যক্তিগত প্রক্ষোভজনিত সমস্যার দিকও রয়েছে। তাছাড়া, যৌবনাগম কোন্ বয়সে হয় বলা শক্ত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ছেলেমেয়েদের যৌন-পরিণতি শীতপ্রধান দেশের ছেলেমেয়েদের চাইতে একটু আগেই হয়। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের চাইতে আগেই যৌন-পরিণতি ঘটে। আমরা সাধারণতঃ যৌন-পরিণতির সময় থেকে শুরু করে শিশু যতক্ষণ না পূর্ণ যৌবনে পরিণত হচ্ছে এ কালকে বয়ঃসন্ধি বলে অভিহিত করি। যৌবনাগম বয়ঃসন্ধিকালের অঙ্গীভূত দৈহিক বিকাশ ও পরিবর্তনের একটি দিক মাত্র।

(v) **বয়ঃসন্ধি পীড়ন ও কষ্টের কাল (Adolescence is a Period of 'stress & strain' or 'strife and strain') :** বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তির দেহে এবং মনে যে পরিবর্তনের আলোড়ন এসে উপস্থিত হয় তা উল্লেখ করে স্টানলি হল (*Stanley Hall*) তাঁর '*Adolescence*' বইতে এ কালকে ঝটিকাক্ষুব্ধ বা পীড়ন ও কষ্টের কাল বলে অভিহিত করেছেন। এ সময়ে ব্যক্তির জীবনে দৈহিক ও মানসিক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ফলে, ব্যক্তির প্রক্ষোভজনিত আচরণেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। বাল্যকালে যে পরিবেশের সঙ্গে ছিল তার সহজ সম্পর্ক, সে পরিবেশই তার বয়ঃসন্ধিকালে নতুন সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়। এ সময় আবার ব্যক্তিকে কর্মমুখর হয়ে উঠতে হয়। তখন তার জীবনে যেন এক দুর্নিবার জোয়ার এসে উপস্থিত হয়। আর এ জোয়ারের বেগে পুরাতনকে ভাঙবার একটি প্রবল তাড়না ব্যক্তি অনুভব করে। তার বাল্যকালের দৈহিক ও মানসিক কাঠামো পরিবর্তিত হওয়ার ফলে সে নিজেকে অনেকটা অসহায় মনে করে এবং নিরাপত্তার জন্য পর-নির্ভরশীল হতে চায়। সুতরাং এ সময় সে খুব আত্মকেন্দ্রিক এবং আবেগ-প্রবণ হয়। সে মাঝে মাঝে অনুভব করে সমাজ বা পরিবার তার প্রয়োজন ও সম্ভাবনাশক্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিচ্ছে না। ফলে, তার মনে একটি নিপীড়নমূলক মনোভাব (Persecution mentality) সৃষ্টি হয়। এটাই ক্ষোভের আকারে প্রচলিত প্রথা, অনুশাসন, রীতিনীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়। এটা আর কিছুই নয়, নতুন ভাব, নতুন প্রক্ষোভ বা

আবেগের গর্ভ-যন্ত্রণা। এজন্য বয়ঃসন্ধিকাল সত্যই ঝটিকাক্ষুব্ধ, পীড়ন ও কষ্টের কাল।

কিন্তু এ ব্যাখ্যার মধ্যে কোন অসঙ্গতি না থাকলেও এর মধ্যে অতিশয়োক্তি বর্তমান। বয়ঃসন্ধিকাল ব্যক্তির জীবন-বিকাশের একটি গুরুত্ব-পূর্ণ অধ্যায়। পরিণত মন ও দেহের অধিকারী হওয়ার জন্য এ স্তর অতিক্রম করা অপরিহার্য। যে দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্তনের স্রোত বয়ঃসন্ধিকাল নিয়ে উপস্থিত হয় তা ব্যক্তির সর্বতোমুখী জীবন-বিকাশ সম্ভব করে তোলে। বয়ঃসন্ধিকাল 'কষ্ট এবং নিপীড়নের' কাল নয়, বৃহত্তর জীবনকে লাভ করবার বলিষ্ঠ সংগ্রাম মাত্র।

## ৮। বয়ঃসন্ধিকালের চাহিদা (Needs of Adolescence):

স্টানলি হল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ বয়ঃসন্ধিকালের বিভিন্ন সমস্যা ও চাহিদা নিয়ে প্রচুর গবেষণা এবং আলোচনা করেছেন। তাঁদের পরিবেশিত তথ্যের উপর নির্ভর করে প্রধান প্রধান চাহিদাগুলি আমরা বিবৃত করছি।

**(ক) স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার চাহিদা (Needs of Freedom and Activity):** বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক ও মানসিক বিকাশে অনেক পূর্ণতা আসে। যে শিশু শৈশব থেকেই পরনির্ভর, এবার সে সবব্যাপারে স্বাধীন হতে চায়। তার আত্মসম্মানবোধ তার মনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। দায়িত্ব বহন করার, নিজের মত প্রকাশ করার,দশ জনের মধ্যে একজন হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে এ সময়ে দেখা দেয়। সে তখন সদা কর্মমুখর। স্থির ও শান্ত হয়ে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার এই স্বাধীনতা ও সক্রিয়তাবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শিশুর এই স্বাধীন আচরণকে যথাযথ মূল্য দেওয়া উচিত। অনেক সময় তার কর্মমুখরতাকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হয়, তাকে গৃহকোণে শান্ত হয়ে পাঠে মনোনিবেশ করতে উপদেশ দেওয়া হয়। তার স্বাধীন মত প্রকাশকে অকাল-পক্বতা বলে অবজ্ঞা করা হয়। কিন্তু এ সময় পরিবার, বিদ্যালয় বা সমাজের কর্তব্য হচ্ছে শিশুকে সক্রিয়তার সুযোগ প্রদান করা। মুক্ত আকাশের নীচে শিশু যেন তার অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে। আমাদের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখী পাঠ্যসূচীতে শিশুর চাহিদা অনুযায়ী সাত ধরনের পাঠ্যবিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। শিশুর সামর্থ্য ও চাহিদার স্বাধীনতা এতে আছে। তা ছাড়া সহপাঠ্যসূচীর ব্যাপক ব্যবস্থা থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয়

আচরণের সুযোগ রয়েছে। পরিবারেরও এ ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের সহায়ক হওয়া উচিত। শিশুর মনে একমাত্র পরিবারই নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের স্বাধীন ও সক্রিয় আচরণে সমর্থন জানাতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে আরোপিত শৃঙ্খলা অর্থহীন। এ সময়ে পরিবার এবং বিদ্যালয় উভয়ের দেখা উচিত ছেলেমেয়েরা যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিয়মনীতি মানবার চেষ্টা করে। কারণ, স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, অসংযত উদ্দাম আচরণ নয়। স্বাধীনতা হল স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা।

(খ) **ব্যক্তির সামাজিক বিকাশের চাহিদা (Needs of Social Development) :** বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তির সমাজচেতনার বিকাশ খুব গভীর হয়। তার আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ এ সময়ে তাকে শৈশবের মতো স্বার্থকেন্দ্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে না। উহা তাকে সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে। সে তখন ভাবের দোসর খোঁজে, স্বাধীন ইচ্ছায় প্রভাবিত হয়ে সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ গ্রহণ করে, অপরিচিতের মধ্যে তার আত্মীয়তা অনুসন্ধান করে। সীমাহীন, বন্ধনহীন এক বৃহত্তর পৃথিবীর আবেদন এসে তার মনে উপস্থিত হয়। গৃহের বন্ধন বা আকর্ষণ তখন তার কমতে থাকে। বাইরের আহ্বান তখন তাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়।

বিদ্যালয় এবং পরিবারের তখন কর্তব্য হচ্ছে যৌথকর্ম, দল বেঁধে ভ্রমণ, বনভোজন, নাটক-অভিনয়, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক দল গঠন, বিদ্যালয় বিতর্ক সভা বা ছাত্র সংগঠন প্রভৃতি সমবেত কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহ ও সুযোগ প্রদান করা। এর ফলে ছেলেমেয়েদের সমাজচেতনা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে, তারা সামাজিক আচরণ ও অনুশাসনে অভ্যস্ত হয় এবং তাদের শক্তি ও উদ্দমশীলতা বিপথগামী বা বিনষ্ট হয় না। তারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সমাজে তাদের যে প্রয়োজন আছে তা অনুভব করে।

(গ) **আত্মনির্ভরতার চাহিদা (Needs of self-dependence) :** বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা নানা আবেগ বা প্রক্ষোভের সম্মুখীন হয়। মানসিক তাড়নার ফলে তারা সব সময় নিজেকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশ করতে চায়। এ সময় সৃজনশীল কর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকলে সহজেই এ চাহিদার পরিতৃপ্তি হয়। অধ্যয়ন, খেলাধূলা এবং অন্যান্য কর্মে তারা আত্মপ্রকাশ খোঁজে। এই আত্মপ্রকাশের চাহিদা থেকেই তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। এ চাহিদাকে অনেকে বৃত্তি (vocation) গ্রহণের চাহিদা বলেও মনে করেন।

পরনির্ভর না হয়ে উপার্জনক্ষম হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করার প্রবল ইচ্ছা বয়ঃসন্ধিকালে দেখা দেয়। এ ব্যাপারে পরিবার শিশুর সহায়ক হতে পারে, বিদ্যালয় বৃত্তি নির্বাচনে শিশুকে (vocational guidance) সহায়তা করতে পারে।

(ঘ) **যৌন-তৃপ্তির চাহিদা (Needs of Sex-satisfaction) :** বয়ঃসন্ধিকালে প্রতিটি ব্যক্তির যৌনবোধ জাগে। শৈশবে এ যৌনতা নিজের দেহকে আশ্রয় করেই তৃপ্ত। এ সম্বন্ধে শিশু-মনে বিশেষ কোন কৌতূহল দেখা যায় না। বাল্যকালে এ যৌনবোধ থাকে স্তিমিত। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে যৌনবোধ পরিপূর্ণ আকারে বিকশিত হয়, দেহ-মন যৌন আচরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। তখন প্রতিটি ব্যক্তি প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর চিন্তায় বিভোর। সে সর্বদা তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীর উপস্থিতি কামনা করে। কিন্তু যৌন চাহিদা প্রধানতঃ যৌন আচরণ-মূলক নয় বলেই অনেকে মনে করেন। কারণ, এ চাহিদা যৌন-কৌতূহলেই আত্মপ্রকাশ করে। বয়ঃসন্ধিকালের এ যৌন-কৌতূহলকে নিবৃত্ত করার একমাত্র উপায় যৌন-শিক্ষা। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'নিষিদ্ধ ফলের' মতো যৌন-শিক্ষা আমাদের সভ্য সমাজে 'নিষিদ্ধ কথা'। অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, বয়ঃসন্ধিকালে সহশিক্ষার (Co-education) প্রবর্তন করা উচিত। তখন ছেলে ও মেয়েরা পরস্পরের সম্বন্ধে অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল পোষণ করবে না। তা ছাড়া মাতাপিতা ছেলেমেয়েদের যৌন-শিক্ষা দিতে পারেন যাতে অশ্লীল পুস্তক বা ছবি, কুসঙ্গ প্রভৃতি থেকে তারা যৌন-শিক্ষা লাভ না করে।

(ঙ) **জীবন দর্শনের চাহিদা (Needs of ideals in life) :** বয়ঃসন্ধিকালেই প্রতিটি ব্যক্তি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে প্রশ্নব্যাকুল হয়ে ওঠে। জীবন ও জগতের রহস্য জানবার এবং সকল নীতিবোধের মর্ম উদ্‌ঘাটন করার জন্য সে নানা প্রশ্ন করে। আসল কথা দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনে তার মনে যে সংঘাত উপস্থিত হয় তারই প্রতিফলন এই জীবন ও জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনের আকাঙ্ক্ষায় আমরা লক্ষ্য করি। এ সময় ব্যক্তি মনে মনে তার জীবন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা বা আদর্শ সৃষ্টি করে ফেলে।

পরিবার বা বিদ্যালয়ের এ সম্বন্ধে প্রচুর দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালে শিশু দিবাস্বপ্নে বিভোর, সে কল্পনাবিলাসী। সুতরাং তার জীবনাদর্শ গঠন যেন অলীক কল্পনার পুঞ্জীভূত রূপায়ণ না হয়, বাস্তববিরোধী না হয়—এ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহে শিশুকে সহায়তা করা পরিবারের কর্তব্য, বিদ্যালয়ের দায়িত্ব। পাঠ্যসূচীর দ্বারা শিশুর যাতে একটা জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে তার

ব্যবস্থা থাকা উচিত। এর ফলে শিশু নৈতিক, সামাজিক আদর্শের সঙ্গে একটি ভাবসংহতি সৃষ্টি করতে পারবে। তা না হলে সে হবে একটি অসমঞ্জস (mal-adjusted) চরিত্রের অধিকারী, সময় সময় অপরাধপ্রবণ।

## প্রশ্নাবলী

1. Describe the major features of the child's physical and mental development and show its relation to other phases of his growth.
   Ans. ( পৃঃ ৭১—পৃঃ ৮৬ )
2. Describe the major features of the mental development of the child.
   Ans. ( পৃঃ ৮১—পৃঃ ৮৬ )
3. Discuss the role of learning in the child's mental development.
   Ans. ( পৃঃ ৮১—পৃঃ ৮৬ )
   Discuss the major features of the child's emotional development.
   Ans. ( পৃঃ ৮৬—পৃঃ ৯০ )
5. Describe the different stages in the development of social behaviour of the child.
   Ans. ( পৃঃ ৯০—পৃঃ ৯৭ )
6. Bring out the chief characteristics of different stages in the development of a child [C. U. 1965
   Ans. ( পৃঃ ৯৮—পৃঃ ১১২ )
7. Describe the speed and mode of social development.
   Ans. ( পৃঃ ৯৪—পৃঃ ৯৭ )
8. Describe the general trend of social development from childhood to adolescence. [C. U. 1969
   Ans. ( পৃঃ ৯৮—পৃঃ ১১২ )
9. Describe the process of socialisation and the different features that work behind it. How is the child's individualisation related to it ?
   Ans. ( পৃঃ ৯০—পৃঃ ৯৭ )
10. Give the chief characteristics of the different stages in the internal development of a child.
    Ans. ( পৃঃ ৯৮—পৃঃ ১১২ )
11. State how a child of eight differs from an adolescent in interest and ideal.
    Ans. ( পৃঃ ৯৯—পৃঃ ১০৮ )
12. Give a brief account of the special needs of the adolescent and their educational implications. [C. U. 1968
    Ans. ( পৃঃ ১১২ —পৃঃ ১১৫ )
13. State the main stages of human development and determine some characteristic features of each stage.
    Ans. ( পৃঃ ৯৮ -পৃঃ ১০৯ )

14. Describe the different stages of development of a child with particular reference to adolescence. [C. U. 1967
Ans. ( পৃঃ ৯৮—পৃঃ ১১২ )

15. Explain why adolescence is regarded as a re-capitulation of the first period of life.
Ans. (পৃঃ ১০৮—পৃঃ ১১০ )

16. Describe the physical and mental changes that occur during adolescence. [C. U. 1964
Ans. ( পৃঃ—পৃঃ )

17. What are the special needs of the adolescent? Examine how far these are satisfied in a multipurpose school.
Ans. ( পৃঃ ১১২—পৃঃ ১১৫ )

18. Discuss the main characteristics of adolescence. [C. U. 1970
Ans. (পৃঃ ১০৬—পৃঃ ১১২ )

19. Describe the main stages of human development from infancy to adolescence.
Ans. ( পৃঃ ৯৮—পৃঃ ১১২ )

20. Describe the nature and needs of adolescence.
Ans. ( পৃঃ ১১২—পৃঃ ১১৫ )

21. What are the physical, mental, social and spiritual needs of the adolescent? How can the school meet the needs?
Ans. ( পৃঃ ১১২—পৃঃ ১১৫ )

22. Adolescence is described as an awkward stage—a period of 'storm and stress.' 'strife, and strain'—Do you agree? Give reason for your answers. [C. U. 1963
Ans. ( পৃঃ ১০৯—পৃঃ ১১২ )

## চতুর্থ অধ্যায়

# বংশধারা ও পরিবেশ

# (Heredity and Environment)

### ১। বংশধারার অর্থ (The Meaning of Heredity) :

মনোবিজ্ঞানে বংশধারা শব্দটিকে 'ক্ষুদ্রতর' এবং 'ব্যাপকতর' অর্থে ব্যবহার করা হয়। ক্ষুদ্রতর অর্থে বংশধারা বলতে বোঝায় কোন ব্যক্তির মধ্যে তার শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারক কোষগুলির (cells) বণ্টনের বিষয়টিকে। এই কোষগুলির জন্যই সন্তানের সঙ্গে মাতাপিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপকতর অর্থে বংশধারা বলতে বোঝায় ব্যক্তির সে সব বৈশিষ্ট্যগুলিকে যেগুলি ব্যক্তি তার মাতাপিতা ও পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকে। বংশধারা হল ব্যক্তির সহজাত বৈশিষ্ট্য যে বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণের পর শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। বংশধারাসূত্রেপ্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য অর্জিত নয়, সহজাত; অর্জিত বৈশিষ্ট্য শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধ। কাজেই বংশধারা হল সেই প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার জন্য ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কতকগুলি সাদৃশ্য নিয়ে জন্মায়। এই প্রক্রিয়া এমন সুনির্দিষ্ট ভাবে ঘটে যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই শিশুর সঙ্গে তার পূর্বপুরুষদের কিছু-না-কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য দু-এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়, তবে এজাতীয় ব্যতিক্রম খুবই দুর্লভ। বংশধারা বলতে শিশুর সঙ্গে মাতাপিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়কে বোঝায়, কেননা, শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে মাতাপিতার কাছ থেকে যে ক্রোমোজোম (Cromosome) এবং জীন (Gene) পেয়ে থাকে সেগুলিই শিশুর সঙ্গে মাতাপিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই নির্ধারণ করে।

**বংশধারার ক্ষুদ্রতর এবং ব্যাপকতর অর্থ**

**বংশধারা হল মাতাপিতা ও পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া ব্যক্তির সবরকম বৈশিষ্ট্য**

### ২। বংশধারা কী? (What is Heredity ?)

স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক মিলনের ফলেই সন্তানের জন্ম, পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলনের ফলে মাতৃজঠরে প্রথম প্রাণের সূচনা ঘটে। পুং-জননকোষ বা শুক্রকীট স্ত্রী-জননকোষ বা ডিম্বাণু (ovum)-তে প্রবেশ করলে গর্ভসঞ্চার হয় এবং তখন একটি ডিম্বকোষ (fertilised egg বা zygot) গঠিত হয়। এই

ডিম্বকোষটি স্বধর্ম অনুযায়ী নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করতে থাকে। একটি কোষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি কোষ, দুটি কোষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে চারটি, চারটি কোষ আবার আটটি কোষ, এই ভাবে কোষ বিভাজনের ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু গর্ভসঞ্চারের ২৮০ দিন পরে ভূমিষ্ঠ হয়। গর্ভসঞ্চারের তিন মাস পর থেকেই কোষগুলি মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি ধারণ করে।

আদিকোষ আত্মবিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়

শিশুর দৈহিক-মানসিক বিকাশ, বংশজ প্রলক্ষণ (hereditary traits), ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির রহস্যের অনেকটাই নিহিত রয়েছে এই কোষ (cell)-এর মধ্যে। কাজেই এই কোষের পূর্ণ পরিচয় জানা একান্তই প্রয়োজন। পুং-জননকোষ বা শুক্রকীটের মস্তকে থাকে ওর কোষকেন্দ্র (nuleus)। স্ত্রী-জননকোষ বা ডিম্বাণুর মধ্যেও থাকে একটি কোষকেন্দ্র। কোষকেন্দ্রের চারপাশে থাকে এক প্রকার জলীয় পদার্থ। কোষকেন্দ্রটিই কোষের প্রাণস্বরূপ। পুং-জননকোষ এবং স্ত্রী-জননকোষের কোষকেন্দ্রে কতকগুলি সূক্ষ্ম সুতোর মতো পদার্থ থাকে। এগুলিকে বলা হয় **কোষতন্তু** বা **ক্রোমোজোম** (cromosome)। মানুষের জননকোষে এই ক্রোমোজোমের সংখ্যা হল ২৪টি। পুং-জননকোষ ও স্ত্রী-জননকোষের মিলনে যে নতুন কোষটি তৈরী হয় তার ক্রোমোজোমেব সংখ্যা হল ২৪ + ২৪ অর্থাৎ ৪৮টি। প্রত্যেক জোড়া ক্রোমোজোমের একটি আসে পুং-জননকোষ থেকে এবং আর একটি আসে স্ত্রী-জননকোষ থেকে। যখন প্রথম ডিম্বকোষটি নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে তখন নতুন কোষ দুটির প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে ২৪ জোড়া বা ৪৮টি ক্রোমোজোম।

ক্রোমোজোম

এই নতুন কোষ দুটি যখন আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে পরিণত হয়, তখন সেই নতুন কোষগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে ২৪ জোড়া বা ৪৮টি করে ক্রোমোজোম। কোষ দুপ্রকারের, দেহ-কোষ (body-cell) এবং জননকোষ (germ cell)। জননকোষে অর্থাৎ পুং-জননকোষে এবং স্ত্রী-জননকোষে কেবল ২৪টি করে ক্রোমোজোম থাকে। দেহ কোষগুলিতেই ২৪ জোড়া বা ৪৮টি করে ক্রোমোজোম থাকে। স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকের দেহের প্রতিটি কোষ ৪৮টি ক্রোমোজোম দ্বারা গঠিত, কিন্তু পুরুষ বা স্ত্রী প্রত্যেকের জননকোষে মাত্র ২৪টি করে ক্রোমোজোম থাকে, এবং পিতৃজননকোষ ও মাতৃজননকোষের মিলনে প্রস্ফুটিত

জননকোষে মাত্র ২৪টি করে ক্রোমোজম থাকে

ডিম্বকোষটিতে থাকে ৪৮টি ক্রোমোজোম। দেহকোষগুলি যেভাবে আত্মবিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমবিভক্ত হতে থাকে জননকোষগুলির সেভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না। পরবর্তী বংশধর সৃষ্টির জন্য সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে।

জননকোষ ছাড়া মানবদেহের সব কোষেই ৪৮টি করে ক্রোমোজোম থাকে। এই ক্রোমোজোমগুলি আকার এবং গঠনের দিক থেকে বিভিন্ন। এই ক্রোমোজোমগুলি অসংখ্য গুটিকা বা দানার (beads) মত পদার্থ দিয়ে গাঁথা একটা মালার মতো। এই দানার মতো পদার্থগুলি প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিক পদার্থের জটিল সমষ্টি (complex chemical compounds)। এগুলিকে বলা হয় জীন (Gene)। এই জীনই হল বংশগত সংলক্ষণের প্রকৃত বাহক। ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক সব রকম বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে জীনের ক্রিয়া। জীন সব সময় জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে। এই জোড়ার একটি আসে মাতৃকোষ থেকে আর একটি আসে পিতৃকোষ থেকে। যেহেতু এক জোড়ার জীন একই ধরনের কাজ করে এবং যেহেতু প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম, সেহেতু কোন একটি জীন ত্রুটিপূর্ণ হলেও অন্যটি সমস্ত কাজ একাই করতে পারে। সময় সময় জীনগুলি প্রকৃতিতে অভিন্ন হয়, তখন সেই জীন দুটির ক্রিয়াও তদ্রূপ হয়। যেমন, যদি পিতা ও মাতা দুজেনর মধ্যে দীর্ঘাঙ্গ হবার জীন থাকে তাহলে তাদের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে তাঁদের সন্তানও হবে দীর্ঘাঙ্গ। কিন্তু অনেক সময় জীন দুটির প্রকৃতি ভিন্ন হতে পারে। এই দুটি জীনের মধ্যে সাধারণতঃ একটি বংশজ প্রলক্ষণগুলিকে সক্রিয়ভাবে বহন করে, অপরটি নিষ্ক্রিয়ভাবে বহন করে।

জীন

একটিকে বলা হয় সক্রিয় (dominant) জীন। অপরটিকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় (recessive) জীন। যেমন, মাতাপিতার দুজনের জীন দুটির একটির মধ্যে যদি খর্বতার প্রলক্ষণ সক্রিয়ভাবে থাকে, অপরটির মধ্যে দীর্ঘতার প্রলক্ষণ নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে তাহলে, নবজাতক খর্ব হবে। দীর্ঘতর প্রলক্ষণবহনকারী জীনটি নিষ্ক্রিয় হওয়াতে নবজাত সন্তানের মধ্যে তার কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে না। অনেক সময় পিতা ও মাতা দুজনে বাহ্যতঃ দীর্ঘকায় হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সন্তান যে খর্বকায় হয়, এর কারণ হল পিতামাতার উভয়ের জননকোষের দীর্ঘতার বাহক জীনটি নিষ্ক্রিয় থাকার জন্য খর্বতার বাহক জীনটি সক্রিয়ভাবে ক্রিয়া করে, যার ফলে সন্তান খর্বকায় হয়।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় জীন

জীনগুলি কি ভাবে জোড় বাঁধবে সেই জোড় বাঁধার উপরই নির্ভর করে বংশগতি। কাজেই ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, স্বভাবগত সব রকম বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে ক্রোমোজোম এবং জীনের জোড় বাঁধার প্রকৃতি। পুং-জননকোষ ও স্ত্রী-জননকোষের মিলনে যে নতুন কোষটি উৎপন্ন হয়, সেই কোষের অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সংগঠনের ব্যাপারটি একেবারেই আকস্মিকতার উপরে নির্ভর করে। জননকোষের মিলনের সময় কোন্ ক্রোমোজোম কোন্ ক্রোমোজোমের সঙ্গে জোড় বাঁধবে বা কোন্ জীন কোন্ জীনের সঙ্গে জোড় বাঁধবে, তাও একান্তভাবে আকস্মিকতার উপর নির্ভর। কাজেই একমাত্র সমকোষী বা সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট যমজ (identical twins) ছাড়া মাতাপিতার দুটি সন্তানের একেবারে অভিন্ন হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

**জীনের সংগঠন একেবারেই আকস্মিক**

ক্রোমোজোম বা জীনের সাদৃশ্যের জন্যই মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানদের এবং সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায়। যে ৪৮টি ক্রোমোজোম একত্রে শিশুর বংশধারার নির্ধারক সমস্ত প্রলক্ষণগুলির বাহক, তার মধ্যে ২৪টি পিতার এবং ২৪টি মাতার কাছ থেকে পাওয়া, সে কারণে সন্তানের সঙ্গে মাতাপিতার সাদৃশ্য কিছু-না-কিছু থাকেই, আবার যেহেতু পিতা ও মাতা প্রত্যেকেই তাঁদের মাতাপিতার কাছ থেকে ২৪টি করে মোট ৪৮টি ক্রোমোজোম পেয়েছেন এবং তার মধ্যে ২৪টি সন্তানকে দিয়েছেন সে কারণে সন্তানের সঙ্গে পিতামহ ও পিতামহীর সাদৃশ্যও থাকতে পারে। সন্তানেরা পিতা ও মাতার কাছ থেকে যে ৪৮টি ক্রোমোজোম পায়, সেগুলি প্রকৃতিতে ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকে। সে কারণে একই মাতাপিতার সন্তানদের মধ্যে কিছু-না-কিছু মিল থাকেই।

**জীনের জন্যই মাতা-পিতার সঙ্গে সন্তানের ও সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য**

সমকোষী বা সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট যমজ সন্তানদের (identical twins) মধ্যে এই সাদৃশ্য সব চেয়ে বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। পুং-জননকোষ ও স্ত্রী-জননকোষের মিলনে যে ডিম্বকোষটি গঠিত হয়, সেই কোষটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি-কোষে পরিণত হবার পরে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন না থেকে সম্পূর্ণ পরস্পর থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী-কালে কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়। সমডিম্বজ বা সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট সন্তানের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমগুলি অভিন্ন হয় এবং সে কারণে সন্তানের বংশধারাও একই হয়। সমডিম্বজ যমজের ক্ষেত্রে দুটি

**সমকোষী যমজ**

*সন্তানই হয় পুত্র নয় কন্যা হবে, একটি পুত্র ও একটি কন্যা হতে পারে না।* ভিন্ন কোষী বা সাধারণ যমজ সন্তানের (fraternal twins) ক্ষেত্রে বা দ্বিডিম্বজ (di-ovular) যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে দুটি পুং-জননকোষ ও দুটি স্ত্রী-জননকোষের মিলন প্রায় একই সময়ে ঘটে থাকে। এর ফলে যে দুটি যমজ সন্তানের জন্ম হয়, তাদের ক্রোমোজোমগুলি ভিন্ন হয়। সে কারণে তাদের মধ্যে শারীরিক মানসিক সব রকম পার্থক্য থাকতে পারে। সাধারণ যমজ সন্তানের মধ্যে একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে হবার পথে কোন বাধা নেই। সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট যমজ সন্তানের উপর বংশগতি ও তুলনামূলক পরিবেশের প্রভাবের বিচার করার জন্য এ জাতীয় যমজ সন্তানের দুটিকে দুটি ভিন্ন পরিবেশে রেখে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ কিভাবে ঘটে সে সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান কার্য চালান হয়েছে। এই সকল অনুসন্ধান কার্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে; বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভিন্নকোষী যমজ

### ৩। শিশুরা কি বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করতে পারে? (Do children inherit specific traits?)

শিশু কি বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বা দক্ষতা (special ability) মাতাপিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারে? সঙ্গীতজ্ঞ মাতাপিতার সন্তান কি সঙ্গীতজ্ঞ হবার গুণটি বা বৈশিষ্ট্যটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে পারে? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে তিনটি বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, অনেক ক্ষেত্রে আমরা যে বৈশিষ্ট্য শিশু মাতাপিতার কাছ থেকে জন্মগতসূত্রে পেয়েছে মনে করি, পরিবেশের জন্যও শিশু সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে। কোন একটি পরিবারে প্রতিটি শিশুই সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারে। তার কারণ এই নয় যে, শিশু সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। বরং এই কারণে যে, সেই পরিবারের অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গীত চর্চা শিশুর মনে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় সন্তান পিতামাতার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে থাকে, খুব শিক্ষিত মাতাপিতার সন্তান মূর্খ হয়ে থাকে। সুতরাং এই কারণেও মনে করা সঙ্গত নয় যে, সন্তান মাতাপিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করবেই। তৃতীয়তঃ, মাতাপিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে দেখা গেলে সাধারণতঃ সেটিকে নিয়মের ব্যতিক্রমই মনে করা হয়।

সন্তান মাতাপিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, একথা বলতে যেন এই বোঝা না হয় যে মা ভাল রাঁধতে জানলে তাঁর মেয়েও ভাল রাঁধার ক্ষমতা নিয়ে জন্মাবে। যখন আমরা বলি, যে কোন শিশু জন্ম থেকেই কবি, লেখক বা সঙ্গীতজ্ঞ, তখন তার অর্থ বুঝে নিতে হবে এই ভাবে যে শিশুটির মধ্যে লেখার বা কবিতারচনা বা সঙ্গীতজ্ঞ হবার প্রবণতা বর্তমান এবং যদি পরিবেশের আনুকূল্য সে লাভ করে তাহলে অপরের তুলনায় এ বিষয়ে সে বেশী দক্ষতা দেখাতে পারবে। সঙ্গীতজ্ঞ মাতাপিতার সন্তানকে সঙ্গীতজ্ঞ হতে হলে, তার মধ্যে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ থাকা প্রয়োজন। তবে নিয়মিত সঙ্গীতের অনুশীলন করা দরকার এবং অনুকূল পরিবেশের সহায়তা তার পক্ষে প্রয়োজন।

উপরিউক্ত বিষয়গুলির অবর্তমানে কারও পক্ষে সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই উত্তরাধিকারসূত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার প্রশ্নে এই কথা বলা যেতে পারে যে, শিশুরা খুব সীমিত অর্থে তার অধিকারী হতে পারে। যেমন, স্বরযন্ত্রের উৎকর্ষের উপর সঙ্গীতের দক্ষতা নির্ভর করে এবং যেহেতু দেহের এই অঙ্গ কতকগুলি কোষের উপর নির্ভর এবং বংশগতিই কোন মানুষের মধ্যে কোষের বণ্টন নির্ধারণ করে সেই অর্থে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তি সঙ্গীত বা অন্য কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করতে পারে।

## ৪। বংশধারার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা ঃ

ব্যক্তির উপর বংশধারা বা পরিবেশ কার প্রভাব বেশী, নির্ধারণ করার জন্য কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী কয়েক পুরুষ ধরে বিভিন্ন পরিবারের বংশপঞ্জী আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে ফ্রান্সিস গ্যাল্টনের (*Francis Galton*) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাল্টন ৯৭৭ জন খ্যাতনামা ব্যক্তির একটি তালিকা তৈরী করেন। তারপর এদের নিকট আত্মীয় স্বজনের একটি তালিকা তৈরী করে তিনি দেখেন যে তাদের মধ্যে ৫৩৬ জন খ্যাতনামা ব্যক্তি। পক্ষান্তরে গ্যাল্টন ৯৭৭ জন সাধারণ ব্যক্তির একটা তালিকা তৈরী করে দেখেন যে তাদের নিকট আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মাত্র ৪ জন খ্যাতনামা ব্যক্তি।

ফ্রান্সিস গ্যাল্টনের গবেষণা

ডক্টর এ. ই. উইনসিপ (*A. E. Winship*) কোন এক এডওয়ার্ড পরিবার নিয়ে যে গবেষণা চালান, তার থেকেও তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষের

ব্যক্তিসত্তা নির্ধারিত হয় তার বংশগতির দ্বারা। রিচার্ড এডওয়ার্ড এলিজাবেথ নাম্নী এক খ্যাতনামা মহিলাকে বিবাহ করেন। তার পরিবারের মধ্যে কেহ বা খ্যাতনামা চিকিৎসক, কেহ বা সুবক্তা, কেহ বা নামকরা অধ্যাপক এবং কেহ বা খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ্ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছুকাল পরে রিচার্ড একটি সাধারণ মহিলাকে বিবাহ করেন এবং এই বিবাহের ফলে যে সন্তানদের জন্ম হয় তারা পরিণত বয়সে বিশেষ কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেনি।

উইনসিপের গবেষণা

এইচ. এইচ. গডার্ড (*H. H. Goddard*) কালিকাক পরিবার নিয়ে যে গবেষণা করেন তাতেও তিনি বংশগতির প্রভাবের গুরুত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন। মার্টিন কালিকাক ছিলেন খুব সাধারণ একজন সৈনিক। সৈন্য থাকাকালীন তিনি নিম্নবংশজাত স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এক মহিলার প্রতি অনুরক্ত হন। এই মহিলাকে কেন্দ্র করে একটি পরিবারের শাখা গড়ে ওঠে। যুদ্ধের থেকে ফিরে আসার পর তিনি একটি উচ্চ পরিবারের মহিলাকে বিবাহ করেন। এই শেষোক্ত মহিলাকে কেন্দ্র করেও আর একটি পরিবারের শাখা গড়ে ওঠে। প্রথম মহিলার বংশ-শাখা আলোচনা করে তিনি দেখেন যে মোট ৪৮০ জনের জন্ম হয়েছে। তার মধ্যে ১৪৩ জন স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, ৪৬ জন খুব সাধারণ স্তরের ব্যক্তি, ৩৬ জন অসৎ চরিত্রের ব্যক্তি এবং ৩৩ জন পতিতা, ২৪ জন মাতাল, ৩ জন হিস্টিরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তি। ৩ জন কোন-না-কোন অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি, ৮ জন পতিতালয়ের মালিক। দ্বিতীয় মহিলাকে কেন্দ্র করে যে পরিবারের শাখা ছড়িয়ে পড়েছে, তার মধ্যে ৪৯৬ জনের খোঁজ পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে মাত্র ৫ জন অসৎ চরিত্রের লোক এবং অবশিষ্ট সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ব্যক্তি।

গডার্ডের গবেষণা

কার্ল পিয়ার্সন গ্যাল্টন-পরিবারের বংশপঞ্জী আলোচনা করে বংশগতির প্রভাব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন। গ্যাল্টন-পরিবারের বংশপঞ্জী আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখেন যে এই পরিবারের সভ্যবৃন্দ পর পর পাঁচ পুরুষ ধরে ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটিতে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত এবং সকলেই খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

কার্ল পিয়ার্সনের গবেষণা

ডাগডেল (*Dugdall*) এবং ইস্টাব্রুক (*Istabruke*) নিম্নশ্রেণীর লোকের বংশপঞ্জী আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন যে,বংশগতির প্রভাব ব্যক্তির উপর খুবই ব্যাপক। তাঁরা ইয়ুকস নামক এক ব্যক্তির বংশ তালিকা প্রস্তুত করেন। ইয়ুকস একজন অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিল এবং নিম্নশ্রেণীর এক মহিলাকে বিবাহ করেছিল। তার পরিবারের পাঁচ পুরুষের বংশপঞ্জী আলোচন করে দেখা গেল যে ১৬৬৭ জনের মধ্যে ৩০০ জনের শৈশবেই মৃত্যু ঘটেছে, ৩১০জন দরিদ্রগৃহে দিন যাপন করেছে, ৪৪০ জনের ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটেছে, ৪০০ জন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে জীবন নষ্ট করেছে, ৭ জন হত্যাকারী, ৬০ জন জন্ম থেকেই চৌর্য-কার্যে রত এবং গড়ে বার বছর জেল খেটেছে, ১৩০ জন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী এবং মাত্র ২০ জন কোন বৃত্তি শিক্ষা করেছে।

ডাগডেল এবং ইস্টাব্রুকের গবেষণা

ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশে বংশগতি এবং পরিবেশ, কোনটির প্রভাব বেশী নির্ধারণ করার জন্য, যমজ সন্তান (twins) নিয়েও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। যমজ সন্তান দু ধরনের হতে পারে, সমকোষী (identical) এবং ভিন্নকোষী (fraternal)। পিতৃদেহ থেকে আগত জনন-কোষের সঙ্গে মাতৃদেহ থেকে আগত জননকোষের মিলনে যে ডিম্বকোষ গঠিত হয়, এবং তার থেকে যে দুই যমজ সন্তানের জন্ম হয় তাকে সমকোষী যমজ বলা হয়। পিতার দুটি ভিন্ন জননকোষ যদি মাতার দুটি ভিন্ন জননকোষের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে মিলিত হয় তাহলে যে দুটি যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাদের বলা হয় ভিন্নকোষী যমজ।

যমজ সন্তান নিয়ে গবেষণা

থর্নডাইক, মেরীম্যান, গেলেস, টমসন, নিউম্যান, ফ্রীম্যান, স্টিফেনস, হলজিনগার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাবের তুলনামূলক বিচার করবার জন্য যমজ সন্তান নিয়ে অনেক অনুসন্ধান কার্য চালান। গেসেল (*Gasell*) এবং টমসন (*Thompson*), দুটি সমকোষী যমজ ভগিনীকে শৈশব থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন। এই দুটি ভগিনীকে পৃথকভাবে শিক্ষা দান করে তাদের ব্যক্তিত্বকে ভিন্নভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা হলেও, উভয়ের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

নিউম্যান (*Newman*) সমকোষী দুটি যমজ ভ্রাতার সন্ধান পান যখন তাদের ২৬ বৎসর বয়স। দুটি ভ্রাতা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে লালিতপালিত হয়েছিল, কিন্তু তবু তাদের দেহের গঠন, আকৃতি, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি বিষয়ে কোনরূপ অনৈক্য ছিল না। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কার্যে উভয়ে সমান দক্ষতার

অধিকারী ছিল। স্টিফেনস (*Stephens*) ও টমসন (*Thompson*) দুটি যমজ ভ্রাতার সন্ধান পেয়েছিলেন যারা ভিন্ন শহরে ভিন্ন পরিবারে লালিতপালিত হয়েছিল, কিন্তু দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে মানুষের উপর পরিবেশের তুলনায় বংশধারার প্রভাবই বেশী। তবে উপরিউক্ত ক্ষেত্রে সবগুলিতেই পরিবেশের তেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। সাধারণতঃ দুটি যমজ সন্তান দুটি ভিন্ন পরিবারে মানুষ হলেই, তারা যে ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হল বলা চলে না। অনেক সময় এইরূপ দুটি পরিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু যখন প্রকৃত ভিন্ন পরিবেশে দুটি যমজ সন্তানকে লালন-পালন করা হয়, তখন শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা দিতে পারে। গ্লাডিস (*Gladys*) এবং হেলেন (*Helan*) নামে দুটি সমকোষী যমজ, ঘটনাচক্রে দু-টি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে লালিতপালিত হয়। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিচারে হেলেন গ্লাডিসের তুলনায় স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী ছিল। গ্লাডিসের মধ্যে সুলভ কমনীয়তা হেলেনের তুলনায় ছিল কম। হেলেন ছিল মার্জিতা, রুচিসম্পন্না, স্থিরচিত্তা; গ্লাডিস ছিল দুর্বলচিত্তা, অস্থিরপ্রকৃতির ও ক্ষীণকায়া। মানসিক শক্তির বিচারে হেলেন ছিল গ্লাডিসের চেয়ে উন্নত হেলেনের বুদ্ধ্যঙ্ক ছিল ১১৬, গ্লাডিসের বুদ্ধ্যঙ্ক হল ৯২। হেলেনের হাতের লেখা ছিল বেশ পরিচ্ছন্ন ও পরিণত বয়সের হাতের লেখা, গ্লাডিসের হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত কাঁচা। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। সুতরাং উপরিউক্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে বংশগতি পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে, যথার্থ পৃথক পরিবেশে সমকোষী যমজ সন্তানদের রেখে যদি লালনপালন করা যায় তাহলে উভয়ের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে।

## ৩। বংশধারা সম্পর্কীয় কয়েকটি নীতির আলোচনা। (Discussion of some Laws of Heredity) :

(ক) **জননকোষের ধারাবাহিকতা** (Continuity of Germ P'asm): জার্মান প্রাণীবিদ্ ভাইসম্যান (*Weisman*)-এর মতে জননকোষ বংশপরম্পরায় সংক্রমিত হয় (transmitted), তার কোন বিনাশ নাই।

পুং-জননকোষ ও স্ত্রী-জননকোষের মিলনে যে প্রস্ফুটিত ডিম্বকোষটি গঠিত হয় সেটি নিজ ধর্ম অনুসারে নিজেকে বিভক্ত করতে থাকে এবং সংখ্যাতীতভাবে বিভক্ত হওয়ার ফলেই ভ্রূণের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন কয়েকটি কোষ ভ্রূণদেহে অবিকৃত ও অব্যাহত থেকে যায়। এই কোষগুলিই নবজাত সন্তানের জননকোষরূপে ভবিষ্যৎ প্রজননের জন্য তার দেহে সুরক্ষিত থাকে। এই জননকোষগুলি দেহের বৃদ্ধিতে কোন অংশ গ্রহণ করে না এবং এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে ধারাবাহিকভাবে সংক্রমিত হতে থাকে। "কাজেই মাতাপিতাকে সন্তানের উৎপাদক অপেক্ষা জননকোষের তত্ত্বাবধায়ক বলাই সমীচিন"।[1] জনকের জননকোষ কেবল সন্তানের দেহকোষই সৃষ্টি করে তা নয়, জননকোষও সৃষ্টি করে। সুতরাং দেহ জননকোষ ধারণ করে মাত্র, দেহের পক্ষে জননকোষ সৃষ্টি করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং বংশপরম্পরায় জননকোষের ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকে।

**(খ) অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশপরম্পরায় অসংক্রমণ (Non-transmission of Acquired Traits) :** ভাইসম্যান-এর মতে ব্যক্তির অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় সংক্রমিত হয় না। ভাইসম্যান এ সম্পর্কে একাধিক অনুসন্ধান কার্য চালান। তিনি কয়েক পুরুষ ধরে ইঁদুরের লেজ কেটে দিয়ে দেখলেন যে, কোন পুরুষেই এমন ইঁদুরের জন্ম হল না যার লেজ নেই। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে মাতাপিতার অর্জিত বৈশিষ্ট্যে তাদের জননকোষের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সুতরাং মাতাপিতার অর্জিত বৈশিষ্ট্য সন্তানে সংক্রমিত হয় না। মাতাপিতা সঙ্গীতজ্ঞ হলে যে ছেলেমেয়েরা সঙ্গীতজ্ঞ হবেই, এমন কোন কথা নেই। ছেলেমেয়ে যে সঙ্গীতজ্ঞ হয় তার কারণ পরিবারের মধ্যে সঙ্গীতের পরিবেশ তাদের মনে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে।

## ৬। মেণ্ডেল-এর নীতি (Mendel's Law) :

অষ্ট্রীয়াবাসী ধর্মযাজক গ্রেগর মেণ্ডেল (*Gregor Mendel*) বংশধারা সম্পর্কে আলোচনা করে কতকগুলি মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মেণ্ডেল-এর নীতি বংশধারার ক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক প্রবণতার (Conservative

1. "Thus the parent is rather the trustee of the germ-plasm than the producer of the child."—Thomson and Geddes : Evolution, p. 116.

Tendency in heredity) উপর আলোকপাত করে। মেণ্ডেল প্রচারিত তত্ত্ব মেণ্ডেলবাদ (Mendelism) নামে পরিচিত।

মেণ্ডেল মটরশুটি নিয়ে তার গবেষণা শুরু করেন। তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল—দীর্ঘাকৃতির ও খর্বাকৃতির মটরশুটি মিশিয়ে, এই দো-আঁশলা বা সঙ্কর জাতীয় মটরশুঁটির বংশধারা কয়েক পুরুষ ধরে পর্যবেক্ষণ করা। তিনি দেখলেন যে দীর্ঘাকৃতি ও খর্বাকৃতির মটরশুঁটির সংমিশ্রণে যে মটরশুঁটি উৎপন্ন হল, তাদের সবগুলি দীর্ঘাকার হল। কিন্তু এরা শুদ্ধ (pure) নয়। দীর্ঘাকারত্ব প্রকট বা সক্রিয় (dominant) থাকায় খর্বাকারত্ব সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় (recessive) রয়েছে। এই দীর্ঘাকারবিশিষ্ট মটরশুঁটি থেকে যে মটরশুঁটি জন্মাল, তার শতকরা ২৪শ ভাগ শুদ্ধ (pure) দীর্ঘাকৃতির। শতকরা ৫ ভাগ মিশ্র (impure) দীর্ঘাকৃতির এবং শতকরা ২৫শ ভাগ শুদ্ধ খর্বাকৃতির। তৃতীয় বংশে দেখা গেল শুদ্ধ দীর্ঘাকারবিশিষ্ট মটরশুঁটি থেকে শুদ্ধ দীর্ঘাকার-বিশিষ্ট মটরশুঁটি উৎপন্ন হয়েছে, শুদ্ধ খর্বাকার মটরশুঁটি থেকে শুদ্ধ খর্বাকৃতির এবং মিশ্র দীর্ঘাকৃতির মটরশুঁটি থেকে, শতকরা ২৫ ভাগ শুদ্ধ দীর্ঘাকৃতির, শতকরা ২৫ ভাগ শুদ্ধ খর্বাকৃতির এবং শতকরা ৫০ ভাগ মিশ্র দীর্ঘাকৃতিবিশিষ্ট মটরশুঁটি উৎপন্ন হয়েছে। একটা ছকের সাহায্যে বিষয়টা বুঝে নেওয়া যাক—

দীর্ঘাকার মটরশুঁটি খর্বাকার মটরশুঁটি

দীর্ঘাকার
অশুদ্ধ )

| শতকরা ২৫ ভাগ দীর্ঘাকার (শুদ্ধ) | শতকরা ৫০ ভাগ দীর্ঘাকার (মিশ্র) | শতকরা ২৫ ভাগ খর্বাকার (শুদ্ধ) |
|---|---|---|
| দীর্ঘাকার (শুদ্ধ) | | খর্বাকার (শুদ্ধ) |
| শতকরা ২৫ ভাগ দীর্ঘাকার (শুদ্ধ) | শতকরা ৫০ ভাগ দীর্ঘাকার (মিশ্র) | শতকরা ২৫ ভাগ খর্বাকার (শুদ্ধ) |

পরবর্তীকালে মেণ্ডেলের গবেষণার ফলাফলগুলিকে উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রে বার বার প্রয়োগ করে, তাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য মেণ্ডেলের নীতির প্রয়োগক্ষেত্রের একটা সীমা আছে। এই নীতি সেই

জাতীয় উদ্ভিদ বা প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা এমন বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যে বৈশিষ্ট্যগুলি কখনও মিশে যেতে পারে না।

উপরিউক্ত গবেষণার ভিত্তিতে মেণ্ডেল সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রথম শঙ্কর জাতীয় জীব বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দু-টি বিপরীত বৈশিষ্ট্যের যে-কোন একটির মাত্র আবির্ভাব ঘটবে, উভয়ের মিশ্রণ ঘটবে না। এই অনুমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল বংশধারা এককের (heredity units) পরিকল্পনা। অর্থাৎ প্রাণী উত্তরাধিকারসূত্রে মাতাপিতার যে বৈশিষ্ট্য লাভ করে সেগুলির মূলে কোন বংশধারা এককের প্রভাব বর্তমান। এই বংশধারা একককে বর্তমানে জীন নামে অভিহিত করা হয়। এই জীনগুলি সব সময় জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে। যেমন, কটা চোখের বেড়াল এবং নীল চোখের বেড়ালের বাচ্চা কটা চোখের হবার কারণ মাতাপিতার কাছ থেকে পাওয়া কটা চোখের জীনটি। মেণ্ডেলের গবেষণার দ্বিতীয় আবদান হল সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় (dominant-recessive) জীনের পরিকল্পনা। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জীনটি সক্রিয় বা প্রকট (dominant) এবং নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত (recessive) হতে পারে। জীন সক্রিয় হলে নবজাত সন্তানের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে, নিষ্ক্রিয় হলে ঘটে না। যেমন, কটা চোখের বেড়াল এবং নীল চোখের বেড়াল। এদের সব বাচ্চাই হল কটা চোখের, কেননা, কটা চোখের জীন সক্রিয় এবং নীল চোখের জীন নিষ্ক্রিয়। তবে কটা চোখের যে বাচ্চা হল তার মধ্যে নীল চোখের জীনটি নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে যেটি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে দেখা দিতে পারে।

## ৭। পরিবেশের অর্থ (The Meaning of Environment) :

সাধারণতঃ পরিবেশ বলতে আমরা বুঝে থাকি ব্যক্তির চারপাশের গণ্ডীটুকু ; তার পরিপার্শ্বিক অবস্থা। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে 'পরিবেশ' কথাটিকে ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাবিজ্ঞানে 'পরিবেশ' বলতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত প্রভাব যেগুলি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশ নির্ধারণ করে, ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনয়ন করে। কাজেই এই সব প্রভাব ব্যক্তির চারপাশের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত না থেকে আরও বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত থাকতে পারে। মানুষকে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়। অনেক সময় মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে

**পরিবেশ বলতে বোঝায় সেই সব প্রভাব যা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশ নির্ধারণ করে**

সংগ্রাম করতে হয়। অনেক সময় মানুষকে তার শক্তি অনুযায়ী পরিবেশকে গঠন করে নিতে হয়।

সাধারণতঃ পরিবেশকে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক এই দু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে বোঝায় এই পৃথিবীর সমস্ত শক্তি যা মানুষকে প্রভাবিত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্যই বিভিন্ন ব্যক্তির দৈহিক গঠন, বর্ণ এবং জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জলবায়ুর পার্থক্যের জন্য কোন একটি বিশেষ স্থানের অধিবাসী হয় অলস কিংবা কর্মঠ হয়ে উঠতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশ যে কেবল মাত্র মানুষের আকার, বর্ণ ও স্বভাবের উপরই প্রভাব বিস্তার করে তা নয়, মানুষের চোখ, কান, ত্বক এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যকে প্রভাবিত করে।

**পরিবেশ—প্রাকৃতিক ও সামাজিক**

প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও রয়েছে মানুষের সামাজিক পরিবেশ। পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিক্রিয়া করার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী মানুষ। এই ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যই মানুষ নিম্নতর প্রাণির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। মানুষের কথা বলার, শোনার এবং পরিকল্পনার ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতার জন্য মানুষ নিজের জন্য একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সামাজিক পরিবেশ বলতে বোঝায় মানুষের অতীত ঐতিহ্য এবং বর্তমান মানব-সমাজ। অতীত ঐতিহ্য বলতে বোঝায় ভাষা, শিল্পকলা, ধর্ম, যেগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়ে এসেছে। মানব-সমাজ বলতে বোঝায় মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। পরিবার, বিদ্যালয়, গ্রাম, সহর, সব কিছুই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এসব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যেমন তার নিরাপত্তায় সহায়তা করে, তেমনি তার আচার-ব্যবহার এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশেও সহায়তা করে।

মানুষকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে হয় কখনও বা নিজের প্রয়োজনে পরিবেশকে বদলাতে হয়। বস্তুতঃ, মানুষের জীবন তার পরিবেশের সঙ্গে এক নিয়ত সংগ্রামের কাহিনী। ব্যক্তির বিকাশে পরিবেশের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই শিশুর বিকাশে পরিবেশের অবদান কতটুকু সে সম্পর্কে শিক্ষক যদি অবহিত না হন, তাহলে শিশুকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

## ৮। পরিবেশ না, বংশধারা, কোন্‌টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ? (Which is more important—Heredity or Environment ?) :

ব্যক্তির জীবন-গঠনে ও ব্যক্তিত্ব-বিকাশে, পরিবেশ না বংশধারা, কোন্‌টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ, এই নিয়ে শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

একদল শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে, ব্যক্তিরজীবন-গঠনে ও ব্যক্তিত্ব-বিকাশে বংশধারাই (heredity) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পরিবেশের অবদান একান্তই মূল্যহীন। শিশু যে বংশধারা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে শিশুর সেই বংশধারাই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের গতি নির্ধারণ করে, পরিবেশের এ ব্যাপারে করণীয় কিছু নেই। পরিবেশ ভাল বা মন্দ হওয়াতে কিছুই যায় আসে না। ব্যক্তির বংশধারার মধ্যে পরিবেশ কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। ব্যক্তির বিকাশে ব্যক্তির সহজাত বা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত স্বভাব বা প্রকৃতিই প্রধান উপাদান। বস্তুতঃ, বংশধারাবাদীরা (hereditarian) এই যুক্তি দেখান যে, একই পরিবেশে বিভিন্ন শিশুকে রেখে দেখা যায় যে, তাদের চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটেছে। তাঁদের মতে এর কারণ শিশুর বংশজ প্রলক্ষণগুলিই (hereditary traits) তার চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ নির্ধারণ করে, পরিবেশের এ ব্যাপারে কোন অবদান নেই। বংশধারাবাদীরা শিশুর মানসিক-বিকাশে শিক্ষার গুরুত্বকে তেমন স্বীকার করেন না। যখন শিশুরা শিক্ষকের প্রত্যাশা পরিতৃপ্ত করতে ব্যর্থ হয়, যখন সুঅভ্যাস গঠনে তারা অপারগ হয়, তখন শিক্ষকরাই মন্তব্য করেন যে, তাদের চরিত্র, শিক্ষা এবং আচরণ বংশধারার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং শিক্ষার দ্বারা কোন পরিবর্তন সংগঠন করা সম্ভব নয়। অনেক শিক্ষক এরূপও অভিযোগ করেন যে, এই জাতীয় শিশু ক্লাসের শিক্ষার মানকে নিম্নগামী করে দেয়। যার মধ্যে যে সম্ভাবনা নেই তার মধ্যে তা সৃষ্টি করা যায় না। বংশধারা যদি অপরিবর্তনীয় হয় এবং শিশুর চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে বংশধারাই যদি একমাত্র উপাদান হয় তাহলে খুবই স্বাভাবিক যে, শিক্ষার প্রভাবকে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব দেবেন না, তাঁদের মতে শিশু জন্মগতসূত্রে যে স্বভাবের অধিকারী হচ্ছে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই শিশুর ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্ধারিত হওয়া দরকার; কারণ, শিশু পিতামাতার কাছ থেকে জন্মগতসূত্রে যে শারীরিক ও

বংশধারাবাদীদের যুক্তি

মানসিক দক্ষতা বা সামর্থ্য নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে সেগুলিই শিশুর শিক্ষার সীমা নির্ধারণ করে। তাছাড়া, একই পরিবেশের সুযোগ-সুবিধা বহু শিশুকে দেয়া হলেও মাত্র কয়েকটি শিশুই ভবিষ্যৎ জীবনে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করতে পারে। এর কারণ শিশুর জন্মগত প্রকৃতি এবং প্রতিভা। সুতরাং পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, জন্মগত বৈশিষ্ট্য বা বংশজ প্রলক্ষণই শিশুর চরিত্র, আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করে।

ফ্রান্সিস গ্যাল্টন (*Francis Galton*), রুশো (*Rousseau*), কার্ল পিয়ার্সন (***Karl Pearson***) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বংশধারাবাদী। এঁরা এদের অভিমতের সমর্থনে দুটি যুক্তির ধারা উপস্থাপিত করেছেন। প্রথমতঃ, তাঁদের মতে শিশুর শারীরিক গুণের সঙ্গে তার নৈতিক গুণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। যেসব শিশুরা স্বাস্থ্যবান তাদের নৈতিক চরিত্র সৎ ও প্রসংশনীয়। শারীরিক গুণ যেহেতু বংশগতসূত্রে প্রাপ্ত, নৈতিক গুণগুলিও বংশগতসূত্রে প্রাপ্ত।

ফ্রান্সিস গ্যাল্টন, রুশো, কার্ল পিয়ার্সন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বংশধারাবাদী

দ্বিতীয়তঃ; ফ্রান্সিস গ্যাল্টন এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা যেসব গবেষণা-কার্য চালিয়েছেন তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যে উল্লেখযোগ্য মানসিক দক্ষতা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যায়, শিক্ষার দ্বারা লব্ধ নয়।

আর একদল শিক্ষাবিদ্ যাদের পরিবেশবাদী (Environmentalist) রূপে অভিহিত করা যায়, তাঁরা শিশুর জীবন-গঠনে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরিবেশের প্রভাবের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, বংশধারার প্রভাব তাঁদের কাছে মূল্যহীন। তাঁদের মতে শিশু বিচিত্র সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং মানুষের সামর্থ্যের গণ্ডীর মধ্যে তার যে-কোন বিকাশ সম্ভব। একটি মানুষ যা করেছে অনুকূল পরিবেশে অপর মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব। শিশুর মন একতাল নরম কাদার পিণ্ডের মতো। পরিবেশ তাকে খুশীমত যে কোন আকার দিতে পারে। মানুষের পরিবেশ তাকে যেমন গড়ে তোলে, মানুষ তেমনিই গড়ে ওঠে। খ্যাতনামা আচরণবাদী ওয়াটসন (*Watson*) একজন চরম পরিবেশবাদী। তিনি বলেন, "আমাকে যদি একটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশু দেওয়া হয়, আমি তাকে ইনজিনিয়ার, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ যে কোন কিছুতে গড়ে তুলতে পারি।" শিশুর মানসিক বিকাশে তার পূর্বপুরুষদের প্রতিভা, সামর্থ্য, বৃত্তি, জাতির প্রভাব তিনি স্বীকার করতে চান না।

পরিবেশবাদীদের যুক্তি

বংশধারাবাদীরা শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে শিক্ষার কোন মূল্য দেন না। পরিবেশবাদীরা শিক্ষার উপরই সকল গুরুত্ব আরোপ করেন। বংশধারার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না। বস্তুতঃ, ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক গঠনের মূলে শিক্ষার অবদানই সবটুকু। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে মানুষ, একদিন বন্য পশুর সামিল ছিল। সেই মানুষ, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কৃষ্টি, কলা, সংস্কৃতি, দর্শন, ধর্মের এক নতুন ইমারত গড়ে তুলেছে। বংশধারাই যদি বড় হত, তাহলে মানুষ সেই প্রাচীন অসভ্য বন্য পশুর পর্যায়েই থেকে যেত। এছাড়াও, অনেক শিশু, যাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়েছে উপযুক্ত পরিবেশে, উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে থাকার জন্য তারাও জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। কাজেই পরিবেশই মানুষকে গড়ে তোলে নয়ত তার ক্ষতি সাধন করে, বংশধারা নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার।

প্রশ্ন হল, বংশধারাবাদী এবং পরিবেশবাদী উভয়ের অভিমতের মধ্যে, কোন্ অভিমত সন্তোষজনক? আমাদের মতে উভয় অভিমতই চরম অভিমত। উভয়েই মনে করে যে বংশধারা এবং পরিবেশ, দুই পরস্পরবিরোধী। কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক গঠনে বংশধারা এবং পরিবেশ, উভয়ের অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। বংশধারা ও পরিবেশ উভয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে।

**ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশে পরিবেশ ও বংশধারা, উভয়ের প্রভাবই সমান গুরুত্বপূর্ণ**

পরিবেশের সঙ্গে বংশধারার যথাযথ সম্পর্ক আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারব যদি আমরা একটি উদ্ভিদের বৃদ্ধির ব্যাপারে বীজ এবং জমি কার কতটুকু অবদান বুঝে নেবার চেষ্টা করি। বীজের মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি লাভ করার শক্তি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজমান। কিন্তু ভাল বা মন্দ কি ভাবে বীজ বেড়ে উঠবে নির্ভর করছে কিরকম মাটিতে সেই বীজ পোতা হচ্ছে। একটি উদ্ভিদ তখনই ভাল ভাবে বেড়ে উঠতে পারে যদি বীজটি ভাল হয় এবং জমিটিও ভাল হয়। বীজ এবং উপযুক্ত জমি এ দুটির কোন একটি ছাড়া কোন উদ্ভিদই ভালমত বেড়ে উঠতে পারে না। বীজ এবং জমি পরস্পর নিরপেক্ষভাবে ক্রিয়া করে না। বীজ এবং জমি পরস্পরনির্ভর। উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার উপরই উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভর। অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার

সংগঠনে বংশধারা এবং পরিবেশ উভয়ই সমান প্রয়োজনীয়। সঙ্গীতের প্রতিভা নিয়ে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে, অনুকূল পরিবেশেই তার সঙ্গীত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে পারে। কাজেই শিক্ষাবিদ্ এবং সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে বংশধারা বা পরিবেশ কোন্‌টি বড় এ সমস্যা নয়। মানুষ বংশধারা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু একটি পরিবেশেই তার জন্ম হয়। এ অর্থে পরিবেশ তার দ্বিতীয় বংশধারা। বংশধারা স্থির, ব্যক্তির সম্ভাবনাকে বংশধারা সীমিত করে দেয়, কিন্তু পরিবেশ পরিবর্তনশীল। অপরিবর্তনীয় বংশধারা গতিশীল পরিবেশের মধ্যে কিভাবে সার্থকরূপ লাভ করতে পারে, এটাই মূল সমস্যা।

## ৯। শিক্ষার্থীর উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব ঃ শিক্ষকের কর্তব্য (Influence of heredity and environment on child : Duties of a teacher) ঃ

শিশুর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে যখন বংশধারা এবং পরিবেশ উভয়ের প্রভাবই ক্রিয়া করে, তখন শিক্ষককে উভয় ব্যাপারেই সমান নজর দিতে হবে। শিক্ষককে যেমন লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিশু তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিকশিত করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সহায়তা লাভ করে তেমনি শিক্ষকের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীর জন্মগত সূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকৃতি জানার চেষ্টা করা এবং তাদের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। ঘরে বাইরে শিশু নানা ধরনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। পিতামাতার এবং শিক্ষকের কর্তব্য হবে লক্ষ্য করা, কোন্ ধরনের কাজে শিশুর অনুরাগ বেশী, যাতে প্রয়োজন হলে শিশুর সহজাত আগ্রহ ও অনুরাগের স্ফুরণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিশু জন্মসূত্রে যে সামর্থ্য, প্রবণতা এবং অনুরাগের অধিকারী হয়, উপযুক্ত পরিবেশে, শিক্ষার মাধ্যমেই তার যথাযথ বিকাশ সম্ভব করে তোলা যেতে পারে। উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামাতার কাছ থেকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লাভ করাই শিশুর ক্ষেত্রে বড় কথা নয়। জগতে সামর্থ্যের থেকেও বেশী মূল্যবান ব্যক্তির কৃতিত্ব ও সফলতা। কাজেই প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সেই সামর্থ্যের বিকাশ। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শারীরিক ও বুদ্ধিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ঠিকমত কাজে লাগাতে শেখানই শিক্ষকের কর্তব্য।

উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিকশিত করার পূর্ণ সুযোগের ব্যবস্থা করা শিক্ষকের কর্তব্য

কখনও কখনও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যাশিত উন্নতির অভাব দেখে শিক্ষক হতাশ হয়ে পড়েন এবং মনে করেন যে, বংশধারা শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এমন সীমারেখা আরোপ করেছে যা শিক্ষার্থীর পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। একথা সত্য যে বংশধারা শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যে সীমা আরোপ করে তা অতিক্রম করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে শিক্ষকের কর্তব্য হবে সেই সীমারেখার মধ্যে শিক্ষার্থীর বংশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করা। শিক্ষকের কর্তব্য হবে বংশধারার প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করে শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করা। আবার শিক্ষক যদি বংশধারার প্রভাবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শিক্ষা ও অনুশীলনেব উপর অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করেন তাহলে তিনি হবেন অতিরিক্ত আশাবাদী এবং সেক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে গিয়ে সময় ও অর্থের অযথা অপচয় ঘটবে। উত্তরাধিকারসূত্রে শিক্ষার্থী যে ক্ষমতা, অনুরাগ ও প্রতিভার অধিকারী নয়, শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যে প্রতিভা শিক্ষার্থীর মধ্যে রয়েছে শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সেই প্রতিভার স্ফুরণে যত্নবান হতে পারেন। জন্মসূত্রে পাওয়া ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশের পথে যদি কোন বাধা দেখা দেয়, শিক্ষকের কর্তব্য হবে সেই বাধা দূর করা, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনের পথে প্রতিরোধক প্রভাবগুলিকে অপসারিত করা। সেই কারণে শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীর জন্মসূত্রে পাওয়া সামর্থ্য, অনুরাগ, ইচ্ছা প্রভৃতি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে তার পরিবেশে সেগুলির বিকাশের যথাযথ সুযোগ করে দেওয়া।

**বংশধারা শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যে সীমারেখা আরোপ করে সেই সীমারেখার মধ্যে বংশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করতে হবে**

কাজেই শিক্ষককে শিশুর শিক্ষায় বংশধারার প্রভাবের দিকে বিশেষ করে মনোযোগী হতে হবে। শিশুর বিকাশের সীমারেখা বংশধারাই নির্ধারণ করে দেয়। এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগে কার্যসিদ্ধি ঘটে না। যতটুকু সম্ভাবনা ততটুকুকেই বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া যায় মাত্র। শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে তার শারীরিক আকার, আকৃতি ও গঠনের প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেক সময় হীনমন্যতাবোধ দেখা দেয়, যা তার ব্যক্তিসত্তার সংগঠন ও বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে, তার আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। এই জাতীয় শিক্ষার্থীর মন থেকে হীনমন্যতাবোধ যতদূর সম্ভব দূর করার জন্য শিক্ষকের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। শিশুর বুদ্ধির উপর শিশুর শিক্ষার বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কাজেই শিক্ষকের

কর্তব্য হবে শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ করা, তার বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করা। শিক্ষক হয়ত তার বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন না। কারণ বুদ্ধ্যঙ্ক পরিবর্তনশীল নয়। তবে অনেক মনোবিজ্ঞানী এই অভিমত স্বীকার করতে নারাজ হলেও বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্তনশীলতার বিষয়টি বিতর্কমূলক। শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ জানা থাকলে শিক্ষকের অনেক উদ্বেগ ও অশান্তি দূর হবে। শিশুর মানসপ্রকৃতি নির্ভর করে তার বংশধারার উপরে এবং এই মানসপ্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষা বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত, কাজেই শিক্ষকের কর্তব্য এই মানসপ্রকৃতির স্বরূপকে জানা।

বংশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করার জন্য শিক্ষকের কতকগুলি কর্তব্য আছে। কোন একটি শ্রেণীর সমান বয়সের ছাত্রদের চেহারা, দৈর্ঘ্য, ওজন, স্বভাব ইত্যাদি বিচার করে দেখলে তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের (individual difference) একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, যাকে অবহেলা করলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। প্রতিটি ছাত্রকে পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু ছাত্রদের বুদ্ধি, সামর্থ্য, রুচি, প্রবণতা, চাহিদার কথা চিন্তা না করে সবাইকে এক দলভুক্ত করে শিক্ষা দেওয়াও কোন যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি নয়। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপের জন্য নির্ভরযোগ্য অভীক্ষার ব্যবস্থা করা, যোগ্যতা নিরূপিত হবার পর তার যোগ্যতানুসারে তাকে সুযোগ দেওয়া, শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও আগ্রহ অনুযায়ী তার পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ করা, অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাধারণ ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষা না দিয়ে পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়া, বুদ্ধি ছাড়াও মানসিক প্রকৃতিগত ও আবেগগত পার্থক্যের কথা স্মরণ রেখে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া, বুদ্ধিগত যোগ্যতা ছাড়াও কোন বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার্থীর দক্ষতাকে শিক্ষা ব্যবস্থায় মর্যাদা দেওয়া, পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর ছেলেদের প্রতিভাবান শিশুদের থেকে পৃথক করে শিক্ষা দেওয়া, এগুলি করলেই শিক্ষার্থীর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত যোগ্যতা ও সম্ভাবনার যথাযথ প্রকাশে সহায়তা করা হবে। অসমঞ্জস ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিশু সমাজের পক্ষে এক বিরাট সমস্যাস্বরূপ, অসমঞ্জস (maladjusted) শিশুদের মানসিক চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। শিশুর মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। বর্তমানে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Mental Hygiene) অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের জন্য বিশেভাবে সচেষ্ট।

পরিবেশের ব্যাপারেও শিক্ষকের করণীয় অনেক কিছু আছে। বিদ্যালয়ে সুন্দর ও স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ গড়ে তোলা, শিক্ষকের উপযুক্ত খেলাধূলার ব্যবস্থা করা শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য। শিক্ষার্থীর জন্মগত বৈশিষ্ট্য একমাত্র উপযুক্ত পরিবেশের সাহায্যে বিকশিত হতে পারে। শিক্ষকের এ সত্য বিস্মৃত হলে চলবে না।

শিশুর বুদ্ধির প্রভাব শিশুর শিক্ষায় উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, পরিবেশের প্রভাবে শিশুর বুদ্ধির উন্নতি সাধিত হয় না। সাম্প্রতিককালে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী যদিও এর বিপরীত অভিমত পোষণ করেন, সে অভিমত এখনও পুরোপুরি সমর্থন লাভ করে নি।

## Questions

1. What do you mean by heredity and environment ? Discuss their relative influence on the development of a child ? [B. A. 1961.
   Ans. ( পৃ: ১১৬, ১২৭, ১৩১—৩৫ )
2. What is the place of heredity and environment in education ?
   Ans. ( পৃ: ১৩২—৩৫ )
3. How far can education make good the defect of inheritance ?
   Ans. ( পৃ: ১৩২—৩৫ )
4. Define heredity and environment ? What is their relative importance in the development of an individual ? [B. A. 1961
   Ans. ( ১১৬, ১২৭, ১৩১—৩৫ )
5. Discuss some major laws of heredity.
   Ans. ( পৃ: ১২৪—২৭ )
6. Why is it necessary for the teacher to understand the heredity of the child ?
   Ans. ( পৃ: ১৩২—৩৫ )
7. Write a short essay on heredity, environment and education.
   Ans, ( পৃ: ১১৬, ১২৭, ১৩১—৩৫ )
8. What part is played by heredity in the education of a child ?
   Ans. ( পৃ: ১২১—২৪ এবং ১৩২—৩৫ ) [B. T. 1964

## পঞ্চম অধ্যায়

# স্মরণ ও বিস্মরণ

# ( Remembering and Forgetting )

### ১। স্মৃতি-প্রতিরূপ ও কল্পনা প্রতিরূপ ( Memory Image and the Image of Imagination) :*

কোন একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর যখন স্মরণক্রিয়ার সাহায্যে তারই একটি প্রতিচ্ছবি আমাদের মানস-চোখের সামনে তুলে ধরি তখন তাকে বলা হয় স্মৃতি-প্রতিরূপ (Memory Image)। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, নতুনভাবে তাকে সাজিয়ে যখন একটি নতুন মানসিক চিত্র আমাদের মনের সামনে তুলে ধরি তখন তাকে বলা হয় কল্পনা-প্রতিরূপ (Image of Imagination)। দশ বছর আগে যে বাড়িতে আমি ছিলুম, তার একটা প্রতিচ্ছবি যখন চোখের সামনে তুলে ধরি, তখন তাহল স্মৃতি-প্রতিরূপ। পাখির ডানাকে ঘোড়ার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে যখন পক্ষীরাজ ঘোড়ার একটি মানসিক চিত্র মনের সামনে তুলে ধরি তখন তাহল কল্পনা-প্রতিরূপ।

স্মৃতি-প্রতিরূপের প্রকৃতি

**উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য :** (ক) স্মৃতি প্রতিরূপ ও কল্পনা-প্রতিরূপ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রতিরূপগুলি অতীতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত। (খ) উভয় ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ছাড়াই প্রতিরূপগুলিকে মনের মধ্যে তুলে ধরা যায়। (গ) স্মৃতি-প্রতিরূপ ও কল্পনা-প্রতিরূপ, উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের চিন্তা একই পদ্ধতিতে কাজ করে। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা বিষয়বস্তুকে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করি। কিন্তু কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে।

**উভয়ের মধ্যে পার্থক্য :** (ক) স্মৃতি-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষিত বস্তুর ছবিই মনে ভেসে ওঠে। কল্পনা-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে যে প্রতিচ্ছবি মনের সামনে তুলে ধরি তা অনেকটা আমাদের সৃষ্টি। বন্ধুর কথা ভাবতে গিয়ে যে প্রতিচ্ছবি মনে জাগল, তা আমার সৃষ্ট নয়। রাক্ষস বা দৈত্যের যে ছবি আমার চোখের সামনে তুলে ধরি, তা আমার দ্বারা এক হিসেবে সৃষ্ট।

(খ) স্মৃতি-প্রতিরূপ অতীতের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপ, অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যে কোন কালের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। আমরা অতীতের স্মৃতির কথাই বলে থাকি, বর্তমান বা ভবিষ্যতের স্মৃতির কথা বলি না, বলি বর্তমানের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। কিন্তু আমরা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের যে কোন বিষয় নিয়ে কল্পনায় প্রতিরূপ গঠন করতে পারি।

(গ) স্মৃতি-প্রতিরূপ-গঠনে ব্যক্তির কোন স্বাধীনতা নেই, কল্পনা-প্রতিরূপ-গঠনে ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে। ব্যক্তি খুশিমত অতীত অভিজ্ঞতার বিভিন্ন প্রতিরূপগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পারে।

(ঘ) স্মৃতি-প্রতিরূপে ঘটনার পারম্পর্য পরিবর্তিত হয় না, কল্পনা-প্রতিরূপে ঘটনার পারম্পর্যের কোন প্রশ্ন নেই। স্মৃতির ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বা অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেক করা হয়, কোন রকম পরিবর্তন করা হয় না। কল্পনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা রূপান্তর লাভ করে।

(ঙ) স্মৃতি-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিরূপগুলি চিনে নিতে পারি, একেই বলা হয় প্রত্যভিজ্ঞা বা পুনঃপরিজ্ঞান (Recognition)। কল্পনা-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে পুনঃপরিজ্ঞানের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

(চ) স্মৃতি-প্রতিরূপের মধ্যে একটা অহং-চেতনা থাকে। আগ্রার তাজমহলের একটি প্রতিরূপ যখন স্মৃতিতে পুনরুজ্জীবিত হয়, তখন আমার এই বোধ থাকে যে, এই স্মৃতির সঙ্গে আমার অতীত অভিজ্ঞতা যুক্ত। কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপের বেলায় অহং-এর চেতনা যে থাকবেই, এমন কোন কথা নেই।

(ছ) পরীক্ষণের সাহায্যে জানা গেছে যে স্মৃতি-প্রতিরূপ পরিবর্তনশীল, কিন্তু কল্পনার প্রতিরূপ হল স্থির।[1]

**কোন কোন সময় স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের সংমিশ্রণ ঘটে**

স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের মধ্যে পূর্বোক্ত পার্থক্য থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রে এই উভয় প্রকার প্রতিরূপ পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। গল্প ও উপন্যাস পড়তে গিয়ে এই উভয় প্রকার প্রতিরূপের সংমিশ্রণ আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করে থাকি।

1. "Popular Psychology regards the memory image as a stable copy of past perception and the image of imagination as subject to Keleidoscopic change. In fact, it is the memory image that varies and the image of imagination that is stable."

—Titchener: A Text Book of Psychology, Page 417.

## ২। স্মৃতি ও স্মরণক্রিয়া কাকে বলে? (What is Memory ?) :

অতীত অভিজ্ঞতার যথাসম্ভব অবিকল পুনরুদ্রেক করার ক্ষমতাকে স্মৃতি (Memory) এবং এই প্রক্রিয়াকে স্মরণক্রিয়া (Recalling) বলা হয়। যেমন, কবিতা মুখস্থ করা। যেমন শোনা হয়েছিল তেমনভাবে মনে রাখা হল স্মৃতি এবং পরে সেটি আবৃত্তি করা হল স্মরণক্রিয়া।

স্মরণ ক্রিয়াকে সাধারণতঃ দু অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথম অর্থে স্মরণক্রিয়া হল সংরক্ষণ বা ধারণ করা (Retention) এবং দ্বিতীয় অর্থে স্মরণক্রিয়া হল পুনরুদ্রেক (Recall)। একটি ছাত্র তার পাঠ্য বিষয়টি বার বার পাঠ করে তাকে মনে ধরে রাখে এবং শিক্ষক যখন ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করেন তখন তার উত্তর দেবার জন্য বিষয়টির পুনরুদ্রেক করে। প্রশ্ন হল, স্মরণক্রিয়াকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করা হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, স্মরণক্রিয়াকে পুনরুদ্রেক করা অর্থে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য পুনরুদ্রেক করতে গেলেই পূর্ব অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করে রাখতেই হবে। মনোবিদ্ স্টাউট (*Stout*) এই অভিমতের সমর্থন করে বলেছেন, "সময় সময় 'স্মৃতি' শব্দটিকে সাধারণভাবে 'ধৃতি' কথাটির সঙ্গে সমার্থক মনে করে ব্যবহার করা হয়। শব্দটির এই জাতীয় প্রয়োগ ব্যাপক ও অসুবিধাজনক। যথাযথ পুনরুদ্রেক অর্থেই এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা ভাল………।[1]

**স্মরণক্রিয়াকে দু-অর্থে ব্যবহার**

সুতরাং স্মরণক্রিয়া হল, মনে সংরক্ষিত এমন একটি পূর্ব অভিজ্ঞতাকে পুনরুদ্রেক করা। অতীতে অভিজ্ঞতা যেভাবে হয়েছে তাকে ঠিক সেভাবেই পুনরুদ্রেক করতে হবে। যদি সেই অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায় বা তার যদি কোনরূপ রূপান্তর ঘটে তাহলে তা স্মরণ ক্রিয়া না হয়ে হবে কল্পনা। স্মৃতি হল পুনরুদ্রেকমূলক কল্পনা, কারণ এই প্রকার কল্পনায় অতীতের প্রতিরূপগুলির অবিকলভাবে পুনরুদ্রেক করা হয়। গঠনমূলক কল্পনায় প্রতিরূপগুলিকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয় এবং একটি নতুন মানসিক চিত্র অঙ্কিত করা হয়।

1. "Sometimes the word 'memory' is used as synonymous with retentiveness in general. This application of the term is inconsistently wide. It is better to confine it to ideal revival........."

—Stout : Manual of Psychology, Page 521.

## ৩। স্মৃতির বিভিন্ন উপাদান (Factors of Memory) :

*স্মরণরূপ প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লক্ষ্য করি। যথা—*

**(ক) শিক্ষণ** (Learning) : কোন বিষয় যদি পূর্বে আমরা না শুনে থাকি, বা দেখে থাকি বা শিক্ষা করে থাকি, তাহলে তাকে প্রতিরূপের সাহায্যে স্মরণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোন কিছু স্মরণ করতে হলে তাকে মনের খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। এর জন্য আমরা কোন একটি পাঠ বার বার শিক্ষা করি। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে সংবেদন, প্রত্যক্ষ, অনুভূতি প্রভৃতি ছাড়া শিক্ষণ সম্ভব নয়, সেহেতু শিক্ষণকে স্মৃতির উপাদানরূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়।

**(খ) সংরক্ষণ** বা **ধারণ** (Retention) : যখন আমরা মন দিয়ে কোন বিষয় বার বার শেখার চেষ্টা করি, তখন বিষয়টি আমাদের মনে ধৃত বা সংরক্ষিত হয়, অর্থাৎ আমরা বিষয়টিকে মনে ধারণ করি। বিষয়টি আমাদের চেতন মনের স্তর থেকে অবচেতন মনের স্তরে চলে আসে। অতীত অভিজ্ঞতাগুলি মানসিক নিদর্শনরূপে বা প্রতিরূপের আকারে অবচেতন মনে রক্ষিত হয়। এই সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনরুদ্রিক্ত হয় বলেই স্মৃতি সম্ভব হয়।

মন যে বিষয়বস্তুকে ধারণ করতে পারে অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেকের দ্বারাই সে কথা প্রমাণ করা যেতে পারে। মনে যা সংরক্ষিত নেই তাকে পুনরুদ্রেক করা সম্ভব নয়।

**(গ) পুনরুদ্রেক** বা **পুনরুৎপাদন** (Recall or Reproduction) : মনে সংরক্ষিত প্রতিরূপগুলিকে ব্যক্ত করার মানসিক ক্রিয়াকেই পুনরুদ্রেক বা পুনরুৎপাদন বলে। পূর্ব অভিজ্ঞতাকে মনে জাগিয়ে তোলা বা মনে করাই হল পুনরুদ্রেক। অতীত বা পূর্ব অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে পুনরুদ্রেক করতে হবে। যথাযথভাবে পুনরুদ্রেক করার অর্থ ঘটনার বিন্যাসটিকে অপরিবর্তিত রাখা—ঘটনার পারম্পর্য বজায় রেখে ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছে তার প্রতিরূপগুলিকে সেভাবে পুনরুদ্রেক করা। অনুষঙ্গের (Association) জন্যই অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব হয়।

**(ঘ) প্রত্যভিজ্ঞা** বা **পুনঃপরিজ্ঞান** (Recognition) : অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলির পুনরুৎপাদনেই স্মরণক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। যে অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলিকে পুনরুদ্রেক করা হল তাকে আমারই পূর্ব

অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বলে চিনে নিতে হবে। একেই বলা হচ্ছে প্রত্যভিজ্ঞা বা পুনঃপরিজ্ঞান অর্থাৎ আমি পুনরায় পরিজ্ঞাত হলাম যে, এই অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ, যার পুনরুদ্রেক করা হয়েছে, তার সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপের প্রভেদ নেই। আমি হঠাৎ পথের মাঝে একটি ছেলের দেখা পেলাম এবং আমার স্মরণ হল যে কয়েক বছর আগে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছেলেটি আমার পাশে বসে ভোজ খেয়েছিল। এই যে ছেলেটিকে দেখে চিনতে পারলুম একেই বলে হয় প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞা হল একটা পরিচিতির বোধ বা চেতনা যার অভাব ঘটলে স্মরণক্রিয়া সুনির্দিষ্ট হয় না।

(ঙ) **স্থান-কাল নির্দেশ** (Lccalisation): নির্ভুল স্মরণক্রিয়া তখনই হয়, যখন ঘটনাটির স্থান-কাল নির্দেশ করা যায় অর্থাৎ স্থান-কাল জ্ঞানেরও পুনরুদ্রেক হয়। ঘটনাটি কোন্ সময়ে এবং কোথায় ঘটেছিল তা নির্ণয় করতে না পারলে স্মরণক্রিয়ার (Memorisation) সঙ্গে প্রত্যাশার (Expectation) প্রভেদ করা যায় না। বস্তুর পুনরুদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে যদি স্থান-কাল নির্দেশিত না হয় তাহলে বস্তুর পরিচিতিবোধ ঘটে না, এবং এই পরিচিতিবোধই প্রত্যভিজ্ঞার মূল কথা।

(চ) **ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা** (Personal Identity): স্মরণক্রিয়া আমাদের ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাকে আশ্রয় করে সম্ভব হয়। বন্ধু পরিতোষের সঙ্গে দশ বছর আগে এক স্কুলে পড়েছিলাম, দশ বছর পরে আজ তার সঙ্গে আবার দেখা হল। আজকের আমি আর সেদিনের আমি যে এক, উভয়েই যে একব্যক্তি, পৃথক ব্যক্তি নয়—এই বোধ না থাকলে স্মরণক্রিয়া সম্ভব নয়। অবশ্য ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা হল মনের অভিন্নতা, দেহের নয়।

স্মৃতি উপরিউক্ত উপাদানগুলির সমষ্টি নয়

স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া বলতে যদি আমরা বুঝি পূর্বোক্ত উপাদানের সমষ্টি তাহলে ভুল হবে। স্মৃতি হল পূর্বোক্ত উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া। স্মৃতি যদিও অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেক তবু স্মৃতি-প্রতিরূপের মধ্যে কিছুটা নিজস্ব নতুনত্ব থাকে।

## ৪। সংরক্ষণ বা ধারণ (Problem of Retention):

অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ সম্পর্কীয় মতবাদ

সংরক্ষণ স্মৃতির অন্যতম উপাদান। পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ যদি মনের মধ্যে সংরক্ষিত না হয় তাহলে অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল, অতীত অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে কিভাবে সংরক্ষিত হয়?

এ সম্পর্কে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে ; যথা—(১) **শারীরবৃত্তীয় মতবাদ** (Physiological Theory), (২) **মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ** (Psychological Theory)।

(ক) **শারীরবৃত্তীয় মতবাদ** (Physiological Theory of Permanent Cerebral Modification): মিল (*Mill*), কারপেণ্টার (*Carpenter*), জেমস (*James*) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ এই মতবাদের প্রবর্তক। মিল ও কারপেণ্টার মনে করেন, যে, যখন আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি উদ্দীপিত হওয়ার ফলে কম্পিত হতে থাকে। প্রত্যক্ষণ শেষ হয়ে গেলেও এই কম্পন ক্ষীণভাবে চলতে থাকে। যদি কোন ভাবে এই কম্পনকে আরও দ্রুত ও তীব্রতর করে তোলা যায়, তাহলে অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি সম্ভব হয়।

**মিল্ এবং কারপেণ্টার-এর অভিমত**

জেম্‌স (*James*)-এর মতে মন এবং চেতনা সমার্থক শব্দ, যেহেতু মন, এবং চেতনা সমব্যাপক। অচেতন মনের কোন অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কাজেই যা চেতনার বাইরে, তা মনেরও বাইরে, সুতরাং তাকে মানসিক বলা যেতে পারে না। অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ দৈহিক প্রক্রিয়া। প্রত্যক্ষণ কার্য সমাপ্ত হলে মস্তিষ্কে কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের পথেই অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব হয়।

**জেম্‌স-এর অভিমত**

**সমালোচনা :**

অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও স্মরণক্রিয়ার ব্যাপারে মস্তিষ্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, কিন্তু সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে দৈহিক প্রক্রিয়া—এ বলা যুক্তিযুক্ত নয়। এ মতবাদ নিম্নলিখিত কারণে গ্রহণযোগ্য নয় :

(১) স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া হল একটা মানসিক প্রক্রিয়া ; সুতরাং দৈহিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা কখনও সন্তোষজনক হতে পারে না। মনের সাহায্যেই মানসিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত।

(২) মিল এবং কারপেণ্টার যে স্নায়ু-কম্পনের কথা বলেছেন, তার দ্বারা স্মৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কোন কম্পন ধীর, কোন কম্পন দ্রুত, কখনও কম্পন ক্ষীণ, কখনও তীব্র, কিন্তু কম্পনের যদি কেবলমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য থাকে, কোন গুণগত পার্থক্য না থাকে তাহলে কম্পনগুলির পারস্পরিক পার্থক্য নির্ধারণ সম্ভব নয়।

(৩) জেম্‌স-এর মতে মস্তিষ্কে স্মৃতিরেখা অঙ্কিত হয় এবং এই স্মৃতিরেখা-গুলির প্রভাবেই পুরাতন অভিজ্ঞতার স্মৃতি সম্ভব হয়। কিন্তু মস্তিষ্কে-স্মৃতিরেখা অঙ্কিত হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষণের দ্বারা সমর্থিত নয়।

(৪) মস্তিষ্ককেই যদি অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ কেন্দ্র বলে মনে করা যায়, তাহলে মানুষের জীবনে যে অসংখ্য অভিজ্ঞতা ঘটে, মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র পরিসরে এত অভিজ্ঞতা কিভাবে সংরক্ষিত হতে পারে?

(৫) এই মতবাদ অনুযায়ী মস্তিষ্কের মধ্যে পরিবর্তনই স্মৃতিকে সম্ভব করে তোলে, কাজেই স্মরণ প্রক্রিয়াটি দৈহিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়। এই মতবাদ জড়বাদের সমর্থক, সেহেতু জড়বাদের সব দোষ এই মতবাদেও বিদ্যমান।

(৬) জেমস-এর মতে অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে সংরক্ষিত হয় না, মনের বাইরে থেকে অর্থাৎ মস্তিষ্ক থেকে সেগুলি মনে আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, মনের মধ্যে যা সংরক্ষিত হয় না, তা মনের মধ্যে কিভাবে উদিত হতে পারে?

(৭) মিল এবং কারপেণ্টার অচেতন মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কথা বলছেন, তাহলে সিদ্ধান্ত করতে হয় সচেতন মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব কি সম্ভব?

(খ) **মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ** (Psychological Theory: Theory of Sub-conscious Mental Modification): এই মতবাদ অনুসারে স্মৃতি দৈহিক প্রক্রিয়া নয়, মানসিক প্রক্রিয়া। অতীত অভিজ্ঞতাগুলি প্রতি-রূপের আকারে মনের অবচেতন স্তরে (Sub-conscious level) রক্ষিত হয়। এই প্রতিরূপ বলতে বোঝায় অবচেতন মনের স্থায়ী পরিবর্তন (Sub-conscious mental modification)। অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের সংগঠনের কিছু পরিবর্তন ঘটে। পরে প্রতিরূপগুলি অবচেতন স্তর থেকে চেতন স্তরে আত্ম-প্রকাশ করলেই আমরা অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে পারি।

স্মৃতি দৈহিক প্রক্রিয়া নয়, মানসিক প্রক্রিয়া

আমাদের মতে এই মতবাদই সন্তোষজনক। মনের অবচেতন স্তরের কল্পনা ছাড়া স্মৃতিকে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা আগেই দেখেছি, যা চেতনার বহির্ভূত তা মনের বহির্ভূত নয়। কোন অভিজ্ঞতা যখন চেতনার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তখন মনের অবচেতন স্তরে একটি ছাপ হিসেবে সেটি সংরক্ষিত থাকে এবং ভবিষ্যতে কোন উদ্দীপক উপস্থিত হলে চেতনলোকে উদ্ভাসিত হয়।

মনস্তাত্ত্বিক মতবাদই সন্তোষজনক

## ৫। সংরক্ষণের প্রমাণ (Proof of Retention) :

আমরা যে কোন বিষয় শেখবার পর তা মনের মধ্যে সংরক্ষিত করতে পারি তা তিন ভাবে প্রমাণ করা চলে। যথা—

(ক) পরীক্ষার সময় আমরা শেখা বিষয়ের পুনরুদ্রেক করতে পারি। কিন্তু এই পুনরুদ্রেক সম্ভব হয় যেহেতু শেখা বিষয় আমরা মনের মধ্যে সংরক্ষিত করে রেখেছি।

(খ) প্রশ্নের সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করতে দেওয়া হয়েছে, এমন পরীক্ষায় যেসব প্রশ্নের উত্তর সত্য বা যথার্থ তাদের পাশে *'T'* এবং যেগুলি মিথ্যা তাদের পাশে *'F'* লিখতে হবে। এটা আমরা করতে পারি কারণ পাঠ্য-পুস্তক থেকে যে বিষয়গুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি আমরা চিনে নিতে পারি এবং যেগুলি পাঠ্যপুস্তক থেকে নেওয়া হয়নি তার সঙ্গে তুলনা করে বিচার করে দেখতে পারি। এই যে চিনে নেওয়া বা পুনঃপরিজ্ঞানের ব্যাপার, এটা সম্ভব হয় যদি শেখা বিষয় মনে ধরে রাখা যায়।

(গ) যে বিষয়টি একেবারে ভুলে গেছে, সেটি পুনরায় শিখতে গিয়ে দেখা যায় পূর্বের তুলনায় অনেকখানি সময় বেঁচেছে। এই সময় বাঁচাবার বিষয়টিকে কেবলমাত্র ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এইভাবে যে, যা কিছু শেখা যায় তা মনে কোন-না-কোন রকম ভাবে সংরক্ষিত হয়; এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে সংরক্ষণ সম্ভব।

## ৬। স্মরণক্রিয়ার শর্ত (Conditions of Remembering) :

স্মরণক্রিয়ার প্রধান উপাদান দুটি—(১) **সংরক্ষণ** বা **ধারণ** (Retention) এবং (২) **পুনরুদ্রেক** বা **পুনরাবৃত্তি** (Recall or Reproduction)। সুতরাং স্মরণক্রিয়ার শর্ত হল আসলে সংরক্ষণ বা ধারণ এবং পুনরুদ্রেকের শর্ত। সোজা কথায় বলা যায়, কোন্ কোন্ অবস্থায় আমরা অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করতে পারি এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় তার পুনরুদ্রেক করতে পারি, এই উভয় প্রকার শর্ত।

### (i) সংরক্ষণের শর্তাবলী বা কোন্ কোন্ অবস্থায় বিষয়টি মনে ধারণ করতে পারি ?

**দেহ ও মস্তিষ্কের সুস্থ ও সতেজ অবস্থা**

প্রথমতঃ, দেহ ও মস্তিষ্কের সুস্থ ও সতেজ অবস্থা কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করার পক্ষে খুবই উপযোগী। দেহ যদি সুস্থ থাকে এবং সেই অবস্থায় যদি কোনকিছু শেখা যায় তাহলে তা সহজেই মনে রাখা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়তঃ, উদ্দীপকের তীব্রতার উপরও ধারণ করার শক্তি নির্ভর করে। বেশ জোরে কেউ যদি কথা বলে, খুব তীব্র আলোক যদি চোখে এসে পড়ে, তাহলে সেগুলিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে ধরে রাখা যায়। ক্ষীণ আলোক বা ক্ষীণ স্বর মনে যে ছায়াপাত করে তা অধিক কাল ধরে রাখা যায় না।

উদ্দীপকের তীব্রতা

তৃতীয়তঃ, উদ্দীপক যদি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয় তাহলে বিষয়টিকে সহজেই মনে ধারণ করা যায়। যে চিত্রখানি বেশ স্পষ্ট, তাকে যেমন সহজে মনে ধারণ করা যায়, অস্পষ্ট রঙের কোন সংমিশ্রণের ছাপ মনে সেভাবে মুদ্রিত করা যায় না।

উদ্দীপকের সুস্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা

চতুর্থতঃ, উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িত্ব বিষয়টিকে মনে ধারণ করার অন্যতম উল্লেখ-যোগ্য শর্ত। যে গানের রেশ কয়েক সেকেণ্ডে মিলিয়ে যায় তাকে মনে রাখা যায় না। কিন্তু অধিক সময় ধরে যে গানের সুরটি কানে ভাসতে থাকে তাকে মনে ধরে রাখা যায়।

উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িত্ব

পঞ্চমতঃ, উদ্দীপকের পৌনঃপুনিকতা বিষয়বস্তুকে মনে ধরে রাখার পক্ষে সহায়ক। কতবার ঘটনাটি ঘটেছে, তার উপর ধারণক্রিয়া নির্ভর করে। অনেকবার একটি কবিতা পড়ে তবে তাকে আমরা মনে রাখতে পারি। শিক্ষক মহাশয় বার বার পাঠ্য বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করে ছাত্রদের সেটি মনে রাখতে সহায়তা করেন।

উদ্দীপকের পৌনঃ-পুনিকতা

ষষ্ঠতঃ, উদ্দীপকের সাম্প্রতিকতা (Recency) বিষয়টিকে মনে রাখতে সহায়তা করে। কতকাল পূর্বে ঘটনাটি ঘটেছে তাও বিষয়টিকে মনে ধারণ করার অন্যতম শর্ত। যে ঘটনাটি কয়েক মাস আগে ঘটেছে তাকে যেমন সহজেই মনে ধরে রাখতে পারি, যে ঘটনা দশ বছর আগে ঘটেছে তাকে তেমন করে ধরে রাখা যায় না, কালের গতিতে মন থেকে তা মুছে যায়।

উদ্দীপকের সাম্প্রতিকতা

সপ্তমতঃ, বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ, বিষয়টিকে মনে ধরে রাখতে সহায়তা করে। কোন একটি পাঠ শেখার সময় যদি ছাত্রের সে বিষয়ে মনোযোগ না থাকে, তাহলে সেই বিষয়টিকে মনে ধারণ করা যায় না।

মনোযোগ

অষ্টমতঃ, বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগও বিষয়টিকে মনে রাখার পক্ষে উপযোগী। সাধারণতঃ দেখা যায়, এক এক মানুষের এক এক বিষয়ে অনুরাগ থাকে। যার

খেলাধূলার প্রতি অনুরাগ, সে বিভিন্ন খেলোয়াড়দের নামধাম, কবে কোথায় কোন্ খেলাটি হয়েছিল ইত্যাদি যত সহজে মনে ধরে রাখতে পারে অন্য ব্যক্তির পক্ষে, সে যে বিষয়ে অনুরাগী নয়, সেগুলিকে মনে রাখা সহজ হয় না।

অনুরাগ

নবমতঃ, সংরক্ষণের ইচ্ছাও বিষয়টিকে মনে ধরে রাখতে অনেকখানি সহায়তা করে। শিখব মনে করে যে বিষয়টি পড়া যায় সেটাকে সহজেই মনে রাখা যায়।

সংরক্ষণের ইচ্ছা

দশমতঃ, বিষয়বস্তুর মর্মোপলব্ধি বিষয়টিকে মনে ধারণ করার পক্ষে খুবই সহায়ক। ভাল করে না বুঝে কোন পাঠ্য বিষয় বার বার পড়লেও তাকে মনে রাখা যায় না। কিন্তু বিষয়বস্তুটির অর্থ ভাল করে বুঝে নিয়ে তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সংযোগের সম্পর্ক অবহিত হয়ে যদি বিষয়টিকে মনে রাখার চেষ্টা করা হয় তাহলে বিষয়টিকে সহজে মনে রাখা যায়।

বিষয়বস্তুর মর্মোপলব্ধি

একাদশতঃ, সংপ্রত্যক্ষণ (apperception) সংরক্ষণের পক্ষে খুবই সহায়ক। সংপ্রত্যক্ষণ মানে পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে বিষয়-বস্তু প্রত্যক্ষ করা।

সংপ্রত্যক্ষণ

দ্বাদশতঃ, যেসব ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক (I Q.) অপেক্ষাকৃত বেশী তারা খুব তাড়াতাড়ি অধিক বিষয় শিক্ষা করতে পারে এবং মনে ধরে রাখতে পারে।

যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক বেশী

ত্রয়োদশতঃ, বিষয়বস্তুর আকর্ষণীয়তাও বিষয়টিকে সহজে মনে ধরে রাখতে সহায়তা করে। যে বিষয় চিত্তাকর্ষক বা হৃদয়গ্রাহী হয় তাকে সহজেই মনে ধরে রাখা যায়।

বিষয়বস্তুর আকর্ষণীয়তা

সর্বশেষে, ঘটনার গুরুত্ব সহজেই ঘটনাটিকে মনে ধরে রাখতে সহায়তা করে। মানুষের জীবনে যে অজস্র ঘটনা ঘটে বা অসংখ্য অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, তার কটিই বা সে মনে রাখতে পারে? যে সব ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ, যে সব অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য, যেগুলি আমাদের মনের উপর গভীর ছাপ রেখে যায়, যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আমাদের ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলিকে সহজে মনে রাখা সম্ভব হয়। যে ব্যক্তির মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ ঘটেছে সেই অভিজ্ঞতার কথা সে সুদীর্ঘকাল মনে ধরে রাখতে পারবে।

ঘটনার গুরুত্ব

এ ছাড়াও জীবনের কোন কোন অবস্থা বিষয়বস্তুর সংরক্ষণের পক্ষে উপযোগী বা অনুপযোগী। যেমন, শৈশবে যত শীঘ্র বিষয়বস্তু মুখস্থ করা চলে, বার্ধক্যে তেমন সম্ভব হয় না।

**(ii) পুনরুদ্রেকের শর্তাবলী বা কোন্ কোন্ অবস্থায় বিষয়টির পুনরুদ্রেক করা যায়? (Conditions of Reproduction):**

কোন বিষয়ের পুনরুদ্রেক বিষয়বস্তুটিকে মনে ধারণ করার উপর নির্ভর করে। সুতরাং যে সব অবস্থা বা শর্ত বিষয়বস্তুকে মনে ধারণ করার জন্য প্রয়োজন সেগুলি পুনরুদ্রেকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সংরক্ষণের শর্তগুলি হল পুনরুদ্রেকের শর্ত

প্রথমতঃ, অভিভাবন (Suggestion) এবং অনুষঙ্গ (Association of Ideas) বিষয়টির পুনরুদ্রেকের পক্ষে সহায়ক। বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার প্রতিরূপগুলি আমাদের মনের মধ্যে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে আছে। সে কারণে কোন একটি ঘটনা অভিভাবনের ফলে অন্য ঘটনাটির প্রতিরূপগুলিকে মনে জাগিয়ে তোলার জন্য স্মৃতিচিহ্নরূপে কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শৈশবে যে বিদ্যালয়ে পড়েছি, তার সামনে পরবর্তীকালে গিয়ে দাঁড়ালেই স্কুল-জীবনের স্মৃতি মনে এসে যায়। বন্ধুর দেওয়া আংটিটি বন্ধুর স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে।

অনুভাবন এবং অনুষঙ্গ

দ্বিতীয়তঃ, যে প্রসঙ্গে (Context) ঘটনাটি ঘটেছিল সেই প্রসঙ্গটিও ঘটনাটির পুনরুদ্রেক সহজ করে তোলে। কোন একটি ঘটনা মনে করতে চাইছি কিন্তু স্মরণ করতে পারছি না। কিন্তু যখনই মনে পড়ল যে ঘটনাটি আমার কলেজ-জীবনের প্রথম দিনটিতে ঘটেছে এবং কোন অধ্যাপক মহাশয় আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রসঙ্গে ঘটেছে তখনই ঘটনাটি মনে পড়ে গেল।

যে প্রসঙ্গে ঘটনাটি ঘটেছে

তৃতীয়তঃ, মনের অনুরাগ যে বিষয়ের উপর নিবদ্ধ থাকে তার উপরই নির্ভর করে কোন্ বিষয়টির পুনরুদ্রেক হবে। অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে যখন আলমারিতে সাজান বইগুলির দিকে তাকালাম, তখন সেই মুহূর্তে আমার অনুরাগ সেদিকে ধাবিত হয় এবং সেই অনুযায়ী ঘটনার পুনরুদ্রেক হয় অর্থাৎ আমার বইগুলির বিষয়বস্তুর কথা মনে আসতে পারে। বইগুলি কোন্ দোকান থেকে কিনেছি সেকথা মনে জাগতে পারে বা বইগুলির কত দাম তাও মনে পড়তে পারে। যে বিষয়টির

অনুরাগ

প্রতি আমার অনুরাগ সেটিই নির্ধারণ করে দেবে যে কোন্ ঘটনাটির পুনরুদ্রেক হবে।

## ৭। পুনরুদ্রেক বা পুনরুৎপাদন (Problem of Reproduction) :

স্মৃতি সম্ভব হয় যদি আমার মনের মধ্যে সংরক্ষিত বিষয়বস্তুকে প্রয়োজনমত পুনরুদ্রেক করতে পারি। কিন্তু এই পুনরুদ্রেক কিভাবে সম্ভব হয়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অভিভাবন প্রক্রিয়া (Process of Suggestion) এবং অনুসঙ্গের নিয়মের (Laws of Association) দ্বারাই একটি বিষয় আর একটি পুরাতন বিষয়কে মনে জাগিয়ে তোলে।

**অনুভাবন ও অনুষঙ্গ**

অভিভাবন প্রক্রিয়া বলতে কি বুঝি? অভিভাবন প্রক্রিয়া হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি প্রতিরূপ অপর একটি প্রতিরূপকে পুনরুদ্রিক্ত বা পুনরুৎপাদিত করে। অনুষঙ্গ হল একটি প্রত্যক্ষরূপ ও তার ধারণার মধ্যে সংযোগ বা একটি ধারণার সঙ্গে আর একটি ধারণার সংযোগ। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া যাক্ : আগ্রার তাজমহল ও তার স্রষ্টা সম্রাট শাহজাহান। তাজমহলের কথা ভাবলেই শাহজাহানের কথা মনে পড়ে যায়। উভয়ের মধ্যে যে মানসিক সংযোগ তাহল অনুষঙ্গ এবং প্রথমটির প্রতিরূপ যে দ্বিতীয়টির প্রতিরূপকে অবচেতন মনের স্তর থেকে চেতনস্তরে টেনে নিয়ে আসছে তাকেই বলা হয় অভিভাবন প্রক্রিয়া।

**অনুষঙ্গের স্বরূপ**

**অভিভাবন-এর স্বরূপ**

অনুষঙ্গ নিয়ম এবং অভিভাবন প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। দুটি বিষয়ের মধ্যে সংযোগ বা অনুষঙ্গ না থাকলে একটির আর একটি'ক পুনরুদ্রেক করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অনুষঙ্গ নিয়মের মাধ্যমেই অভিভাবন প্রক্রিয়া ক্রিয়া করে। প্রতিরূপগুলি অনুষঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ বলেই ওদের একটি অপরটিকে অভিভাবিত (Suggest) করতে পারে। যেমন, তাজমহলের প্রতিরূপ শাহজাহানের প্রতিরূপ অভিভাবিত করে, কারণ তাজমহলের সঙ্গে শাহজাহান অনুষঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ। সুতরাং আমাদের অভিজ্ঞতা কিভাবে অনুষঙ্গবদ্ধ হয় তার আলোচনা করলেই, অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক কিভাবে হয় তা জানা যাবে।

**অনুভাবন ও অনুষঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত**

যে নিয়ম অনুসারে পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং এই সম্বন্ধের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে অনুষঙ্গ নিয়ম বলে।

আধুনিক মনোবিদ্যায় তিন প্রকার অনুষঙ্গ স্বীকৃত হয়েছে—যথা, (১) **সান্নিধ্য অনুষঙ্গ** (Association of Contiguity), (২) **সাদৃশ্য অনুষঙ্গ** (Association of Similarity) এবং (৩) **বৈপরীত্য অনুষঙ্গ** (Association of Contrast)। এই তিন প্রকারের অনুষঙ্গের ভিত্তিতে আমরা তিনটি নিয়ম পাই। যথা—

অনুষঙ্গের তিনটি নীতি

**(ক) সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contiguity):** অতীতে যে সব বস্তু স্থানের এবং কালের দিক থেকে পরস্পরের কাছাকাছি রূপে জ্ঞাত হয়েছে, তাদের প্রতিরূপগুলি সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম অনুসারে অনুষঙ্গবদ্ধ হয় এবং একটির প্রতিরূপ মনে জাগলে অপরটিরও মনে জেগে ওঠে। যেমন—কমলালেবুর প্রতিরূপ তার মিষ্টি আস্বাদ ও গন্ধের প্রতিরূপের কথা মনে জাগিয়ে তোলে। হেমলেটের প্রতিরূপ সেক্সপীয়রের প্রতিরূপ মনে জাগিয়ে তোলে; শান্তিনিকেতনের প্রতিরূপের কথা মনে হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিরূপের কথা মনে পড়ে যায়। এই সান্নিধ্য দুরকমের হতে পারে: (i) **স্থানগত সান্নিধ্য** (Spatial Contiguity) এবং (ii) **কালগত সান্নিধ্য** (Temporal Contiguity)। স্থানগত সান্নিধ্যের উদাহরণ—যেমন, হাওড়া ব্রীজ ও হাওড়া স্টেশন, বোলপুর ও শান্তিনিকেতন।

সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম

স্থানগত ও কালগত সান্নিধ্য

কালগত সান্নিধ্যের উদাহরণ—বিদ্যুতের চমক ও বজ্রধ্বনি। হাওড়া ব্রীজ এবং হাওড়া স্টেশন পরস্পরের কাছাকাছি। এদের একই সঙ্গে আমরা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি, কাজেই স্থানগত নৈকট্য বা সান্নিধ্যের জন্য উভয়ের প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়। আবার বিদ্যুৎ চমকাবার অব্যবহিত পরেই আমরা বজ্রধ্বনি শুনতে পাই। এই অভিজ্ঞতা আমাদের বহুবার হয়েছে, কাজেই কালগত নৈকট্যের জন্য উভয়ের প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে।

**(খ) সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Similarity):** যদি দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে আকারগত বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকে, একটি অপরটির

সদৃশরূপে জ্ঞাত হয়, তাহলে প্রতিরূপগুলিও পরস্পরের সদৃশ হওয়ার জন্য পরস্পরের সঙ্গে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়। একটির প্রতিরূপ অপরটির কথা মনে জাগিয়ে তোলে। রামের সঙ্গে শ্যামের আকৃতিগত সাদৃশ্য পূর্বে জ্ঞাত হয়েছি, সে কারণে রামকে দেখলেই শ্যামের কথা মনে পড়ে যায়।

**(গ) বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contrast) :** দুটি বিষয়ের মধ্যে বৈপরীত্য থাকলে একটির প্রতিরূপ অপর প্রতিরূপকে মনে জাগিয়ে তোলে। যেমন—জীবনের দুঃখের দিনগুলির কথা মনে করলে সুখের দিনগুলির কথা মনে জেগে ওঠে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির কথা মনে করিয়ে দেয়। সুন্দর-কুৎসিতের কথা, আলো-অন্ধকারের কথা, মোটা লোক-রোগা লোকের কথা মনে জাগিয়ে তোলে।

পূর্বোক্ত তিনটি অনুষঙ্গ নীতি ছাড়াও আরও কয়েকটি নীতি আছে যেগুলি অনুষঙ্গকে সুদৃঢ় করে এবং বিষয়ের পুনরুদ্রেকের সহায়তা করে। যথা—

**(১) সাম্প্রতিকতার নীতি (Law of Recency) :** কোন ধারণা অন্য আর একটি ধারণাকে সহজেই পুনরুদ্রেক করে যেহেতু সাম্প্রতিককালে উভয়ের মধ্যে অনুষঙ্গ ঘটেছে। যেমন—'উপন্যাস' কথাটি উচ্চারিত হলেই আমরা সেই উপন্যাসটির কথা স্মরণ করি যেটি সম্প্রতি পড়েছি।

**(২) পৌনিপুনঃকতার নীতি (Law of Frequency) :** যে ধারণার সঙ্গে অন্য ধারণার বার বার অনুষঙ্গ ঘটেছে, তাদের একটি অপরটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন, আগুন দেখলেই দাহিকা শক্তির কথা মনে পড়ে।

**(৩) প্রাথমিকতার নীতি (Law of Primacy) :** প্রথম ছাপ বা অনুষঙ্গ মনের মধ্যে দীর্ঘকাল সংরক্ষিত হয় এবং সহজেই তার পুনরুদ্রেক করা চলে। যেমন, স্কুলের বা কলেজের প্রথম দিনটি।

**(৪) সুস্পষ্টতার নীতি বা আগ্রহের তীব্রতা (Law of Vividness or the Intensity of Interest) :** যে অভিজ্ঞতার ছাপ বা অনুষঙ্গ যত সুস্পষ্ট, তত সহজে তার পুনরুদ্রেক সম্ভব। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের দিনটি আজও আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে আছে এবং দিনটিকে আমি স্মরণ করতে পারি।

## ৮। অনুষঙ্গ নীতিগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ (Interrelation of Laws of Association) :

কোন্ নীতিটি মৌলিক

পূর্বোক্ত তিনটি অনুষঙ্গ নিয়ম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। অনেকে মনে করেন এই তিনটি অনুষঙ্গ নিয়ম সমান মৌলিক। কিন্তু এ সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। প্রশ্ন হল, এই তিনটি অনুষঙ্গ নিয়মের মধ্যে কোন্ নিয়মটি মৌলিক ?

### বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম মৌলিক নিয়ম হতে পারে না :

বৈপরীত্য-সম্বন্ধীয় নীতি মৌলিক নীতি নয়

বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contrast) স্বতন্ত্র ও মৌলিক নীতি হতে পারে না। এক হিসেবে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়মকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ নিয়েমর (Law of Similarity) প্রকারভেদ বলেই মনে করা যেতে পারে। 'সাদা ও কালো'—এই রঙ দুটিকে আমরা পরস্পরের বিপরীত বলে মনে করি। কিন্তু এই বৈপরীত্যের পেছনে সাদৃশ্য আছে ; কেননা, সাদা ও কালো উভয়ই বর্ণ, সুতরাং উভয়ের মধ্যে জাতিগত (generic) সাদৃশ্য আছে। অনুরূপভাবে, সুখ আমাদের দুঃখের কথা মনে করিয়ে দেয়, কারণ সুখ হল দুঃখের বিপরীত। কিন্তু এখানেও সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সুখ-দুঃখ উভয়ই অনুভূতি। এখানেও জাতিগত সাদৃশ্য আছে।

মনোবিদ্ টিচনার (*Titchener*)-এর মতে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম সাদৃশ্য অনুষঙ্গ নিয়মের প্রকারভেদ—এ যুক্তি মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। সাদা কালোর প্রতিরূপ জাগিয়ে তোলে, যেহেতু উভয়ই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয়ের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু অন্তর্দর্শনে এই বর্ণ ধরা পড়ে না। তাছাড়া, সাদৃশ্য অনুষঙ্গ চিন্তামূলক ; বৈপরীত্য অনুষঙ্গ অনুভূতিমূলক, কেননা বৈপরীত্য অনুষঙ্গে বিরোধিতার বেদনা উপস্থিত থাকে। টিচনারের মতে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের (Law of Contiguity) প্রকারভেদ ; কেননা, দুটি বিপরীত বিষয়ের ধারণার মধ্যে সান্নিধ্য আছে এবং ধারণা দুটি একসঙ্গে মনের মধ্যে গঠিত হয় ; যেমন, অন্ধকারের ধারণা ছাড়া আলোর জ্ঞান হয় না।

এখন সাদৃশ্য অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Similarity) এবং সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contiguity) এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি মৌলিক, সেটিই হল প্রশ্ন—এ বিষয়ে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

মনোবিদ্ স্পেন্সার (*Spencer*)-এর মতে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ নিয়ম হল মৌলিক নিয়ম এবং সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়মের মধ্যে মূলতঃ সাদৃশ্য অনুষঙ্গ নিয়মই ক্রিয়া করে। স্থানগত সান্নিধ্যের মূলে আছে স্থানগত সাদৃশ্য এবং কালগত সান্নিধ্যের মূলে আছে কালগত সাদৃশ্য। আমি পূর্বে রাম ও যদুকে একসঙ্গে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। স্থানগত সান্নিধ্যের জন্য রাম ও যদুর প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে এবং রামকে দেখলে যদুর প্রতিরূপ মনে জেগে ওঠে। আসলে আমি যখন রামকে প্রত্যক্ষ করলাম, তখন মনের অবচেতন স্তরে রামের যে প্রতিচ্ছবিটি রয়েছে, রামের প্রত্যক্ষ রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যবশতঃ সেটি মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হল এবং রামের প্রতিরূপের সঙ্গে সান্নিধ্য সম্বন্ধে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে আছে যদুর প্রতিরূপ, সেহেতু যদুর প্রতিরূপও মনে ভেসে উঠল।

**স্পেন্সার-এর মতে সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় নীতিই হল মৌলিক নীতি**

মনোবিদ্ জেম্‌স (*James*)-এর মতে সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contiguity) হল মূল নিয়ম এবং এই নিয়মের সাহায্যেই সাদৃশ্য অনুষঙ্গ নিয়মকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জেম্‌স-এর মতে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ নিয়মটি ক্রিয়া করতে পারে; কেননা, দুটি সদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য অধিকমাত্রায় থাকলেও আংশিক পার্থক্য থাকে। যেমন, 'হরেন' নামটি শুনলে 'হরেশের' কথা মনে পড়ে। উভয় নামের অক্ষরের মধ্যে সাদৃশ্য আছে 'হরে' শব্দটিকে নিয়ে। কাজেই 'হরেন' শব্দটির 'হরে' শুনলেই, 'হরেশ' শব্দটির 'হরে'-র কথা মনে পড়ে যায় এবং শেষের 'হরে' শব্দটির সঙ্গে সান্নিধ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়ে রয়েছে 'শ' অক্ষরটি, কাজেই সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম অনুসারে অবশিষ্ট অক্ষর 'শ'টি মনে পড়ল। শেষোক্ত নিয়মের জন্যই হরেন 'হরেশ'কে মনে পড়িয়ে দিল।

**জেম্‌স-এর অভিমত অনুযায়ী নৈকট্য সম্বন্ধীয় নীতিই হল মূল নীতি**

পূর্বোক্ত অভিমত দুটির কোনটিই যুক্তিযুক্ত নয়। 'নৈকট্য সম্বন্ধীয় নীতি' এবং 'সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় নীতি'—দুটি ভিন্ন নীতি এবং একটিকে আর একটি থেকে অনুসৃত করা চলে না।

**কোন্ অভিমত যুক্তিযুক্ত**

হ্যামিলটন (*Hamilton*) পূর্বোক্ত দুটি নিয়মকে একটি মূল নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করছেন। এই নিয়মটি হল সমগ্রীকরণ সম্বন্ধীয় নিয়ম (Law of Redintegration)। এই নিয়মের অর্থ হল—একটি সমগ্র অভিজ্ঞতার অংশবিশেষ যদি মনে পড়ে, তাহলে সেই অংশবিশেষ সমগ্র অভিজ্ঞতাটিকেই মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে।

**হ্যামিলটন-এর সমগ্রীকরণ সম্বন্ধীয় নীতি**

যেমন—বোলপুর, শান্তিনিকেতন, সব মিলে আমার একটি সমগ্র অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই বোলপুরের প্রতিরূপ মনে জাগলে শান্তিনিকেতনের প্রতিরূপ মনে জাগে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা একত্রে অনুভূত হলে, মনের সামগ্রিক অবস্থার (A whole mental state) অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। কাজেই মনের এই সামগ্রিক অবস্থার অংশবিশেষ মনের সামগ্রিক অবস্থাটিকে না জাগিয়ে, অন্য অংশবিশেষকে জাগাতে পারে না। বস্তুতঃ, আমাদের মনের ধর্মই হল বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে তার সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ সামগ্রিক রূপকে মনের মধ্যে ধরে রাখা।

হ্যামিলটনের মতে সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম, সাদৃশ্য অনুষঙ্গ নিয়ম এবং বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম—এই তিনটি নিয়মকেই সমগ্রীকরণ সম্বন্ধীয় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

## ৯। স্মৃতির প্রকার ভেদ (Kinds of Memory) :

বার্গসোঁর মতে স্মৃতি দুপ্রকার—আসল স্মৃতি (True Memory) এবং অভ্যাসমূলক স্মৃতি (Habit Memory)। অভ্যাসমূলক স্মৃতি হল কোন বিষয় নিছক মুখস্থ আওড়ান। এ হল দেহনির্ভর ও যান্ত্রিক। আসল স্মৃতি হল, স্বাধীনভাবে, কোন কিছুর উপর নির্ভর না করে বিষয়বস্তুকে স্মরণ করা। আসল স্মৃতি হল, অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বা মানসিক ছবি মনের সামনে তুলে ধরা; অভ্যাসমূলক স্মৃতির সঙ্গে প্রতিরূপের (image) কোন সম্পর্ক নেই। অভ্যাসমূলক স্মৃতি হল নিছক কোন কিছু মুখস্থ করা।

**অভ্যাসমূলক স্মৃতি ও আসল স্মৃতি**

বার্গসোঁর মতে অভ্যাসমূলক স্মৃতি হল দেহের প্রক্রিয়া এবং আসল স্মৃতি হল মনের প্রক্রিয়া। অভ্যাসমূলক স্মৃতি হল যান্ত্রিক। কোন বিষয়ের বার বার পুনরাবৃত্তি করে তাকে মনে রাখা হল এই ধরনের স্মৃতির কাজ এবং এত ভালভাবে একে স্মরণ রাখা যায় যে বিনা প্রচেষ্টায় এর পুনরুদ্রেক সম্ভব হয়। এখানে বিষয়বস্তুর অর্থ বোঝার বা তাৎপর্য উপলব্ধির কোন ব্যাপার নেই। না বুঝেই বিষয়বস্তুর যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। কবিতা বা নামতা মুখস্থ করা এ ধরনের স্মৃতির উদাহরণ। এই ধরনের স্মৃতি সময়ের অপচয় রোধ করে, কেননা, ভাল করে মুখস্থ করা জিনিস সহজেই পুনরুদ্রেক করা চলে। কিন্তু মনের বিকাশ সাধনে এর কোন উপযোগিতা নেই। তবে বুঝে বুঝে মুখস্থ করা হলে তা কার্যকরী হয়।

**অভ্যাসমূলক স্মৃতি দেহের এবং আসল স্মৃতি মনের প্রতিক্রিয়া**

আসল স্মৃতির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। এ ধরনের স্মৃতি নিছক যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি নয়। এই ধরনের স্মৃতির বিকাশ সাধনে অনুষঙ্গ নীতির সহায়তা গ্রহণ করা হয়। এই ধরনের স্মৃতিতে বিষয়বস্তু বুঝে বুঝে পড়ার এবং শিক্ষার্থীর আগ্রহের প্রয়োজন আছে।

**আসল স্মৃতির উপযোগিতা**

প্রায় সব মনোবিজ্ঞানীই স্মৃতির উপরিউক্ত প্রকারভেদ স্বীকার করেছেন। কিন্তু মান্ (*Munn*) উপরিউক্ত প্রকারভেদ স্বীকার করেন না। তাঁর মতে বার্গসোঁ উপরিউক্ত স্মৃতির প্রকারভেদ মেনে নিয়ে পরোক্ষভাবে দেহকে মন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন।

**মনোবিজ্ঞানী মান্-এর অভিমত**

কারণ বার্গসোঁর মতে আসল স্মৃতি হল মনের ক্রিয়া আর অভ্যাসমূলক স্মৃতি হল দেহের ক্রিয়া। মনোবিজ্ঞানী রস্ (*Ross*)-এর মতে উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, সে পার্থক্য হল মাত্রাগত, স্বরূপগত নয়। তাঁর মতে মুখস্থর মাধ্যমে যখন আমরা কোন কিছু স্মরণ করি, তখন আসল শিক্ষণের বিষয়ও স্মরণ করতে পারি এবং কোন অভ্যাসমূলক স্মৃতিই শুরুতে কখনও প্রতিরূপ ছাড়া ঘটতে পারে না।

**মনোবিজ্ঞানী রস্ এর অভিমত**

## ১০। স্মৃতি-প্রখরতার লক্ষণ (Marks of good memory) ঃ

স্মৃতি-প্রখরতা অর্থে আমরা কোন এক বা একাধিক বিশেষ ঘটনা স্বল্লায়াসে স্মরণ করার কথা বলছি না। স্মৃতি-প্রখরতা অর্থে আমরা বুঝি স্মরণশক্তির তীক্ষ্ণতা, অর্থাৎ স্বল্লায়াসে বিষয়বস্তুকে মনে সংরক্ষিত করা এবং প্রয়োজনমত তার পুনরুদ্রেক করা। স্মৃতি-প্রখরতার কতকগুলি লক্ষণ আছে। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হচ্ছে।

**স্মৃতি-প্রখরতার লক্ষণ**

**(ক) স্বল্লায়াসে এবং দ্রুত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করা (Ease and rapidity of learning) ঃ** যে ব্যক্তির স্মৃতি খুবই প্রখর সে অল্প চেষ্টায় এবং খুব দ্রুত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় কোন একটা ছাত্র একটি পাঠ দশবার পড়েও আয়ত্ত করতে পারছে না; সেক্ষেত্রে ছাত্রটির স্মৃতিশক্তির প্রখরতা নেই বলেই স্বীকার করতে হবে। অবশ্য এই শক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ এবং অনুরাগের উপর। পাঠ্য বিষয়বস্তুটি যদি তৃপ্তিদায়ক হয় তাহলেও তাকে অল্প প্রচেষ্টায় এবং দ্রুত আয়ত্ত করা যেতে পারে।

(খ) **দীর্ঘ সময় ধরে বিষয় বস্তুটিকে মনে সংরক্ষিত করা** (The long duration of retention) : যে ব্যক্তির স্মৃতি খুবই প্রখর সে যে কেবল স্বল্পায়াসে বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করতে পারে তা নয়, বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করার পর সুদীর্ঘ সময় ধরে তাকে মনে সংরক্ষিত করতে পারে। অবশ্য বিষয়বস্তুর সংরক্ষণের দীর্ঘস্থায়িত্ব বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ, বিষয়বস্তুর আলোচনার পৌনঃপুনিকতা ও ব্যক্তির সহজাত মানসিক প্রবণতার উপর নির্ভর করে।

(গ) **দ্রুত এবং যথাযথভাবে পুনরুদ্রেক করা** (Rapidity and Accuracy of reproduction) : যে ব্যক্তির স্মৃতি প্রখর, সে যে কেবল মাত্র স্বল্পায়াসে এবং দ্রুত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করে মনে সংরক্ষিত করতে পারে তা নয়, প্রয়োজনমত, দ্রুত এবং যথাযথভাবে বিষয়বস্তুর পুনরুদ্রেক করার শক্তিরও অধিকারী। প্রয়োজনমত বিষয়বস্তুর পুনরুদ্রেক করতে না পারলে সেটিকে আয়ত্ত করার কোন অর্থই হয় না। যে ছাত্র পরীক্ষা চলাকালীন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হল না, অথচ পরীক্ষা-গৃহের বাইরে এসে বিষয়বস্তুটিকে স্মরণ করল, তার স্মৃতিশক্তিকে প্রখর বলা যেতে পারে না।

(ঘ) **প্রয়োজনমত দ্রুত প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুটিকে পুনরুদ্রেক করা বা স্মরণক্রিয়ার কার্যকারিতা** (Re-serviceableness of memory) : যে ব্যক্তির স্মৃতি প্রখর সে ব্যক্তি প্রয়োজনমত প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুটিকে স্মরণ করতে পারে। যে প্রসঙ্গে যে বিষয়বস্তুটিকে স্মরণ করা দরকার তা যদি করা না যায়, তাহলে স্মৃতিশক্তিকে প্রখর বলা যেতে পারে না। যে ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি প্রখর সে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় অংশ অনায়াসে এবং যথাযথভাবে পুনরুৎপাদন করতে পারে।

## ১১। স্মৃতি-প্রখরতার অনুকূল শর্তাবলী (Favourable conditions for memorization) :

কতকগুলি শর্ত বা অবস্থার উপর স্মৃতি-প্রখরতা নির্ভর করে। এই শর্তগুলি নিম্নরূপ :

(১) আগ্রহ (Interest) : কোন বিষয় কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ করার জন্য বিষয়বস্তুতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। শিশুকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়তে হবে।

(২) প্রেষণা (Motivation) : শিক্ষণের জন্য প্রেষণার দরকার।

প্রেষণাই আগ্রহ সৃষ্টি করে। স্মৃতি-প্রখরতার জন্যও এই প্রেষণার প্রয়োজন আছে।

(৩) অনুষঙ্গ (Association): অনুষঙ্গ নীতির সহায়তায় বিষয়বস্তু কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ করার চেষ্টা করতে হবে। যদি ঠিকমত অনুষঙ্গ ঘটে, তাহলে বিষয়বস্তুর পুনরুদ্রেক সহজতর হয়।

(৪) শিক্ষণ (Learning): কোন বিষয়বস্তু কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ করার জন্য শিক্ষণের যথারীতি পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।*

(৫) মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা (Mental and Physical Condition): যথাযথ শিক্ষণের জন্য মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভাল থাকা দরকার। যে লোক ক্লান্ত বা রুগ্ন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে পারে।

(৬) শান্তিপূর্ণ পরিবেশ (Peaceful environment): স্মৃতি-প্রখরতার জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশের একান্ত প্রয়োজন। হৈ চৈ, গোলমাল ইত্যাদিতে স্মরণপ্রক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

## ১২। স্মরণপ্রক্রিয়াকে কি অনুশীলনের সহায়তায় উন্নত করা যেতে পারে? (Can memory be improved by Practice?):

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে শিক্ষা, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক হল স্মরণক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদান। মনোবিদ্‌ জেম্‌স (*James*)-এর মতে অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষিত করার ক্ষমতা মানুষের জন্মগত ক্ষমতা; একে পরিবর্তন করা যায় না। যেহেতু তাঁর মতে অভিজ্ঞতার সংরক্ষণের ব্যাপারটি মানসিক ঘটনা নয়, দৈহিক ঘটনা (physiological phenomena) এবং দেহযন্ত্রের মাধ্যমে এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়, সেহেতু অনুশীলনের সহায়তায় স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করা সম্ভব নয়। শারীরিক সুস্থতার উপর সংরক্ষণের বিষয়টি কিছু পরিমাণে নির্ভরশীল হলেও এবং শারীরিক সুস্থতা ও অসুস্থতা অনুসারে স্মৃতিশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলেও অনুশীলনের মাধ্যমে এর উন্নতি সম্ভব নয়। তবে জেম্‌স (*James*) স্বীকার করেন যে, আমাদের মনোযোগ ও অনুরাগ বাড়িয়ে দিয়ে বিষয়বস্তুকে আমরা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করতে পারি।

**জেমস-এর মতে অনুশীলনের সহায়তায় স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করা সম্ভব নয়**

* এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হয়েছে।

মনোবিদ্ স্টাউট (*Stout*)-এর মতে অনুশীলনের ফলে সাধারণ স্মরণক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব নয়, তবে অনুশীলনের সহায়তায় কোন একটি বিশেষ দিকে স্মরণক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব। এজন্যই অভিনেতারা অভিনয়ে, পাদ্রীরা ধর্মোপদেশে এবং অধ্যাপকেরা তাদের বক্তৃতা-বিষয়ে স্মরণশক্তির উন্নতি করতে পারেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও মনোযোগ, অনুরাগ ও উভয়ের অনুষঙ্গই পরোক্ষভাবে স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করে।

**স্টাউট-এর মতে অনুশীলনের দ্বারা বিশেষ কোন একটি দিকে স্মরণক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব**

মনোবিদ্ জেম্স্-এর মতে এসব ক্ষেত্রে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত স্মরণক্রিয়ার কোন উন্নতি সাধিত হচ্ছে না, বিষয়বস্তুটিকে আয়ত্ত করার পদ্ধতির যেমন—মনোযোগ, অনুরাগ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কারণগুলির উন্নতি সাধিত হচ্ছে মাত্র।

কিন্তু মনোবিদ্ স্টাউট (*Stout*)-এর অভিমত সমর্থন করে আমরা একথা বলতে পারি যে, সাধারণভাবে স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করা না গেলেও যেহেতু আনুষঙ্গিক কারণগুলির উন্নতির জন্য কোন বিশেষ বিষয়ের সংরক্ষণ দৃঢ়তর এবং পুনরুদ্রেক দ্রুততর হয়, কোন একটি বিশেষ দিকে অনুশীলনের মাধ্যমে স্মৃতির উন্নতি সম্ভব। তবে সে উন্নতি পরোক্ষ এবং শর্তসাপেক্ষ; যেহেতু মনোযোগ, অনুরাগ এবং ভাবগুলির পারস্পরিক অনুষঙ্গই স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করতে সহায়তা করে।

**স্টাউট-এর অভিমত সমর্থনযোগ্য**

## ১৩। শিক্ষণ ও স্মরণক্রিয়া (Learning and Memory):

স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়াকে অনুশীলনের সহায়তায় উন্নত করা যেতে পারে কিনা, এই প্রশ্নটি বিতর্কমূলক হলেও শিক্ষা গ্রহণ করার পদ্ধতিকে নানাভাবে উন্নত করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল, শিক্ষার সঙ্গে স্মরণক্রিয়ার সম্পর্ক কী? মনোবিদ উডওয়ার্থ (*Woodworth*) স্মরণক্রিয়ার চারটি অংশের কথা উল্লেখ করেছেন—(১) শিক্ষণ, (২) সংরক্ষণ, (৩) পুনরুদ্রেক এবং (৪) প্রত্যভিজ্ঞা। সুতরাং শিক্ষণ স্মরণক্রিয়ার একটি পূর্ববর্তী শর্ত (antecedent condition)। শিক্ষণের এ ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে যে, শিক্ষণ হল কোন একটি ঘটনাকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ বা কোন একটি কার্য এমনভাবে সম্পাদন করা যাতে অব্যবহিত পরেই তাকে স্মরণ করা যেতে পারে। কাজেই শিক্ষণকে স্মরণক্রিয়ার অংশরূপে গণ্য না করে, স্মরণক্রিয়ার মাধ্যমেই শিক্ষণের যাচাই হয়, একথা বলাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যেহেতু মানসিক প্রক্রিয়াগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় এবং শিক্ষণ ও

**শিক্ষণ স্মরণক্রিয়ার পূর্ববর্তী শর্ত**

সংরক্ষণ, বা শিক্ষণ ও পুনরুদ্রেক, অর্থাৎ পাঠ এবং আবৃত্তি, একটির পর আর একটি ঘটতে থাকে, সেহেতু ব্যবহারিক দিক থেকে শিক্ষণকে স্মরণক্রিয়ার একটি অংশ এবং সে হিসেবে তার প্রথম স্তর বলেই গণ্য করা সুবিধাজনক।

শিক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে অনৈচ্ছিক হতে পারে—যেমন, সঙ্গীতের প্রতি সহজাত অনুরাগ আছে এমন কোন বালক কোন একটি গান শোনার অব্যবহিত পরে সেটি গেয়ে লোককে চমৎকৃত করে দিতে পারে। আবার শিক্ষণ ঐচ্ছিকও হতে পারে—যেমন, সেই একই বালক কোন একটি কবিতা বার বার পড়ে স্মৃতিতে তাকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করতে পারে। এই শিক্ষণ যখন ঐচ্ছিক হয়, তখনই আমরা কোন বিষয় স্মৃতিতে সংরক্ষিত করার কথা বলে থাকি (committing to memory or memorising)।

শিক্ষণ—ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক

## ১৪। স্বল্পায়াসে শিক্ষণ ও স্মরণ রাখার পদ্ধতি (Methods of Economy in learning and memorisation):

প্রশ্ন হল, কিভাবে শিক্ষা করলে খুব অল্প আয়াসে কোন বিষয় মনে ধরে রাখা যায়?

এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতির কথা বলা যেতে পারে না, যেগুলি সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। তবে সাধারণভাবে কয়েকটি নীতির আলোচনা করা যেতে পারে।

**(i) যুক্তিনিষ্ঠ বা অর্থপূর্ণ শিক্ষণ-পদ্ধতি** (Logical Method): পাঠ্য বিষয়টির অর্থ ভাল করে বুঝে নিয়ে সেটি শিক্ষা করলে সেটিকে দীর্ঘকাল মনে রাখা সম্ভব। পাঠ্য বিষয়বস্তুর ভাবগুলিকে সুসংবদ্ধ করে, অন্য ভাবের সঙ্গে তার সাদৃশ্য এবং কার্যকারণ সম্পর্কটি নির্ধারণ করে বিষয়টি শিক্ষা করলে সেটি দীর্ঘদিন স্মরণে থাকে।

**(ii) আবৃত্তি পদ্ধতি** (Recitation): স্থায়িভাবে কোন বিষয়কে মনে ধরে রাখার জন্য আবৃত্তি খুবই কার্যকরী। কোন একটি বিষয় পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকবার যদি বিষয়টিকে নিজের কাছে আবৃত্তি করা যায় তাহলে কি সাময়িকভাবে বা কি দীর্ঘকালের জন্য পাঠ্য বিষয়টিকে মনে সংরক্ষণ করা যায়। কোন্ অংশটি অধিগত হয় নি আবৃত্তিতে তা ধরা পড়ে এবং সে অংশ যে আবার পাঠ করা প্রয়োজন তা বোঝা যায়। আবৃত্তি মূল্যবান সময়ের অপচয় বন্ধ করে এবং বিষয়টিকে মনের মধ্যে গেঁথে দেয়।

মনোবিজ্ঞানী গেট্স (*Gates*) ১৬টি অর্থহীন শব্দ এবং ১৭০টি শব্দের পাঁচটি সংক্ষিপ্ত জীবনীর অংশ নিয়ে এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালান। তিনি দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করেন। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থী তার কাজের উপর থেকে মাথা না তুলে বার বার পড়ে যাবে। অপর পদ্ধতি অনুসারে মাঝে মাঝে কাগজের দিকে না তাকিয়ে তা আবৃত্তি করতে হবে এবং পুনরুদ্রেক করার চেষ্টা করতে হবে। তাতে দেখা গেল যে আবৃত্তির পদ্ধতিই স্বল্পায়াসে স্মরণ রাখার ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে। যদি পর্যাপ্ত সময় থাকে তাহলে এই পদ্ধতি সব সময়ই শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী।

এই পদ্ধতির সুবিধা হল—(১) শিখতে গিয়ে কোন্ কোন্ জায়গায় ভুল হচ্ছে তা টের পাওয়া যায় এবং তার উপর মনঃসংযোগ করা যায়। (২) বিষয়বস্তু আয়ত্ত হয়েছে, এই মনোভাব শিক্ষার্থীকে আরও উদ্যমশীল করে তোলে। (৩) ভুলগুলি স্থায়ী হবার পূর্বেই সেগুলিকে দূর করা সম্ভব হয়। (৪) যেহেতু ব্যবহারের জন্যই বিষয়বস্তু শেখা হচ্ছে, সেহেতু পুনরুদ্রেক সহজতর হয়। পরীক্ষণকার্যের ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে যে পাঠের তিন-পঞ্চমাংশ সময় যদি আবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়, তাহলে সুফল পাওয়া যায়।

**(iii) সময়ের ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি (Spaced Repetition):** একবারেই একটি পাঠ শিক্ষা করার চেয়ে যদি কিছু সময়ের ব্যবধান রেখে আবার সেটি পাঠ করা যায় তাহলে সহজেই বিষয়টিকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত করা যায়। যেমন, একটি বিষয় একবারে মুখস্থ করার চেষ্টা না করে যদি কদিন ধরে দিনে দু-তিনবার করে পড়া যায় তাহলে সেটিকে মনে রাখা সহজসাধ্য হয়। এর কারণ একটানা পরিশ্রমে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কিছুটা বিশ্রাম পেলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াশক্তি বর্ধিত হয়।

**(iv) সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি ও অংশ অবধারণ পদ্ধতি (Whole versus Part Learning):** কোন দীর্ঘ ও জটিল পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করার জন্য তাকে কি সমগ্র হিসেবে শিক্ষা করলে সুফল পাওয়া যায় অথবা তাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক ভাবে আয়ত্ত করলে সুফল পাওয়া যায়। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, উভয় পদ্ধতিই সময় অনুযায়ী সুফল দান করে। তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি অধিক কার্যকরী। এই পদ্ধতি অধিক কার্যকরী হওয়ার কারণ, এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি অংশকে অপরাপর অংশের সঙ্গে সংযুক্ত, বা অনুষঙ্গরূপে শিক্ষা করা হয়।

যে পাঠ্যসূচীর বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, সেক্ষেত্রে অংশ অবধারণ পদ্ধতি সুফল দান করে না; কারণ অংশগুলিকে পৃথকভাবে শিক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে অনুসঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং একটি অংশ অপরটির স্মারক হয় না। যে ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ সংযোগ নেই সেক্ষেত্রে অংশ অবধারণ পদ্ধতি ভাল ফল দেয়। যেমন, নামতার ক্ষেত্রে এক এক ঘরের নামতা আলাদা আলাদা ভাবে শিখলে সহজেই মুখস্থ হয়।

অংশ অবধারণ পদ্ধতির তুলনায় সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি যে বেশী উপযোগী সে সম্পর্কে এভেলিং (*Aveling*) একটি পরীক্ষণকার্য চালান। ২৪০ পঙক্তির দুটি কবিতা শিক্ষার্থীকে দুভাবে শিখতে দেওয়া হল। প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিদিন একবারে ৩০ পঙক্তি করে পড়া, দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে পুরো ২৪০ পঙক্তি দিনে তিনবার করে পড়া। দুটি কবিতাই শিখবার পর দেখা গেল অংশ অবধারণ পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীর ওটি শিখতে ১২ দিন (৪৩১ মিনিট) লেগেছে এবং সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি অনুসারে শিখতে কেবলমাত্র ১০ দিন (৩৫৮ মিনিট) লেগেছে। এতে দেখা যাচ্ছে সময়ের এক-পঞ্চমাংশ এই পদ্ধতির সাহায্যে সঞ্চয় করা যেতে পারে।

অংশ অবধারণ পদ্ধতির অসুবিধা হল: (১) অংশ অবধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা করলে সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে অংশবিশেষের অর্থের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। অর্থাৎ সমস্ত কবিতার কাঠামোটি সম্পর্কে জ্ঞান হয় না। তবে অংশ অবধারণ পদ্ধতিতে প্রতিটি অংশকেই প্রত্যক্ষ করা যায় বলে, প্রতিটি অংশই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। (২) অংশ অবধারণ পদ্ধতিতে প্রতি অংশটি এক-একটি বিচ্ছিন্ন একক, কাজেই তাদের পারস্পারিক সংযোগ দুরূহ হতে পারে।

অংশ অবধারণ পদ্ধতিরও কিছু সুবিধা আছে। অংশ অবধারণ পদ্ধতি কার্যকরী হয় যদি শিক্ষার্থীর বয়স খুব অল্প হয়, যদি শিক্ষার্থী অনভিজ্ঞ হয় বা তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে বা শিক্ষণীয় বিষয় তার কাছে খুব অপরিচিত বা দুরূহ বলে মনে হয়। *Pyne* এবং *Synder* পরীক্ষণকার্য চালিয়ে বলেছেন যে ২৪০ পঙক্তি কবিতা মুখস্থ করার জন্য সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি (Whole Learning) খুবই উপযোগী। কিন্তু তার থেকে দীর্ঘতম কবিতা মুখস্থ করতে হলে অংশে অংশে ভাগ করে মুখস্থ করাতেই সুফল পাওয়া যায়।

**(x) মধ্যবর্তী পদ্ধতি (Mediating method of Part Progressive method):** শিক্ষণীয় বিষয় যদি দৈর্ঘ্যে বড় হয় তাহলে সমগ্র অবধারণ

পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয় না। যদি শিক্ষণীয় অংশবিশেষ অত্যন্ত দুরূহ হয় তাহলে কেবলমাত্র দুরূহ বিষয়টুকুর অবধারণের জন্যই সমগ্র বিষয়টি পড়ার প্রয়োজন হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য সমগ্র অবধারণ পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তন হল—কঠিন শব্দ বা বাক্যাংশগুলি প্রথমে আয়ত্ত করার পর সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

এই পদ্ধতিরই আর একটি রূপ হল শিক্ষণীয় বিষয় এক, দুই, তিন প্রভৃতি অংশে বিভক্ত করে নেওয়া। প্রথমে এক নম্বর অংশ বিচ্ছিন্নভাবে, তারপর দুই নম্বর অংশ বিচ্ছিন্নভাবে, তারপর উভয় অংশ একত্রে শিক্ষা করা হয়। এইভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টি মুখস্থ করা হয়। একে প্রগতিশীল পদ্ধতি (Progressive method) বলা হয়। এই পদ্ধতির অসুবিধা হল, কোন বিশেষ অংশের তুলনায় অপর অংশের পুনরাবৃত্তি বেশীবার ঘটে। সমগ্র-অবধারণ পদ্ধতির মাধ্যমে শেখার তুলনায় এতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

**(vi) অধিশিক্ষণ ও পর্য্যালোচনা (Overlearning and Review) :** এবিংহাউস (Ebbinghaus)-এর অভিমতানুযায়ী নির্ভুল পুনরাবৃত্তির জন্য যতবার শিক্ষা করা দরকার তার অধিক যে কোন শিক্ষণই হল অধিশিক্ষণ। পাঠ্যবিষয়কে অধিশিক্ষণের সহায়তায় মনে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত করা যায় এবং মাঝে মাঝে পাঠ্যবিষয়ের পর্যালোচনা (review) করলে বিষয়বস্তুর পুনরুজ্জীবন ও পুনরুদ্রেক সহজতর হয়।

**(vii) শ্রেণীগঠন পদ্ধতি (Classification Method) :** শিক্ষণীয় বিষয়কে শ্রেণীবদ্ধ করে শিক্ষা করলে সেটি সহজে স্মরণ রাখা সম্ভব হয়। যেমন——৬৫, ৭৫, ৮৫, সংখ্যাকে যত সহজে মনে রাখা যাবে ৬২, ৪১, ৮৭-কে মনে রাখা যাবে না।

**(viii) স্মৃতি সঙ্কেত :** কোন সঙ্কেত বা স্মৃতি-সহায়ক ছড়ার সহায়তা গ্রহণ করলে বিষয়বস্তু তাড়াতাড়ি স্মরণ করা যায়।

**(ix) শিক্ষা করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প (The will or intention to learn) :** ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু শিক্ষা করতে গেলে, তার থেকে কখনও ভাল ফল পাওয়া যায় না। কোন কিছু শিক্ষা করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প থাকা চাই এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কোন কিছু আয়ত্ত করার চেষ্টা করলে তা অতি সহজেই আয়ত্ত করা যায়।[1]

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য H. E. Garrett: Great Experiments in Psychology, Page 122. দ্রষ্টব্য :

## ১৩। বিস্মৃতি (Forgetfulness) :

**(ক) বিস্মৃতির উপকারিতা :** স্মৃতি এবং বিস্মৃতি উভয়ই আমাদের জীবনে খুব স্বাভাবিক ঘটনা। বিষয়বস্তুকে যদি মনে ধরে রাখতে পারি, তাহলে তা স্মরণে আসে আর যদি তাকে ধরে রাখতে না পারি তাহলেই তা ভুলে যাই।

স্মৃতিরও যেমন প্রয়োজন আছে, বিস্মৃতিরও ঠিক তেমনি প্রয়োজন আছে। রিবর্ট (*Ribbort*)-এর মতে স্মৃতির জন্য বিস্মৃতির প্রয়োজন। আমাদের মানসিক শক্তি সীমাবদ্ধ। অজস্র বিষয়বস্তুকে স্মরণে রাখা মনের পক্ষে সম্ভব নয়।! কাজেই অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় যদি বিস্মৃত না হই তবে প্রয়োজনীয় এবং নতুন বিষয় মনে ধরে রাখা কিভাবে সম্ভব ? কাজেই বিস্মৃতি অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নতুন বিষয় স্মরণে রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, কোন ছাত্র কোন বিষয় শিখতে গিয়ে অসতর্কতাবশতঃ কতকগুলি ভুল বিষয় শিখে ফেলেছে। এখন এই ভুলগুলি যদি সে বিস্মৃত না হয় তবে তার পক্ষে শুদ্ধ বিষয়গুলি শিক্ষা করা কখনও সম্ভব হবে না। এছাড়াও আমাদের জীবনের সব অভিজ্ঞতাই তৃপ্তিদায়ক নয়; এমন অনেক অভিজ্ঞতা আছে যেগুলি খুবই বেদনাদায়ক। যেমন, প্রিয়জনের মৃত্যু, কর্মে ব্যর্থতা, বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য ইত্যাদি। এই জাতীয় অভিজ্ঞতাগুলি যদি আমরা বিস্মৃত না হই, তাহলে, আমাদের সমস্ত জীবন দুর্বিষহ যন্ত্রণায় নানা ভাবে ভরে ওঠে। কাজেই বিস্মৃতি মানসিক জীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে সহায়তা করে।

**স্মৃতির মত বিস্মৃতিরও প্রয়োজন আছে**

**(খ) বিস্মৃতির অপকারিতা :** প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয় বিস্মৃত হলে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। ফলে কর্মদক্ষতা (efficiency) হ্রাস পায়; সময়ের অপচয় ঘটে। নানা কাজ বিপর্যস্ত হয় - নানা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

**(গ) বিস্মরণের কারণ (Causes of Forgetting) :** প্রশ্ন হল, আমরা ভুলে যাই কেন ? ভুলে যাওয়ার কারণ কি ? এর পশ্চাতে একাধিক কারণ বর্তমান। উদ্দীপক যদি তীব্র, সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, দীর্ঘস্থায়ী ও পৌনঃপুনিক হয়; উদ্দীপক যদি আমাদের মনোযোগ ও অনুরাগ আকর্ষণ করে এবং উদ্দীপকের ক্রিয়ার সময়টি যদি সম্প্রতি ঘটে থাকে তবে বিষয়বস্তুটিকে আমরা মনে ধরে রাখতে পারি। যেহেতু পূর্বোক্ত অবস্থাগুলি স্মৃতির সহায়ক সেহেতু পূর্বোক্ত অবস্থার অভাব বিস্মৃতি সূচনা করে।

**যে অবস্থাগুলি স্মৃতির সহায়ক, সেগুলির অভাব বিস্মৃতির কারণ**

উদ্দীপক সম্পর্কীয় ত্রুটি ছাড়াও বিস্মৃতির আরও কয়েকটি কারণ আছে। নিম্নে এগুলি পর পর আলোচিত হল :

(i) **পর্যালোচনার অভাব :** যে কোন বিষয়বস্তুর আলোচনার অভাব সেটিকে বিস্মৃত হবার অন্যতম কারণ। পাঠ্যবিষয় মনে রাখার জন্য সেগুলিকে মাঝে মাঝে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন। আলোচনার অভাবে কালের গতিতে বিষয়টি ধীরে ধীরে মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অবশ্য মনোবিদ্‌রা আলোচনার অভাবকে বিস্মৃতির কারণ বলে মনে করেন না। কারণ, অনেক সময় আলোচনার অভাবেও বিষয়টি মনে সংরক্ষিত থাকে। এমনও দেখা যায়, যে কাহিনী মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে করি, আকস্মিকভাবে মনে তা জেগে উঠেছে।

**(ii) পশ্চাদ্‌মুখী বাধ (Retroactive Inhibition) :** কোন বিষয় শিক্ষা করার সময় প্রথমটি শেখার পর কিছুটা বিরতি দিয়ে তবে দ্বিতীয়টা শিক্ষা করতে হয়। কিন্তু কোন একটি বিষয় শেখার পরই যদি কিছু সময়ের বিরতি না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় শিখি তাহলে দেখা যাবে যে, প্রথম বিষয়টির অংশবিশেষ ভুলে গেছি। এর কারণ দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টি মনে রাখার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করছে এবং পেছন দিক থেকে এসে প্রথম বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। পরবর্তীকালে অধীত বিষয়ের অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতিপথে আবির্ভাবে বাধা সৃষ্টি করাকে বলা হয় 'পশ্চাদ্‌মুখী বাধ' (retroactive inhibition)। কোন ছাত্র যদি প্রথমে একটি কবিতা মুখস্থ করে এবং সময়ের কোন বিরতি না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটি অংশ মুখস্থ করে তাহলে প্রথমটি মুখস্থ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে দেখতে পাবে, তার অংশবিশেষ সে ভুলে গেছে।

**(iii) আঘাতজনিত বিস্মরণ (Shock Amnesia) :** মস্তিষ্কে আঘাত লাগার জন্য বিস্মৃতি দেখা দিতে পারে। এই জাতীয় বিস্মৃতিকে বলা হয় 'আঘাতজনিত বিস্মরণ'। দুর্ঘটনা, খেলাধূলা, যুদ্ধের সময় গোলাগুলির বিস্ফোরণ এই জাতীয় আঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

**(iv) অবদমন (Repression) :** ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা মনে করেন যে, স্মরণ করার অনিচ্ছা থেকেই বিস্মৃতি আসে। কোন ব্যক্তিকে হয়ত কোন কারণে আমরা পছন্দ করি না ; দেখা যায় তার কথা আমরা ধীরে ধীরে

ভুলে গেছি। একে বলা হয় অবদমন। অবদমন প্রক্রিয়া মনকে বেদনাদায়ক এবং অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার হাত থেকে রক্ষা করে।

**(v) যথাযথ অনুষঙ্গ এবং অভিভাবন শক্তির অভাব (Want of proper association and suggestive forces) :** আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি অনুষঙ্গের প্রভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যদি এই অনুষঙ্গের অভাব ঘটে তাহলে একটি ঘটনা অভিভাবন প্রক্রিয়ার দ্বারা আর একটি ঘটনাকে মনে জাগিয়ে তুলতে পারে না।

আমাদের অভিজ্ঞতাগুলির ছাপ চেতন মন থেকে ধীরে ধীরে চলে যায় অবচেতন মনে। কালের গতিতে এ ছাপ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে এবং অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে এগুলির সংযোগসূত্রও হয়ে আসে ক্ষীণ। তার ফলে বিস্মৃতি ঘটে।

**(vi) পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন (Change of Environment) :** এক একটি বিশেষ পরিবেশে আমরা এক একটি বিষয় শিক্ষা করি। অনেক সময় পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে বিষয়টি আমরা ভুলে যেতে পারি। ঘরে বসে যে ছাত্র একটি বিষয় শিখে নির্ভুলভাবে তার উত্তর দিতে পারে, স্কুলের ক্লাসে বা পরীক্ষার হলে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সে বিষয়বস্তু ভুলে যায়।

**(vii) আবেগজনিত প্রতিরোধ (Emotional Blocking) :** সময় সময় বিভিন্ন আবেগ, যেমন—রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি মনের মধ্যে জেগে ওঠে আমাদের মনে এমন অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে, ভাল করে আয়ত্ত করা হয়েছে এমন বিষয়ও আমরা স্মরণে আনতে পারি না।

**(viii) মনোযোগের এবং অনুরাগের অভাব :** যদি কোন বিষয়ের প্রতি আমাদের অনুরাগ না থাকে তাহলে সে বিষয় আমরা অতি সহজেই ভুলে যাই। তাছাড়া, মনোযোগ সহকারে যদি কোন বিষয় আয়ত্ত করার চেষ্টা না করি তাহলে বিষয়টি সহজেই বিস্মৃত হবার সম্ভাবনা থাকে।

**(ix) দেহ ও মস্তিষ্কের অসুস্থতা :** অসুস্থ দেহ নিয়ে ও ক্লান্ত মস্তিষ্কে যদি আমরা কোন কিছু স্মরণ করতে চাই তাহলে দেখা যায় আমরা কিছুতেই বিষয়কে স্মরণে আনতে পারছি না। নেশাকারক বস্তুর দীর্ঘকাল ব্যবহার মস্তিষ্ককে দুর্বল করে বিস্মৃতি ঘটাতে পারে।

**(x) বাচনিক অনুষঙ্গের অভাব (What of verbal association) :** মনোবিদ্ ওয়াটসন (*Watson*)-এর মতে ভাষার অভাব অথবা বাচনিক অনুষঙ্গের অভাব বিস্মৃতির কারণ। শৈশবের প্রথম কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা যে আমরা স্মরণ করতে পারি না তার কারণ ভাষার অভাবের জন্য।

এই কারণগুলি ছাড়া বিস্মৃতির আরও অন্যান্য কারণ আছে। সকল প্রকার বিস্মৃতি একটি মাত্র কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ঘটনা-বিশেষে বিস্মৃতির কারণ ভিন্নরূপ হয়ে থাকে।

## ১৬। স্মৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষণ (Experiments in Memory) :

মনোবিদ্ এবিংহাউস্ (*Ebbinghaus*) স্মৃতি এবং বিস্মৃতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সর্বপ্রথম পরীক্ষণ কার্য চালান। তাঁর পরিচালিত পরীক্ষণ কার্যগুলি থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই সব পরীক্ষণের ক্ষেত্রে তিনিই একাধারে পরীক্ষক এবং একাধারে পরীক্ষণ-পাত্র। পরীক্ষার উপকরণ হিসেবে তিনি কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টি (nonsense syllables) যেমন, wok, pam, zurt, bip, seg) এবং সংখ্যা (digits) গ্রহণ করেন। অর্থযুক্ত শব্দসমষ্টি নিয়ে পরীক্ষণ কার্য চালনার অসুবিধা হল এই যে, শব্দ যদি অর্থবোধক হয়, তাহলে অর্থের সাহায্যে শব্দটিকে সহজে মনে রাখা সম্ভব হয়, কিন্তু অর্থহীন শব্দসমষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে কোন রকম অনুষঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না। এবিংহাউস্ পরিচালিত পরীক্ষণের কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হচ্ছে :

**অর্থহীন শব্দসমষ্টির সাহায্যে পরীক্ষণ**

**(i) পাঠ্যবিষয়ের দৈর্ঘ্য এবং মোট শিক্ষা করার জন্য কতখানি সময় লাগে?** এবিংহাউস পাঠ্যবিষয়ের দৈর্ঘ্য এবং তা শিক্ষা করার জন্য কতখানি সময় লাগতে পারে সে সম্পর্কে একটি পরীক্ষণ পরিচালনা করেন। তিনি কতকগুলি অর্থহীন শব্দ নিয়ে মুখস্থ করার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি তখনই বিষয়টিকে আয়ত্ত হয়েছে বুঝতে পারবেন যখন তিনি সব কয়টি শব্দ, অর্থাৎ অর্থহীন শব্দসমষ্টির তালিকাটি নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন।

এবিংহাউস তাঁর পরীক্ষণের মাধ্যমে যে ফলাফল লক্ষ্য করলেন তাহল এই যে, অর্থহীন শব্দসমষ্টির তালিকায় শব্দের সংখ্যা যত অধিক হয়, সেটি মুখস্থ করতে তত বেশী সময় লাগে এবং সেটিকে অধিকবার আবৃত্তি করার

প্রয়োজন হয়। আর শব্দের সংখ্যা যত কম থাকে, সেটি মুখস্থ করতে তত কম সময় লাগে এবং সেই অনুপাতে আবৃত্তির সংখ্যাও অনেক কম লাগে।

সাতটি অর্থহীন শব্দ নিয়ে গঠিত শব্দসমষ্টি মুখস্থ করতে এবিংহাউসকে একবার মাত্র আবৃত্তি করতে হয় এবং সময় লেগেছিল মোট ৩ সেকেণ্ড, অর্থাৎ প্রতি শব্দ পিছু গড়ে ·৪ সেকেণ্ড। বারটি শব্দ নিয়ে গঠিত শব্দসমষ্টি আয়ত্ত করতে সতের বার আবৃত্তির প্রয়োজন হয়েছিল। সময় লেগেছিল ছয়ত্রিশ সেকেণ্ড, প্রতি শব্দ পিছু গড়ে সময় লেগেছিল ৩ সেকেণ্ড। আর ৩৬টি শব্দ নিয়ে গঠিত শব্দসমষ্টি আয়ত্ত করার জন্য পঞ্চান্ন বার আবৃত্তি করতে হয় এবং মোট সময় লাগে ৭৯২ সেকেণ্ড, প্রতি শব্দ পিছু গড়ে সময় লাগে ২২ সেকেণ্ড।

পূর্বোক্ত পরীক্ষণ থেকে একটি বিষয় জানা গেল যে, শব্দের সংখ্যা যত বেশী হবে, আয়ত্ত করার জন্য তত অধিক সময়ের প্রয়োজন হবে। সুতরাং পাঠ্যতালিকা যদি দীর্ঘ হয়, সেটি আয়ত্ত করতে হলে, প্রতি শব্দ পিছু অধিক সময় ব্যয় করতে হয় এবং বেশীবার পুনরাবৃত্তিরও প্রয়োজন হয়।

**শব্দের সংখ্যা যত বেশী হবে, সেটি আয়ত্ত করার জন্য তত অধিক সময়ের প্রয়োজন**

**(ii) সঞ্চয় প্রণালীর সাহায্যে স্মৃতি পরীক্ষণ (Memorization by Saving Method):** পরীক্ষক একটি অর্থহীন বর্ণসমষ্টির তালিকা পরীক্ষার্থীর সামনে আবৃত্তি করে যাবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষার্থী সম্পূর্ণ তালিকাটি নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারছে। দেখা গেল পরীক্ষণ পাত্র ১২ বারে সম্পূর্ণ তালিকাটি নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারল। ৩৪ ঘণ্টা পরে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীকে আগের যে শব্দ তালিকাটি সে আয়ত্ত করেছে তার কতটা মনে আছে পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখা গেল ১৩টি শব্দের মধ্যে ৩টি শব্দ তার মনে আছে। পরীক্ষক আবার আগের দিনের মতো তালিকাটি পরীক্ষার্থীর সামনে আবৃত্তি করে যাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষণ-পাত্র সম্পূর্ণ তালিকাটি আবার আয়ত্ত করতে পারে। দেখা গেল, দ্বিতীয় দিন তালিকাটি আয়ত্ত করতে তাকে অনেক বার কম আবৃত্তি করতে হয়েছে এবং তার অনেক কম সময় লেগেছে। দ্বিতীয় বার পরীক্ষা করে দেখা গেল পরীক্ষণ-পাত্র ৭ বারে সম্পূর্ণ তালিকাটি নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারল। কিন্তু প্রথমবার পরীক্ষণ-পাত্রের লেগেছিল ১২ বার। অতএব পরীক্ষণ-পাত্র বাঁচাতে পেরেছে ১২—৭=৫ বার এবং পরীক্ষার্থীর মোট সঞ্চয় হল ১২-তে পাঁচ বা ৪১·৭%। একেই বলে সঞ্চয় পদ্ধতির সাহায্যে স্মৃতি পরীক্ষা।

**(iii) আমরা কি হারে ভুলে যাই?—তার পরীক্ষণ:** কোন বিষয় শিক্ষা করার অব্যবহিত পরেই বিস্মৃতি বেশী মাত্রায় এবং দ্রুত ঘটে। ক্রমশঃ তা কমমাত্রায় এবং মন্দগতিতে ঘটে থাকে। যদি একটি অর্থহীন শব্দের তালিকা (যেমন—lut, fom, bot, muz, roz) মুখস্থ করার পরে, কিছু সময়ের বিরতি দিয়ে সেটা স্মরণ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, সম্পূর্ণ তালিকাটি আমরা স্মরণ করতে পারছি না, অংশবিশেষ ভুলে গেছি। কত সময় পরে কতটুকু স্মরণ করতে পারি, আর কতটুকু ভুলে যাই তা নিম্নোক্ত বর্ণিত মনোবিদ্ এবিংহাউস (*Ebbinghaus*)-এর তালিকা থেকে জানা যাবে।

| শোনা ও মনে করার মধ্যে সময়ের ব্যবধান | মনে রাখার শতকরা হার | ভুলে যাওয়ার শতকরা হার |
|---|---|---|
| ২০ মিনিট | ৫৮ | ৪২ |
| ১ ঘণ্টা | ৪৪ | ৫৬ |
| ৯ ঘণ্টা | ৩৬ | ৬৪ |
| ২৪ ঘণ্টা | ৩৪ | ৬৬ |
| ২ দিন | ২৮ | ৭২ |
| ৬ দিন | ২৫ | ৭৫ |
| ৩১ দিন | ২১ | ৭৯ |

উপরিউক্ত তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথম দিকে অর্থাৎ ২০ মিনিট থেকে ২ দিনের ব্যবধান ভুলে যাওয়ার হার দ্রুত হচ্ছে, কিন্তু তারপর অর্থাৎ ২ দিন থেকে ৩১ দিনের ব্যবধানে ভুলে যাওয়ার হার ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে।

**(iv) স্মৃতি-প্রসর সম্বন্ধে পরীক্ষণ:** একবার 'কতটুকু মনের মধ্যে ধরে রাখা যায়?

কতকগুলি অর্থহীন বর্ণসমষ্টি বা সংখ্যা একবার পরীক্ষণ পাত্রের কাছে উপস্থাপিত করার পর পরীক্ষণ পাত্র যতটুকু মনের মধ্যে ধরে রেখে তার নির্ভুল ও সুশৃঙ্খল পুনরাবৃত্তি করতে পারে তাকেই স্মৃতি-প্রসর (memory-span) বলে। এই পরীক্ষণের দ্বারা জানা যায় বিভিন্ন ব্যক্তি কত বেশী সংখ্যক সংখ্যা বা অক্ষর শুধু একবার দেখার বা শোনাবার পর মনে রাখতে পারে এবং নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারে। কোন ব্যক্তির স্মৃতির প্রসর নির্ণয় করতে হলে তাকে এমন সংখ্যার সারি বা অক্ষরের সারি দেওয়া হয় যার দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বাড়িয়ে যাওয়া

হয় এবং পরীক্ষা করে দেখা হয় পরীক্ষণ-পাত্র কতদূর পর্য্যন্ত নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারে। পরীক্ষক ৬টি বিভিন্ন তালিকা তৈরী করবেন, তন্মধ্যে প্রথমটি ৩টি অঙ্কের বা ৩টি অক্ষরের হবে এবং প্রতি লাইনে একটি করে সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে শেষ লাইনে অঙ্কের বা অক্ষরের সংখ্যা হবে ১২টি। তালিকাগুলি তৈরী করার সময় মনে রাখতে হবে যে, প্রথম লাইনের শেষ সংখ্যা বা বর্ণ যেন দ্বিতীয় লাইনের প্রথম অক্ষর বা সংখ্যা না হয়। পরীক্ষণ-পাত্র অক্ষর বা সংখ্যাগুলি দেখার বা শোনার পর কতদূর স্মরণ করতে পারছে তা তাকে বলতে বা কাগজে লিখতে বলা হয়।

| সংখ্যা-সারি | অক্ষর-সারি |
|---|---|
| ৬ ৩ ৯ | প ক ভ |
| ৮ ২ ৫ ৪ | র ধ গ ন |
| ৬ ১ ৩ ৭ ৯ | ল ব ত ম চ |
| ৪ ২ ৬ ৮ ৩ ৫ | ট প ঞ ঝ থ চ |
| ৭ ৪ ৯ ১ ২ ৬ ৩ | র দ হ ফ জ ক ঠ |
| ৮ ২ ৫ ৪ ৩ ৭ ৯ ১ | প ত ন ঞ চ ঝ ই অ |
| ৪ ৫ ৬ ৩ ৯ ৮ ৭ ২ ১ | উ ঐ ঢ হ খ ন ম ষ ধ |
| ৫ ৬ ৮ ৯ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ৯ | প ক জ ঝ ঋ থ ক ম ঞ ত |
| ৮ ৭ ৬ ৩ ২ ১ ৪ ৫ ৪ ৬ ৭ | জ ক ই উ ঋ ৯ গ ক ব ঞ ঝ |
| ৯ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭৮ ৯ ১ ৬ ২ | থ প ল জ শ হ স র ড ণ ঝ গ |

বয়স অনুযায়ী স্মৃতি-প্রসরের তারতম্য ঘটে। শ্রবণের দ্বারা স্মৃতি অনুশীলন এবং দর্শনের দ্বারা স্মৃতি অনুশীলন সংক্রান্ত পরীক্ষণ কার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে ৪ থেকে ৬ বছরের শিশুর গড়ে স্মৃতি-প্রসর হল ৪টি সংখ্যা, ৬ থেকে ৮ বৎসরের শিশুর হল ৫টি সংখ্যা, ৯ থেকে ১৪ বছরের ৬টি সংখ্যা এবং ১৪ বৎসরের উর্ধ্বে ৭টি সংখ্যা। মানসিক অবস্থা, মনোযোগ, অনুশীলন ও স্ত্রীপুরুষ ভেদেও স্মৃতি-প্রসারের তারতম দেখা যায়।[1]

1. "Memory span differs with age and with the type of material used. For example, the average span for auditory presentation and vocal recall of digits is four between four and five years, five between six and eight years, six between nine and twelve years and seven beyond twelve years."

—Munn : Psychology, Page 265.

**(v) আংশিকভাবে শিখলে বেশী মনে থাকে—না, সম্পূর্ণ শিখলে বেশী মনে থাকে—তার পরীক্ষণ (To determine the capacity of memorization by part and by whole method of learning) :** অর্থহীন বর্ণসমষ্টির ১০টি অক্ষরবিশিষ্ট একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। সেটি পরীক্ষণ-পাত্রকে দুরকম ভাবে শিখতে বলা হবে। সম্পূর্ণ তালিকাটি পর পর পড়ে একেবার মুখস্থ করতে হবে। আবার তালিকাটি কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিয়ে আংশিকভাবে মুখস্থ করে সম্পূর্ণ তালিকাটি মুখস্থ করতে হবে। এই পরীক্ষণ-কার্য কবিতার সাহায্যেও করা যেতে পারে। যেমন, প্রথমে পরীক্ষণ-পাত্রকে নির্দেশ দিতে হবে যে, পুরো কবিতাটি বার বার পড়ে মুখস্থ করার। তারপর কবিতাটি ছোট ছোট তিন চার ভাগে ভাগ করে নিয়ে একভাগ করে মুখস্থ করলেই পুরো মুখস্থ হয়ে যাবে। স্টপওয়াচ (stop-watch)-এর সাহায্যে শেখার সময় লিখে রাখতে হবে। একবার পড়েই পরীক্ষণ-পাত্রকে সেটা পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করতে হবে। যদি আটকে যায় তাহলে আবার প্রথম থেকে পড়তে হবে। যত বার পড়বে তার সংখ্যা লিখে রাখতে হবে, আর মুখস্থ হবার পরে সময়টা দেখে নিতে হবে।

এরূপ পরীক্ষণের' সাহায্যে দেখা যায়, সম্পূর্ণ শিক্ষণ-পদ্ধতির (whole method) সাহায্যে আমরা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে পারি।

**(vi) পশ্চাৎমুখী বাধ সম্পর্কে পরীক্ষণ (Experiment on Retroactive inhibition) :** কোন বিষয় শিক্ষা করার সময় প্রথমটি শেখার পর কিছুটা বিরতি দিয়ে তবে দ্বিতীয়টি শিক্ষা করতে হয়। কিন্তু কোন একটি বিষয় শেখার পরই যদি কিছু সময়ের বিরতি না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় আমরা শিখি তাহলে দেখা যায় প্রথম বিষয়টির অংশবিশেষের বিস্মরণ ঘটে। এর কারণ দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টিকে মনে রাখার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করছে এবং পেছন দিক থেকে এসে প্রথম বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। একেই বলা হয় 'পশ্চাৎমুখী বাধ' (Retroactive inhibition)।

এ সম্পর্কে পরীক্ষণ কার্য চালাইবার জন্য দু দল পরীক্ষণ-পাত্র প্রয়োজন, যারা মোটামুটি বয়স, লেখাপড়া, বুদ্ধির দিক থেকে সমকক্ষ। প্রথম দলটিকে একটি তালিকা মুখস্থ করতে দেওয়া হল এবং তারপর দ্বিতীয় একটি তালিকা

মুখস্থ করার জন্য বলা হল। এরপর প্রথম তালিকার বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি করার জন্য বলা হল। দ্বিতীয় দলটিকে প্রথম তালিকাটি মুখস্থ করার পর দ্বিতীয় তালিকাটি মুখস্থ করতে না বলে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বলা হল। দেখা গেল যে, বিশ্রামের জন্য দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে প্রথম দলের তুলনায় বিস্মৃতির সংখ্যা খুবই কম।

## প্রশ্নাবলী

1. Analyse memory. Bring out the factors which influence forgetting. [C. U. 1968

   Ans. ( পৃঃ ৭৬—পৃঃ ৮৬ )

2. What is memory? What are its various factors? Throw light on each of them.

   Ans. ( পৃঃ ৮১—পৃঃ ৮৬ )

3. How would you proceed to memorize (a) a short poem, (b) a long poem, (c) mathematical tables?

   Ans. ( পৃঃ ৮১—পৃঃ ৮৬ )

4. What do you understand by Habit Memory? Distinguish it from True Memory. How can the knowledge of this difference between these two types of memory be helpful to a teacher in his work?

   Ans. ( পৃঃ ৮৬—পৃঃ ৯০ )

5. How do we retain things in our mind?

   Ans. ( পৃঃ ৯০—পৃঃ ৯৭ )

6. Explain fully the laws of association. Can the laws be reduced to one single law?

   Ans. ( পৃঃ ৯৮—পৃঃ ১১২ )

7. What are the conditions of remembering?

   Ans. ( পৃঃ ৯৪—পৃঃ ৯৭ )

8. What are the marks of good memery? Can memory be improved by practice? How can you increase the power of memorization of a child?

   Ans. ( পৃঃ ৯৮—পৃঃ ১১২ )

9. Mention the most economical methods of memorizing. Explain how you can utilise them in your teaching practice.

   Ans. ( পৃঃ ৯০—পৃঃ ৯৭ )

10. What do you understand by economical methods of memorizing? Show your acquaintance with some of th'm. [C. U. 1966

Ans. ( পৃঃ ৯৮—পৃঃ ১১২ )

11. Why do we forget? What are the different causes of forgetting? [C. U. 1970

Ans. ( পৃঃ ৯৯—পৃঃ ১০৮ )

12. How will you determine the rate of forgetting of your pupils? List remedies for minimizing the rate of forgetting.

Ans. ( পৃঃ ১১২ —পৃঃ ১১৫ )

13 Describe some of the experiments made on memory.

Ans, ( পৃঃ ৯৮—পৃঃ ১০৯ )

14. Discuss the importance of attention and interest in memorization. How can memory be improved? [C. U. 1963

Ans. ( পৃঃ ৯৮—পৃঃ ১১২ )

15. Describe various methods of memorizing and the points of advantage and disadvantage of each.

Ans. (পৃঃ ১০৮—পৃঃ ১১০ )

16. What is memory span? Haw can it be measured?

Ans. ( পৃঃ—পৃঃ )

17. Describe some experiments that have been conducted on forgetting of learned materials. What is over-learning?

Ans. ( পৃঃ ১১২—পৃঃ ১১৫ )

18. What do you understand by retrocactive inhibition? Discuss its educational significance.

Ans. (পৃঃ ১০৬—পৃঃ ১১২ )

19. 'Recitation is a significant means for retention.'—Discuss.

Ans.' ( পৃঃ ৯৮—পৃঃ ১১২ )

20. What are the conditions of good memory? [C. U. 1962

21. Write short notes on :—

(a) Memory [C. U. 196' ], (b) Retroactive Inhibition.

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# মনোযোগ ও আগ্রহ

# ( Attention and Interest )

### ১। মনোযোগের স্বরূপ (Nature of Attention) :

কোন বিষয়ে মনকে নিযুক্ত করা অর্থাৎ কোন নির্বাচিত বিষয়কে চেতনার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসাই হল মনোযোগ। সব বিষয়ের প্রতি একই সময়ে আমাদের মন নিবিষ্ট করা কখনও সম্ভব নয়। কাজেই সাধারণতঃ একটি বিষয়ের পরে আর একটি বিষয়ে আমরা মনঃসংযোগ করি। মনোযোগ বলতে আমরা সেজন্য সাধারণতঃ বুঝে থাকি অসংখ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে দু-একটি বিষয়কে নির্বাচন করে নিয়ে তার উপর মনকে নিবিষ্ট করা এবং অন্যান্য বিষয় থেকে সাময়িকভাবে মনকে দূরে সরিয়ে নেওয়া। সুতরাং মনোযোগ হল চেতনার ক্ষেত্রটিকে সঙ্কুচিত করে মাত্র দু-একটি বিষয়বস্তুতে মন নিবিষ্ট করা।

**কোন বিশেষ বিষয়ে মনঃসংযোগ করাই হল মনোযোগ**

মনোযোগ শব্দটিকে তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, মনোযোগ বলতে বোঝায় কোন বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট চেতনা। মনোযোগ হল একটা মানসিক শক্তি। দ্বিতীয়তঃ, মনোযোগ বলতে বোঝায় একপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মনকে কোন একটি বস্তুর উপর নিবিষ্ট করা হয় এবং তারই ফলস্বরূপ বস্তুটি পূর্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। তৃতীয়তঃ, মনোযোগ বলতে কেবলমাত্র মানসিক প্রক্রিয়াকে না বুঝিয়ে, মানসিক প্রক্রিয়া এবং বস্তুর সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চেতনা উভয়কে বোঝাতে পারে। এই মতানুসারে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চেতনা মনোযোগেরই অংশস্বরূপ।

**বিভিন্ন অর্থে মনোযোগ শব্দটির ব্যবহার**

সাধারণতঃ, তৃতীয় অর্থেই মনোযোগ কথাটিকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং মনোযোগ হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা কোন একটি বিষয়ের উপর আমাদের মনকে নিবিষ্ট করি এই উদ্দেশ্যে যে, বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে আমরা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞানলাভ করব। আমি ঘরে বসে মনোযোগ দিয়ে

**মনোযোগ কথাটির সাধারণ অর্থ**

একটি বই পড়ছি। বাইরের নানা রকম শব্দ, গোলমাল যদিও আমার কানে আসছে, তবু বইটির প্রতি মনোযোগী হওয়াতে পাঠ্যবিষয়টি আমার চেতনার কেন্দ্রস্থল (focus of consciousness) এবং অন্যান্য বিষয়গুলি চেতনার ক্ষেত্র অধিকার করে আছে।

## ২। মনোযোগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Attention) :

মনোযোগের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতে পারে :

মনোযোগ ইচ্ছামূলক মানসিক প্রক্রিয়া

(ক) মনোযোগ একটি ইচ্ছামূলক মানসিক প্রক্রিয়া, সেহেতু এই মানসিক প্রক্রিয়াটিকে একটি বিশেষ দিকে চালিত করতে হয়। এই প্রক্রিয়া চেতনাকে বস্তুর উপরে কেন্দ্রীভূত করে বস্তুর ধারণাকে সুস্পষ্ট করে।

মনোযোগ নির্বাচনধর্মী

(খ) মনোযোগ নির্বাচনধর্মী (selective)। একটি মাত্র বিষয় নির্বাচন করা ও অপরগুলিকে বর্জন করা বা চেতনার ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করাই হল মনোযোগের ধর্ম। যেমন, কোন ছাত্র যখন পাঠ্যবিষয়ের উপর মনকে নিবদ্ধ করে তখন সে অন্যান্য বিষয়—যেমন, পথ দিয়ে গাড়ি চলার শব্দ, পাখীর ডাক, নানা রকম গোলমালের শব্দকে চেতনার ক্ষেত্র থেকে বর্জন করে।

মনোযোগের সদর্থক এবং নঞর্থক দিক

(গ) মনোযোগের মধ্যে দুটি দিক আছে—একটি সদর্থক এবং আরেকটি নঞর্থক (positive and negative)। যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় সেটা হল সদর্থক দিক এবং অপর যে যে বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে নেওয় হয় সেটা নঞর্থক দিক।

মনোযোগের ক্ষেত্র সীমিত

(ঘ) মনোযোগের ক্ষেত্র খুব সীমিত বা সংকীর্ণ, যেহেতু একই সময়ে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের প্রতিই আমরা মনোযোগী হতে পারি।[1]

1. প্রশ্ন হল, একই সময়ে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি আমরা মনোযোগী হতে পারি—এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। কেউ বলেন এক, কেউ বা বলেন দুই, কেউ বা বলেন ছয়। আসলে আমরা একের অধিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি না।

(ঙ) মনোযোগ হল অস্থির ও সঞ্চরণশীল। মনোযোগ বস্তু থেকে বস্তুতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সাধারণতঃ কয়েক সেকেণ্ডের বেশি কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে আমরা মনকে নিবদ্ধ রাখতে পারি না। একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে বিষয়টি জানা যায়। যদি একটি ঘড়ি কানের কাছে ধরা যায়, আমরা ঘড়িটির টিকটিক শব্দ শুনি এবং মনে হয় শব্দ একবার তীব্র হচ্ছে একবার ক্ষীণ হচ্ছে, আসলে আমাদের মনোযোগের অস্থিরতা ও সঞ্চরণশীলতাই এর কারণ।

অস্থির ও সঞ্চরণশীল

(চ) মনোযোগ অস্থির ও সঞ্চরণশীল হলেও একটা ধারাবাহিক (continuous) এবং একত্ববিশিষ্ট (unified) ক্রিয়া। কতকগুলি বর্ণ বা সংখ্যার প্রতি একসঙ্গে মনোযোগী হলে বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে দৃষ্ট হয়।

(ছ) মনোযোগ হল অনুসন্ধানী (exploratory)। মনোযোগ নিত্য নতুন নতুন বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করে বেড়ায়। সাধারণতঃ বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব বা অভিনবত্ব না থাকলে সে বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়ানই মনোযোগের ধর্ম। মনোবিদ্ উডওয়ার্থের (*Woodworth*) "মতে 'মনোযোগ' হল সচল, কারণ এ হল অনুসন্ধানী, অনবরত নতুনকে নিয়ে এ পরীক্ষা করতে চায়।"[1]

অনুসন্ধানী

(জ) মনোযোগ উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া। মনোযোগ জ্ঞেয় বস্তুর অস্পষ্টতা দূর করে তাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে তোলে। মনোযোগ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চেতনার কারণস্বরূপ। কিন্তু তাই বলে মনোযোগ সুস্পষ্ট চেতনার সঙ্গে অভিন্ন নয়।

ধারণাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে তোলে

(ঝ) মনোযোগ হল এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে। যদি ক, খ, গ, ঘ—এই চারটি বিষয়ের প্রতি আমরা বার বার মনোযোগী হই তাহলে যে পারম্পর্য অনুযায়ী তাদের প্রতি মনোযোগী হব, সেই পারম্পর্য অনুযায়ী তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হবে।

পারম্পর্য অনুযায়ী সম্বন্ধ স্থাপন

(ঞ) মনোযোগ হল বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক মানসিক প্রক্রিয়া।

1. **"Attention is mobile because it is exploratory, it continually seeks something fresh for examination."—Woodworth.**

কোন একটি গাছের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে গাছের বিভিন্ন অংশ, তার কাণ্ড, তার শাখা-প্রশাখা, ফল-ফুল প্রভৃতি বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগী হতে পারি। আবার এই বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে গাছের যে সামগ্রিক রূপটুকু ফুটে উঠছে তার প্রতি মনোযোগী হতে পারি।

**বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক**

(ট) মনোযোগের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়বস্তুর বিশেষ উপযোজনের (special adjusment) প্রয়োজন হয়। যেমন, আমার মনোযোগের বিষয়বস্তু যদি আমার পেছনে থাকে তাহলে আমাকে ঘাড়টিকে ঘুরিয়ে সেই বস্তুটির প্রতি মনোযোগী হতে হবে। এমনিভাবে চোখে দেখার জন্য বা শব্দ শোনার জন্য সেই সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়ের উপর যাতে উদ্দীপকটি ক্রিয়া করতে পারে তার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হয়।

**মনোযোগের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের উপযোজন**

## ৩। মনোযোগের কারণ (Conditions or Deterninants of Attention) :

প্রশ্ন হল : অসংখ্য বস্তুর মধ্যে বিশেষ কোন একটির প্রতি আমাদের মনোযোগ ধাবিত হয় কেন ? কোন্ কোন্ বিষয়ের দ্বারা আমাদের মনোযোগ নির্ধারিত হয় ? কোন একটি বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার কারণ কি ?

যে বিষয়গুলি মনোযোগ নির্ধারণ করে তাকেই বলা হয় মনোযোগের কারণ। এই কারণগুলিকে তিন দিক থেকে বিচার করা যেতে পা'র। যথা— **(ক) উদ্দীপক সংক্রান্ত কারণ** বা **ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কারণ** (relating to objective conditions), (খ) **মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণ** বা **ব্যক্তি-সাপেক্ষ কারণ** (relating to mental conditions or subjective conditions) এবং (গ) **দৈহিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণ** (relating to physical conditions)।

**মনোযোগের কারণ তিন প্রকার**

(ক) **উদ্দীপক সংক্রান্ত কারণ** বা **ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কারণ :** ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কারণ হল সেই সব কারণগুলি যেগুলি বাইরের জগতের বস্তু বা উদ্দীপকনির্ভর। যথা—

(i) **তীব্রতা (Intensity) :** উদ্দীপকের মধ্যে যেটি বেশি তীব্র, সেটি সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন—ক্ষীণ, মৃদু স্বরের তুলনায়

উচ্চ স্বর সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ; উজ্জ্বল আলোক, তীব্র গন্ধ প্রভৃতির দিকে আমাদের মনোযোগ সহজেই ধাবিত হয়।

(ii) **আকার (Size) :** সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকার বস্তুর তুলনায় বৃহৎ বস্তু সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, হাতি ও ছাগলের মধ্যে হাতিই সহজে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। দৈনিক সংবাদপত্রে বড় অক্ষরে ছাপা বিষয় সহজে আমাদের নজরে পড়ে। ঐ একই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনদাতারা বড় বড় অক্ষরে লেখা পোস্টার ব্যবহার করে।

(iii) **গতিশীলতা (Mobility) :** স্থির বস্তুর তুলনায় গতিসম্পন্ন বস্তু সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বড় বড় শহরে গতিশীল বৈদ্যুতিক আলোর বিজ্ঞাপনগুলো সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(iv) **নতুনত্ব (Novelty) :** যা কিছু নতুন, বৈচিত্র্যপূর্ণ তা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নতুন খেলনা, নতুন বই, নতুন পোশাক সহজেই শিশুর মনকে আকর্ষণ করে। চেনা পথে চলতে চলতে হঠাৎ একটা নতুন বাড়ি দেখে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। নতুন খবর শোনার আগ্রহ আমাদের খুবই।

(v) **পরিবর্তনশীলতা (Change) :** পরিবর্তন যদি আকস্মিক হয় এবং অবিচ্ছিন্ন ধারায় না চলে তাহলে তা আমাদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করে। ঘড়ির টিকটিক শব্দ ক্রমাগত চলতে থাকলে তা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। কিন্তু হঠাৎ শব্দ থেমে গেলেই আমাদের মনোযোগ সেদিকে ধাবিত হয়।

(vi) **পুনরাবৃত্তি (Repetition) :** পুনরাবৃত্তিও মনোযোগের অন্যতম কারণ। কোন একটি উদ্দীপকের যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে আমাদের মনোযোগ সহজেই সেদিকে আকৃষ্ট হয়। শিক্ষক মহাশয় কোন একটি বিষয় যখন বার বার ব্যাখ্যা করতে থাকেন তখন ছাত্রের মনোযোগ সে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। তবে পুনরাবৃত্তি যদি বার বার হতে থাকে তাহলে একঘেয়েমির জন্য সে বিষয় থেকে মনোযোগ অপসারিত হতে পারে।

(vii) **বৈসাদৃশ্য (Contrast) :** বৈসাদৃশ্য মনোযোগের অন্যতম কারণ। খুব লম্বা লোকের পাশে যদি কোন বেঁটে লোক, কিংবা খুব মোটা লোকের পাশে যদি কোন রোগা লোক দাঁড়ায়, তাহলে সহজেই আমাদের দৃষ্টি সেদিকে ধাবিত হয়।

(viii) **গোপনতা** (Secrecy): গোপন বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ সহজেই ধাবিত হয়। কেউ যদি কোন খবর গোপন রাখতে চায় তাহলে স্বভাবতই সে বিষয়টির প্রতি আমাদের মনোযোগ ধাবিত হয়। আমরা খবরটি শোনার জন্য উদগ্রীব হই।

(ix) **বিচ্ছিন্নতা** (Separation): যখন একাধিক উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ের উপর কাজ করছে তখন কোন একটি উদ্দীপককে অন্য উদ্দীপক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে তা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেতার এবং স্বরোদ, এই দুটি বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে বাজান হচ্ছে। যদি সেতারের বাজনাটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শুধু মাত্র স্বরোদটি বাজতে থাকে তাহলে বিষয়টির প্রতি আমাদের মনোযোগ ধাবিত হয়।

(x) **দীর্ঘস্থায়িত্ব** (Long duration): উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িত্ব মনোযোগকে সহজেই আকর্ষণ করে। কোন শিশু কেঁদে উঠেই থেমে গেলে আমাদের নজর সেদিকে নাও যেতে পারে। কিন্তু সে অনবরত যদি কেঁদেই চলে তার দিকে আমাদের মনোযোগ দিতেই হয়।

**(খ) মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণ** বা **ব্যক্তি-সাপেক্ষ কারণ**: মনোযোগের ব্যক্তি-সাপেক্ষ কারণ হল সেগুলি, যেগুলি ব্যক্তিনির্ভর, বস্তুনির্ভর নয়। যথা—

(i) **অনুরাগ** বা **আগ্রহ** (Interest): যার যে বিষয়ে অনুরাগ তার মনোযোগ সে বিষয়ে বেশি। এজন্যই দৈনিক সংবাদপত্রে ক্রীড়ামোদী ব্যক্তি আগে খেলার খবরটি দেখেন এবং ব্যবসায়ী দেখেন বাজার দর।

(ii) **আবেগ** (Emotion): আবেগও মনোযোগ নির্ধারণ করে।[1] যাকে আমরা ভালবাসি তার সদ্‌গুণের প্রতি আমাদের মনোযোগ ধাবিত হয়। আর যাকে আমরা অপছন্দ করি তার দোষত্রুটিগুলিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(iii) **কামনা** (Desire): কামনা, বাসনা বা অভিপ্রায় মনোযোগ নির্ধারণ করে থাকে। যে ব্যক্তি অর্থের কামনায় উন্মত্ত, তার মনোযোগ সকল সময়ই অধিক অর্থ উপার্জন করার দিকে।

1. **"And not only our interests but our general mind or attitude may affect the direction of our attention."**

**—Rex and Knight: A Modern Introduction to Psychology. Page 113.**

(iv) **অভিজ্ঞতা** (Experience) : পূর্ব-অভিজ্ঞতাও মনোযোগ আকর্ষণ করার অন্যতম হেতু। যেমন, পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে শিকারী জানে বনে কোথায় সে শিকারের দেখা পাবে এবং সেখানে উপস্থিত হলেই তার মনোযোগ প্রত্যাশিত শিকারের দিকে ধাবিত হয়।

(v) **অভ্যাস ও শিক্ষা** (Habit and Education) : অভ্যাস এবং শিক্ষাও মনোযোগ নির্ধারণ করে থাকে। ঘুম থেকে উঠেই যার খবরের কাগজ পড়া অভ্যাস, সকালে তাঁর মনোযোগ খবরের কাগজের দিকেই সহজে যায়। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসম্পর্কীয় বিষয়ে, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ গাছপালা, ফুল ইত্যাদিতে, প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বিভিন্ন ধরনের প্রাণীতে মনোযোগী হয়ে থাকেন।

(vi) **মানসিক প্রবণতা** (Mental Disposition) : জন্মগত মানসিক প্রবণতাও মনোযোগ নির্ধারণ করে। দক্ষ গায়ক, শিল্পী, চিত্রকর প্রভৃতি জন্মগত মানসিক প্রবণতার জন্যই নিজের নিজের বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হন।

(vii) **মানসিক সুস্থতা** (Sound condition of mind) : রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যাধি প্রভৃতি কারণবশতঃ যদি মন চঞ্চল ও অস্থির হয় এবং মনের স্বাভাবিক সুস্থতা ব্যাহত হয় তাহলে কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সম্ভব হয় না। সে কারণে মানসিক সুস্থতাও মনোযোগের একটি কারণ।

যদিও উদ্দীপক সংক্রান্ত কারণ ও মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণ—উভয়ই মনোযোগ নির্ধারণ করে থাকে তবু মনে হয় ব্যক্তিসাপেক্ষ কারণগুলিরই প্রভাব বেশি। মন যদি কোন কারণে উদ্বেগে ভারাক্রান্ত থাকে তাহলে তীব্র উদ্দীপক যেমন, কোনও উচ্চ শব্দ মনকে আকৃষ্ট করতে পারে না। আবার যখন বন্ধুর প্রত্যাশায় বসে আছি তখন সে চুপি চুপি ডাকলেও সাড়া দিয়ে থাকি।

**(গ) দৈহিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণ :** দৈহিক সুস্থতা মনোযোগের অন্যতম কারণ। দেহ সুস্থ থাকলেই কোন বিষয়ের প্রতি মনঃসংযোগ করা আমাদের পক্ষে সংব হয়। দেহ যদি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় বা অন্য কোন কারণবশতঃ যদি দৈহিক সুস্থতা ব্যাহত হয় তাহলে কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করা সম্ভব হয় না।

মনোযোগের শারীরিক কারণ, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিশেষ করে গুরু-মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ এলাকায় (association area) নিহিত। কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার অর্থ সেই সব স্নায়ুর ক্রিয়া, যেগুলি, ঐ বিষয়ের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

যে অনুষঙ্গ এলাকা, তার সঙ্গে যুক্ত এবং সেই সব স্নায়ুপথের নিষ্ক্রিয়তা যেগুলি ওর সঙ্গে যুক্ত নয়।

## ৪। মনোযোগের প্রকারভেদ (Types or Kinds of Attention) :

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী মনোযোগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

**(ক) ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ (Voluntary Attention, Non-voluntary Attention and Involuntary Attention) :** মনোযোগের ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করা বা না করার উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

(i) **ইচ্ছাকৃত মনোযোগ (Voluntary Attention) :** যখন আমরা স্বেচ্ছায় কোন বিষয়বস্তুর উপর মনোনিবেশ করি তখনই তাকে বলা হয় ইচ্ছাকৃত মনোযোগ। ইচ্ছাকৃত মনোযোগ হল স্বতঃপ্রসূত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং একে সক্রিয় (Active) মনোযোগও বলা যেতে পারে। বাইরে গোলমাল চলছে, তবু কোন ছাত্র যখন নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করে পুস্তকে মনঃসংযোগ করে, তখন তার মনোযোগ ইচ্ছাকৃত মনোযোগের দৃষ্টান্ত। নীরস বিষয়বস্তুর মর্মোপলব্ধি করার জন্য অনেক সময় আমাদের একরকম জোর করেই কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে হয়।

(ii) **অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ (Non-voluntary Attention) :** যখন আমাদের মন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কোন বিষয়ে মনোযোগী হয়, তখন তাকে বলা হয় অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ। এই জাতীয় মনোযোগ হল নিষ্ক্রিয় (Passive)। ঘরে বসে বই পড়তে পড়তে একটা তীব্র গন্ধ নাকে এল। তখন আমাদের মনোযোগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার প্রতি ধাবিত হল। অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ নির্ধারিত হয় উদ্দীপকের দ্বারা। তীব্র উদ্দীপক স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(iii) **ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ (Involuntary Attention) :** মনোযোগী হবার ইচ্ছা নেই, তবু জোর করে কোন বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করা হলে তাকে ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ বলে। এক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মন বিষয়-বস্তুর উপর নিবিষ্ট হয়। বিষয়বস্তুটি মোটেও আকর্ষণীয় বা প্রীতিকর নয়, তবু বিষয়টি একরকম জোর করেই মনকে আকৃষ্ট করে। অঙ্ক করার স্বাভাবিক ইচ্ছা

নেই, বরং অনিচ্ছাই আছে, তবু পরীক্ষার কথা ভেবে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার প্রতি মনোযোগী হতে হয়।

**(খ) বস্তুবিষয়ক মনোযোগ এবং ভাববিষয়ক মনোযোগ (Sensory Attention and Ideational Attention) :** যখন আমাদের মনোযোগ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে (sensible objects) আকৃষ্ট হয় তখন আমাদের মনোযোগকে বলা হবে **বস্তুবিষয়ক মনোযোগ**। যেমন—কোন ফুল, ফল, বাড়ি বা গাছের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

কিন্তু যখন আমাদের মনোযোগ ভাব, ধারণা বা অনুভূতির প্রতি ধাবিত হয় তখন তাকে বলা হবে **ভাববিষয়ক মনোযোগ**। যেমন—আমার মনোযোগ যখন সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির প্রতি, কোন কাব্যের আলোচনার প্রতি বা মৃত বন্ধুর প্রতিরূপের (image) প্রতি ধাবিত হয়।

**(গ) পরোক্ষ মনোযোগ এবং প্রত্যক্ষ মনোযোগ (Immediate Attention and Derived Attention) :**

বিষয়বস্তুর আকর্ষণীয়তার উপর এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি।

কোন বস্তু চিত্তাকর্ষক বা আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য যখন সহজেই আমাদের মনোযোগ তার দিকে ধাবিত হয় তখন তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ মনোযোগ। যেমন, কোন মধুর সঙ্গীত বা কোন অভিনব ঘটনা সহজেই আমাদের মনকে আকর্ষণ করে।

যখন কোন বস্তু নিজে চিত্তাকর্ষক বা আকর্ষণীয় না হয়েও অন্য চিত্তাকর্ষক বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তখন সেই মনোযোগকে বলা হয় পরোক্ষ মনোযোগ। কলম আমরা অনেক দেখেছি, কিন্তু যখন বলা হয় যে এই কলমটি সাহিত্যিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্যবহার করতেন তখন তার প্রতি আমরা মনোযোগী হই। সেরূপ, ছাত্র যখন নীরস বিষয়ের প্রতি কেবলমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যেই মনোযোগী হয়, তখন সেই মনোযোগ হয় পরোক্ষ মনোযোগ।

**(ঘ) বিশ্লেষণাত্মক মনোযোগ এবং সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ (Analytical and Synthetical Attention) :** মনোযোগের বিষয়-বস্তুকে সমগ্র হিসেবে অবধারণ করা হচ্ছে, কি হচ্ছে না, তার উপরে এই শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তি।

যখন কোন বস্তুকে 'সমগ্র' হিসেবে না দেখে তাকে পৃথক পৃথক অংশে বিশ্লেষণ করে তার প্রতি মনোযোগী হই তখন আমাদের মনোযোগ হয়

বিশ্লেষণাত্মক। যেমন, একটি বৃক্ষকে তার বিভিন্ন অংশে (মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, ফুল-ফল প্রভৃতিতে) বিশ্লেষণ করে তার প্রতি মনোযোগী হওয়া।

মন যখন কোন বিষয়বস্তুর সামগ্রিক রূপটির প্রতি মনোযোগী হয় তখন সেই মনোযোগকে বলা হয় সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ। যেমন, একটি ঘরে নানারকম আসবাবপত্র সাজিয়ে আমরা যখন দেখি সাজানটা কিরকম হল, তখন সেই মনোযোগকে বলা হয় সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ।

দৈনন্দিন জীবনে বিষয়বস্তুতে মনোযোগী হতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করি যে, বিশ্লেষণাত্মক মনোযোগ এবং সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ একই সঙ্গে কার্য করে।

**(ঙ) তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক মনোযোগ (Theoretical and Practical Attention):**

যে মনোযোগের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ও বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করা, তাকে তাত্ত্বিক মনোযোগ বলে। যেমন, নিছক জ্ঞানের জন্য সুন্দরবন অঞ্চলের কোন একটি এলাকার বিবরণের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

যে মনোযোগের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বিষয়ের জ্ঞান লাভ নয়, কোন কার্যকরী ফল লাভ করা, তাকে ব্যবহারিক বা কার্যকরী মনোযোগ বলে। যেমন, সুন্দরবন অঞ্চলের কোন একটি বিশেষ এলাকায় চাষ আবাদ করার জন্য তার বিবরণে মনোযোগী হওয়া ব্যবহারিক মনোযোগের উদাহরণ।

## ৫। শিশুর মনোযোগের বিকাশ (Development of Attention in child):

শিশুর মনোযোগের বিকাশের তিনটি স্তর দেখতে পাওয়া যায়।

শৈশবে শিশুর মনোযোগ থাকে অনিচ্ছাকৃত, উদ্দীপক কতখানি আকর্ষণীয়, অর্থাৎ উদ্দীপকের প্রকৃতিই শিশুর মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্বতঃপ্রসূত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইচ্ছা এই সময় শিশুর ক্ষেত্রে খুব কমই দেখা যায়।

**অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ**

স্বেচ্ছায় কোন বিষয়বস্তুর উপর মনোনিবেশ করা তখন শিশুর পক্ষে তেমন সম্ভব হয় না। এই কারণে এই সময় শিশুকে এমন কোন বিষয় শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা উচিত নয় যাতে শিশুকে জেদ করে ইচ্ছা প্রয়োগ করে বিষয়বস্তুতে মনোযোগী হতে হবে। স্বাভাবিকভাবে শিশু মনোযোগী হবে এমন বিষয়ই তাকে এই সময় শিক্ষা দেওয়া উচিত। রঙিন ছবির বই, খেলাধূলার জিনিস, এগুলি সহজেই শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং এগুলির সাহায্যেই শিশুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

যখন শিশু আর একটু বড় হয় তখন তার মধ্যে ইচ্ছাকৃত মনোযোগ দেখা দেয়। এই স্তরে শিশু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের ইচ্ছাকে কোন বিষয়ের প্রতি প্রয়োগ করে তার প্রতি মনোযোগী হতে পারে। অনেক সময় অনেক পাঠ্যবিষয়ে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায় না, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণীয় বা প্রীতিকর নয় এমন বস্তুতেও সে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে ছাত্রজীবনে স্কুলে পড়াশোনার ব্যাপারে নিরস বিষয়বস্তু অনুধাবনের জন্য অনেক সময় শিশুকে নিজের ইচ্ছাকে জোর করেই প্রয়োগ করে মনঃসংযোগ করতে হয়।

ইচ্ছাকৃত মনোযোগ

শিশু যখন আরও বড় হয়, অর্থাৎ পরিণত বয়সে তার মধ্যে অভ্যাসমূলক মনোযোগ (habitual attention) দেখা দেয়। অভ্যাসমূলক মনোযোগ হল স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া। উদ্দীপক তেমন আকর্ষণীয় বা প্রীতিকর না হলেও, ব্যক্তি বিনা চেষ্টায় তার প্রতি মনোযোগী হতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়। সংসারের নানান কাজ-কর্মে, নানারকম দায়িত্বপালনের ব্যাপারে, নিজের নেশার চাপে, পরিবেশের চাপে, শখ মেটাবার আগ্রহের জন্য ব্যক্তির মধ্যে এই অভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা যায়।

অভ্যাসমূলক মনোযোগ

## ৬। মনোযোগের বিস্তার বা পরিধি (The Span or Range of Attention):

আমরা একই সময়ে এক সঙ্গে যে কয়টি বস্তুর প্রতি মনোযোগী হতে পারি, তাই নিয়ে মনোযোগের বিস্তার বা পরিধি নির্ধারিত হয়। প্রশ্ন হল, কয়টি বস্তুর প্রতি আমরা একসঙ্গে একই সময়ে মনোযোগী হতে পারি? যখন আমরা একাধিক বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করি, তখন ঐ মনঃসংযোগ কি সমকালীন (simultaneous), না ক্রমিক? অর্থাৎ আমাদের মনোযোগ কি একই সময়ে একাধিক বস্তুর উপর নিবিষ্ট হয়, না পর্যায়ক্রমে একটির পর একটিতে নিবিষ্ট হয়? এ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। কারও কারও মতে আমরা একই সময়ে, একই সঙ্গে, একাধিক বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করতে পারি। আবার কারও কারও মতে আমরা পর্যায়ক্রমে একটির পর একটিতে মনঃসংযোগ করি। তবে

মনোযোগ সমকালীন না, ক্রমিক

এই সব পৃথক পৃথক মনঃসংযোগের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এত সামান্য যে, মনোযোগ পর্যায়ক্রমে না ঘটে সমকালীন হচ্ছে, এরূপই ধারণা হয়।

ট্যাকিস্টোস্কোপ (Tachistoscope) বা ক্ষণদৃক যন্ত্রের সাহায্যে মনোযোগের বিস্তার বা পরিধি পরিমাপ করা যেতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে, সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি একেবারে পাঁচ-ছয়টির অধিক বস্তুর প্রতি মনোযোগী হতে পারে না। এই যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরী যে, কোনও ছবি খুব কম সময়ের জন্য এক ঝলক দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে যায় এবং সে সময় সেই বস্তুটির উপর এমন ভাবে আলোকপাত করা হয় যাতে পরীক্ষণ-পাত্র একবারের বেশী দুবার বস্তুটির উপর মনোযোগ দিতে পারে না। কয়েকটি সংখ্যা বা অক্ষরযুক্ত কার্ড বেছে নিয়ে ট্যাকিস্টোস্কোপের জানালাটির দিকে পরীক্ষণ-পাত্রকে মনোনিবেশ করতে হলে, সেই জানালার মধ্যে কার্ডগুলিকে আধ সেকেণ্ড ধরে দেখান হয়। কার্ডগুলিকে সংখ্যা বা অক্ষরের অনুক্রম অনুযায়ী দেখান চলবে না। এলোমেলো ভাবে দেখাতে হয়। তারপর পরীক্ষণ-পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কয়টি সংখ্যা বা অক্ষর সে দেখতে পেয়েছে। যতগুলি সংখ্যা বা অক্ষর পরীক্ষণ-পাত্র নির্ভুলভাবে অবধারণ করতে পারে, তাই হয় পরীক্ষণ-পাত্রের মানাযোগের পরিধি বা বিস্তার। দেখা গেছে যে, সাধারণ মানুষ পাঁচ ছয়টির অধিক সংখ্যা বা অক্ষরের প্রতি মনোযোগী হতে পারে না।

**দৃষ্টিগত মনোযোগের বিস্তার নির্ধারণ বিষয়ক পরীক্ষণ**

উপরে যে পরীক্ষণের কথা বলা হল তাহল দৃষ্টিগত মনোযোগের বিস্তার-নির্ধারকবিষয়ক পরীক্ষণ। পরীক্ষাটি যুগপৎ পদ্ধতির (simultaneous method) সাহায্যে করা হয়। আমাদের শ্রবণগত মনোযোগের বিস্তার দৃষ্টিগত মনোযোগের বিস্তারের তুলনায় অধিক। এ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পূর্বাপর উদ্দীপক উপস্থাপিত করার পদ্ধতির (method of successive stimuli) আশ্রয় নেওয়া হয়। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর আটটি শব্দের প্রতি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মনোযোগী হতে পারে। মেট্রোনাম (Metronome) নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে এ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। মেট্রোনাম বা মাত্রামাপক ঘণ্টা স্বল্প ব্যবধানে পর পর কয়েকবার দু-দফায় বাজান হয় এবং পরীক্ষণ-পাত্রকে দু-দফার ধ্বনির সংখ্যা সমান কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়। দেখা গেছে যে, পরীক্ষণ-পাত্র

**শ্রবণগত মনোযোগের বিস্তার**

দুইটির বেশী ধ্বনির প্রতি মনোযোগী হতে পারে না এবং ঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু যদি শব্দ ছন্দযুক্ত হয় তবে শ্রবণগত মনোযোগের বিস্তার অধিক হতে পারে।

একসঙ্গে কয়টি কাজের প্রতি আমরা মনোযোগী হতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ঐচ্ছিক ক্রিয়া একসঙ্গে একেবারে একটিই করা যেতে পারে। কিন্তু একটি ঐচ্ছিক ক্রিয়া থেকে আর একটি ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় দ্রুত মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

**একসঙ্গে কয়টি কাজের প্রতি আমরা মনোযোগী হতে পারি?**

পূর্বোক্ত পরীক্ষণগুলির ফলাফল থেকে যদিও একথা প্রকাশ পায় যে, ব্যক্তি একই সময়ে ছয়, সাত বা আটটি বিষয়ে মনোযোগী হতে পারে, তবু আসলে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, মানুষ এক সময়ে একটি বিষয়েই স্পষ্টভাবে মনোযোগী হতে পারে। একই সময়ে সমান স্পষ্টতার সঙ্গে একাধিক বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়, তবে অনেক সময় একাধিক সংখ্যা, বর্ণ প্রভৃতি নানাভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে একটি সমগ্র বিষয়রূপে জ্ঞাত হওয়ায় জন্য মনে হয় যেন একই সময়ে একাধিক বিষয়ে সমান স্পষ্টভাবে মনোযোগী হওয়া সম্ভব, কিন্তু আসলে তা নয়।

## ৭। মনোযোগের স্থায়িত্ব (Duration of Attention):

অবিরতভাবে একটি বস্তুর প্রতি আমরা কতক্ষণ মনোযোগী থাকতে পারি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, বিশেষ অভ্যাস ছাড়া আমাদের মনোযোগ অবিচ্ছিন্নভাবে কোন একটি বস্তুতে অতি অল্পক্ষণের জন্যই স্থির রাখা সম্ভব। অস্থিরতা মনোযোগের একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে গিয়ে আমরা দেখি যে, মনোযোগ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যাচ্ছে এবং আবার ফিরে আসছে। কোন একটি বিন্দুর উপর যদি মনোযোগকে নিবিষ্ট করি তবে দেখা যাবে যে, নিমিষের মধ্যে মনোযোগ অন্য বস্তুর উপর নিবদ্ধ হয়েছে। মনোযোগের স্থায়িত্ব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যেসব পরীক্ষণ-কার্য চালান হয়েছে তার থেকে জানা যায় যে, হ্রাস-বৃদ্ধিই মনোযোগের স্বভাব।

**অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ অল্পক্ষণের জন্যই সম্ভব**

মনোযোগের এই অস্থিরতা সহজেই পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়। যেমন, আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে একটা টেবিলের উপর একটি ঘড়ি

আছে যাকে একটু দূরে সরালেই দেখা যাবে যে, ঘড়ির টিক টিক শব্দ আমরা মাঝে মাঝে শুনছি আবার মাঝে শুনতে পাচ্ছি না; এভাবে মাঝে মাঝে ঘড়ির শব্দ না শুনার কারণ হল মনোযোগের অস্থিরতা। ঘড়ির গতি ঠিকই আছে। কিন্তু মনোযোগের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য মনে হয় ঘড়ির গতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটছে।

মনোযোগের অস্থিরতার দৃষ্টান্ত

আরও একটি পরীক্ষণে দৃষ্টিমূলক উদ্দীপকের (visual stimulus) সহায়তায় মনোযোগের এই অস্থিরতার পরিমাপ করা যেতে পারে। একটি ম্যাসন চাকতি (Masson Disc) এই পরীক্ষণে ব্যবহার করা হয়। এই গোলাকার সাদা চাকতির একটি ব্যাসার্ধের উপর একটি কালো রেখা আঁকা থাকে এবং এই কালো রেখাটির মাঝে মাঝে কতকগুলি সাদা রেখা আঁকা থাকে। যদি এই চাকতিকে যন্ত্রের সাহায্যে জোরে ঘোরান হয় তাহলে কালো রেখাটি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং কতকগুলি ধূসর রঙের ক্ষীণ গোলাকার বৃত্ত দৃষ্টিগোচর হবে। যদি পরীক্ষণ-পাত্রকে এই ঘূর্ণায়মান চাকতির (Masson Disc) যেকোন একটি ধূসর বৃত্তের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য বলা হয় তাহলে সে দেখবে যে, বৃত্তটি একবার দেখা যাচ্ছে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে যে, আমাদের মনোযোগ কত অল্প সময়ের জন্য একটি বস্তুর উপর নিবদ্ধ থাকতে পারে।

মনোযোগের অস্থিরতার পরিমাপ

এই পরীক্ষার মনোযোগের হ্রাস বৃদ্ধি কাইমোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা যায়। মনোযোগের এই হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব থেকে জানা যায় যে, কোন বিষয়েই মনোযোগ একটানা ভাবে চব্বিশ সেকেণ্ডের বেশী চলতে পারে না। অবশ্য মনোবিদ্ টিচনার মনে করেন যে, অনুশীলনের সাহায্যে মনোযোগকে সুদীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী করা যেতে পারে। এক নাগাড়ে দু-তিন মিনিট তো সম্ভব বটেই, দুই-তিন ঘণ্টাও সম্ভব।

## ৮। মনোযোগের দোদুল্যমানতা (Oscillation of Attention) :

দু'টি সমান শক্তিশালী উদ্দীপকের মধ্যে মনোযোগের ঘোরাফেরা করাকে বলা হয় মনোযোগের দোদুল্যমানতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে,

পাশের ঘরে বসে কেউ বাজনা বাজাচ্ছে, আর আমি ঘরে বসে কোন একটি গল্পের বই পড়ার চেষ্টা করছি, তখন মনোযোগ ঘড়ির দোলকের মতো একবার বই আর একবার বাজনা—এ দুটির মধ্যে সঞ্চালিত হতে থাকবে। পরীক্ষণকার্য চালিয়ে মনোযোগের এই দোদুল্যমানতা সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে।

দুটি সমশক্তিশালী উদ্দীপকের মধ্যে মনোযোগের ঘোরাফেরা, হল মনোযোগের দোদুল্যমানতা

ফুলদানি না, দুটি মানুষের মুখ?

উপরের ছবিটি এমনভাবে আঁকা হয়েছে যে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কখনও এটি একটা ফুলদানি আবার কখনও দুটি মানুষের মুখ চোখে পড়ছে। যদি আমরা
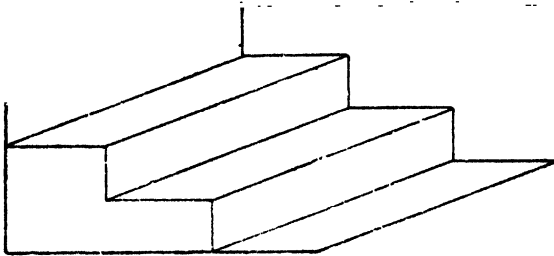
**The reversible stairs**

মনোযোগ ফুলদানির উপর রাখতে চাই, দেখা যাবে কিছু পরেই তা ফুলদানি থেকে মানুষের মুখের উপর সরে গেছে। আবার মানুষের মুখের দিকে নজর

রাখতে গেলে মনোযোগ মানুষের মুখ থেকে ফুলদানির উপর সরে যাবে। একেই বলা হয় মনোযোগের দোদুল্যমানতা। অনুরূপভাবে যদি ৩০৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ছবিটির সিঁড়িটির দিকে ভাল ভাবে তাকান যায় তাহলে দেখা যাবে যে, ওপরের দিক থেকে যেমন সিঁড়ি নেমে এসেছে ঠিক তেমন নীচের দিক থেকে সিঁড়ি উপরের দিকে উঠে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে দেখা যাবে মনোযোগ সিঁড়ির এ দুটি দৃশ্যের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

## ৯। অমনোযোগ (Inattention) :

অমনোযোগ বলতে সাধারণতঃ আমরা মনোযোগের অভাবই বুঝে থাকি। কিন্তু প্রশ্ন হল, সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়া কি সম্ভব? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, স্বাভাবিক ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুতঃ অমনোযোগ মনোযোগের অভাব নয়, স্বল্পমাত্রায় বা কম মনোযোগ অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু থেকে মনকে অপসারিত করে অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুতে মনোযোগী হওয়া।

সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়

যেমন, যে ছাত্রকে আমরা অমনোযোগী বলি সে আসলে শিক্ষক মহাশয় যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করছেন সেটির উপর মন নিবিষ্ট না করে, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুতে মনোযোগী হয়েছে। হয়ত সে ফুটবল খেলার কথা ভাবছে।

অমনোযোগ হল অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে মনোযোগ

স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় সম্পূর্ণ অমনোযোগী হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মূর্ছিত অবস্থায় বা নিদ্রিত অবস্থাতেই মনের পক্ষে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়া সম্ভব। সাধারণতঃ, শিশুরা অমনযোগী একথা আমরা বলে থাকি। শিশুর ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ অমনোযোগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল ও অস্থিরমতি, তাই তার মনোযোগ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে দ্রুত ধাবিত হয় এবং এই অবস্থাকেই আমরা সাধারণতঃ অমনোযোগের অবস্থা মনে করে থাকি।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, অমনোযোগ মনোযোগের সহায়ক। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে হলে অপর বিষয় থেকে মনোযোগকে অপসারিত করা দরকার। কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি মনকে নিবিষ্ট করার সময় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু থেকে অবশ্যই মনোযোগকে সরিয়ে আনতে হয়। কোন ছাত্র যখন পাঠে মন নিবিষ্ট করতে চায় তখন তার পক্ষে প্রয়োজন অন্যান্য বিষয় যেমন—

অমনোযোগ মনোযোগের সহায়ক

খেলাধূলা, গল্পগুজব, গান-বাজনা, আশপাশের হৈ-চৈ ইত্যাদিতে মনোযোগী না হওয়া!

**১০। প্রত্যাশামূলক মনোযোগ (Expectant Attention):**

প্রত্যাশামূলক মনোযোগ প্রকৃতপক্ষে মনোযোগ নয়; এ হল মনোযোগের জন্য পূর্ব থেকে একটা মানসিক প্রস্তুতি। সময় সময় আমরা পূর্ব থেকেই জানি কোন্ উদ্দীপকটি আমাদের কাছে উপস্থিত হবে এবং তার জন্য দৈহিক ও মানসিক একটা প্রস্তুতির ভাব আমাদের মধ্যে দেখা যায়, যাতে উদ্দীপকটি উপস্থিত হওয়া মাত্রই আমরা তাতে মন নিবিষ্ট করতে পারি। এই ধরনের মনোযোগকে প্রত্যাশামূলক মনোযোগ বলে। যেমন, কোন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে দেখবার জন্য আমরা পথের পাশে আগ্রহভরে অপেক্ষা করি। এই প্রত্যাশামূলক মনোভাবের জন্য যখন তিনি সত্যই আমাদের সামনে উপস্থিত হন, তখন তাঁকে ভালভাবে দেখার সুযোগ আমরা পাই। সুতরাং প্রত্যাশামূলক মনোযোগ কোন বিষয়বস্তুর উপলব্ধি এবং সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। উদ্দীপকের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য দেহ ও মনে ধাক্কা লাগার যে সম্ভাবনা থাকে, প্রত্যাশামূলক মনোযোগের জন্য তা হ্রাস পায়। আকস্মিক ধাক্কা, যত মৃদুই হোক না কেন, ব্যক্তির মানসিক স্থৈর্য নষ্ট করে দিতে পারে। অপর পক্ষে, প্রত্যাশিত ধাক্কা যত তীব্রই হোক না কেন দেহ মনের উপর ততখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সুতরাং প্রত্যাশামূলক মনোযোগের একটা দৈহিক দিক আছে যেটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে অতিরিক্ত প্রত্যাশার ভাব মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখার জন্য যখন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি, তখন যে কোন ব্যক্তিকে দেখামাত্রই মনে হয় আমার সেই পরিচিত ব্যক্তিটি বুঝি উপস্থিত হয়েছে। প্রুফ-সংশোধকের ভ্রান্তিও অনুরূপ কারণে ঘটে থাকে। পূর্ব থেকেই শুদ্ধ বানানটি দেখতে পাব এরূপ প্রত্যাশা করার জন্যই অশুদ্ধ বানান আমাদের চোখে পড়ে না।

প্রত্যাশামূলক মনোযোগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধা হল এই যে, এতে প্রতিক্রিয়া-কাল বিলম্বিত হয় না। উদ্দীপকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা প্রতিক্রিয়া করতে পারি। উদ্দীপকের উপস্থাপন এবং ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান তাকেই প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction-time) বলে। প্রত্যাশামূলক মনোযোগের জন্য প্রতিক্রিয়া-কাল কমে যায়। এ বিষয়ে ভুণ্ডট্ (*Wundt*) একাধিক পরীক্ষণকার্য চালান। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, পূর্ব থেকে সতর্ক করে দিয়ে যদি পরীক্ষণ-পাত্রকে কোন শব্দের

উপর প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়, তাহলে পরীক্ষণ-পাত্রের প্রত্যাশামূলক মনোযোগের জন্য প্রতিক্রিয়া কাল কম হয়ে গড়ে ·০৭৬ সেকেণ্ড ; আর পূর্ব থেকে সতর্ক করে না দিলে, প্রতিক্রিয়া-কাল হয় গড়ে ০·২৫৩ সেকেণ্ড। এ বিষয়ে একাধিক পরীক্ষণকার্য চালিয়ে প্রতিক্রিয়া-কালকে আরও কমিয়ে আনা যায় এবং শেষ পর্যন্ত পরীক্ষণ-পাত্রের প্রত্যাশামূলক মনোযোগের জন্য দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি এত নিখুঁত হয় যে উদ্দীপক উপস্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষণ-পাত্র প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

## ১১। মনোযোগ এবং বিক্ষেপ (Attention and Distraction) :

আমাদের কোন বিষয়ে মনোযোগ অনেক সময় অন্য বিষয়ের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়। আবার যখন মন দিয়ে কোন বই পড়ছি, তখন পাশের ঘরের অন্য লোকের কথাবার্তা ও পাশের বাড়ির রেডিওর গান মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে। কাজেই যা কিছু মনোযোগের পথে বাধা সঞ্চার করে তাকেই বিক্ষেপ (Distraction) বলা চলে। যে উদ্দীপকটি বিক্ষেপ সৃষ্টি করে তার লক্ষ্য, মনোযোগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হওয়া।

মনোযোগের উপর বিক্ষেপের প্রভাব নির্ধারণ করার জন্য মনোবিজ্ঞানীগণ একাধিক পরীক্ষণ-কার্য পরিচালনা করেন। এই পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে যে বিক্ষেপ যদি খুব তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী না হয়, তাহলে কাজের দক্ষতা কিছু পরিমাণে বেড়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় চারপাশের হৈ-চৈ-এর মধ্যেও কোন ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট কাজটি করে চলেছে। এর কারণ, যে উদ্দীপক মনোযোকে বিক্ষিপ্ত করতে চায়, সেই উদ্দীপকটির বিরুদ্ধে অধিকতর মনোযোগ প্রয়োগ করে ব্যক্তি তার মনকে বিষয়বস্তুর উপর নিবিষ্ট রাখার জন্য সচেষ্ট হয়, যার ফলে বিক্ষেপ-সৃষ্টিকারী উদ্দীপকটি শেষ পর্যন্ত মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু এই বিক্ষেপ যদি খুব তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত বিক্ষেপ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তির মনোযোগকে ব্যাহত করে। এর কারণ বিক্ষেপের বিরুদ্ধে অধিকতর মানসিক শক্তি প্রয়োগ করার জন্য মনের শক্তির অযথা অপচয় ঘটে এবং মনে ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দেয়। এজন্য বিক্ষেপ-সৃষ্টিকারী উদ্দীপকটিকে অপসারিত করার চেষ্টা করে বিষয়বস্তুর উপর মনোযোগকে ধরে রাখার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত।

নানাভাবে বিক্ষেপ দূর করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, কাজে অধিকতর প্রচেষ্টা। যেমন, চারপাশের গোলমালে যদি পড়ার অসুবিধে হয়, সেক্ষেত্রে বেশ

চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করলে সেই অসুবিধা দূর করা যেতে পারে। অভ্যাসের দ্বারাও বিক্ষেপের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে। রেলওয়ে স্টেশনের কাছে যারা থাকে, তারা ক্রমশঃ রেলগাড়ির শব্দে আর তেমন অসুবিধা বোধ করে না, কারণ সেই শব্দের প্রতি অমনোযোগী হওয়ার অভ্যাস ক্রমশঃ তারা আয়ত্ত করে। আবার কাজের প্রতি আগ্রহকে বাড়িয়ে বিক্ষেপের প্রভাব অনেক কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

## ১২। মনোযোগের কার্যকারিতা (Uses of Attention) :

মনোযোগের নিম্নলিখিত কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়। মনোযোগ সংবেদন ও ধারণাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে। মনোযোগের জন্য সংবেদন বা ধারণাকে আমরা মনের সামনে ধরে রাখতে পারি, নতুবা এগুলি খুব তাড়াতাড়ি বিলীন হয়ে যায়। এজন্য মনোযোগের দ্বারা সংবেদন ও ধারণাগুলিকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত করতে পারি এবং প্রয়োজনে এগুলিকে পুনরুজ্জীবিত বা পুনরুদ্রেক করতে পারি। কারণ, মনের সামনে এভাবে যাদের আমরা ধরে রাখি, তারা মনের উপর গভীর ছাপ রেখে যায় ও অন্য ধারণার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে এবং পরে অভিভাবন প্রক্রিয়ার ফলে একটির সহায়তায় আমরা অপরটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারি। তাছাড়া, ঐচ্ছিক মনোযোগ মনকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হতে সহায়তা করে এবং তার ফলে মন তার অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হতে পারে। মানসিক পরিশ্রম লাঘব করার পক্ষে ঐচ্ছিক মনোযোগ (Voluntary action) একান্ত সহায়ক। তা না হলে, মন যে কোন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত এবং আমাদের সমস্ত মানসিক শক্তির অযথা অপচয় ঘটত। তাছাড়া, মনোযোগ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সহায়ক এবং এই প্রক্রিয়া কোন বিষয়বস্তুর সামগ্রিক জ্ঞানলাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

মনোযোগ ভবিষ্যৎ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার জন্য দেহ ও মনকে প্রস্তুত করে তোলে এবং এর ফলে আমরা দ্রুত প্রতিক্রিয়া করতে পারি, যার জন্য প্রতিক্রিয়া-কাল অযথা বিলম্বিত হয় না।

## ১৩। আগ্রহ (Interest) :

আমরা ইতিপূর্বে মনোযোগের বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছি যে, মনোযোগের মানসিক অবস্থা-সংক্রান্ত কারণগুলির মধ্যে

অনুরাগ বা আগ্রহ (interest) হল অন্যতম। সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন ব্যক্তি একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিক প্রত্যক্ষ করে। সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে কেউ বা প্রথমে পড়ে খেল ধূলার কথা, কেউ বা রাজনীতির কথা, কেউ বা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা। আসলে যার যে বিষয়ে আগ্রহ তাতেই সে আগ্রহ দেখায়। একজন কৃষক, একজন চিত্রকর ও একজন উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্ একই সঙ্গে একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যখন নীচের কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করে, তখন নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী তারা প্রাকৃতিক দৃশ্যটির ভিন্ন ভিন্ন দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিভাবে শিশুকে শ্রেণীকক্ষে তার পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আগ্রহশীল করে তোলা যায়, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীর কাছে এ অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, সে কারণে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে :

আগ্রহ অনুযায়ী ব্যক্তি একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হয়

## ১৪। আগ্রহের অর্থ (Meaning of Interest) :

আগ্রহের অর্থ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। আগ্রহ বলতে আমরা বুঝতে পারি বাহ্যজগতের কোন বস্তু, যাতে ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করছে। সুতরাং এই অর্থে আগ্রহ হল আগ্রহ জাগায় এমন বস্তু (object of interest)। দ্বিতীয় অর্থে আগ্রহ হল একটা প্রক্রিয়া, এ হল মানুষের কাজের প্রকৃতি (nature of man's activity)। যেমন, আমরা বলি, সে আগ্রহের সঙ্গে কাজটা করছে। তৃতীয়তঃ, আগ্রহ বলতে বোঝায় মনের স্থায়ী প্রবণতা (enduring disposition)। যেমন, আমরা বলি, তার উপন্যাস পড়াতে আগ্রহ আছে। ম্যাকডুগালের মতে আগ্রহ হল সুপ্ত মনোযোগ (intent attention)। মনোবিজ্ঞানী ড্রেভার (*Drever*)-এর মতে আগ্রহ হল গতিশীল মনোভাব (disposition in its dynamic aspect)।

আগ্রহের বিভিন্ন অর্থ

## ১৫। আগ্রহের উৎস ও প্রকারভেদ (Sources and Types of Interest) :

আমাদের সব আগ্রহের প্রাথমিক উৎস হল আমাদের জন্মগত প্রবণতা, তাড়না, সহজাত প্রবৃত্তি, কামনা ইত্যাদি। কৌতূহল, প্রবৃত্তি, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, আত্মপ্রকাশের তাগিদ প্রভৃতি আগ্রহের প্রয়োজনীয় উৎস।

আগ্রহের উৎস জন্মগত প্রবণতা

আগ্রহ দু রকমের হতে পারে—(১) স্বাভাবিক বা প্রত্যক্ষ (natural and direct) এবং অর্জিত বা অপর কিছু থেকে উৎপন্ন (acquired or derived)। আমাদের সহজাত প্রবণতার সঙ্গে যে বিষয়গুলি যুক্ত তার উপর স্বাভাবিক আগ্রহ নির্ভর করে। আমাদের অর্জিত মনোভাবের অর্থাৎ অনুভূতি, আবেগ প্রভৃতির উপর অর্জিত আগ্রহ নির্ভর করে। আমদের জন্মগত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই আমাদের অনেক বিষয়ে আগ্রহশীল করে তোলে। কৌতূহলী হবার, সঞ্চয়ী হবার এবং নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্মগত আগ্রহ শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং তাদের আগ্রহ জাগ্রত করতে হলে স্বাভাবিক কাজেই তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে হবে। শিশুদের অর্জিত আগ্রহ জাগ্রত করতে হলে প্রয়োজনীয় কাজে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। অর্জিত প্রবণতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। কারও মধ্যে দেশপ্রেমের আবেগ বর্তমান, কাজেই দেশের কল্যাণমূলক কাজে তার আগ্রহ দেখা যায়। কারও মধ্যে রয়েছে হীনমন্যতাবোধ, তাই অপরের সদ্‌গুণগুলির তুলনায় তার দুর্বলতাগুলি অনুসন্ধান করে বেড়ানতেই তার আগ্রহ। কাজেই মানুষের মনোভাব, মেজাজ, প্রবণতা এবং অর্জিত প্রাণতার দ্বারা আগ্রহ নির্ধারিত হয়। যখন আমাদের মনোভাব বন্ধুত্বভাবাপন্ন তখন আমরা কোন ব্যক্তির সদ্‌গুণগুলির দিকে নজর দিই এবং যখন শত্রুভাবাপন্ন তখন তার দুর্বল দিকের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করি। যখন মন খুশীখুশী ভাবে পূর্ণ তখন সুন্দর বস্তু দেখলেই তাতে আগ্রহ প্রকাশ করি, কিন্তু যখন মন দুঃখে ভারাক্রান্ত তখন হতাশজনক ও বিষাদজনক কথাবার্তায় আগ্রহ প্রকাশ করি। আবার শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি নানারকম প্রবণতা অর্জন করে, যা তাকে সেই প্রবণতা অনুযায়ী বিষয়বস্তুতে আগ্রহী করে তোলে। যেমন, পকেটমার লোকের পকেটের প্রতি, দরজী অপরের পোশাকের প্রতি, মুচি অপরের জুতোর প্রতি আগ্রহশীল হয়। কাজেই মানুষের প্রায় আগ্রহই নির্ভর করে তার অর্জিত প্রবণতা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর।

**আগ্রহ—স্বাভাবিক ও অর্জিত**

## ১৬। আগ্রহ এবং মনোযোগ (Interest and Attention)

কোন বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ বা অনুরাগই আমাদের বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী করে তোলে। সুতরাং মনোযোগ এবং আগ্রহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। আগ্রহ ও উদাসীনতা হল পরস্পর বিরুদ্ধ। যদি আমি খড়ের কুটিরে বাস করি তাহলে আমার সব সময়ই আগ্রহ থাকে যাতে কাছাকাছি

কোথায়ও আগুন না লাগে এবং আগুন নিবারণ করার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও আমি গ্রহণ করি। সুতরাং আগ্রহ হল এমন মনোভাব যার সঙ্গে ইচ্ছা, অনুভূতি ও কর্মপ্রবৃত্তি যুক্ত। যার প্রতি আমার আগ্রহ আছে আমার অনুভূতির উপর তা প্রভাব বিস্তার করে এবং মনে সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির সঞ্চার করে। আগ্রহ মানুষকে সক্রিয় করে তোলে। যার প্রতি আমাদের আগ্রহ আছে তার প্রতি আমরা মনোযোগী হই ও তার জন্য পরিশ্রম করি এবং যার প্রতি আমাদের আগ্রহ নেই তাকে আমরা এড়িয়ে চলতে চাই। এই আগ্রহ ক্ষণস্থায়ী হতে পারে বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। গন্তব্য স্থানে পৌছানর জন্য গাড়ির প্রতি যে আগ্রহ তাহল ক্ষণস্থায়ী। আবার যে কৃপণ নির্বিচারে অর্থ সঞ্চয় করে চলেছে তার অর্থের প্রতি আগ্রহ হল দীর্ঘস্থায়ী।

আগ্রহই মনোযোগ নির্ধারণ করে

আগ্রহের সঙ্গে ইচ্ছা, অনুভূতি ও কর্মপ্রবৃত্তি যুক্ত

আগ্রহ অর্জিত হতে পারে বা জন্মগত হতে পারে। খাদ্যের প্রতি দার্শনিকের আগ্রহ হল জন্মগত বা সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আগ্রহ আর দর্শন আলোচনার প্রতি দার্শনিকের আগ্রহ হল অর্জিত আগ্রহ।

আগ্রহ অর্জিত এবং জন্মগত

জৈবিক প্রবৃত্তি, মানসিক প্রবণতা, শিক্ষা, অভ্যাস, কৌতূহল, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে।

বস্তু নিজ গুণেই চিত্তাকর্ষক বা আকর্ষণীয় হয়ে আগ্রহের সৃষ্টি করে না। কোন উপাদেয় খাদ্যের প্রতি আমারও আগ্রহ আছে, আমার বন্ধুরও আগ্রহ আছে। আমার আগ্রহ যেহেতু আমি ক্ষুধার্ত, আমার বন্ধুর আগ্রহ যেহেতু সে পেটুক। কোন বিষয়ের আলোচনা চলছে, কিন্তু আমি যখনই তাতে মনোযোগী হই যখন সে আলোচনায় আমার নাম উচ্চারিত হচ্ছে শুনতে পাই। আমার এই আগ্রহ উদ্ভূত হয় সহজাত আত্মপ্রীতি থেকে। যার ধূমপানের অভ্যাস, সে ধূমপান সম্পর্কীয় আলোচনাতেই আগ্রহ দেখায়। এই আগ্রহ তার অর্জিত। সুতরাং দেখতে পাই আগ্রহ এবং মনোযোগের মৌলিক শর্ত হল আমাদের সহজাত বা অর্জিত মনোভাব এবং বিশেষ বিশেষ বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট উত্তেজনা। তবে ম্যাকডুগাল (*MacDougall*) মনে করেন যে এগুলিই একমাত্র যে মনোযোগ নির্ধারণ করে এ সিদ্ধান্ত সত্য নয়। আবার কারও কারও মতে সুখ-দুঃখও আগ্রহ সৃষ্টি করে যার জন্য আমরা কোন বিষয়ে মনোযোগী হই। অবশ্য সুখ দুঃখও

আগ্রহ ও মনোযোগের মৌলিক শর্ত

আগ্রহের শর্ত যদিও একমাত্র শর্ত নয়। আবার উদ্দেশ্যও আমাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, মুচি তাকায় লোকের পায়ের দিকে, নাপিত তাকায় মাথার দিকে। এক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ এবং মনোযোগ উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত।

মনোযোগের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত হল আগ্রহ। মনোবিদ ড্রেভার (*Drever*)-এর মতে আগ্রহ হল গতিশীল মনোভাব (a disposition in its dynamic aspect), কারণ যে বিষয়বস্তু আমাদের মনে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে তাতেই আমরা মনোযোগী হই। সুতরাং যে-যে বিষয় আগ্রহ নির্ধারণ করে সেগুলি অনেক সময় মনোযোগও নির্ধারণ করে। মনোযোগ হল নির্বাচনধর্মী (selective)। অসংখ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে দু-একটি বিষয়কে নির্বাচন করে নিয়ে তাতে আমরা মনোযোগী হই, কিন্তু সে বিষয়ই আমরা নির্বাচন করি যাতে আমাদের আগ্রহ আছে।

আগ্রহই মনোযোগকে নির্বাচনধর্মী করে তোলে

আমরা ইচ্ছাপূর্বক যখন কোন কাজ করি তখন আগ্রহই আমাদের প্রেরণা যুগিয়ে দেয়। আগ্রহ যত অধিক হয় বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ ততই প্রবল এবং বিষয়বস্তুর উপর তা স্থিরভাবে নিবিষ্ট হয়। সুতরাং আগ্রহ হল দীর্ঘস্থায়ী মনোভাব (enduring disposition) যা মনোযোগ নির্ধারণ করে।

আগ্রহ হল স্থায়ী মনোভাব

কোন কোন মনোবিদ্ মনে করেন যে, আগ্রহ এবং মনোযোগ অভিন্ন বিষয়। আগ্রহ হল মনোযোগী হবার উদ্দীপনা (impulse to attend)। মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল পূর্বোক্ত মতের সমর্থন করে বলেন যে, 'আগ্রহ হল সুপ্ত বা অব্যক্ত মনোযোগ আর মনোযোগ হল সক্রিয় আগ্রহ'।[1] কিন্তু ম্যাকডুগালের এই অভিমত যথার্থ নয়। যদিও আগ্রহ সকল সময়ই আমাদের মনোযোগী করে তোলে তবু এমন অনেক বিষয় আছে যার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরাগ বা আগ্রহ নেই, অথচ বিষয়টি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন, ঘরে বসে বই পড়ছি সে সময় হঠাৎ দরজাটি যদি বিকট শব্দ করে বন্ধ হয়ে যায়, আমরা তার প্রতি মনোযোগী হই, যদিও ঐ শব্দের প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ নেই। আবার মনোযোগী হলেই যে তার প্রতি আগ্রহ আছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। যে কেরানী হিসাবের খাতার প্রতি খুব

আগ্রহ এবং মনোযোগ অভিন্ন নয়

1. "Interest is latent attention and attention is interest in action."
—McDougall : Outlines of Psychology, Page 277

মনোযোগী তার যে সেই বিষয়ের প্রতি খুব আগ্রহ আছে তা বলা চলে না। আবার অধিক মনোযোগ আগ্রহ নির্দেশ করে না। **আগ্রহ মনোযোগ নির্ধারণ করতে পারে কিন্তু মনোযোগ সকল সময় আগ্রহ নির্ধারণ করে না।**

## ৭। শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের মূল্য (The importance of Interest in Education):

শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহের নিবিড় সম্পর্ক

শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের বিশেষ মূল্য আছে। বস্তুতঃ, পঠনীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগী না হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে তা আয়ত্ত করা কোন মতেই সম্ভব নয়। আবার আগ্রহ না থাকলে শিক্ষার্থী কখনই পঠনীয় বিষয়ে মনোযোগী হতে পারে না। কাজেই শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহের নিবিড় সম্পর্ক।

আগ্রহতেই শিক্ষার শুরু এবং শেষ

শিক্ষাবিদ্ মাত্রই শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের মূল্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে আগ্রহতেই শিক্ষার শুরু এবং শেষ। আগ্রহের মনস্তাত্ত্বিকতাই (Psychology of interest) হল শিক্ষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এবং ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষার কাজ হল শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি আলোচনা করা। যদিও কোন কোন শিক্ষাবিদ্ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে আগ্রহের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সমালোচনা করেছেন এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে 'কোমল শিক্ষাব্যবস্থা' (soft pedagogy) বলে বিদ্রূপ করেছেন, তবু শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ কিভাবে সঞ্চার করা যায় এবং শিক্ষণীয় বিষয়কে কিভাবে তার পাঠযোগ্য করা যেতে পারে, তাই হল শিক্ষার মূল কথা।

আগ্রহ শিক্ষার লক্ষ্য এবং উপায়

আগ্রহ কাজে সক্রিয়তা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। কোন কাজ করার জন্য যখন আমরা আগ্রহশীল হয়ে উঠি, তখন সে কাজ না করে আমরা থাকতে পারি না। আগ্রহই আমাদের উদ্যোগী করে তোলে। বিষয়বস্তুর দুরূহতা সত্ত্বেও যে শিক্ষার্থী তা শিখতে চায়, তার কারণ শিক্ষার্থীর পঠনীয় বিষয়ের প্রতি আগ্রহ। শিক্ষার দিক থেকে বিচার করলে আগ্রহ শিক্ষার লক্ষ্য এবং উপায়, উভয়ই। শিশুর কাছে আগ্রহ হল উপায় এবং শিক্ষকের কাছে আগ্রহ হল লক্ষ্য। আগ্রহের সহায়তায় শিশুরা জ্ঞান অর্জন করে এবং তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, আর

শিক্ষকের লক্ষ্য হল শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিশুর মধ্যে তীব্র অথচ প্রীতিকর স্থায়ী আগ্রহের সঞ্চার করা, যাতে শিশু নিজে নিজেই জ্ঞান অর্জন করার ও উদ্দেশ্যসিদ্ধ করার জন্য উদ্দীপিত হয়। শিশুর এবং শিক্ষকের আগ্রহের পার্থক্য হল এখানেই।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্যই হল শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলা। জার্মান শিক্ষাবিদ্ হারবার্ট (*Herbert*) শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের বিশেষ ভূমিকা আছে বলে মনে করেন। শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করা। আধুনিক শিক্ষাবিদ্ জন ডিউই (*John Dewey*)-র মতে আগ্রহই শিক্ষাব্যবস্থার পথ নির্দেশ করবে। কেননা, ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাই হল আগ্রহ।

**হারবার্ট ও ডিউইর-অভিমত**

পূর্বোক্ত অভিমতের সমালোচনা করে একদল শিক্ষাবিদ্ বলেন যে, শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শিক্ষণীয় বিষয়কে আকর্ষণীয় করার জন্য তাকে সহজ ও সরল করার কোন যৌক্তিকতা নেই। পঠনীয় বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করার জন্য তাকে যদি অতিরিক্ত সোজা ও সরল করা হয়, কঠিন বা শ্রমসাধ্য বিষয় যদি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে সে হবে এক 'কোমল শিক্ষাব্যবস্থা' (soft pedagogy), যা শিক্ষার্থীর চরিত্রের দৃঢ়তাকে ক্ষুণ্ণ করবে, শিক্ষার্থীর উদ্যম, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে নষ্ট করে দেবে। তাছাড়া, এর ফলে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবেই। তাঁদের মতে বিদ্যালয়জীবনের শিক্ষা হল প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর উত্তর জীবনের প্রস্তুতি স্বরূপ এবং যেহেতু শিক্ষার্থীর উত্তর-জীবন নানারকম বাধাবিঘ্ন, ঘাতপ্রতিঘাত-পূর্ণ, সেহেতু কঠোর জীবন সংগ্রামের জন্য তাকে প্রস্তুত করতে হলে শিক্ষাকে অযথা চিত্তাকর্ষক করে তোলা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত হবে না। কঠোর শাসন, নিয়মানুবর্তিতা ও নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে শিশুকে বিদ্যালয়জীবনে শিক্ষা দিতে হবে এবং বিদ্যালয়জীবনেই ভবিষ্যতের বিপদসঙ্কুল জীবনের পরিচয় তার সঙ্গে করিয়ে দিতে হবে, যাতে উত্তর-জীবনে শিক্ষার্থী সাহসের সঙ্গে এই সব বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারে।

**সমালোচনা**

**কোমল শিক্ষাব্যবস্থা**

যাঁরা শিক্ষাব্যবস্থাকে আগ্রহভিত্তিক করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী, তাঁরা পূর্বোক্ত অভিমত সমর্থন করেন না। পূর্বোক্ত সমালোচনার উত্তরে তাঁরা

বলেন যে, শিক্ষা কেবলমাত্র জীবনের প্রস্তুতি নয়, শিক্ষাই জীবন। কাজ করার মধ্যে, সংগঠনের মধ্যে, আবিষ্কারের মধ্যে শিশুরা যে আনন্দ পায়, বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় যেন সে আনন্দ থেকে শিশু বঞ্চিত না হয়।

দ্বিতীয় অভিমতের সমালোচনা

এই অভিমতের সমর্থকদের মতে, আত্মপ্রকাশ ও আত্মসক্রিয়তার মূলে যে আনন্দ তা আগ্রহভিত্তিক এবং শিক্ষা ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে তার মূল্য অপরিসীম। শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলার অর্থ শিক্ষার মান অবনত করা, দুরূহ বিষয় পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দেওয়া বা শিক্ষার্থীর চরিত্রের দৃঢ়তা নষ্ট করা নয়। যে আগ্রহ শিক্ষার্থীর মনে রয়েছে তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার কিভাবে করা যায় তার উপায় নির্ধারণ করা। শিক্ষার্থীকে যদি ভয় দেখিয়ে কোন কিছু শিখতে বাধ্য করা হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর শেখার স্বতঃস্ফূর্ততা ও উদ্যমশীলতা নষ্ট হয়ে যাবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে বিষয়বস্তু যত দুরূহই হোক না কেন শিক্ষার্থী সহজেই তা শিক্ষা করতে পারে—অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে যদি শিশুর মানসিক সামর্থ্যের সামঞ্জস্য থাকে। সুতরাং একদিকে যেমন একদল শিক্ষাবিদ্ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'কোমল শিক্ষাব্যবস্থা' নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উভয় দিক থেকেই শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুপযোগী, তেমনি যাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের বিশেষ ভূমিকার কথা স্বীকার করেন তাঁরা বলেন যে, শিক্ষার্থীর কাছে পঠনীয় বিষয়কে বিরক্তিকর ও ক্লান্তিজনক করে তোলাটাও মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক উভয় দিক থেকেই অযৌক্তিক।

পূর্বোক্ত দুটি অভিমতই চরমপন্থী এবং উভয় অভিমতেরই ভিত্তি একটি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় মতবাদই মনে করে যে আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা পরস্পরবিরোধী। বস্তুতঃ, আগ্রহ পঠনীয় বিষয়ের কোন অন্তর্নিহিত গুণ নয়, আগ্রহ থাকে শিক্ষার্থীর মধ্যে। কাজেই শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করা নয়, বরং পঠনীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার কিভাবে করা যায় তাই হল প্রশ্ন। পঠনীয় বিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্য তাকে সহজ ও সরল করা নয়, বরং শিশুর আগ্রহকে জাগরিত করা, উদ্দীপিত করা ও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিশুর মনোযোগকে আকৃষ্ট করা। আসলে আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা, একটি অপরটির পরিপূরক। আগ্রহের কাজই হল শিক্ষার্থীর উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট

উভয় মতের সমন্বয়

আগ্রহের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারই আগ্রহভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্য

লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত করা। চিত্তবিনোদন, আমোদ বা কৌতুক সৃষ্টি করা আগ্রহের লক্ষ্য নয়, আগ্রহের উদ্দেশ্য সক্রিয়তা, প্রচেষ্টা ও কর্মসম্পাদন। প্রচেষ্টাও আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই।

**আগ্রহ ও প্রচেষ্টা পরস্পরের পরিপূরক**

প্রচেষ্টা সহকারে কোন কাজ শুরু করলে, তা শেষ পর্যন্ত আগ্রহ সঞ্চার করেই। শিশুর প্রচেষ্টা যখন সফল হয়, তখন শিশুর মনে আনন্দ জাগে, তখন শিশু প্রেরণা লাভ করে নতুন উৎসাহে কাজ শুরু করে দেয়, ফলে শিশুর মধ্যে আগ্রহ জাগে। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, আগ্রহ ও প্রচেষ্টা উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই, বরং লক্ষ্য সিদ্ধ করার পক্ষে একটি অপরটিকে সহায়তা করে। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ভাল করে বুঝে নেওয়া যাক: কোন শিশু বর্ণমালা শেখার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করে এবং গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ শিক্ষা করার জন্য শেষ পর্যন্ত সফলতা অর্জন করে ও শিক্ষকের প্রশংসা লাভ করে। ফলে, কাজে তার আগ্রহ জাগে এবং এই আগ্রহই তাকে আরও শেখার জন্য পরিশ্রমী হতে ও প্রচেষ্টাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করার জন্য উদ্যোগী করে তোলে।

সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার যেমন মূল্য আছে আগ্রহেরও সমধিক মূল্য আছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে পুরস্কার, শাস্তি, প্রশংসা, নিন্দা প্রভৃতি বাহ্য প্ররোচকের (incentive) সহায়তায় শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহের সঞ্চার করার চেষ্টা না করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ সেক্ষেত্রে আগ্রহ স্থায়ী হয় না, ক্ষণস্থায়ী হয়। যেমন—পুরস্কার পেয়ে যাবার পর অনেক শিক্ষার্থীকেই আর আগের মতন উদ্যমশীল হতে দেখা যায় না। সে কারণে

**বাহ্য-প্ররোচকের সাহায্যে আগ্রহ সৃষ্টি করলে সে আগ্রহ স্থায়ী হয় না**

শিক্ষণীয় বিষয়ে যাতে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহের সৃষ্টি হয় সেদিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য প্রয়োজন শিশুর স্বাভাবিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে শিশুর শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর চাহিদা, প্রয়োজন, কামনা, বাসনা, মানসিক সামর্থ্য প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষাব্যবস্থাকেই গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা যেমন একাধারে যুগোপযোগী, তেমনি অপর দিকে শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু সংগঠনের পরিপন্থী।

### ১৮। পাঠ্যবিষয়ে শিশুর আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে? (How to make a lesson interesting?) :

আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, ইতিপূর্বে আমরা তা দেখেছি। পাঠ্যবিষয়ের প্রতি শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে শিশুদের কাছে পাঠ্যবিষয়কে অবশ্যই আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে, যাতে পাঠ্যবিষয়ে তাদের আগ্রহ জন্মায়। প্রশ্ন হল, পাঠ্যবিষয়ে শিশুর আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি করা যায়?

প্রথমতঃ, শিক্ষককে স্মরণ রাখতে হবে যে শিক্ষার কেন্দ্র হল শিশু, পাঠ্য-বিষয় নয়। কাজেই পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে শিশুর বা শিক্ষার্থীর বয়স, শিশুর মানসিক বিকাশ, শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ ও সামর্থ্যের যেন সামঞ্জস্য থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আগ্রহ পরিবর্তিত হতে থাকে। কাজেই শিক্ষককে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে—যতদিন পর্যন্ত না শিশু নিজে আগ্রহ অর্জন করে নেয়।

শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে পাঠ্য-বিষয়ের সামঞ্জস্য

পাঠ্যবিষয়ে শিশুর আগ্রহ স্থায়ী করার জন্য শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষণীয় বিষয় খুব সহজ বা খুব দুরূহ না হয়। শিক্ষার মান যেন শিশুর বোধশক্তির সীমার মধ্যে থাকে। পাঠ্যবিষয় যদি খুব সহজ হয় তাহলে শিশু তা অপ্রয়োজনীয় মনে করে শেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে না। আর যদি খুব কঠিন হয় এবং তা যদি আয়ত্ত করা তার ক্ষমতার পরিসীমার বাইরে মনে করে, তাহলে শিশু তা শিক্ষা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে না। শৈশবে কিণ্ডারগার্টেন এবং মন্টেসরী পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে এবং তাতে শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলিকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে। বয়স্ক শিশুদের কল্পনাশক্তি, স্মৃতি, বিচারবুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে উদ্দীপিত করে পাঠ্যবিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। কারণ শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার কল্পনাশক্তি এবং স্মরণক্রিয়ার বিকাশ সাধিত হয় এবং আরও পরে তার চিন্তন-শক্তি ও বিচারবুদ্ধি বাড়তে থাকে।

শিক্ষণীয় বিষয়—সহজ ও সরল হওয়া প্রয়োজন

পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করার জন্য প্রেষণার ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা শিক্ষকের মনে রাখতে হবে। কোন শিক্ষার্থীই তার পাঠ্যবিষয়ে

আগ্রহ প্রকাশ করবে না যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে তার মধ্যে সচেতনতা না থাকে। সে কারণে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য শিক্ষার্থীর কাছে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করতে হবে এবং তা লাভ করার জন্য উপযুক্ত প্রেষণার সৃষ্টি করতে হবে। সহজাত প্রবৃত্তি, কামনা ও অর্জিত প্রবণতার উপর ভিত্তি করে যে আগ্রহ জাগান হবে তাকে কেন্দ্র করেই পাঠ শুরু হওয়া উচিত। এই প্রাথমিক আগ্রহই তাদের আরও শিক্ষা করার প্রেষণা জোগাবে।

প্রেষণা।

পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে ধরে রাখা সম্ভব হবে, যদি নতুন বিষয় শেখবার সময় শিক্ষার্থীর পূর্বার্জিত জ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ রেখে তাকে নতুন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। যা শিখেছে এবং যা শিখতে চলেছে, উভয়ের মধ্যে যে সংযোগ সেটি যখন শিশু প্রত্যক্ষ করতে পারে, তখন সঠিকভাবে শেখার জন্য সে মনোযোগী হয়ে ওঠে।

নতুন বিষয়ের সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতার সংযোগ রক্ষা করা

শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে না হয়। বিনা প্রয়োজনে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা শিক্ষকের উচিত হবে না। শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করার জন্য পাঠ্যবিষয় যাতে শিক্ষার্থীর কাছে বৈচিত্র্যহীন মনে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং পাঠ্যবিষয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। বৈচিত্র্যহীনতা, আগ্রহ ও শেখার উৎসাহ নষ্ট করে দেয়। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিষয়বস্তুর আলোচনা করে, শিক্ষণীয় বিষয়কে নতুনভাবে সাজিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করে, চিত্তাকর্ষকভাবে বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা করে এবং শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে নতুনভাবে উদ্দীপিত করে শিক্ষক বৈচিত্র্যহীনতা দূর করতে পারেন।

বৈচিত্র্যহীনতা দূরীকরণ

শিশুর আগ্রহ সঞ্চার করার ব্যাপারে শিক্ষকের মনোভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের ব্যক্তিগত আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাসি হাসি মুখ, মেজাজ ইত্যাদি শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করার ব্যাপারে খুবই উল্লেখযোগ্য। যে শিক্ষক উৎসাহ, আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষা দেন তিনি ছাত্রদের অবশ্যই মনোযোগী করে তুলতে পারেন। শিক্ষকের কৌতুকবোধ, কাজের প্রতি অনুরাগ ও সক্রিয়তাও শিক্ষার্থীকে পাঠে মনোযোগী করে তোলে। বিষণ্ণ, বদমেজাজী, উৎকণ্ঠিতভাবাপন্ন, নিস্তেজ, অনুৎসাহী শিক্ষক কখনও পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার

শিক্ষকের মনোভাব

করতে পারে না। এই কারণে উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন যথার্থ শিক্ষাদানের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ছোট ছোট শিশুদের আগ্রহ হল সহজাত। তাদের মনোযোগ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘোরাফেরা করে। কাজেই ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষা দেবার সময় তাদের সহজাত আগ্রহকে জাগিয়ে তুলতে হবে। কৌতূহল, সংগঠন বা আত্ম-অধিকার প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে উদ্দীপিত করেই আগ্রহ সঞ্চার করতে হবে।

সহজাত আগ্রহকে জাগিয়ে তোলা

পাঠ্যবিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রভৃতি বিষয়গুলি শিক্ষা দেবার সময় কার্যকরী বা ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষা দিতে হবে। বিজ্ঞানের পরীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যগুলি যদি পরীক্ষণাগারে গিয়ে ছাত্রদের দেখান না হয়, তাহলে ছাত্ররা বিজ্ঞান শিক্ষায় কখনও আগ্রহশীল হয়ে উঠবে না। এ ছাড়া দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিকে সহায়তা করে এমন সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার করলেও ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়ে মনোযোগ বাড়ে। চিত্র, চলচ্চিত্র, টেলিভিশান, ম্যাপ, মডেল প্রভৃতিও পাঠ্যবিষয়ে আগ্রহ সঞ্চার করার ব্যাপারে খুবই উপযোগী। খুব ছোট শিশুকে যদি খেলনার মাধ্যমে কোন কিছু শেখান যায় তাহলে সে সহজে শেখে, কারণ খেলাধূলার মাধ্যমে শিখতে তার আগ্রহ জাগে।

পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের সংযোগ

## প্রশ্নাবলী

1. Explain the nature of Attenti n. [ B.A. 1965
   Ans. ( পৃ: ১৭২—১৭৩ )
2. What are the conditions of Attention ? [ B. A. 1960
   Ans. ( পৃ: ১৭৫—১৭৯ )
3. Explain and Illustrate the different types ( or kinds ) of Attention. [ C. U. 1962, '65
   Ans. ( পৃ: ১৭৯—১৮১ )
4. What is the range or span of Attention? How many things can we attend at the same time ?
   Ans. ( পৃ: ১৮২—১৮৪ )
5. Explain the nature of attention. Is attention interest in action ? Discuss. [ B. T. 1965
   Ans. ( পৃ: ১৭২—১৯২ )
6. Why is attention important in education ? [ B. A. 1968
   Ans. ( পৃ: ১৯৫—১৯৮ )

7. What is Interest ? How attention is related to interest ? What are the sources of interest ? [ B. A. 1958, 1962, 1968
Ans. ( পৃঃ ১৯০, ১৯১, ১৯২ )

8. Discuss the place of Interest in Education. How interest can be aroused in children ?
Ans. ( পৃঃ ১৯২— )

9. Should interest always accompany Learning ? Explain to what extent it should accompanny ?
Ans. ( পৃঃ ১৯০—১৯১ )

10. What are the uses of attention ?
Ans ( পৃঃ ১৯০ )

11. What is attention ? What are the factors determining attention ? [ B. A. 1970
Ans. ( পৃঃ ১৭২—১৭৩ ; ১৭৫—১৭৯ )

12. Discuss a few methods by which attention can be controlled.
Ans. ( পৃঃ ১৮৯—১৯০ )

13. Discuss the importance of attention and interest in memorization. [ B. A. 1963
Ans. ( পৃঃ ১৯৫— ১৯৮ )

14. What do you understand by fluctuation of attention ? How is it measured ?
Ans. ( পৃঃ ১৮৪—১৮৫ )

15. How does attention develop in child ?
Ans. ( পৃঃ ১৮১—১৮২ )

# সপ্তম অধ্যায়

# কাজ ও অবসাদ

# (Work and Fatigue)

## ১। মানসিক কাজ ও অবসাদ (Mental work and Fatigue) :

কাজ বলতে সাধারণতঃ আমরা দু ধরনের কাজ বুঝে থাকি। শারীরিক (Physical) ও মানসিক (Mental)। মানসিক কাজ দু ধরনের হতে পারে—অনৈচ্ছিক এবং স্বেচ্ছাকৃত। যখন ইচ্ছা প্রয়োগ করে আমায় কোন বিষয় চিন্তা করতে হচ্ছে না, তখনও মনের কাজ চলছে, এলোমেলোভাবে মনে চিন্তা যাওয়া আসা করছে। তবে এ হল অনৈচ্ছিক মানসিক কাজের উদাহরণ। আর যখন ইচ্ছা প্রয়োগ করে, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কোন বিষয় আমরা চিন্তা করি তখন তাহল স্বেচ্ছাকৃত মানসিক কাজ। ঐচ্ছিক মনোযোগ (voluntary attention) ছাড়া স্বেচ্ছ কৃত মানসিক কাজে সফলতা আসে না। মনে মনে একটা হিসেব করছি। অমনোযোগী হলে হিসেব মিলবে না। এই ঐচ্ছিক মনোযোগ আবার কাজের প্রতি আগ্রহের উপর নির্ভর করে। স্বেচ্ছাকৃত মানসিক কাজ একটানা করে চললেই মানসিক অবসাদ দেখা দেয়। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার কাজই সাধারণভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে, আবার নিপুণতা বা দক্ষতার সঙ্গেও সম্পন্ন করা যেতে পারে। যথাযথ শিক্ষা, অভ্যাস, অনুশীলন ও সঠিক কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য যখন কোন কাজ স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে, স্বচ্ছন্দভাবে ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা যায়, তখনই কাজে দক্ষতা প্রকাশ পায়। যে কোন কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হলে তা নিপুণভাবে শিক্ষা করারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু কোন কাজে দক্ষতা অর্জন করলেও সে কাজ সম্পাদন করার সময় দক্ষতার মান বরাবর বজায় রাখা সম্ভব হয় না। নিপুণভাবে কাজ শিক্ষা করলেই যে সব সময় বা বরাবর দক্ষতার সঙ্গে সেই কাজ সম্পন্ন করা যাবে তা সম্ভব নয়, অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ের প্রভাব কর্মীর উপর এমনভাবে পড়তে পারে যার জন্য কর্মীর দক্ষতা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে।

দক্ষতায় মান বরাবর বজায় রাখা সম্ভব নয়

কাজের দক্ষতা কিভাবে বাড়ে বা কমে তার যদি একটা হিসেব নেওয়া যায় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, তার কয়েকটি স্তর আছে। কাজের শুরুতে

উর্ধ্বগতি দেখা দেয়, তারপর একটা স্থিতিশীল অবস্থা আসে, তারপর কাজের নিম্নগতি দেখা দেয়। শুরুতে কর্মীর মনে থাকে আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা, কাজেই কর্মীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেতে পেতে একটা সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে পৌছায়। তারপর দক্ষতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং এমন এক অবস্থায় এসে পৌছায় যে, যখন উর্ধ্বগতি বা নিম্নগতি আর কিছুই ঘটে না—অর্থাৎ দক্ষতা একটা স্থিতিশীল অবস্থায় এসে উপনীত হয়, একে বলা যেতে পারে কাজের উন্নতির পথে উপত্যকা (Plateau)। কাজের রেখাচিত্র অঙ্কন করলে এরূপ স্থানের রেখাচিত্র অনেকটা উপত্যকার মতো মনে হয়। এই অপরিবর্তিত অবস্থা বেশ কিছু সময় চলার পর কাজের নিম্নগতি লক্ষ্য করা যায়। কর্মীর দক্ষতা ধীরে ধীরে আরও কমতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে একটা উর্ধ্বগতি দেখা দেয়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী, তারপর আবার দক্ষতা হ্রাস পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত কর্মীর কর্মদক্ষতায় বিরতি এসে যায়।

**কাজের গতির কয়েকটি স্তর আছে**

**উপত্যকাকাল**

কাজের দক্ষতার এই হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে নানা কারণে। তার মধ্যে দুটি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। একটি প্রেষণা (Motivation) এবং অপরটি অবসাদ বা ক্লান্তি (Fatigue)। শক্তিশালী প্রেষণার অনুপস্থিতির জন্য কর্মীর দক্ষতার হ্রাস ঘটে। এই প্রেষণা ব্যক্তিভেদে এবং অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। একটি শিশুর কাজের দক্ষতার মান অব্যাহত রাখতে হলে অবশ্যই খুব শক্তিশালী প্রেষণার প্রয়োজন। কিন্তু একজন বয়ঃপ্রাপ্তের ক্ষেত্রে হয়ত তার প্রয়োজন সব সময় নাও দেখা দিতে পারে। ক্লান্তি হল সর্বজনীন। কাজে ক্লান্তি বা অবসাদ সকলকেই কম-বেশী অনুভব করতে হয়। দৈহিক পরিশ্রমের একটা সীমা আছে, যদিও তা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। সেই সীমা অতিক্রম করলে দৈহিক ক্লান্তি দেখা দেবেই। মানসিক অবসাদও তার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। মানসিক অবসাদ কারও ক্ষেত্রে সহজে দেখা দেয় আবার কারও ক্ষেত্রে বিলম্বে দেখা দেয়, তবু এ সর্বজনীন। অবসাদ বা ক্লান্তি কতকগুলি কারণে দেখা দেয় এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট সূত্রের দ্বারা অবসাদের কাল, পরিমাণ প্রভৃতি নির্ধারিত হয়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলেও ক্লান্তি বা অবসাদের জন্যই কর্মীর দক্ষতার মান অপরিবর্তিত থাকে না। উপযুক্ত উপায়

**কর্মদক্ষতার হ্রাসবৃদ্ধির দুটি প্রধান কারণ—প্রেষণা ও অবসাদ**

অবলম্বনের দ্বারা এই ক্লান্তি দূরীভূত করে কর্মীকে তার পূর্ব দক্ষতার মানে আবার ফিরিয়ে আনতে হয়।

## ২। অবসাদ বা ক্লান্তি (Fatigue) :

কার্যকর শিক্ষণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছি যে ক্লান্তি বা অবসাদ কার্যকর শিক্ষণের পথে এক বিরাট অন্তরায়স্বরূপ। ক্লান্তি বা অবসাদের জন্য শিক্ষণের ক্ষেত্রে দক্ষতা হ্রাস পায়।

অবসাদের জন্য শিক্ষণের ক্ষেত্রে দক্ষতার হ্রাস

**অবসাদ বা ক্লান্তির স্বরূপ কি?** দৈহিক বা মানসিক, যে কোন কাজ অবিরতভাবে সম্পাদন করতে করতে যখন একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তখন দেখা যায় কাজে দক্ষতা বা কুশলতা হ্রাস পাচ্ছে, কাজে আর আগ্রহ জাগছে না, শরীর ও মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে এবং কাজ করার ইচ্ছাও আর জাগছে না। একেই বলা হয় ক্লান্তি বা অবসাদ। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর পা আর চলতে চায় না। দীর্ঘ সময় ধরে কোন বই পড়তে থাকলে চোখ টনটন করে—এমন একটা অবস্থা আসে যখন আর পড়তে ইচ্ছা করে না। কোন হাতের কাজ একটানা কয়েক ঘণ্টা করার পর, কাজ আর এগোয় না, কাজে ভুল হয়। তখনই মনে করতে হবে কাজে ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দিয়েছে। স্যাণ্ডিফোর্ড (*Sandiford*) অবসাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'কর্মে দক্ষতার হ্রাসই অবসাদ'।

অবসাদ বা ক্লান্তির স্বরূপ

কার্যকরী শিক্ষণের জন্য প্রেষণা, মনোযোগ, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা, দৈহিক সুস্থতা, মনোরম পরিবেশ প্রভৃতির প্রয়োজন। কিন্তু এই সবগুলির উপস্থিতি সত্ত্বেও কেবলমাত্র অবসাদ বা ক্লান্তির জন্য সার্থক শিক্ষণ ব্যাহত হয়। ক্লান্তি বা অবসাদ কাজে আগ্রহ ও মনোযোগ নষ্ট করে দেয়, দৈহিক সামর্থ্য নষ্ট করে এবং কাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে।

## ৩। ক্লান্তি বা অবসাদের শ্রেণীবিভাগ

ক্লান্তি বা অবসাদকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (১) পেশী সংক্রান্ত (Muscular), (২) ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত (Sensory) এবং (৩) মানসিক (Mental)। পেশী সংক্রান্ত এবং ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত অবসাদকে একত্রে দৈহিক অবসাদ (Physiological Fatigue) নামে অভিহিত করা হয়।

সুতরাং অবসাদের মোটামুটি দুটি শ্রেণী বিভাগ হল, দৈহিক (Physiological) এবং মানসিক (Mental)।

যান্ত্রিক ধরনের কাজ একটানা করতে থাকলে পেশীগুলির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, পেশীগুলি অবসন্ন হয়ে পড়ে। তার ফলে দৈহিক ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। দীর্ঘ সময় ধরে লাফালাফি করা, দৌড়-ঝাঁপ দেওয়া, মাটি কোপান প্রভৃতি কাজের ফলে পেশীর অবসাদ দেখা দেয়, তার ফলে দৈহিক ক্লান্তি ও অবসাদ জাগে। আবার কোন মানসিক কাজ একটানা করতে থাকলে স্নায়ুকেন্দ্র অবসন্ন হয়ে পড়ে, তার ফলেও মানসিক অবসাদ দেখা দেয়। যেমন, একটানা কয়েক ঘণ্টা ধরে কোন বই পড়তে থাকলে, অঙ্ক কষতে থাকলে, কোন সূক্ষ্ম জটিল সমস্যা নিয়ে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করতে থাকলে দেখা যায় যে, ধীরে ধীরে ক্লান্তি বা অবসাদ জাগছে, আর কাজ করা যাচ্ছে না বা চিন্তা করা যাচ্ছে না। চিন্তা জট পাকিয়ে যাচ্ছে, বা কাজে ভুল হচ্ছে ; জোর করে কাজ করবার চেষ্টা করলেও লাভ হয় না, কেননা, কাজে গতি আসে না। কাজ করতে বিরক্তির সঞ্চার হয়, শেষ পর্যন্ত কাজে আর আগ্রহ জাগে না। এই হল মানসিক অবসাদ বা ক্লান্তির উদাহরণ।

পেশী অবসন্ন হলে দৈহিক ক্লান্তি ও স্নায়ুকেন্দ্র অবসন্ন হলে মানসিক ক্লান্তি দেখা দেয়

দৈহিক অবসাদ আর মানসিক অবসাদের মধ্যে কোন ধরাবাধা শ্রেণীবিভাগ করা চলে না। যেহেতু একটির সঙ্গে আর একটির নিবিড় সম্পর্ক। তাছাড়া, দৈহিক অবসাদ মানসিক অবসাদ সৃষ্টি করে। আবার মানসিক অবসাদ দৈহিক অবসাদ সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উভয় প্রকার অবসাদের একত্র সংমিশ্রণই লক্ষ্য করা যায়। একটানা কয়েক ঘণ্টা দৈহিক পরিশ্রম করার পর যেমন দৈহিক অবসাদ দেখা দেয় তেমনি মানসিক অবসাদও দেখা দেয়। ঐ অবস্থায় কোন কঠিন সমস্যার সমাধানে মনকে নিবিষ্ট করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে, মানসিক অবসন্নতা চলাকালীন দৈহিক কাজে অনিচ্ছা জাগে। সাধারণতঃ দৈহিক অবসাদ পেশীর ক্লান্তির জন্য এবং মানসিক অবসাদ স্নায়ুর ক্লান্তির জন্য ঘটে থাকে—এরূপই ধারণা করা হয়। দেহতত্ত্বের দিক থেকে উভয় প্রকার ক্লান্তির উৎস এভাবে চিহ্নিত করা হলেও বাস্তবে উভয় প্রকার অবসাদকে পৃথকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। দৈহিক অবসাদে মানসিক অবসাদ জাগে, আবার মানসিক অবসাদেও দৈহিক অবসাদ জাগে।

দৈহিক ও মানসিক অবসাদ একত্র মিশিয়ে থাকে

তবে সাধারণতঃ দেখা যায়, দৈহিক অবসাদ যত তাড়াতাড়ি মানসিক অবসাদ সৃষ্টি করে, মানসিক অবসাদ তত দ্রুত দৈহিক অবসাদ সৃষ্টি করতে পারে না।

ক্লান্তি বা অবসাদ সাধারণ (general) হতে পারে বা আংশিক (partial) হতে পারে। যখন সমগ্র দেহেই ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভূত হয় তখন এ হল সাধারণ অবসাদের উদাহরণ। কোন বিশেষ পেশী বা ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা হল আংশিক অবসাদ। একটানা লেখার জন্য যখন কেবলমাত্র ডান হাতেই অবসন্নতা দেখা দেয়, তখন তাহল আংশিক অবসাদের উদাহরণ।

অবসাদ সাধারণ বা আংশিক হতে পারে

## ৪। দৈহিক ও মানসিক অবসাদ পরিমাপের বিভিন্ন যন্ত্র ও উপায় (Different ways of the measurement of physical and mental fatigue) :

দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিরূপণ এবং পরিমাপ করার জন্য নানা ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। নাড়ীর স্পন্দনের হার, দেহের উত্তাপের তারতম্য, নিশ্বাস প্রশ্বাসের পার্থক্য, অঙ্গ সঞ্চালনের সামর্থ্যের তারতম্য, পেশী সংক্রান্ত কর্মকুশলতার হ্রাসবৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে দৈহিক অবসাদ পরিমাপ করা হয়।

দৈহিক অবসাদ পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি

অবিরতভাবে দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা বা কাজ করার ক্ষমতা, প্রশ্নোত্তরের দ্রুততা, লেখা বা বলার ভুলের হার, নির্ভুল গণনাশক্তি, মনোযোগ, আগ্রহের তীব্রতা, পাদপূরণ, স্মরণশক্তি, একটানা অনুশীলন, কোন বিষয়ে একটানা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ক্ষমতা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সহায়তায় মানসিক অবসাদ পরিমাপের চেষ্টা করা হয়। মানসিক অবসাদ সম্পর্কে পরিমাপ করার জন্য নানাবিধ পরীক্ষণকার্য চালান হয়েছে। তারই দু'-একটি নীচে আলোচিত হচ্ছে :

মানসিক অবসাদ পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি

পাদপূরণ করা সম্পর্কে যে পরীক্ষণকার্য (Completion test) চালান হয় তাতে পরীক্ষণ-পাত্রকে (Subject) একটি গল্প পড়তে দেওয়া হয়। এই গল্পটির কতকগুলি অংশ অপূরণ রাখা হয় এবং পরীক্ষণ-পাত্রকে বলা হয় সেই অংশগুলি পূরণ করার জন্য। পরীক্ষণ-পাত্র পড়া শুরু করার কিছুক্ষণ পরে দেখা যায়, পড়ার গতি ও পাদপূরণের গতি হ্রাস পাচ্ছে ও

পাদপূরণের পরীক্ষা

ভুল হচ্ছে। ক্রমশঃ ভুলের সংখ্যা বাড়ছে বা যে পাদগুলি পূরণ করতে হবে সেগুলি নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। এর থেকেই মানসিক অবসাদের পরিমাপ করা যায়।

মানসিক অবসাদ পরিমাপের আর একটি পদ্ধতি হল অক্ষর কেটে বা মুছে দেওয়ার পরীক্ষা (cancellation test or letter erasing test)।

**অক্ষর কেটে দেওয়ার পরীক্ষা**

কোন একটি লেখার মধ্যে 'প' এই বিশেষ অক্ষরটি পরীক্ষার্থীকে কেটে দিতে বলা হল। এইরূপ একটানা কাজের জন্য পরীক্ষার্থীর মধ্যে ক্লান্তি দেখা দেয়। পরীক্ষার্থীর ভুলের পরিমাণ, কাজের গতি, নজর এড়িয়ে যাওয়া প্রভৃতি থেকে তার মানসিক অবসাদের পরিমাপ করা যায়।

মুখস্থ করার পরীক্ষণ (Memorisation test) কার্য চালিয়েও মানসিক অবসাদের পরিমাপ করা যায়। একটা পড়া মুখস্থ করতে কতবার পড়তে হচ্ছে তা থেকে মানসিক অবসাদের পরিমাপ করা যেতে পারে।

**মুখস্থ করার পরীক্ষণ**

গণনার সাহায্যে পরীক্ষণ কার্য (Calculation test) চালিয়েও মানসিক অবসাদ পরিমাপ করা যেতে পারে। এ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে নানা ধরনের আঙ্কিক গণনা করতে দেওয়া হয়। গণনা করতে কত সময় লাগে, কি পরিমাণ ভুল হচ্ছে তার সাহায্যে মানসিক অবসাদ মাপা যায়।

**গণনার সাহায্যে পরীক্ষণ কার্য**

এইভাবে আঙ্কিক গণনার সাহায্যে মানসিক অবসাদ পরিমাপ করার জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টিচার্স কলেজের' জাপানী ছাত্রী মিস্ আরাই (*Miss Arai*) নানা ধরনের পরীক্ষণ করেন। তিনি তাঁর পরীক্ষণ-কার্যে চারটি সংখ্যাকে চারটি সংখ্যা দিয়ে মনে মনে কয়েকদিন ধরে গুণ করতে লাগলেন। প্রথমতঃ, তিনি ৮,১৭৩ এবং ৫,৬৯৯ এই সংখ্যা দুটি মুখস্থ করলেন। তারপর তাদের গুণফল নিরূপণ করার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি মনে মনে তাদের গুণফল নির্ণয় করলেন। প্রায় ১১ ঘণ্টা অনুশীলনের পর তিনি দেখলেন যে, সঠিক উত্তর পাবার জন্য তাকে পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ সময় ব্যয় করতে হচ্ছে এবং ভুলের পরিমাণও কিছু বাড়ছে। এ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত করলেন যে মানসিক অবসাদই এর কারণ। ১১ ঘণ্টার শেষে তার যে কর্মদক্ষতা প্রকাশ পাচ্ছে, তা শুরুতে যে কর্মদক্ষতা ছিল তার শতকরা ৫০ ভাগ।

**মিস্ আরাই-এর পরীক্ষণ-কার্য**

দৈহিক অবসাদ পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন রকম যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে :

(১) **এস্‌থিসিওমিটার (Aesthesiometer) :** এ যন্ত্রের সাহায্যে ত্বকের স্পর্শানুভূতির পরিমাপ করা হয়। অবসাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি হ্রাস পেতে থাকে।

এস্‌থিসিওমিটার

(২) **ডাইনামোমিটার (Dynamometer) :** এ যন্ত্রটির সাহায্যে হাতের মুঠির শক্তি (strength of grip) নিরূপণ করা যায়। কিছুক্ষণ পরিশ্রমের পর ব্যক্তি কতটুকু অবসাদগ্রস্ত হল তাও এ যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়ে। অবসাদের ফলে হাতের মুঠির জোর কমে আসে।
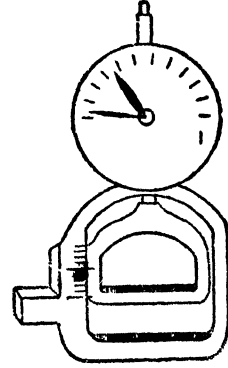
ডায়নামোমিটার

(৩) **আরগোগ্রাফ (Ergograph) :** ১৮ খ্রীষ্টাব্দে মসো (*Mosso*) এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। এ যন্ত্রে পরীক্ষার্থীর হাতটি শক্ত করে একটি টেবিলের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে মাঝের আঙ্গুল ছাড়া অন্য আঙ্গুল নাড়তে না পারে। ঐ মাঝের আঙ্গুলের সঙ্গে একটা শক্ত দড়ি দিয়ে একটা ওজন বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর পরীক্ষার্থীকে আঙ্গুলকে সঙ্কুচিত আর প্রসারিত করে ওজনটিকে ওঠাতে নামাতে বলা হয়। ক্রমশঃ আঙ্গুলে অবসন্নতা দেখা দেয়, তখন আর দ্রুত তাকে ওঠান নামান সম্ভব হয় না। কিমোগ্রাফের ধোঁয়ান কাগজের সঙ্গে একটি লেখার স্টাইলাস সংযুক্ত থাকে যার দ্বারা পরীক্ষার্থীর প্রতিটি টানের একটি চিত্ররূপ কিমোগ্রাফে আঁকা হয়ে যায়। এই চিত্রটিকে বলা হয় **আরগোগ্রাম (Ergogram)**।
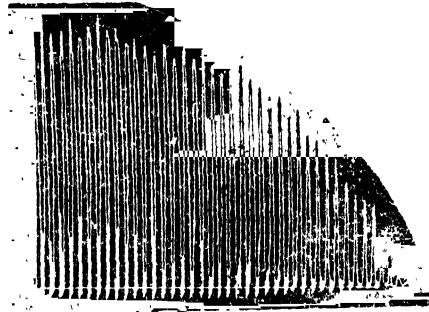
আরগোগ্রাফ

আরগোগ্রাম

উপরের রেখাচিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পরীক্ষার্থীর প্রথম দিকের টানগুলি খুব দীর্ঘ ছিল কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যতই আঙ্গুল অবসন্ন হয়ে পড়ছে

ততই এই টানের দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে আসছে এবং সর্বশেষে যখন আঙ্গুল খুবই অবসন্ন হয়ে পড়েছে তখন টান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝামাঝি অবস্থায় এই দৈর্ঘ্য প্রায় একই আছে।

## ৫। বিদ্যালয়ে অবসাদ (Fatigue in School) :

বিদ্যালয়ের কাজে শিক্ষার্থীদের অবসন্নতা কতখানি দেখা দেয় এবং তার জন্য কাজের দক্ষতা কিভাবে ব্যাহত হয় সে সম্পর্কেও পরীক্ষণকার্য চালান হয়েছে। *Winch, Gates Heck* প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, ক্লান্তি বা অবসাদ-হেতু বিদ্যালয়ের শিশুদের কাজের দক্ষতার বিশেষ হেরফের ঘটে না। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সুনিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রকৃত কোন মানসিক অবসাদ নেই। বিদ্যালয়ের কাজের বিভিন্ন সময়ে পড়া, অঙ্ককষা, অসম্পূর্ণ বাক্যের পাদপূরণ করা প্রভৃতি ব্যাপারে শিশুদের কর্মক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে কিনা, সে সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে, বিদ্যালয়ের কাজের সারা দিন তাদের সামর্থ্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। সকাল আটটায় এবং দুপুর চারটায় মানসিক কাজ করার সামর্থ্য গড়ে সব শিশুরই প্রায় সমান। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, মানসিক অবসাদের জন্য বিদ্যালয়ের কাজে দিনের কোন সময়েই মানসিক শক্তি ও কর্মক্ষমতার বিশেষ হানি ঘটে না।

**ক্লান্তির জন্য বিদ্যালয়ের শিশুদের কাজের দক্ষতা হ্রাস পায় না**

বিদ্যালয়ের কাজে কর্মক্ষমতায় যে হ্রাস লক্ষ্য করা যায় তার কারণ মানসিক অবসাদ নয়; বিরক্তি, চঞ্চলতা, কাজে আগ্রহের অভাব বা বদ্ধ ঘরে আলো-বাতাসের অভাব ইত্যাদি। উন্নত শিক্ষণ-প্রণালীর প্রয়োগে শিশুদের শেখার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। একথা সত্য যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষণকার্যে শিক্ষার্থীদের কোন মানসিক ক্লান্তি আসে না, তবু কেমন যেন একটা ক্লান্তির ভাব তাদের মধ্যে দেখা দেয়। শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষের কঠোর শাসনব্যবস্থা; খেলাধূলা, বিশ্রাম ও আনন্দের অভাব, অমনোরম পরিবেশ, আলো-বাতাসহীন বদ্ধ শ্রেণীকক্ষ, বৈচিত্র্যহীন শিক্ষাপদ্ধতি, পুষ্টিকর খাদ্যাভাবহেতু শিক্ষার্থীর দৈহিক দুর্বলতা, সফলতা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ও

**বিরক্তি, চঞ্চলতা, আগ্রহের অভাব ও কর্মদক্ষতা হ্রাস পাবার কারণ**

উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও মানসিক দুশ্চিন্তা, ভাবদমন প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেমন একটা অবসাদের ভাব সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষার্থীর দৃঢ়সঙ্কল্প ও ইচ্ছা, শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষণ-কার্যে আন্তরিকতা, শিক্ষার্থীর শিক্ষণের আগ্রহ, সময়োচিত বিরাম ও বিশ্রাম, খেলাধূলার ব্যবস্থা, শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য, উন্নত শিক্ষণ-প্রণালী ইত্যাদি এই ক্লান্তিভাব দূরীকরণে সমর্থ হয়। কাজেই বিদ্যালয়ের কাজে দক্ষতার মান যদি হ্রাস পায়, তা শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতা হ্রাস পাবার জন্য নয়; কাজে আগ্রহের অভাবহেতু এবং কেমন যেন একটা ক্লান্তি বা অবসাদের অনুভূতির (feeling of tiredness) জন্যই তা ঘটে থাকে।

বিদ্যালয়ের কাজের শুরুর সময় শিশুরা যে কর্মদক্ষতা দেখায়, বিদ্যালয়ের কাজের শেষভাগে তারা সেই একই কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে পারে। তবু বিদ্যালয়ের কাজের শেষভাগে শিশুরা চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের পরে যেসব কাজ তারা করে থাকে, যেমন বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব, খেলা-ধূলা, বেড়ান—এ সবের একটা মানসিক প্রস্তুতি তাদের মধ্যে দেখা দেয়, ফলে পঠনীয় বিষয়ে আগ্রহের অভাব দেখা দেয়। বস্তুতঃ, শিক্ষকদের মধ্যেও এ সময় কাজে আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করা যায়, শিশুদের তো দূরের কথা। শিশুদের মধ্যে এই সময় চঞ্চলতা ও মনোযোগের অভাব দেখা গেলেও, কোন পরীক্ষণকার্যে শিশুদের এ সময় নিযুক্ত রাখলে তাদের কর্মশক্তি, কাজে মনোযোগ ও আগ্রহ যে অন্য সময়ের অনুরূপ তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ কোন বিদ্যালয়ের পাঠদান-তালিকা পরীক্ষণকার্যের মতো অতটা কঠোর হয় না। সে কারণে দিনের শেষভাগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজের আগ্রহের অভাব দেখা যায়। এই কারণে পাঠদান তালিকাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সেই সময়েই বেশী উৎসাহভরে কাজ করতে পারে, যে সময়ে কাজে মনোযোগ নিবিষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিদ্যালয়ের কাজের শুরুতে যে কর্মদক্ষতা দেখা যায় তা বিদ্যালয়ের কাজের শেষ ভাগেও পরিদৃষ্ট হয়

সাধারণতঃ ধারণা করা হয় যে, কোন কোন পঠনীয় বিষয় অন্য বিষয়ের তুলনায় সহজেই অবসাদ সৃষ্টি করে, কাজেই বিদ্যালয়ের কাজের প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলি শিক্ষার্থীর শিক্ষা করা উচিত। ভাগনার (*Wagner*) এ সম্পর্কে একটা তালিকাও তৈরী করেছেন। পরপৃষ্ঠায় তালিকাটি লিপিবদ্ধ করা হল। এই তালিকায় ১০০-কে অবসাদের পূর্ণমান হিসেবে ধরা হয়েছে।

ভাগনারের তালিকা

| বিষয় | অবসাদের মান |
| --- | --- |
| গণিত | ১০০ |
| ভাষা | ৯১ |
| ইতিহাস ও ভূগোল | ৮৫ |
| প্রকৃতি-বিজ্ঞান | ৮০ |
| অঙ্কন | ৭৫ |
| পরিশ্রমসাধ্য খেলাধূলা ও ব্যায়াম | ৯০ |

এ সম্পর্কে একাধিক পরীক্ষণকার্য চালিয়ে এই সিদ্ধান্ত করা গেছে যে, পূর্বোক্ত অভিমতের মূলে কোন সত্যতা নেই। গণিতের কাজে সহজেই অবসাদ বা ক্লান্তি আসে। সুতরাং বিদ্যালয়ের কাজের শেষ ঘণ্টায় তা করান যেতে পারে না, এ সত্য নয়। ক্লান্তি উৎপাদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের তারতম্য চলে না। সুতরাং ভাগনারের উপরিউক্ত তালিকা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়। গণিত, ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় দিনের যে কোন সময়েই সমান কুশলতার সঙ্গে শিক্ষা করা চলে। আসলে আগ্রহের অভাব ও অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রম কর্মকুশলতার হানি ঘটায়। পঠনীয় বিষয়ের দুরূহতা ও বৈচিত্র্যহীনতা, শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, অমনোরম পরিবেশ, শিক্ষকের কঠোর মনোভাব শিক্ষণীয় বিষয়কে বিরক্তিকর করে তোলে। মানসিক অবসাদ ও বিরক্তি সমার্থক নয়, তবু শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর বিতৃষ্ণা জাগলে শিক্ষাদান-কার্য ব্যাহত হয়। কাজের মধ্যে পরিবর্তন এনে শিক্ষার্থীর কর্মকুশলতার মান অব্যাহত রাখা সম্ভব। ক্লান্তির প্রশ্ন বড় নয়, শিক্ষকের কাছে প্রধান সমস্যা হল বিদ্যালয়ের কাজের সমস্ত দিনটি ধরে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে কিভাবে জাগিয়ে রাখা যায়।

ক্লান্তি উৎপাদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তারতম্য করা চলে না

### ৬। অবসাদের কারণ (Causes of Fatigue) :

অবসাদ বা ক্লান্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটি—শারীরিক (physical), মানসিক (mental) এবং পরিবেশগত (environmental)।

**(ক) শারীরিক কারণ (Physical Cause):** শরীরের অভ্যন্তরে শক্তি-উৎপাদক পদার্থগুলির ক্ষয়ের দরুন ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। পেশী বা স্নায়ুগুলি যদি একটানা কাজ করতে থাকে তাহলে যে তন্তুর দ্বারা পেশীগুলি

গঠিত বা যে কোষের দ্বারা স্নায়ুগুলি গঠিত, সেগুলির শক্তি-উৎপাদক পদার্থের ক্ষয় সাধিত হয়, ফলে অবসাদ দেখা দেয়। আহার এবং বিশ্রামের দ্বারা শক্তি-উৎপাদক পদার্থ পুনরায় সঞ্চিত হলে পেশী ও স্নায়ুর অবসন্নতা দূর হয় এবং সেগুলি আবার কার্যক্ষম হয়ে ওঠে। তবে পরীক্ষণের সাহায্যে জানা গেছে, পেশী যত দ্রুত অবসন্ন হয়ে পড়ে, স্নায়ু তত দ্রুত অবসন্ন হয় না।

**শক্তি-উৎপাদক পদার্থগুলির ক্ষয়ের দরুন অবসাদ**

পেশীগুলি ক্রিয়া করার জন্য দেহের অভ্যন্তরে অপচয়জনিত বিষাক্ত পদার্থ (toxic waste products) সঞ্চিত হতে থাকে।[1] দেহের অভ্যন্তরেই এমন ব্যবস্থা আছে যার দ্বারা এই দূষিত বিষাক্ত পদার্থ শোধিত ও নিষ্কাশিত হয়। যদি এই শোধন ও নিষ্কাশন-ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে দূষিত বিষ ক্রমশঃ সঞ্চিত হতে থাকে তখনই অবসাদ দেখা দেয়। প্রান্ত-সন্নিকর্ষ বা স্নায়ু সংযোগের (Synapse) উপরই এই দূষিত বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়া অধিক পরিমাণে ঘটে থাকে।

**অপচয়জনিত বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয়**

পরিমিত অম্লজানের (oxygen) অভাব ঘটলেও অবসাদ দেখা দেয়। রক্তের মধ্যে দু প্রকার কণিকা আছে শ্বেত-কণিকা ও লোহিত-কণিকা। এই লোহিত-কণিকাগুলি অম্লজান বহন করে। এই অম্লজানই শরীরের শক্তি উৎপাদনকারী উপাদানগুলিতে বিশ্লেষিত হতে সহায়তা করে এবং তার দ্বারা দেহে শক্তি উৎপাদিত হয়। অম্লজানের অভাব ঘটলে শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয় না, ফলে দেহের ক্ষয় পূরণ ঘটে না। সুতারং অবসাদের সৃষ্টি হয়।

**অম্লজানের অভাব**

এ ছাড়াও দাঁত বা চোখের ত্রুটি, অনিদ্রা প্রভৃতিও ক্লান্তি বা অবসাদ সৃষ্টি করতে পারে। কারও যদি দন্তশূল হয়, টনসিল ফোলে বা চোখের অত্যধিক পরিশ্রম ঘটে বা দেহে পুষ্টি বা সজীবতার অভাব দেখা দেয় তাহলে, শিশু বা বয়ঃপ্রাপ্ত যেই হোক না কেন, অবসাদ অনুভব করবে এবং পাঠে মনঃসংযোগ করতে পারবে না। সোজা কথায় দুর্বল ও অসুস্থ শরীরে ক্লান্তি বা অবসাদ সহজেই দেখা দেয়, কিন্তু সুস্থ শরীরে অবসাদ অত সহজে দেখা দেয় না।

**দুর্বল ও অসুস্থ শরীরে ক্লান্তি সহজেই দেখা দেয়**

1. "Fatigue is an accumulation of the waste products of muscular activity."—Woodworth : Psychology, page 372

**(খ) মানসিক কারণ** ( Mental Cause ): অবসাদের যেমন কতকগুলি দৈহিক কারণ আছে, তেমনি কতকগুলি মানসিক কারণও আছে। কাজে আগ্রহের অভাব ঘটলে সহজেই ক্লান্তি বা অবসাদ আসে। আগ্রহের অভাব ঘটে যখন উপযুক্ত প্রেষণার অভাব থাকে। কাজের পেছনে যদি প্রেষণা থাকে তাহলে সহজে ক্লান্তি আসে না। তবে দীর্ঘ একটানা কাজ চালান হলে স্নায়ু ও পেশী অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন প্রেষণার উপস্থিতিতেও ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। এছাড়া কর্মীর মানসিক প্রস্তুতি না থাকলেও অবসাদ দেখা দেয়।

**মানসিক কারণ**

**আগ্রহের অভাব**

**কর্মীর মানসিক প্রস্তুতি**

যে কাজের জন্য কর্মীর মানসিক প্রস্তুতি থাকে সেই কাজে ব্যক্তি তার প্রচেষ্টাকে আন্তরিক ভাবে নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু কাজের জন্য যদি মানসিক প্রস্তুতি না থাকে, বা অপরের দ্বারা কোন কাজ করার জন্য যদি সে বাধ্য হয়, কাজটি যদি ব্যক্তির নিজের কোন উদ্দেশ্য সাধন না করে, তাহলে কাজে অবসাদ বা ক্লান্তি দেখা দেয়। একটানা কাজ করার অভ্যাস না থাকা ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অভাব ঘটলেও ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়।

**একটানা কাজ করার অভ্যাস ও দৃঢ় ইচ্ছা-শক্তির অভাব**

মানসিক দৃঢ়তা থাকলে অনেক দুরূহ ও বিরক্তিজনক কাজও বেশ আনন্দের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে সম্পাদন করা যায়। কোন ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয় না।

**(গ) পরিবেশগত কারণ** (Environmental Cause): অবসাদ বা ক্লান্তি জাগাবার ব্যাপারে পরিবেশ একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। যে পরিবেশ প্রীতিকর বা মনোরম তা একটানা কাজের পক্ষে উপযোগী, সহজে সে পরিবেশ অবসাদ সৃষ্টি করে না। যেমন, আলো-হাওয়াযুক্ত শ্রেণীকক্ষে শিশুরা কাজে বেশী মনোযোগী হতে পারে, অবসাদগ্রস্ত বোধ করে না। কিন্তু যে শ্রেণীকক্ষে আলো-হাওয়ার অভাব, যার চারপাশে হৈ-চৈ গোলমাল লেগেই রয়েছে, শ্রেণীকক্ষে বসার আসনগুলি ঠিকমত সাজান নেই, এই ধরনের পরিবেশে শিক্ষার্থীর মধ্যে অবসাদ জাগে।

**মনোরম পরিবেশ একটানা কাজের পক্ষে উপযোগী**

আবার খুব গরমে বা খুব জলো আবহাওয়াতে কাজে ক্লান্তি দেখা দেয়। পফেন বার্জার (*Poffen Berger*)-এর পরীক্ষণকার্যের দ্বারা জানা যায়, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নেই এমন দুটি কারখানাতে শীতের তুলনায় খুব গরমের সময়

উৎপাদন শতকরা ১১ এবং ১৮ ভাগ কম, অথচ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আছে এমন কারখানাতে শীতের তুলনায় গরমকালের উৎপাদন শতকরা মাত্র ৮ ভাগ কম। অবশ্য পরীক্ষণের সাহায্যে দেখা গেছে গরম, বদ্ধ বাতাস, হৈ-চৈ ইত্যাদিতেও ক্লান্তি বা অবসাদ অনেক সময় দেখা দেয় না যদি উপযুক্ত প্রেষণা কর্মীর মধ্যে থাকে।

খু' গরমে বা জলো আবহাওয়াতে ক্লান্তি দেখা দেয়

## ৭। অবসাদের কুফল (Dangers of Fatigue) :

কার্যকরী শিক্ষণ (effective learning) যেসব কারণে ব্যাহত, হয়, তার মধ্যে অবসাদ অন্যতম। শিক্ষণের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর সুস্থ দেহ ও সতেজ মন। দেহ ও মন যদি সুস্থ থাকে তাহলে শিক্ষার্থী সহজে শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করতে পারে, শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করার সম্ভাবনা থাকে। ক্লান্ত দেহ ও অবসন্ন মন নিয়ে পাঠে মনঃসংযোগ করা সম্ভব নয় এবং এই অবস্থায় কাজ করলে কাজে ভুলভ্রান্তি দেখা দেয়। অবসন্ন অবস্থায় চিন্তন-শক্তির সক্রিয়তা দেখা যায় না, স্মরণ রাখার ক্ষমতা হ্রাস পায়। শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সংযোগ সাধন তেমন ভালভাবে সংগঠিত হতে পারে না। মনোযোগের অভাবহেতু চিত্তবিক্ষেপ ঘটে, মন বিষয়ান্তরে ধাবিত হওয়ার জন্য পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। এ তো গেল শিক্ষার্থীর অবসাদের কথা।

শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে অবসাদের কুফল

শিক্ষকের অবসাদ বা ক্লান্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও ক্ষতিকর ও মারাত্মক। ক্লান্ত-অবসন্ন শিক্ষক যদি যান্ত্রিকভাবে কোনরকমে দায়সারা করে শিক্ষাদান কাজে লিপ্ত থাকেন, তাহলে ছাত্ররা সেই শিক্ষা থেকে কোন প্রেরণা বা উৎসাহ লাভ করতে পারে না, নতুন জ্ঞান অর্জনও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। শিক্ষকের মনোভাব সার্থক শিক্ষণের অন্যতম শর্ত। সদাপ্রফুল্ল, সতেজ, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর এমন শিক্ষক যদি শিক্ষা দেন তাহলে ছাত্ররা শেখার প্রেরণা পাবে, শিক্ষণীয় বিষয় বৈচিত্র্যহীন মনে হবে না। কিন্তু ক্লান্ত মন নিয়ে শিক্ষক যদি শ্রেণীকক্ষে যান, তাঁর নীরস বৈচিত্র্যহীন শিক্ষাপদ্ধতি পঠনীয় বিষয়কে বিরক্তিকর করে তুলবে; পাঠে ছাত্রদের বিতৃষ্ণা জাগবে, ছাত্র-ছাত্রী লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক আদর্শস্বরূপ, ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত শিক্ষক নিজেই নিরুৎসাহী, শিক্ষার্থীর উৎসাহ জোগাবার সুযোগ তাঁর কোথায়?

শিক্ষকের ক্ষেত্রে অবসাদের কুফল

শিক্ষার্থী ও শিক্ষক—শিক্ষার ক্ষেত্রে উভয়ের দিকে সমানভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর ক্লান্তি বা অবসাদ দূরীকরণের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের অবসাদ বা ক্লান্তি অপনোদন করার দিকেও সমান নজর দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের দারিদ্র্য মোচন করা, তাঁর নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করা, জীবনধারণের জন্যই তার সমস্ত শক্তি যাতে ব্যয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, কাজের মধ্যে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা, দৈনন্দিন কাজের পাঠদান-তালিকা (routine) যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক করে তোলা ইত্যাদি।

শিক্ষকের অবসাদ দূরীকরণের উপায়

## ৮। অবসাদ দূরীকরণের উপায় (Remedy for Fatigue) :

কাজ করার জন্য আমাদের দেহের শক্তির ক্ষয় সাধিত হয়। এই ক্ষয় পূরণ না হলে ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। প্রয়োজনমত বিশ্রাম দেহের এই ক্ষয় পূরণে সহায়তা করে। বিশ্রামে দেহের শক্তি উৎপাদনকারী পদার্থগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে; দেহে শক্তি ও উত্তাপের সঞ্চার হয়, ফলে ক্লান্তি দূরীভূত হয়।

বিশ্রাম

পুষ্টিকর ও টাট্কা খাদ্য দেহের ক্ষয় পূরণ করে ক্লান্তি দূর করে। চা, কফি, কোকো প্রভৃতি পানীয়ও দেহের অবসাদ দূরীকরণে সহায়তা করে। কিন্তু দুধ, ফল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য শুধুমাত্র ক্লান্তি দূর করে না, নষ্ট শক্তির পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। এই কারণে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের টিফিনের সময় পুষ্টিকর খাদ্য দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

পুষ্টিকর ও টাটকা খাদ্য

নিদ্রা ক্লান্তি অপনোদনে সহায়তা করে। নিদ্রার মাধ্যমে শরীর বিশ্রাম পায়, ফলে দেহের ক্ষয় পূরণ হয়, ক্লান্তি দূরীভূত হয়। শিক্ষার্থীর যাতে সুনিদ্রা হয়, তার প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখা উচিত। রাত্রে সুনিদ্রা না হওয়ার জন্য অনেক সময় শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে দৈহিক অবসাদ অনুভব করে এবং পাঠে মনঃসংযোগে অপরাগ হয়।

নিদ্রা

শারীরিক সুস্থতা রক্ষিত হলে ক্লান্তি বা অবসাদ সহজে দেখা দিতে পারে না। কোন বিষয় শিক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীকে যে পরিমাণ দৈহিক ও মানহিক পরিশ্রম করতে হবে, শিক্ষার্থীর শরীর যেন তার উপযোগী হয়, নতুবা কাজে অবসাদ দেখা দেবে।

শারীরিক সুস্থতা

মানসিক অবসাদের প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর আগ্রহ। শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর যদি প্রবল আগ্রহ থাকে, তাহলে ক্লান্তি সহজে দেখা দিতে পারে না।

**শিক্ষার্থীর আগ্রহ**

প্রেষণাই আগ্রহ সৃষ্টি করে, সুতরাং স্থায়ী প্রেষণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে ধরে রাখতে পারলে সহজে ক্লান্তি দেখা দেবে না।

শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে একটানা কাজ করার অভ্যাস গঠিত হয়। ক্লান্তির আবির্ভাবকে ঠেকাতে হলে ছাত্রদের মধ্যে প্রচুর পরিশ্রম করার অভ্যাস যাতে গড়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অবশ্য সুদৃঢ় ও স্থায়ী প্রেষণার মাধ্যমেই কেবলমাত্র এই অভ্যাস গঠন করা সম্ভব হবে। এই অভ্যাস গঠিত হলেই শিক্ষার্থী দুরূহ ও বিরক্তিকর কাজও দীর্ঘ সময় ধরে অবসন্ন না হয়ে প্রফুল্লমনে সম্পাদন করতে পারবে।

**একটানা কাজ করার অভ্যাস**

ধীর গতিতে কাজ করলে অনেক সময় কাজে অবসাদ জাগে। সে কারণে চটপট ও দ্রুত কাজ করার অভ্যাস আয়ত্ত করা ভাল।

**চটপট ও দ্রুত কাজ করার অভ্যাস**

শিক্ষণীয় বিষয় যদি চিত্তাকর্ষক না হয়ে একঘেয়েমি সৃষ্টি করে তাহলে সহজেই অবসাদের আবির্ভাব ঘটে। সে কারণে শিক্ষকের প্রয়োজন পঠনীয় বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা যাতে শিক্ষায় বৈচিত্র্যহীনতা দেখা না দেয় এবং শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে না হয়।

**পঠনীয় বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে তোলা**

শিক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশও ক্লান্তির আবির্ভাবকে বিলম্বিত করে। আলো-বাতাস ও সুসজ্জিত আসনযুক্ত ঘরে, নিরিবিলি শান্তিময় মনোরম পরিবেশে যদি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে পঠনীয় বিষয়ে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং সহজে ক্লান্তি দেখা যায় না।

**উপযুক্ত পরিবেশ**

শিক্ষণের যথাযথ প্রণালী অনুসরণও ক্লান্তি অপনোদন করার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে বিষয়টি যে পদ্ধতিতে পড়ান উচিত, সে পদ্ধতিতে পড়ালেই শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সঞ্চারিত হয়, শেখায় ক্লান্তি আসে না। ভূগোল পড়বার সময় যদি মানচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়, বিজ্ঞান পড়বার সময় যদি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহায়তা নেওয়া হয় বা উদ্ভিদবিদ্যা পড়াবার সময় যদি গাছপালার

**শিক্ষণের যথাযথ প্রণালী অনুসরণ**

সাহায্যে পড়ান হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায় না এবং ক্লান্তিও চট করে দেখা দেয় না।

সফলতার আনন্দ কাজে সহজে অবসাদ আনতে দেয় না। সে কারণে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার যাতে শিক্ষার্থী সাফল্যের আনন্দ লাভ করে। যদি এমন হয় যে সমগ্র শিক্ষণ-কার্যটি সমাপ্ত হবার পর শিক্ষার্থী সফলতার আনন্দ লাভ করবে তাহলে শিক্ষণ-কার্যটিকে কয়েকটিকে স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত করে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে সাফল্যের আনন্দ লাভের সুযোগ দিতে হবে। তাহলেই কাজে অবসাদ আসবে না বা যদি অবসাদ আসে তাহলে তা সাফল্যের আনন্দে দূরীভূত হবে।

সফলতার আনন্দ

## ৯। বিদ্যালয়ে অবসাদ দূর করার উপায় (Remedy for School-fatigue) :

ছোট ছোট শিশুদের চট করে অবসাদ এসে যায়। কাজেই তাদের শিক্ষণের সময় সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং বিশ্রামের প্রচুর অবসর তাদের দেওয়া প্রয়োজন। কাজেই বিদ্যালয়ের পাঠদান-তালিকায় কাজের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা বা বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। একটানা চিন্তামূলক বা বৌদ্ধিক কাজে রত থাকলে শিক্ষার্থীর ক্লান্তি আসবে, সে কারণে চিন্তামূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ করার সুযোগ যদি পাঠদান-তালিকায় মাঝে মাঝে রাখা হয় তাহলে একঘেয়েমির ভাব দূর হয়ে যাবে, শিক্ষার্থীর কাজে ক্লান্তি দেখা দেয় না। যেমন—ভাষা, অঙ্ক প্রভৃতির পর অঙ্কন, কারুকলা, বাগান করা প্রভৃতি কাজের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

আগ্রহের সঙ্গে অবসাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। কোন বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তির আগ্রহ থাকে তাহলে একটানা বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে সেই কাজ করে যেতে পাবে। কাজেই শিক্ষকের উচিত বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা যাতে শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যখন শিক্ষক দেখবেন যে ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে অবসাদ দেখা যাচ্ছে, তখন শিক্ষকের উচিত হবে সহজতর এবং আকর্ষণীয় কোন বিষয়ের আলোচনায় নিজেকে নিযুক্ত করা। আলোচ্য বিষয় আকর্ষণীয় হলে ছাত্ররা কোন রকম ক্লান্তি অনুভব না করেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে যেতে

আগ্রহ ও অবসাদ

পারে। যেসব বিষয়ের আলোচনা ছাত্রদের কাছে কঠিন মনে হয়, সেগুলিকে কোন বিশেষ সময়ে শিক্ষা দিলে, ছাত্রদের পক্ষে গ্রহণ করা সহজতর হয়, সেদিকেও শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

যেসব বিষয় দুরূহ সেগুলি কাজ শুরুর প্রথম দিকে শেখাই ভাল। কারণ কাজের প্রথম দিকে শিশুদের মনে গ্রহণ-প্রবণতা থাকে এবং শেখানর প্রস্তুতিও অধিক থাকে। এ ছাড়া, শিক্ষণীয় বিষয় যেন কোন শিক্ষার্থীর শিক্ষণের সীমার বাইরে চলে না যায়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া, কাজের যোগ্যতার ব্যাপারে ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়। শিক্ষণের কার্যটি নিয়ন্ত্রণ করার সময় শিক্ষকের এ সম্পর্কেও অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষকের সহানুভূতি, উদার দৃষ্টিভঙ্গী, উন্নত শিক্ষণপদ্ধতি, কাজে আন্তরিকতা ইত্যাদি বিদ্যালয়ের অবসাদ দূরীকরণে যথেষ্ট সহায়তা করে।

## ১০। অবসাদ ও বিরক্তি (Fatigue and Boredom) :

অবসাদের সঙ্গে বিরক্তির সাদৃশ্য থাকলেও দুটি কিন্তু সমার্থক শব্দ নয়। অবসাদ ও বিরক্তি উভয়ই কাজের অগ্রগতির পথে অন্তরায় স্বরূপ। অবসাদে কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা হ্রাস পায়; বিরক্তি কাজের প্রতি অনিচ্ছা বা বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়ে তোলে। একটানা কাজ করার জন্য অবসাদ দেখা দেয়; বিরক্তি অল্প কিছুক্ষণ কাজ করার পরও দেখা দিতে পারে। কোন শিশুর মধ্যে একটানা পাঁচ ঘণ্টা অঙ্ক করার জন্য মানসিক অবসাদ দেখা দিল। কিন্তু এমন হতে পারে যে শিক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটির জন্য শ্রেণীকক্ষে কাজ শুরু হবার কিছু পরেই তার মধ্যে বিরক্তি দেখা দিতে পারে। অধ্যাপকের নীরস বক্তৃতা ক্লান্তি জাগায় না, বিরক্তির সৃষ্টি করে। অনেক সময় শিক্ষার্থীর এই বিরক্তিকেই আমরা অবসাদ বলে ভুল করি। কিন্তু কাজে অবসাদ এত দ্রুত দেখা দেয় না। যদি শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি যথাযথ আগ্রহের সঞ্চার করা যায়, তাহলে বিরক্তির ভাব কেটে যায় এবং কার্যদক্ষতাও পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। সুতরাং বিরক্তি হল কৃত্রিম ক্লান্তির ভাব। বিরক্তি অবসাদের বহু পূর্বেই দেখা দেয় এবং খুব শীঘ্র বেড়ে চলে। বিরক্তির প্রথম লক্ষণ হল মানসিক অস্থিরতা অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগের অভাব, তারপর শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করার তীব্র অনিচ্ছা বা বিতৃষ্ণা এবং সর্বশেষে আলস্য ও বোধহীনতা; কিন্তু অবসাদের শুরুতেই দেখা

অবসাদে কর্মদক্ষতার হ্রাস ও বিরক্তিতে কাজে অনিচ্ছা জাগে

দেয় বোধহীনতা ও আলস্য। শিক্ষার্থী কোন বিষয় শিখতে গিয়ে যদি তাতে আনন্দ না পায় বা বিষয়বস্তু যদি একঘেয়ে হয়, তাহলেই তার বিরক্তি আসে। অবসাদ বা ক্লান্তির কারণ একাধিক—শারীরিক, মানসিক ও পরিবেশগত।

**বিরক্তির কারণ**

শিশুরা কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রাণশক্তিকে বিচিত্র ভাবে প্রকাশ করতে চায়। এই প্রাণশক্তির প্রকাশের পথ রুদ্ধ হলেই কাজে একঘেয়েমি আসে এবং কাজে বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। সে কারণে নীরস একঘেয়ে একটানা কাজে শিশুদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, ফলে কাজে বিরক্তি দেখা দেয়।

## প্রশ্নাবলী

1. What is the nature of fatigue? What are the different types of fatigue? Describe the different ways of the measurement of physical and mental fatigue.

Ans. (পৃঃ ২০৫—২০৯)

2. What is the nature of fatigue in school? How can this be removed?

Ans. (পৃঃ ২১০—২১১ ; পৃঃ ২১৬—২১৮)

3. What are the causes of fatigue? How can they be remedied? What are the dangers of fatigue?

Ans. (পৃঃ ২১২—২১৪ ; পৃঃ ২১৬—২১৮ ; পৃঃ ২১৫—২১৬)

4. How do you distinguish between Fatigue and Boredom?

Ans. (পৃঃ ২১৯—পৃঃ ২২০)

5. Discuss the relation betw'en work and fatigue.

Ans. (পৃঃ ২০৩ - ২০৪)

# অষ্টম অধ্যায়

# শিক্ষণ

# (Learning)

## ১। ভূমিকা (Introduction) :

পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে না পারলে কোন প্রাণীর পক্ষেই এ জগতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না। প্রাণী কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী। এগুলি প্রকৃতির দান। এই সহজাত প্রবৃত্তির বশে প্রাণী যেসব সাহজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে, সেগুলি প্রাণীকে তার জীবনের কতকগুলি মৌলিক প্রয়োজন চরিতার্থ করতে সহায়তা করে। আবার কতকগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রাণী সম্পন্ন করে, সেগুলিকে শিক্ষার দ্বারা আয়ত্ত করার প্রয়োজন হয় না। এই সব প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রাণীর আত্মরক্ষার সহায়ক। কিন্তু পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল এবং সেহেতু বিচিত্র পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি প্রাণীর উপর বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া করে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে, প্রাণীকে জীবন-সংগ্রামে পরাজয় বরণ করে নিতে হয়; এমন কি, পৃথিবীর বুকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাই তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সেই কারণেই প্রাণীকে তার পরিবেশের উপযোগী নিত্য নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে হয়। নূতন নূতন আচরণ সম্পন্ন করা, অর্থাৎ কোন কিছু আয়ত্ত করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। প্রাণীর অতীত অভিজ্ঞতাই প্রাণীকে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার জন্য এবং নতুন বিষয় আয়ত্ত করার জন্য সহায়তা করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন বিষয় আয়ত্ত করাই হল শিক্ষণ। ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জীবজন্তু অতীত অভিজ্ঞতার সহায়তায় নতুন পরিস্থিতিতে আচরণ সম্পন্ন করার জন্য নতুন কৌশল আয়ত্ত করতে শেখে।

নতুন বিষয় আয়ত্ত করাই হল শিক্ষণ

মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো মানুষও প্রকৃতির দানের অধিকারী, মানুষও সাহজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। মানুষের ক্ষেত্রেও প্রতিবর্ত ক্রিয়া তার আত্ম-রক্ষায় সহায়তা করে। কিন্তু এই জাতীয় আচরণ মানুষের জীবনধারণের জন্য এবং জীবনকে সহজ করে তোলার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। মানুষের এই

শিক্ষণ-ক্রিয়া শুরু হয় শৈশব থেকে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মানুষের শিক্ষণের কোন শেষ নেই। কথায় বলে, 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি'। মানুষের সমস্ত জীবন ধরে এই শিক্ষণের কাজ চলতে থাকে। শৈশবকাল অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অনেক নতুন কিছু শিক্ষা করি। যেমন, নানা ধরনের খেলাধূলা, সাইকেল চালান, সাঁতার কাটা ইত্যাদি। তাছাড়াও পরিবেশ সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণা গঠন করতে শিক্ষা করি। শিক্ষার সাহায্যে আমরা বাহ্যজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করে তুলি।

মানুষের ক্ষেত্রে এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শিক্ষণের সাহায্যে যদি আমরা আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে ভরিয়ে না তুলি তাহলে আমাদের পক্ষে জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে পড়ে। মানুষ ইতর প্রাণীর মত একমাত্র প্রকৃতি-নির্ভর জীব নয়। আমাদের দেহের ক্ষতিসাধন করে এমন খাদ্যবস্তু শৈশব অবস্থাতেই বর্জন করে শরীরের উপযোগী খাদ্যই কেবলমাত্র আমরা গ্রহণ করি। দৈনন্দিন জীবনে নানা রকম বিপদ-আপদ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য আমাদের শিক্ষা লাভ করতে হয়। জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কোন বৃত্তি শিক্ষা করতে হয়, সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা করতে হয়। আবার, ছাত্র হিসেবে কিভাবে শিক্ষা করব তাও আমাদের শিক্ষা করতে হয়। নানারকম পদ্ধতি অনুসরণ করেই আমাদের এই সব শিক্ষা করতে হয়। সে কারণে মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষণ সম্পর্কীয় নানাবিধ সূত্রগুলি সন্ধান করবার চেষ্টা করেছেন। সাম্প্রতিক-কালে শিক্ষণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্যার উপর গবেষণা চালিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা সকলেই উপলব্ধি করেছেন যে, মনোবিজ্ঞানে এই বিষয়টির আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের ক্ষেত্রে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

## ২। শিক্ষণের স্বরূপ (Nature of Learning) :

**অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করাই হল শিক্ষণ।**

শিক্ষণ হল সেই প্রক্রিয়া যার সহায়তায় ব্যক্তি নতুন পরিবেশে নূতন আচরণ সম্পন্ন করার দক্ষতা অর্জন করে। অবশ্য শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের হতে

পারে বা তার পূর্ব আচরণের উন্নত রূপও হতে পারে। শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ হয় তখন কোন একটি পরিস্থিতিতে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার কৌশল আয়ত্ত করা হয়। সুতরাং শিক্ষণের লক্ষ্য হল ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনা এবং এই পরিবর্তনের মধ্যে যেগুলি পরিবেশের সঙ্গে যথাযথ প্রতিক্রিয়ার উপযোগী, সেগুলিকে স্থায়ী করা।

শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনা

আমাদের বেশীর ভাগ শিক্ষণই হল উদ্দেশ্যমূলক। শিক্ষণ মানুষের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করে। শিক্ষণ দেহ ও মনে পরিণতি আনে, শিক্ষার্থীর মানসিক উৎকর্ষ ও অন্তর্নিহিত গুণের বিকাশসাধন করে। শিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি কোন নতুন আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা অর্জন করে। যখন আমরা বলি, শিক্ষণ আচরণের মধ্যে পরিবর্তন এনে তাকে স্থায়ী করে, তার অর্থ এই নয় যে, আর পরিবর্তন সম্ভব নয়। নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে এই আচরণ আরও পরিবর্তিত হতে পারে। শিক্ষণের ফলে ব্যক্তির পুরাতন আচরণে উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাছাড়া, যা শিক্ষা করা হল তা স্মরণ রাখতে না পারলে শিক্ষা ফলপ্রসূ হয় না। শিক্ষণের ফলে ইন্দ্রিয় ও পেশীর মধ্যে নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং দৈহিক অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষেত্রেও নতুন পরিবর্তন সাধিত হয়।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা শিক্ষণের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করি :

(১) শিক্ষণ হল কোন উদ্দেশ্য লাভের জন্য আচরণকে পরিবর্তিত করা এবং কোন বিশেষ পরিবেশে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার উপযোগী আচরণকে স্থায়ী করা। (২) শিক্ষণ হল উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করা। (৩) শিক্ষণ হল অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া করে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা। (৪) শিক্ষণ হল আমাদের নানাবিধ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নতুন কৌশল আয়ত্ত করা বা পুরাতন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা। (৫) শিক্ষণ হল দ্রুতগতিতে এবং উন্নত পদ্ধতির সহায়তায় আচরণের নতুন কৌশল আয়ত্ত করা।

শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

সুতরাং শিক্ষণ আমাদের সুবিধাজনকভাবে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে সহায়তা করে। শিক্ষণের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে আমরা শিক্ষণের এইভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারি : **"শিক্ষণ হল সেই প্রক্রিয়া যার সহায়তায় আমরা আচরণের মধ্যে এমন পরিবর্তন আনতে পারি যা পরিবেশের সঙ্গে আমাদের**

শিক্ষণের বিভিন্ন সংজ্ঞা

**সম্বন্ধের উন্নতি সাধন করে।"** শিক্ষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী উডওয়ার্থ বলেছেন, "শিক্ষণ হল এমন একটি ক্রিয়া যা পরবর্তী ক্রিয়ার উপর অপেক্ষাকৃত একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যায় অর্থাৎ যখনই কোন ক্রিয়ার মধ্যে পূর্ববর্তী ক্রিয়ার ছাপ লক্ষ্য করা যায় তখনই সে ক্রিয়াকে শিক্ষণের ফল মনে করা যেতে পারে।" ম্যাকগিয়োক (*McGeoch*) শিক্ষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "শিক্ষণ হল অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন।" বার্নার্ড (*Bernard*) শিক্ষার স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, "শিক্ষা হল আচরণের পরিবর্তন।"[1]

শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। আচরণবাদী বা চেষ্টিতবাদীদের মতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হল বিচারবুদ্ধি বিবর্জিত যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র। মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইক মনে করেন যে, শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপন করা। ম্যাকডুগাল প্রমুখ উদ্দেশ্যসাধনবাদীদের মতে উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী উপায় নির্বাচন করার ক্ষমতা অর্জন করাই হল শিক্ষণ। কোয়লার, কাফ্‌কা প্রমুখ গেস্টাল্টবাদীদের মতে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কোন একটি পরিস্থিতিকে খণ্ড খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন অংশে প্রত্যক্ষ না করে, সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করে প্রতিক্রিয়া করাই হল শিক্ষণ।

**শিক্ষণ প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতবিভেদ**

## ৩। শিক্ষণ ও পরিপক্কতা (Learning and Maturation)

যে-কোন ব্যক্তির ক্রমবিকাশের বা ক্রমোন্নতির মূলে শিক্ষণ ও পরিপক্কতা উভয়েরই অবদান আছে ; উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক এতই নিকট যে একটিকে আর একটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তবু ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

শিক্ষণ এবং অনুশীলন ছাড়াও কোন ব্যক্তির যে স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধি ঘটে তাকেই আমরা পরিপক্কতা বলতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে-কোন রকম বিশেষ শিক্ষণ বা অনুশীলন ব্যতিরেকেও একটা বিশেষ বয়সে সব শিশুই কথা বলতে, হাঁটা-চলা করতে বা অন্য বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনা করতে শেখে। পরিবেশগত পার্থক্য সত্ত্বেও শিশুদের

1. "...learning is the modification of behaviour through practice"—H. W Bernard : Psychology of Learning and Teaching, page 121.

এই ক্রমবৃদ্ধি প্রায় সব ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষণ (learning) কিন্তু ভিন্ন বিষয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আচরণে পরিবর্তন আনাই হল শিক্ষণ এবং আচরণে এই পরিবর্তন আনার জন্য পরিবেশ যেসব উদ্দীপক প্রয়োগ করে তার উপরে শিক্ষণ নির্ভর। শিশুর পরিপক্কতা আসে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, পরিবেশের উপর তা নির্ভর করে না; কিন্তু যে রকম পরিবেশে শিশুকে রাখা হয় এবং যে রকম অভিজ্ঞতা সে লাভ করে সে অনুযায়ী সে শিক্ষণ প্রাপ্ত হয়. অর্থাৎ শিশুর শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষা এবং অনুশীলন ক্রিয়া করে।

দুটি যমজ শিশু নিয়ে পরীক্ষণকার্য চাপিয়ে ম্যাকগ্র (*McGraw*)[1] এবং অপর সকলে দেখতে পেলেন যে, শিশুর স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধি বা ক্রমোন্নতির জন্য যেসব ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন সেগুলি বিশেষ ধরনের অনুশীলন ব্যতীত কার্যকরী হয় না; যেমন—হাঁটাচলা, হামাগুড়ি দেওয়া, কোন কিছু জোর করে চেপে ধরা, শব্দোচ্চারণ করা ইত্যাদি। যেসব ক্রিয়াকলাপ শিশুর স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নয় সেসব ক্ষেত্রেই বিশেষ ধরনের শিক্ষা এবং অনুশীলন কার্যকরী হয়। যেমন—সাঁতার দেওয়া, স্কেট পরে চলা, কোন কিছু আরোহণ করা, লাফ দেওয়া ইত্যাদি। এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে ম্যাকগ্র (*McGraw*) আরও লক্ষ্য করলেন যে, বিশেষ ধরনের শিক্ষা হয় খুব অল্প বয়সে বা খুব বেশী বয়সে দিলেই ফল পাওয়া যায়। শিক্ষণ পরিপক্কতার উপর নির্ভর করে না তা নয়, তবে শিশুর আশানুরূপ ক্রমবৃদ্ধি বা ক্রমোন্নতি ঘটলেও পরিপক্কতার এক বিশেষ স্তরে এই শিক্ষণ-প্রদান করা প্রয়োজন। শিশুর পরিপক্কতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে যদি সে উপযুক্ত অনুশীলন করে তবেই উপযুক্ত ফল লাভ ঘটে।

## ৪। শিক্ষণের প্রকারভেদ (Types of Learning) :

মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রকার শিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এই সকল শিক্ষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—(ক) পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষণ (Observational Learning), (খ) অন্তর্দৃষ্টি (Insight), (গ) প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন (Trial and Error), (ঘ) সাপেক্ষীকরণ (Conditioning) এবং (ঙ) অনুকরণ (Imitation)।

1. McGraw : Growth.

আমরা এবার এই সকল শিক্ষণ প্রক্রিয়াগুলি একটি একটি করে আলোচনা করব :

**(ক) পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষণ** (Observational Learning) : প্রত্যক্ষণ (perception) এবং পর্যবেক্ষণ (observation) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইন্দ্রিয়লব্ধ সংবেদনের ব্যাখ্যা হল প্রত্যক্ষণ। কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মনোযোগ সহকারে কোন কিছু প্রত্যক্ষ করা হল পর্যবেক্ষণ। বস্তুকে কেন্দ্র করে বা বস্তুর প্রতিনিধিস্থানীয় কোন কিছুকে কেন্দ্র করে যখন শিক্ষণ-প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষণ খুবই কার্যকরী হয়। চিহ্ন বা প্রতীকের ক্ষেত্রে এই ধরনের শিক্ষণ বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

**(খ) অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষণ** (Learning by Insight) : গেস্টাল্ট (*Gestalt*) বা সমগ্রতাবাদীরা এই শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সমর্থক। এই মতবাদ গেস্টাল্ট বা সমগ্রতা মতবাদ (Gestalt Theory of learning) নামেও পরিচিত।

**(i) গেস্টাল্ট** বা **সমগ্রতাবাদের স্বরূপ** (Nature of Gestalt Theory of Learning) : গেস্টাল্টবাদী বা সমগ্রতাবাদীদের মতে আমরা যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করি, তখন বিষয়টিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ না করে তাকে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করি। বিভিন্ন বস্তু যদি পরস্পরের কাছাকাছি থাকে, তাদের মধ্যে যদি সাদৃশ্য থাকে, তাহলে সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ না করে একটি সমগ্র (Whole) বা একক (Unit) হিসেবে প্রত্যক্ষ করি। শিক্ষণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে গেস্টাল্টবাদী বা সমগ্রতাবাদীদের মতবাদ তাদের প্রত্যক্ষণ-সম্পর্কিত মতবাদের অনুরূপ।

**প্রত্যক্ষণের সময় কোন বিষয়কে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়**

গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। তাঁরা বলেন, থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির সহায়তায় শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। প্রাণী যখন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন উদ্দীপকের উপর প্রতিক্রিয়া করে, তখন তার প্রতিক্রিয়াগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন অন্ধ প্রতিক্রিয়া মাত্র নয়, প্রাণী সমস্ত পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিকভাবে অবধারণ করে প্রতিক্রিয়া করে। গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হল অন্তর্দৃষ্টির (Insight) সাহায্যে কোন বিশেষ সমস্যার পূর্ণ স্বরূপটি বুঝে নিয়ে কি ভাবে প্রতিক্রিয়া

**শিক্ষণ প্রক্রিয়া অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়**

করতে হবে সেটি জানা। অন্তর্দৃষ্টি হল কোন সমস্যার বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে পূর্ণ সমস্যাটির সম্বন্ধ সমগ্ররূপে উপলব্ধি করা। এই অন্তর্দৃষ্টি কোন সহজাত ক্ষমতা নয়, এ হল অভিজ্ঞতালব্ধ ক্ষমতা। কাজেই শিক্ষণ প্রক্রিয়া কোন অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, এ হল সমগ্র পরিস্থিতি বা সমস্যা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি।

**(ii) সমগ্রতাবাদের শিক্ষণ নীতি** (Gestalt Principles of Learning): অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষণ তিনটি নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যথা—(i) অন্তর্দৃষ্টির নীতি, (The principle of insight), (ii) সমগ্রতার নীতি (The law of whole) এবং (iii) সমাধানের আকস্মিক আবির্ভাব নীতি (Sudden appearence of the solution)।

**(iii) শিক্ষণবিষয়ে গবেষণা** (Experiment in learning): কোয়লার (*Kohler*) মুরগী, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি শিক্ষণ-প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক পরীক্ষণ কার্য চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শিক্ষণ-প্রক্রিয়া কোন অন্ধ-যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। এ সম্পর্কে তিনি যে সব পরীক্ষণকার্য চালান তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণের বর্ণনা নীচে দেওয়া হচ্ছে:

কোয়লার-এর পরীক্ষণকার্য

সুলতান নামে একটি শিম্পাঞ্জীকে একটি বড় খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয় এবং খাঁচার মধ্যে দুটি বাঁশের টুকরাও রাখা হয়। খাঁচার বাইরে কিছু দূরে কয়েকটি কলা রাখা হয় এমন ভাবে, যাতে শিম্পাঞ্জীটি হাত বাড়িয়ে সেই কলার নাগাল না পায় বা যে কোন একটি বাঁশের টুকরার সাহায্যে সেই কলার নাগাল পেতে না পারে। শিম্পাঞ্জীটি প্রথমে হাত বাড়িয়ে কলার নাগাল পাবার জন্য খাঁচার মধ্যে খুব লাফালাফি করল কিন্তু সফল হতে পারল না। তখন তার চোখ পড়ল বাঁশের টুকরো দুটির উপর। সে একটি টুকরো নিয়ে কলার নাগাল পাবার খুব চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই সফল হল না। হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর, হঠাৎ সে একটা বাঁশের টুকরোকে আর একটা বাঁশের টুকরোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা লম্বা বাঁশের লাঠি তৈরী করে নিল, তারপর সহজেই সেই লাঠির সাহায্যে কলাগুলিকে নিজের নাগালের মধ্যে টেনে নিল।

গেস্টাল্টবাদীদের মতে উপরিউক্ত শিম্পাঞ্জীটির শিক্ষণ-প্রক্রিয়া 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে' (Trial and Error) শিক্ষণ নয়। এ হল অন্তর্দৃষ্টির (Insight) সাহায্যে শিক্ষণ। সমস্যা সমাধানের আকস্মিক উপলব্ধিই হল অন্তর্দৃষ্টি। সমস্যার সমাধানটি বিদ্যুৎচমকের মতো দেখা দেয়। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার

মধ্যে যে সম্বন্ধ এবং তাদের যে পারস্পরিক তাৎপর্য, তার পূর্ণ দৃষ্টি যখন প্রাণীর মধ্যে জাগরিত হল তখনই অন্তর্দৃষ্টির সঞ্চার হল। বিশেষ একটি মুহূর্তে শিম্পাঞ্জীটির মধ্যে পরিস্থিতিটিকে সমগ্রভাবে অবলোকন করার এবং কিভাবে তার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে হবে, সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হল। এই অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হওয়ায় প্রাণীটি আকস্মিকভাবে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পেল। যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি লাঠি একটি লাঠিতে পরিণত হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সমগ্রতার সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু যখনই দুটি লাঠি মিলে একটি লাঠিতে পরিণত হল, তখনই একটি নতুন সংগঠনের সৃষ্টি হল এবং ছেদ বা ফাঁক পূরণ হয়ে গেল। কোন একটা পরিস্থিতিকে অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া অবধারণ করা হয়, যখন তার বিভিন্ন উপাদান-গুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অংশরূপে প্রত্যক্ষ করা হয়। কোন সমস্যার ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ তখনই হয় যখন যে অংশগুলি সুবিন্যস্ত নয়, তাদের মধ্যে একটি অখণ্ড সমগ্রতা প্রত্যক্ষ করা হয়। অবশ্য গেস্টাল্টবাদীরা শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের বিষয়টিকে একেবারে অস্বীকার করেন না, তবে প্রকৃত শিক্ষণ-প্রচেষ্টা ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না। শিক্ষণ হল সমগ্র ও অংশের পারস্পরিক সংযোগ অবধারণ করা ও তা সম্ভব হয় যখন অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমস্যার সমাধানের সূত্রটি পাওয়া যায়। তখনই ভ্রান্ত প্রচেষ্টাগুলি পরিত্যক্ত হয়।

অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষণ

গেস্টাল্টবাদীদের মতে প্রত্যক্ষণের ধর্ম হল ভগ্নতা, ছেদ বা ফাঁক পূরণ করা। সে কারণে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নতুন সংগঠন। সমগ্র এবং অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষণ করার জন্য প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুটি নতুন ভাবে সংগঠিত হয়। শিক্ষণের ক্ষেত্রেও রয়েছে এই ছেদ বা ফাঁক পূরণ (Closure) এবং প্রত্যক্ষণজনিত সংগঠন। শিক্ষণের ক্ষেত্রে যখনই শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হয় তখনই সে পরিস্থিতি (situation) এবং পরিস্থিতির উপযোগী প্রতিক্রিয়া—এই দুইয়ের মধ্যে যে ফাঁক বা ছেদ থাকে তাকে পূরণ করে এবং পরিস্থিতিটিকে সমগ্রভাবে অবধারণ করার জন্য সমগ্র পরিস্থিতি ও অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রটিকে নতুনভাবে সংগঠিত করে। [1]গ্যারেট (*Garrett*)-এর ভাষায়, "কোন সমস্যার সমাধান বা উদ্দেশ্য প্রাপ্তি ছেদ পূরণ করে এবং শিক্ষার্থীর

ভগ্নতা পরিপূরণ

---

1. "Thus the solution of a problem or the attainment of a goal brings closure and ends the active search of the learner."

—R. E. Garrett : Great Experiments in Psychology, Page 69

সক্রিয় অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটায়।” এই অন্তর্দৃষ্টির উদ্ভবের ফলে প্রাণী সমস্যার সমাধানের জন্য যে যথাযথ প্রতিক্রিয়া অর্জন করে, ভবিষ্যতে অনুরূপ পরিস্থিতিতে যেসব সমস্যার উদ্ভব ঘটে সেগুলির সমাধানের জন্যও তাকে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়।

(iv) **শিক্ষার ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Gestalt theory in Education) :** শিক্ষার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত শিক্ষণ-প্রক্রিয়া বিশেষ মূল্যবান; কারণ এ জাতীয় শিক্ষণ-পদ্ধতি মুখস্থ করার পদ্ধতিকে বাতিল করার পক্ষপাতী। এ জাতীয় শিক্ষণ-প্রক্রিয়া স্বল্প সময়সাপেক্ষ। এই প্রক্রিয়ায় পাঠ্যবিষয়ের অর্থ উপলব্ধি, সংগঠন ও সংহতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাঠ্যবিষয়টি এমনভাবে রচিত হবে যাতে সেটি একটি অর্থপূর্ণ (meaningful) সমগ্রতা নিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয়। এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়া কল্পনা-শক্তিকে, বিচার বুদ্ধিকে এবং চিন্তার সামর্থ্যকে উন্নত করে। এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টি (initial insight), যা সহজাত এবং স্বতঃস্ফূর্ত, তাকেই এ শিক্ষণ-প্রক্রিয়া গুরুত্ব প্রদান করে। এই অন্তর্দৃষ্টিকে অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে বা অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আরও গভীর করে তোলা যেতে পারে। আচরণকে সহায়তা করা, পরিচালিত করা ও উৎসাহিত করার প্রতিক্রিয়ার উপর এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়া গুরুত্ব আরোপ করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদের মূল্য

(v) **শিক্ষার ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদের অনুপযোগিতা (Disadvantage of Gestalt Theory in Education) :** শিক্ষার ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদের মূল্য স্বীকার করা হলেও, এই মতবাদেরও নানারকম সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচকদের মতে ‘অন্তর্দৃষ্টি’ শব্দটি বর্ণনামূলক, প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি কিছুই ব্যাখ্যা করে না। একটি শিশু একটি যান্ত্রিক খেলনা বেশ দ্রুত ও নিপুণতার সঙ্গে চালনা করতে পারে এবং তার কার্যকলাপ বুঝে নিতে পারে; সেক্ষেত্রে আমরা বলি শিশুর অন্তর্দৃষ্টি আছে। কিন্তু যখন বলা হয় অন্তর্দৃষ্টি হল একটা নীতি বা সূত্র যার সাহায্যে প্রাণী যথাযথ প্রতিক্রিয়া করে, তখন তার অর্থ কি দাঁড়ায়? গেস্টাল্টবাদীরা যখন অন্তর্দৃষ্টিকে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ এবং সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া মতবাদের মতো একটা ব্যাখ্যামূলক নীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চান তখনই সমালোচকরা আপত্তি করেন। তাছাড়া, শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হওয়ার পূর্বে কতবার

তাকে 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। বস্তুতঃ, শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে 'এই প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' পদ্ধতিকে কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না। ছোটখাট কাজে প্রায়ই দেখা যায়—কি মানুষ, কি প্রাণী উভয়কেই এই পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আকস্মিকভাবে কোন্ পদ্ধতিতে কাজটি সম্পন্ন হবে তা তার কাছে ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এই অন্তর্দৃষ্টির উৎস যে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতি, তা স্বাভাবিক মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কোয়লার প্রাণীদের নিয়ে যেসব পরীক্ষণ করেছেন, সেসব পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের উপস্থিতির বিষয়টিও সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খুব নির্দোষ পরীক্ষকের কাছ থেকেও প্রাণীরা সহজে সংকেত বা ইঙ্গিত পেয়ে থাকে। তাছাড়া, গেস্টাল্টবাদীদের অনেক পরীক্ষণের ফলাফল পরিসংখ্যানের দিক থেকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**(vi) শিক্ষা দেবার সময় এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে? (How to apply this Method of Learning in Teaching) :** শিক্ষা দেবার সময় 'অন্তঃদৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে' যদি কাজে লাগিয়ে ফল পেতে হয় তাহলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখতে হবে :

**(১) সমগ্র বিষয়টিকে উপস্থাপিত করতে হবে (Presentation of the whole problem) :** ছাত্ররা কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে গিয়েই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেটির সন্ধান পায়। সেই কারণে শিক্ষককে প্রথম থেকেই সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত করতে হবে— খণ্ড খণ্ড ভাবে নয়, বা সমাধানের জন্য একটির পর একটি স্তর অতিক্রমণের প্রচেষ্টার মাধ্যমেও নয়। বীজগণিতের অঙ্ক শেখাতে গিয়ে তাকে শুধু গুণনীয়ক বা উৎপাদক না দিয়ে, এমন একটি সমস্যা দিতে হবে যাতে গুণনীয়ক বা উৎপাদক রয়েছে। অনুরূপ ভাবে পাটীগণিতের অঙ্ক শেখাতে গিয়ে শুধু ভগ্নাংশ না দিয়ে, এমন একটি সমস্যা দিতে হবে যাতে ভগ্নাংশ এসে পড়েছে। শুধু গণিতের ক্ষেত্রে নয়, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেবার সময় পাঠ্যবস্তুটির একটি সমগ্র রূপ শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে এবং সেগুলিকে অংশে বিশ্লেষণ করে অংশগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে।

**(২) পরিমাপ (Pacing) :** সমস্যার প্রাথমিক উপস্থাপন এবং শিক্ষণের ক্রমোন্নতি—এই দুটির জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির দিকে।

শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির সঙ্গে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য থাকবে। শিক্ষার পরিমাপ করতে গিয়ে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর শিক্ষাব্যাপারে বুদ্ধি সম্পর্কীয় এবং অনুভূতি সম্পর্কীয় প্রস্তুতির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, পরিমাপ প্রক্রিয়া হল শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা, শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতির মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা নয়। যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে এই প্রস্তুতি না থাকে তাহলে শিক্ষক সমস্যাটিকে খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত না করে, সমস্যাটিকে সহজতর ভাবে উপস্থাপিত করার জন্য সচেষ্ট হবেন, বা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজনমত প্রস্তুতি যতদিন না আসছে ততদিনের জন্য সমস্যাটিকে তার কাছে উপস্থাপিত করা থেকে বিরত হবেন।

(৩) **বুদ্ধিগত এবং আবেগমূলক প্রস্তুতি** (Cognitive and Emotional Readiness)**:** বুদ্ধিগত প্রস্তুতি বলতে বোঝাচ্ছে কোন সমস্যার সমাধান করতে গেলে যে অতীত অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন এবং বর্তমান সমস্যার ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা, তা যেন শিক্ষার্থীর থাকে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের সাদৃশ্য এবং সাধারণ ধারণা গঠন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করাই হল সামান্যীকরণ (generalization)। বুদ্ধিগত প্রস্তুতি বলতে এই সামান্যীকরণের ক্ষমতা শিক্ষার্থীর কতটা আছে তাকেই বোঝাচ্ছে। আবেগমূলক প্রস্তুতি হল শিক্ষণের পরিস্থিতি অনুধাবন করার মানসিক প্রস্তুতি। সমস্যাটি অনুধাবন করতে গিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন মানসিক প্রবণতা যেন শিক্ষার্থীর না থাকে। অর্থাৎ, পূর্ব বদ্ধমূল ধারণা, কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণা যেন শিক্ষার্থীর সমস্যাটির যথাযথ অনুধাবণ প্রচেষ্টার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। কোন ছাত্রের বিদ্যালয়ে যাবার জন্য যদি আবেগমূলক প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে বিদ্যালয়ে তার উপস্থিতি শিক্ষণের সহায়ক হতে পারে না। বস্তুতঃ, বিদ্যালয় তার কাছে একটা ভীতির বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

(৪) **শিক্ষকের সহায়তা** (Help of the Teacher) **:** অন্যান্য শিক্ষণ-পদ্ধতির মতো অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষণের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে হলে শিক্ষকের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষকের সহায়তা বলতে বোঝাচ্ছে, শিক্ষার্থীকে সমস্যাটির সূত্র প্রদান করা নয়, যাতে শিক্ষার্থী সমস্যাটির সমাধানটি খুঁজে পায় তাতে সাহায্য করা এবং সমস্যাটির প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহকে জাগিয়ে রাখা। কোন সমস্যাকে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করার ক্ষমতা শিক্ষার্থীর মধ্যে বিকশিত করার জন্য সেই সম্বন্ধ অনুসন্ধানের অভ্যাস শিক্ষককে

শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার্থী যাতে অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানের জন্য অযথা উদ্যম ও সময় নষ্ট না করে সেদিকেও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

**(গ) প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষণ (Learning by Trial and Error Method):**

(i) **প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির স্বরূপ (Nature of learning by trial and error):** এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে 'সফল বিকল্প নির্বাচনের সহায়তায় শিক্ষণও' (**Learning by selection of the successful variant**) বলা হয়ে থাকে। যখন আগে থেকে তৈরী এমন কোন সমাধান শিক্ষার্থীর জানা থাকে না, তখন শিক্ষার্থী শিক্ষা করার জন্য উপরিউক্ত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথমে একটি সমাধান সে খুঁজে বার করে, তাকে প্রয়োগ করে, যদি তাতে কাজ না হয়, সে সেটিকে বর্জন করে এবং আর একটি সমাধান খুঁজে বার করে তাকে প্রয়োগ করে। এভাবে একটির পর একটি প্রচেষ্টা সে চালিয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ভুল পরিহার করতে এবং অপ্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া বর্জন করতে শেখে, যেগুলি তার উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী নয়। এইভাবে অগ্রসর হতে হতে সে শেষ অবধি যথার্থ বা নির্ভুল সমাধানটি আবিষ্কার করতে শিক্ষা করে। বার বার প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই এই পদ্ধতির বিশেষত্ব। উপায় ও লক্ষ্যের (**means and ends**) মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তার চেতনা শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকেই না, যদিও থাকে তা নিতান্তই অস্পষ্ট। তবে যদিও শিক্ষার্থীকে বার বার প্রচেষ্টা করতে হয়, তার এই সব প্রচেষ্টা একেবারেই যে অর্থহীন তা নয়। এলোমেলো বা খুশীমত প্রচেষ্টা করার পদ্ধতি এ নয়; কেননা, শিক্ষার্থীর একটা বিশেষ লক্ষ্য থাকে এবং পরিস্থিতির দ্বারা অনুভাবিত হয়েই সে প্রচেষ্টা করে। তাই এই প্রচেষ্টা একেবারে লক্ষ্যহীন বা উদ্দেশ্যহীন নয়।

থর্নডাইক (*Thorndike*) এবং হল্ (*Hall*) এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। থর্নডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ ও সম্বন্ধ স্থাপন করাই হল শিক্ষণ-প্রক্রিয়া। বার বার চেষ্টা ও ভুল-ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমেই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই সংযোগ স্থাপিত হয়। শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হল একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়ার অনুক্রম ও পারম্পর্য। আকস্মিকভাবে বিনা প্রচেষ্টায় কোন কিছু শিক্ষা করা সম্ভব নয়।

**উদ্দীপকের ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ স্থাপন করাই হল শিক্ষণ**

**(ii) প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতিবিষয়ে গবেষণা ( Experimental studies in Trial and Error) :** এই পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মানুষ ও নিম্নতর প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষণকার্য চালান হয়েছে। থর্নডাইক কুকুর, বিড়াল ও বানরের উপর একাধিক পরীক্ষণকার্য চালান। একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালের উপর তিনি যে পরীক্ষণটি করেন, এই পরীক্ষণটিকেই প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষণের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হয়।

থর্নডাইক একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন এবং খাঁচার বাইরে এক টুকরো মাছ রাখলেন যাতে মাছের টুকরোটি বেড়ালটির চোখে পড়ে। বিড়ালটি খাঁচার দরজা খুলতে পারলেই, মাছের টুকরোটি তার আয়ত্তে আসবে। খাঁচার দরজাটি এমনভাবে ছিটকিনি দিয়ে আটকান, যাতে সামান্য চাপ লাগলেই ছিটকিনিটি খুলে যায়। বিড়ালটি প্রথমেই খাঁচার ভেতর থেকেই মাছটি পাবার চেষ্টা করল

**একটি পরীক্ষণকার্যের বিবরণ**
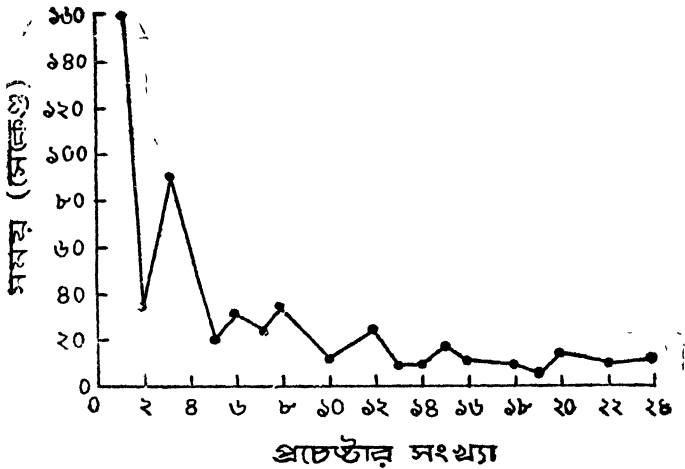
একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালের শিক্ষণের চিত্ররেখা

এরূপ রেখাচিত্র থেকে বোঝা যাবে যে প্রতিবারের প্রচেষ্টায় বিড়ালটির কতটা সময় লেগেছে।

কিন্তু বিফল হয়ে সে খাঁচার ভিতর ছুটাছুটি করতে লাগল, খাঁচাটি আঁচড়াতে লাগল, কামড়াতে লাগল এবং এই অবস্থায় হঠাৎ ছিটকিনির উপর চাপ পড়াতে ছিটকিনিটি খুলে গেল। তখন বিড়ালটি বেরিয়ে এসে মাছের টুকরোটি লাভ করল। দ্বিতীয় দিনে ঐ একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি করা হল, দেখা গেল

বিড়ালটি পূর্বদিনের তুলনায় কম প্রচেষ্টায় এবং অল্প সময়ে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। তৃতীয় দিনেও বিড়ালটিকে একই ভাবে খাঁচায় আটকান হল এবং দেখা গেল যে, তৃতীয় দিনে তার ব্যর্থ প্রচেষ্টার সংখ্যা আরও কমে গেছে এবং পূর্বদিনের তুলনায় সময় আরও কম লেগেছে। এইভাবে দেখা গেল তার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বা ভুলের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। অবশেষে এমন একদিন এল যেদিন বিড়ালটি কোন ভুল বা ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করে প্রথমবারেই অনায়াসে খাঁচার দরজাটি খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। সেই দিনই বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের সহায়তায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ বা সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হল এবং তার শিক্ষাও সমাপ্ত হল। বিড়ালের এই প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করার একটা রেখাচিত্র পূর্বপৃষ্ঠায় দেখান হল। খাঁচার দরজা খুলে খাদ্যে পৌছতে মোট ২৪টি ক্রমিক প্রচেষ্টায় মধ্যে বিড়ালটির প্রথম প্রচেষ্টায় ১৬০ সেকেণ্ড সময় লাগলেও ক্রমশঃ সেট কমে কমে ৭ সেকেণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে।

**থর্নডাইকের মতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া যান্ত্রিক প্রক্রিয়া**

থর্নডাইকের মতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, এর মধ্যে বিচার বা মননশীলতার কোন স্থান নেই। শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্দেশ্যর সঙ্গে উপায়ের সঙ্গতিবিধান সম্পর্কে প্রাণীর মধ্যে কোন রকম সচেতনতা নেই; অর্থাৎ সমস্যার সামগ্রিক রূপটিকে কল্পনায় মনের সামনে উপস্থিত করে কিভাবে সমস্যাও সমাধানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যাবে তার কোন পূর্ব কল্পনা প্রাণীর মধ্যে নেই। অনুশীলনের সহায়তায় ভুল প্রক্রিয়াগুলিকে পরিহার করে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার সামর্থ্য অর্জন করাই হল শিক্ষা। প্রাণীর শিক্ষণ-প্রক্রিয়া কতকগুলি দৈহিক প্রতিক্রিয়ার পারম্পর্য।

**মানুষও প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা করে**

থর্নডাইকের মতে কেবলমাত্র ইতর প্রাণীই এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে না, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে। কোন ছাত্রকে একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া হল, ছাত্রটি সমস্যা সমাধানের জন্য পর পর বিভিন্ন ফরমুলা বা সূত্র প্রয়োগ করতে লাগল; কিন্তু যখন নির্ভুল সূত্রটি প্রয়োগ করল তখনই সমস্যার সমাধানে সমর্থ হল। অর্থাৎ ছাত্রটি উদ্দীপক (গাণিতিক সমস্যা) এবং প্রতিক্রিয়ার (ফরমূলা বা সূত্রের প্রয়োগ) মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হল এবং সে শিখল। কাজেই থর্নডাইকের মতে

সব মানুষই এইভাবে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে।

(iii) **শিক্ষায় প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতির তাৎপর্য (Significance of Trial and Error Method in Education) :** যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করা হয় তাহলেও এই পদ্ধতির বিশেষ কোন উপযোগিতা আছে বলে অনেকে মনে করেন না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে অযথা অনেক সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে।[1]

তবু এমন কয়েকটি বিষয় আছে, যেমন—অঙ্ক, নামতা, কবিতা মুখস্থ করা, ব্যাকরণের নিয়ম, এসব ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতিকে পরিহার করা সম্ভব হয় না। যুক্তিতর্ক সংক্রান্ত বিষয়ের (reasoning subjects) ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের সবচেয়ে বেশী সুবিধা রয়েছে।

যেসব শিক্ষক অঙ্ক, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা (অর্থাৎ যেসব বিষয়ে যুক্তি ও আবিষ্কারের প্রয়োজন) শিক্ষা দেবেন তাঁরা এই পদ্ধতির সহায়তায় শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হবেন। তাঁরা ছাত্রদের কাছে এমন সমস্যা উপস্থাপিত করবেন যার সমাধানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সমাধানগুলি নিজে বার করে না দিয়ে, সেগুলি খুঁজে বার করার দায়িত্ব ছাত্রদের উপর অর্পণ করবেন। এর ফলে ছাত্ররা লক্ষ্যটিকে সুনির্দিষ্টভাবে জানবে, কিন্তু সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে থাকবে।

শিক্ষক নজর রাখবেন যাতে শিক্ষার্থী শুরুতে ঠিক পথ অনুসরণ করে। তার ফলে শুরুতেই ঠিকমত কর্ম সম্পাদনের আনন্দ-অনুভূতিতে তার মন পূর্ণ হয়ে উঠবে। তাছাড়া, শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে এমন সমস্যা উপস্থাপিত করবেন, যাতে তাদের বার বার চেষ্টা করতে হয়, পূর্ণ অভিজ্ঞতাকে কাজে প্রয়োগ করতে হয়, ফলাফল পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং নির্ভুল প্রতিক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট মনোযোগী ও সতর্ক হতে হয়।

প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী লক্ষ্যহীন ভাবে প্রতিক্রিয়া করে, একথাও অনেকে স্বীকার করতে চান না। অনেক শিক্ষামনোবিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই পদ্ধতিতে অনেক সময় সুনির্দিষ্ট এবং

1. "There is much wastage of time and energy in learning by this method."
—R. P. Bhatnagar : A Study of Educational Psychology, Page 157

প্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে যদিও সেই ক্রিয়াগুলি লক্ষ্যহীন মনে হয়, আসলে পরিস্থিতিই শিক্ষার্থীর কাছে ক্রিয়াগুলির ইঙ্গিত দেয় এবং শিক্ষার্থীও সেইভাবে অগ্রসর হয়।[1]

## থর্নডাইকের শিক্ষণের সূত্র (Thorndike's Laws of Learning) :

শিক্ষণসম্পর্কীয় বিভিন্ন ফলাফলের উপর ভিত্তি করে থর্নডাইক কতকগুলি সূত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই সূত্রগুলি হল সংখ্যায় আটটি এবং এর মধ্যে তিনটি প্রধান সূত্র এবং পাঁচটি অপ্রধান সূত্র। তিনটি প্রধান সূত্র হল (১) **অনুশীলনের সূত্র** (Law of Exercise) ; (২) **ফলাফল সূত্র** (Law of Effect) ; (৩) **প্রস্তুতি সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Readiness)। অপ্রধান সূত্রগুলি হল (i) **একই উদ্দীপকের প্রতি বহু প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Multiple Response to the same external stimulus) ; (ii) **মনোভাব, প্রস্তুতি** বা **প্রবণতার সূত্র** (Law of Attitude, Set or Disposition) ; (iii) **আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র** (Law of Partial Activity) ; (iv) **উপমানের সূত্র** (Law of Assimilation) ; এবং (v) **অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র** (Law of Associative Shifting)।

শিক্ষণের তিনটি সূত্র

আমরা প্রথমে প্রধান সূত্রগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব :

(১) **অনুশীলনের সূত্র** (Law of Exercise) : কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যদি বার বার সংযোগ স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তাহলে উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংযোগ দৃঢ়তর হয় ; অপরপক্ষে, যদি কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল কোন সংযোগ স্থাপিত না হয় তাহলে সংযোগটি শিথিল হয়ে পড়ে। এই সূত্রটির মূল বক্তব্য হল অনুশীলন উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগকে দৃঢ়তর করে। অনুশীলনের অভাব ঘটলে

অনুশীলনের ফলে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগ দৃঢ়তর হয়

---

1. "........in Trial and Error also, there are often systematic and relevant responses. Activities are not wholly random. All these activites though apparently random are suggested to him by the situation and the learner proceeds accordingly."

--R. P. Bhatnagar : A Study of Educational Psychology, page 157.

সেই সংযোগ শিথিল হয়ে পড়ে। মানুষের শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই সূত্রটির বিশেষ প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি। মোটর গাড়ী চালান, টাইপরাইটার শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা, কবিতা মুখস্থ করা প্রভৃতি শিক্ষণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুশীলন কাজটিকে নিয়মিতভাবে ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।

এই সূত্রটির তিনটি উপসূত্র আছে; যথা—(i) **তীব্রতা সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Vividness or Intensity); (ii) **সাম্প্রতিকতা সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Recency); (iii) **পৌনঃপুনিকতা সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Frequeney)। উদ্দীপকের তীব্রতা এবং শিক্ষণের সাম্প্রতিকতা ও পৌনঃপুনিকতা শিক্ষণের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে সহায়তা করে।

(২) **ফললাভের সূত্র** (Law of Effect): একই অবস্থায় একটি কাজ বার বার করার ফলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগটি স্থাপিত হয়, সেই সংযোগটি যদি শিক্ষার্থীর পক্ষে সন্তোষজনক বা তৃপ্তিদায়ক হয় তাহলে সংযোগটি মনে রেখাপাত করে (stamped in), আর যদি সংযোগের ফল সন্তোষজনক না হয় তাহলে সংযোগটি শিথিল হয়ে বিলুপ্ত (stamped out) হয়ে যায়। ইতর প্রাণীর পক্ষে যে প্রতিক্রিয়ার ফল তার জৈব প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে সহায়ক, সেই প্রতিক্রিয়ার ফলই তৃপ্তিদায়ক যেমন—থর্নডাইকের ক্ষুধার্ত বিড়ালকে নিয়ে যে পরীক্ষণকার্য চালাবার ঘটনাটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় ক্ষুধার্ত বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে খাঁচার দরজাটি খুলে খাদ্য লাভ করল। এক্ষেত্রে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার যথাযথ সংযোগের ফল প্রাণীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক সেহেতু বিড়ালটি দরজা খোলার কৌশলটি শিখে রাখল। আর যেসব ভুল প্রতিক্রিয়ার জন্য সে খাদ্য লাভ করতে পারেনি সেগুলি বিস্মৃত হল।

উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হলে সংযোগ রেখাপাত করে

এই সূত্রকে পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কীয় নিয়ম (The Law of Reward and Punishment) বলা হয়। ক্ষুধার্ত বিড়ালটির যে প্রচেষ্টা তাকে খাদ্য লাভে সহায়তা করে সেগুলির ফলে সে পুরস্কৃত হয়। আবার যেগুলি সহায়তা করে না সেগুলির ফলে সে অসন্তুষ্ট হয় অর্থাৎ তার শাস্তি ভোগ হয়।

বস্তুতঃ, এই সূত্রটি অনুশীলনের সূত্রের পূর্বে আসে, যেহেতু এই সূত্রের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে সফল প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থী নির্বাচন করে।

(৩) **প্রস্তুতির সূত্র** (Law of Readiness): উদ্দীপক ও তার উপযোগী প্রতিক্রিয়াটির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির ভাব থাকা প্রয়োজন। এই প্রস্তুতি থাকলে কাজটি করা শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক মনে হয়, আর এই প্রস্তুতি না থাকলে কাজটি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিজনক মনে হয়।

**শিক্ষার্থীর মধ্যে দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি**

পূর্বোক্ত এই তিনটি সূত্র ছাড়াও থর্নডাইক আরও তিনটি অপ্রধান সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

(i) **একই উদ্দীপকের প্রতি বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র** (Law of Multiple Response to the same external stimulus): অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির বিকাশের ফলে জীব একই উদ্দীপকের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যত বৈচিত্র্য দেখা দেয়, শিক্ষণকার্য ততই সহজতর হয় এবং কোন বিশেষ পরিবেশে একাধিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াটি উদ্দীপকের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সবচেয়ে উপযোগী মনে হয়, শিক্ষার্থী সেটিই নির্বাচন করে নেয় এবং অনুশীলনের সহায়তায় সেই প্রতিক্রিয়াটিকেই স্থায়ী করার জন্য সচেষ্ট হয়। খাঁচায় বদ্ধ বিড়াল খাঁচার বাইরে খাদ্য দেখে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া করে।

**প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে**

(ii) **মনোভাব, প্রস্তুতি ও মানসিক অবস্থার সূত্র** (Law of Attitude, Set or Disposition): কোন্ অবস্থায় কোন উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে তার মনোভাব, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা এবং প্রস্তুতির উপর। খাঁচার বিড়ালটি ক্ষুধার্ত ছিল বলেই বাইরে আসার চেষ্টা করেছিল।

**প্রাণীর প্রতিক্রিয়া তার মনোভাব, দৈহিক এবং মানসিক অবস্থার ও প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে**

(iii) **আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র** (Law of Partial Activity): সমগ্র অবস্থাটি উপস্থিত না থাকলেও, কোন অবস্থার অংশবিশেষ সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করতে পারে। যে বিড়াল আটক খাঁচা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে শিখেছে সে অনভিজ্ঞ বিড়ালের তুলনায় খাঁচার পাশে রাখা খাদ্যের প্রতি প্রথম থেকেই মনোযোগী হবে।

**অবস্থার অংশবিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে**

(iv) **সাদৃশ্য বা উপমানের সূত্র (Law of Assimilation or Analogy):** এক অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা অনুরূপ অবস্থার দ্বারার সৃষ্ট হতে পারে, যদিও পূর্বে সেই অবস্থা স্বভাবতঃ সেই প্রতিক্রিয়া করত না; যেমন, সম্পূর্ণ নতুন একটি খাঁচাতে একটি বিড়ালকে আটকে রাখা হলে পুরনো খাঁচাতে থাকা অবস্থায় সে যেসব প্রতিক্রিয়া করেছিল, তার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া সে করবে।

(v) **অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of Associative Shifting):** একই অবস্থার দ্বারা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়, সেই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্য অবস্থার দ্বারাও সেই প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্ট হতে পারে। যেমন, একটি নির্দিষ্ট পাত্রে কোন কুকুরকে যদি রোজ খাদ্য দেওয়া হয়, তাহলে পরে পাত্রটি দেখামাত্রই কুকুরটি প্রতিক্রিয়া করবে।

একই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্য অবস্থার দ্বারাও প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হতে পারে

## শিক্ষার ক্ষেত্রে থর্নডাইকের সূত্রগুলির উপযোগিতা (Utility of Thorndike's Principles in Education):

থর্নডাইকের সূত্রগুলির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল, তিনি শিক্ষণের সূত্রগুলিকে নিছক যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্রটির মূল্য শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্বীকৃত। অনুশীলনের সহায়তায় শিক্ষণীয় বিষয়টিকে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করা যায় এবং অনুশীলনের অভাব ঘটলে শিক্ষণীয় বিষয়টির ছাপ মনের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে থাকে, এ অস্বীকার করা চলে না। তবে অনেকের মতে এই সূত্রটিতে প্রেষণা, আগ্রহ এবং বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রেষণা, আগ্রহ এবং অর্থ বা তাৎপর্য উপলব্ধি ছাড়া কেবলমাত্র যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকতা কখনও শিক্ষার্থীকে কোন কিছু সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম করে না এবং এগুলি ছাড়া যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি ব্যর্থ বলেই মনে করা যেতে পারে।

অনুশীলন সূত্রটির মূল্য

বার বার পরীক্ষাকার্য চালিয়ে থর্নডাইক অনুশীলনের সূত্রটিকে সংশোধিত করেছেন। অনুশীলনের সূত্রটিকে বর্তমানে শিক্ষণের নীতিরূপে স্বীকার না করে দক্ষতা বা নিপুণতা অর্জনের নীতিরূপে স্বীকার করা হয়। শিক্ষণকার্য

1. H.E. Garret: Great Experiments in Psychology, page 57.

শিক্ষার্থীর শিক্ষণের পুনরাবৃত্তির উপরই নির্ভর করে না, শিক্ষণীয় বিষয়ের উপযোগিতা এবং মূল্যের উপরও নির্ভর করে।

থর্নডাইকের 'ফললাভের সূত্রটিরও' শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগিতা আছে। আনন্দ বা তৃপ্তি যতই অধিক হবে শিক্ষার্থীর শিক্ষণের প্রেষণা ততই শক্তিশালী হবে, এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে শিক্ষণের পক্ষে বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে, লক্ষ্যকে তৃপ্তিদায়ক করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। এই সূত্রটির উপর ভিত্তি করেই পুরস্কার, পদক প্রভৃতি প্রদান করে শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেবার রীতি বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়েছে।

ফললাভের সূত্রের মূল্য

১৯৩২ সালে থর্নডাইক এই সূত্রটিকে সংশোধিত করেন। সূত্রটির সংশোধিত ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে আনন্দ বা তৃপ্তি, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগকে দৃঢ় করে; কিন্তু বিরক্তি (annoyance) যে সংযোগকে দুর্বল করে তা নয়। বিরক্তি শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার সহায়ক; কেননা, অনেক ক্ষেত্রে বিরক্তি শিক্ষার্থীকে নতুন প্রচেষ্টার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার এই সূত্রটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি এবং সূত্রটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। শেষ লক্ষ্য যে সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হবেই এমন কোন কথা নেই। আবার অনেক সময় সে লক্ষ্য শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হলেও সমাজের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলে সামাজিক আদর্শ ও শিক্ষার্থীর লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হবে। অনেক বিষয় শিক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীকে কঠিন পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়। লক্ষ্য তৃপ্তিদায়ক হওয়া ছাড়াও, দৃঢ় সংকল্প, অধ্যবসায়, ধৈর্য প্রভৃতি শিক্ষার্থীকে বাঞ্ছিত ফললাভে সহায়তা করে।

থর্নডাইকের 'প্রস্তুতির সূত্রটি'র মূল্যও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্বীকৃত। শিক্ষা-গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি কোন প্রস্তুতি না থাকে তাহলে শিক্ষা-গ্রহণ এবং শিক্ষা-প্রদান উভয় কার্য সম্পন্ন করা নিতান্তই কষ্টকর হয়ে পড়ে।

প্রস্তুতির সূত্রটির মূল্য

থর্নডাইকের 'উপমানের সূত্রটি'ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে মূল্যবান। অতীত ও পুরাতনের সাদৃশ্যের উপর এবং প্রতিদিনের শিক্ষণকার্যে জানা থেকে অজানা বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করার উপর, এই সূত্রটিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

উপমান সূত্রটির মূল্য

'একই উদ্দীপকের প্রতি বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র'—শিক্ষার্থীকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জনের, নিজের অভিজ্ঞতা লাভ করার এবং নিজের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হবার সুযোগ প্রভৃতির প্রয়োজন ও গুরুত্ব স্বীকার করে।

অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্রটির মূল্য

থর্নডাইকের 'অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের' সূত্রটিরও কার্যকারিতা শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়। বিদ্যালয়ে থাকাকালীন শিশু যেসব অভ্যাস, প্রবণতা এবং আগ্রহ মনের মধ্যে গড়ে তোলে, সেগুলিই তার ভবিষ্যৎ জীবনে পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক আচরণের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

থর্নডাইকের শিক্ষণের সূত্রগুলি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই সূত্রগুলির মূল্য যদিও অস্বীকার করা হয় না, তথাপি শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অনুরাগ, প্রেষণা, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা, উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে উপায় নির্বাচন, শিক্ষার্থীর মনোভাব প্রভৃতি বিষয়গুলিকে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত না করে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে নিছক যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি।

(ঘ) **সাপেক্ষীকরণের সাহায্যে শিক্ষণ** (Learning by Conditioning): এই প্রকার শিক্ষণের মূল কথা হল উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংযোগসাধন করা (linking of a response to a stimulus)। প্যাভলভ (*Parlov*) এবং ওয়াটসন (*Watson*) প্রমুখ আচরণবাদীরা এই শিক্ষণ-পদ্ধতির সমর্থক। তাঁদের মতে শিক্ষণ হল একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। প্যাভলভের মতে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া বা সাপেক্ষীকরণের সাহায্যে সব প্রকারের শিক্ষণ পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করা চলে। তাঁর মতে জটিল শিক্ষণ-প্রক্রিয়া একাধিক সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার দীর্ঘ শৃঙ্খল (a long chain of conditioned reflexes)। ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীরাও শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্যাভলভের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাঁদের মতেও শিক্ষণ হল একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার উপর এর ভিত্তি।

শিক্ষণ প্রক্রিয়া একাধিক সাপেক প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দীর্ঘ শৃঙ্খল

আচরণবাদীরা সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন; কেননা—ইচ্ছা, আশা, প্রত্যাশা, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতি ধারণার সাহায্যে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার তাঁরা মোটেই পক্ষপাতী নন। তাছাড়া, এজাতীয় ধারণাকে তাঁরা মনোবিজ্ঞান থেকে বর্জন করার পক্ষপাতী। এই শিক্ষণের স্বরূপ বুঝতে হলে প্রথমেই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া কাকে বলে তা বোঝা দরকার।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্য বিশেষ উদ্দীপকের প্রয়োজন ; যেমন, ক্ষুধার্ত প্রাণীর জিহ্বা খাদ্যের সংস্পর্শে এলে লালা ক্ষরণ হয় বা চোখে তীব্র আলোক পড়লে চোখ বুজে যায়। এ রকম উদ্দীপককে স্বাভাবিক উদ্দীপক বলে এবং এর প্রতিক্রিয়া হল প্রতিবর্তক্রিয়ার উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে বাহ্য উদ্দীপক প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণীর দেহের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিক্রিয়া' দেখা দেয়। এই প্রতিক্রিয়া ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বা শিক্ষাপ্রসূতও নয়। ইহা স্বাভাবিক দেহজ বা শারীরিক ব্যাপার।

সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া কাকে বলে ?

বিখ্যাত রুশ শারীরতত্ত্ববিদ প্যাভলভ তাঁর গবেষণার সাহায্যে দেখালেন যে, যদিও স্বাভাবিক উদ্দীপক (natural stimulus) বা নিরপেক্ষ উদ্দীপক প্রয়োগ করার জন্য স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তবু সেই স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে যদি কোন একটি বিকল্প উদ্দীপক (substitute stimulus) বারে বারে উপস্থাপিত করা হয় তাহলে কালক্রমে কেবলমাত্র বিকল্প উদ্দীপকটি উপস্থাপিত করেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিকল্প উদ্দীপকের সাহায্যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করাকেই বলা হয় সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Reflex)। বিকল্প উদ্দীপক কৃত্রিম, স্বাভাবিক নয়।

প্যাভলভ 'Conditioned Reflex' কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বর্তমানে 'Conditioned Reflex' কথাটি ব্যবহার না করে 'Conditioned Response' কথাটি ব্যবহার করা হয়। প্রতিবর্তক্রিয়া শিক্ষানিরপেক্ষ কিন্তু সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া শিক্ষাসাপেক্ষ। কৃত্রিম উদ্দীপকের দ্বারা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হয় বলে তাকে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া বলে। শিক্ষা এক অর্থে কৃত্রিম উদ্দীপকের নামান্তর।

## প্যাভলভের পরীক্ষণ-পদ্ধতি (Pavlov's Method) :

অত্যন্ত সুপরিচিত একটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই প্যাভলভের গবেষণা শুরু হয়। প্যাভলভ লক্ষ্য করে দেখলেন যে, খাদ্য জিভের সংস্পর্শে এলে যেমন কুকুরের লালা ক্ষরণ হয়, খাদ্য জিভের সংস্পর্শে না এলেও খাদ্য দেখা মাত্র বা যে পাত্রে খাদ্য সরবরাহ করা হয় সেটি দেখা মাত্র, কিংবা যে ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে কুকুরটিকে খাদ্য দেয় তাকে দেখা মাত্রই কুকুরটির লালা ক্ষরণ হয়। নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক উদ্দীপক অর্থাৎ খাদ্য ছাড়াও অন্যান্য যেসব অনুষঙ্গবদ্ধ উদ্দীপক কুকুরটির লালা ক্ষরণ করে, তিনি তার নাম দিলেন

সাপেক্ষ উদ্দীপক বা বিকল্প উদ্দীপক (Conditioned Stimulus) এবং এই সাপেক্ষ বা বিকল্প উদ্দীপক-প্রয়োগে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার নাম দিলেন সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Reflex)। এর পরে প্যাভলভ দেখলেন যে, অন্য কোন একটি কৃত্রিম উদ্দীপককে (অর্থাৎ যা স্বাভাবিকভাবে নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয়) যদি স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে বার বার উপস্থাপিত করা হয় তাহলে স্বাভাবিক উদ্দীপকের পরিবর্তে কৃত্রিম উদ্দীপকটি সেই একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, তিনি কুকুরটিকে খাবার দেবার পূর্বে প্রতিদিনই একটি ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। পরে দেখা গেল ঘণ্টা শোনা মাত্রই কুকুরটি চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তার লালা ক্ষরণ হয়। এক্ষেত্রে ঘণ্টার শব্দ হল সাপেক্ষ উদ্দীপক (Conditioned Stimulus) এবং ঘণ্টার শব্দ শুনে কুকুরের লালা ক্ষরণকে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response) বলা হয়।

**প্যাভলভের পরীক্ষণ-পদ্ধতির বিবরণ:** সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Reflex) সম্পর্কে গবেষণা করার সময় প্যাভ্লভ বিশেষ করে কুকুরের উপর এই পরীক্ষণকার্য চালান। কুকুরের লালা ক্ষরণরূপ প্রতিক্রিয়াটিকে কেন্দ্র করে গবেষণা করার কারণ, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র
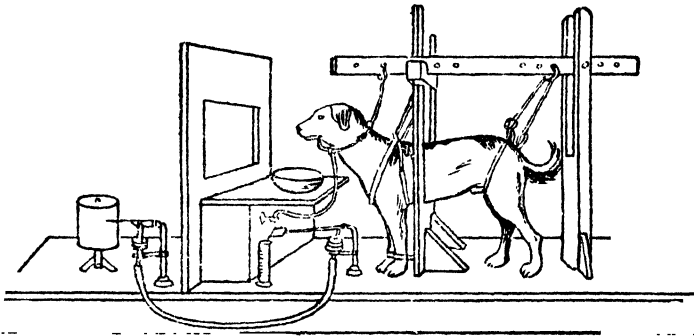
সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধীয় পরীক্ষণ

প্রতিক্রিয়া নয়, প্রতিক্রিয়ার ফলে কতখানি লালা ক্ষরিত হল তা যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। নিঃসৃত লালাকে সংগ্রহ করার জন্য প্যাভলভ যে পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তা অপেক্ষাকৃত সহজ। তিনি কুকুরটির গণ্ডদেশে একটি ছিদ্র করে তার মধ্য দিয়ে একটি সরু কাচের বা রবারের নল ঢুকিয়ে দিতেন এবং সেই নলের একটি প্রান্ত লালা নিঃসারী গ্রন্থির

(Parotid অথবা Submaxilary) সঙ্গে এবং নলের অপর প্রান্তটি একটি দাগকাটা কাচের পাত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতেন, যাতে কুকুরের জিভের নিঃসৃত লালা রবারের' নল বেয়ে নির্দিষ্ট পাত্রে গড়িয়ে পড়ে। এই লালা নিঃসরণের ব্যাপারটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাপার এবং যাতে এই কাজে কোন রকম বাধা দেখা না দেয় তার জন্য প্যাভলভ বিশেষভাবে নির্মিত বায়ু-প্রতিরোধক কক্ষে (এ জাতীয় আটটি কক্ষ তাঁর ছিল) পরীক্ষণকার্য চালাতেন। খাদ্য এবং বিকল্প উদ্দীপক উপস্থাপনের ব্যাপারেও যান্ত্রিক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা হত। যাতে পরীক্ষককে দেখলে কুকুরটির মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়, সে কারণে পরীক্ষক অন্য একটি কক্ষ থেকে দেয়ালের মধ্য দিয়ে পেরিসকোপের (Periscope) সাহায্যে কুকুরটিকে লক্ষ্য করতেন। পরীক্ষককে খুব সতর্ক থাকতে হত যাতে তিনি স্বয়ং বিকল্প উদ্দীপকরূপে গণ্য না হন। যখন লালা গড়িয়ে পাত্রটির উপর পড়ত তখন পাত্রটির সঙ্গে সংলগ্ন স্টাইল্যাসটি কিমোগ্রাফের ধোঁয়ানো কাগজের[1] উপর দাগ কেটে যেত। এই কাগজের উপর যে রেখা অঙ্কিত হয় তার সাহায্যেই জানা যায় কত ফোঁটা লালা নিঃসৃত হয়েছে এবং এই ক্ষরণ কতখানি নিয়মিতভাবে ঘটেছে। কুকুরটিকে গবেষণাগারে একটি ছোট কাঠের টেবিলের উপর দাঁড় করান হয় এবং একটি কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে তাকে এমনভাবে বেঁধে রাখা হয় যাতে কুকুরটি খুব নড়াচড়া না করেও সহজভাবে দাঁড়াতে পারে। প্রত্যেকটি কুকুরকেই দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা দিয়ে গবেষণাগার, চারপাশের পরিবেশ, গবেষণাগারের কর্মী এবং যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত করান হয়। দেখা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে শিক্ষা পাবার পর কুকুরগুলি পরীক্ষণকার্যের পক্ষে বেশ উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

**সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় (How Conditioned Response is established) :** সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করার সহজতম উপায় হল নিরপেক্ষ উদ্দীপক বা স্বাভাবিক উদ্দীপক (Original Stimulus) এবং বিকল্প উদ্দীপক বা সাপেক্ষ উদ্দীপক (Substitute or Conditioned Stimulus) একই সঙ্গে উপস্থাপিত করা। বার বার প্যাভ্‌লভ্‌ তাঁর পরীক্ষণকার্যে খাদ্যকে সকল সময়ই স্বাভাবিক বা নিরপেক্ষ উদ্দীপকরূপে ব্যবহার করতেন এবং দর্শন-

**নিরপেক্ষ উদ্দীপক ও সাপেক্ষ উদ্দীপক পুনঃ পুনঃ উপস্থাপন**

1. কিমোগ্রাফ (Kymograph]—একটি বিদ্যুৎ চালিত ঘূর্ণায়মান ড্রাম যার উপর একটি ধোঁয়ানো (smoked) কাগজ থাকে।

সম্পর্কীয়, শ্রবণ-সম্পর্কীয়, ঘ্রাণজ এবং স্পর্শণ-সম্পর্কীয় উদ্দীপককে সাপেক্ষ উদ্দীপকরূপে ব্যবহার করতেন। কথনও 'ঘণ্টার শব্দ'—এই বিকল্প উদ্দীপক প্রয়োগ করেই লালা নিঃসরণ-রূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘটান হত, কথনও বা কর্পূরের গন্ধ, কথনও বা আলোক, আবার কথনও বা কুকুরটির গাত্রচর্ম ঘর্ষণ করে এই প্রতিক্রিয়া ঘটান হত। এই সব পরীক্ষণের দ্বারা বোঝা যেত যে কুকুরটি বিকল্প উদ্দীপক (যেমন-কর্পূরের গন্ধ, আলো ইত্যাদি) এবং প্রতিক্রিয়া (লালা নিঃসরণ) এ দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে অনুষঙ্গবদ্ধ করে নিয়েছে।

**ঘটনার শব্দ, কর্পূরের গন্ধ, আলোক প্রভৃতি বিকল্প উদ্দীপকরূপে ব্যবহৃত হত**

**সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার অবলুপ্তি** (Extinction of a Conditioned Response) : একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া কথনও একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। প্রয়োজন হলে এই শিক্ষা আবার প্রাণীর মন থেকে মুছে দেওয়া যেতে পারে। যদি সাপেক্ষ উদ্দীপক (ঘণ্টা বাজান) বার বার উপস্থাপিত করার পর নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক উদ্দীপক (খাদ্য) উপস্থাপিত করা না হয় তাহলে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়াটি আর ঘটে না, অর্থাৎ সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার অবলুপ্তি ঘটে (Extinction of Conditioned Response)। প্যাভলভের একটি পরীক্ষণের ক্ষেত্রে খাদ্যের সঙ্গে মেট্রোনোম (Metronome) বাজিয়ে শব্দ করে একটি কুকুরের লালা নিঃসরণ করা হত। তারপর একদিন শুধু মেট্রোনোম ৩০ সেকেণ্ড ধরে বাজান হল, কিন্তু কোন খাদ্য দেওয়া হল না, কিন্তু সেদিনও দেখা গেল কুকুরটির লালা ক্ষরণ হচ্ছে। এর পরের দিন ঐ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তিতে লালা ক্ষরণের পরিমাণ কমে গেল। এইভাবে পরিমাণ কমে আসতে আসতে দেখা গেল যে, মেট্রোনোমের শব্দ শুনে কুকুরটির আর লালা ক্ষরণ হচ্ছে না অর্থাৎ যে সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়াটি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটির অবলুপ্তি ঘটেছে।

**সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অবলুপ্তি**

সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতি কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতির উপর নির্ভরশীল। এ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপরে নির্ভর করে। যথা—

(১) **সময়ের নীতি** (Time Principle) : কৃত্রিম উদ্দীপক ও স্বাভাবিক উদ্দীপক—এই দুটির উপস্থাপনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যেন খুব দীর্ঘ না হয়।

(২) **তীব্রতার নীতি** (Principle of Intensity) : স্বাভাবিক উদ্দীপকটির তীব্রতা খুব বেশী হওয়া প্রয়োজন, নতুবা জীবদেহে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না।

(৩) **সামঞ্জস্যপূর্ণতার নীতি** (Principle of Consistency): কোন রকম পরিবর্তন না করে একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি বেশ কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৪) **পরিস্থিতিসম্পর্কীয় নীতি** (The Situational Principle): যে পরিস্থিতিতে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতি অনুসৃত হবে, তাতে এমন কিছু থাকা যুক্তিযুক্ত হবে না যাতে চিত্তবিক্ষেপ ঘটতে পারে বা মনোযোগ বিষয়ান্তরে ধাবিত হতে পারে।

(৫) **পুনরাবৃত্তির নীতি** (Principle of Repetition): সাপেক্ষীকরণকে সুদৃঢ় করার জন্য পুনরাবৃত্তির একান্ত প্রয়োজন।

**থর্নডাইকের সঙ্গে প্যাভলভের পার্থক্য**: প্রথমতঃ, থর্নডাইক প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন; কিন্তু প্যাভলভ এই পদ্ধতির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ, থর্নডাইকের মতে প্রাণিবিশেষ দৈহিক ভঙ্গিমার পারম্পর্য কতখানি শিক্ষা করেছে, তাই হল গুরুত্বপূর্ণ। আর প্যাভলভের কাছে স্বাভাবিক উদ্দীপকের পরিবর্তে কৃত্রিম বা বিকল্প উদ্দীপকের উপর প্রাণী প্রতিক্রিয়া করছে কি না তাই হল লক্ষ্য করার বিষয়। একটি বিশেষ অবস্থায় প্রাণী বার বার প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের দ্বারা উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারছে কি না, থর্নডাইক তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন; কিন্তু প্যাভলভ প্রাণীর সহজাত বৃত্তিকে তৃপ্ত করার জন্য কোন স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত কৃত্রিম উদ্দীপকের ক্ষেত্রে প্রাণী কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে তারই উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

থর্নডাইকের সঙ্গে প্যাভলভের পার্থক্য

**মানুষের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া** (Conditioned Response in human beings): প্রশ্ন হল, মনুষ্যেতর জীবের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কীয় পরীক্ষণের সহায়তায় প্যাভলভ যেসব ফলাফল লক্ষ্য করেছেন, মানুষের ক্ষেত্রে সে জাতীয় ফলাফল লক্ষ্য করা যেতে পারে কি?

রুশদেশীয় মনোবিজ্ঞানী ভ্লাডিমির বেকৃটেরেভ (*Vladimir Bechterev*) মানুষের উপর পরীক্ষণকার্য চালিয়ে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ লক্ষ্য করেন। মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসনও (*Watson*) পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর পরীক্ষণকার্য

চালিয়ে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব প্রমাণ করেন। সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক শক্ লাগামাত্রই আমরা হাত-পা সরিয়ে নিই, এটি একটি প্রতিবর্তক্রিয়ার উদাহরণ। ওয়াটসন পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখালেন যে, শক্ দেবার পূর্বে যদি একটি বাতি জ্বালান হয়, তারপর 'শক্' বা বৈদ্যুতিক ধাক্কা দেওয়া হয় এবং বেশ কয়েকবার এই অবস্থার যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপকটির প্রয়োগের ফলে অর্থাৎ বাতি জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তি তার হাত-পা গুটিয়ে নিচ্ছে। দমকা বাতাস চোখের উপর এসে পড়লেই আমাদের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়—এটি একটি প্রতিবর্তক্রিয়া। কিন্তু দমকা বাতাস চোখের উপর লাগার পূর্বে যদি একটা ক্ষীণ আলোক ঠিক বাতাস লাগার আগে চোখের উপর ফেলা হয় এবং এটি বেশ কয়েকবার করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে বাতাস চোখে লাগার আগেই চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষণের সাহায্যে দেখা গেছে আলো বাতাস লাগার $\frac{1}{2}$ সেকেণ্ড আগে ফেলতে হয়।

বেক্‌টেরেভ এবং ওয়াটসন মানুষের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন

পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া

শিশুদের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়ার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ক্ষিধে পাওয়ার জন্য শিশু যখন কাঁদতে থাকে তখন যে লোকটি রোজ দুধের বোতল দেয়, তার হাতে দুধের বোতল দেখেই তার কান্না থেমে যায়। দুধের বোতলটি দেবার ঠিক কিছু আগে যদি বাজনা বাজিয়ে গুনগুন শব্দ করা হয় এবং কয়েকদিন ধরে এই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে দেখা যাবে কেবলমাত্র বাজনার গুনগুন শব্দ শুনেই শিশুটির লালা ক্ষরণ হচ্ছে।

শিশুর ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া

বিভিন্ন সাপেক্ষ উদ্দীপক প্রয়োগ করে যেমন কুকুরের লালা ক্ষরণ হয়, প্যাভলভের জনৈক ছাত্র ক্রাস্‌নোগোরস্কি (*Krasnogorski*) বিভিন্ন সাপেক্ষ উদ্দীপক—যেমন খাদ্য, ঘণ্টা বাজান, বাঁশীর শব্দ, গায়ে হাত বুলান প্রভৃতি প্রয়োগ করে সাপেক্ষ-প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার ফলে শিশুদের লালা ক্ষরণ হয়েছে। আমেরিকার মাটিয়ের (*Mateer*), মারকুইস (*Marquis*), রাজরন (*Razron*) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী ক্রাস্‌নোগোরস্কির ফলাফলকেই তাঁদের পরীক্ষণের মাধ্যমে সমর্থন করেছেন। মাটিয়ের বারমাস বয়স থেকে সাত বছরের পঞ্চাশটি স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর এবং দুটি দুর্বলমনা শিশুর উপর পরীক্ষণ চালিয়ে দেখান যে, দুর্বলমনা শিশুদের

ক্রাস্‌নোগোরস্কির পরীক্ষণকার্য এবং মাটিয়ের, মারকুইস ও রাজরন-এর পরীক্ষণকার্য

তুলনায় স্বাভাবিক শিশুদের ক্ষেত্রেই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং দ্রুত অবলুপ্ত করে দেওয়া যায়।

প্রক্ষোভের জটিলতা ও বিস্তৃতির মূলে সাপেক্ষীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ওয়াটসন প্রক্ষোভ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা থেকে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে দুটি উদ্দীপক নবজাতকের মনে ভয় জাগাতে পারে—উচ্চশব্দ ও আকস্মিক পতন, কিন্তু শিশু যখন বড় হয় তখন দেখা যায় যে তার ভয় কেবলমাত্র ঐ দুটি উদ্দীপকেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অন্যান্য উদ্দীপকও ভয় জাগাতে পারে। সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রক্ষোভ বিভিন্ন উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়। প্রক্ষোভের জটিলতা ও বিস্তৃতি সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার জন্যই যে অনেক শিশুর মধ্যে নানা ধরনের ভয় দেখা দেয়, ওয়াটসন একটি পরীক্ষার মাধ্যমে তা দেখান। এলবার্ট নামে নয় মাসের একটি শিশুর উপর এই পরীক্ষণকার্য চালান হয়। ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি দেখে এলবার্ট ভয় পেত না, কিন্তু অন্যান্য ছোট শিশুর মতো সে জোরালো শব্দ শুনলে ভয় পেত। এলবার্টের কাছে একটা ইঁদুরকে আনা হয় এবং যখনই সে ইঁদুরকে স্পর্শ করতে যাবে তখনই তার পেছনে বেশ জোরে একটি শব্দ করা হত। শব্দ শোনামাত্রই এলবার্ট ভয় পেয়ে যেত এবং কেঁপে উঠত। এই রকম বার বার করার পর দেখা গেল, কেবল মাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপক অর্থাৎ ইঁদুরটিকে দেখেই সে ভয় পাচ্ছে।

সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মনে ভয়ের উদ্রেক

ওয়াটসন পরীক্ষার মাধ্যমে আরও দেখালেন যে, সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে কি ভাবে কোন ভয়কে মন থেকে দূর করা যেতে পারে। যে উদ্দীপকটি ভয় জাগায়, সেই উদ্দীপকটিকে যদি একটি আনন্দজনক উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে ক্রমশঃ ভয়ের ভাব মন থেকে দূর হয়ে যায়। কোন একটি শিশু একটি নিরীহ বেড়াল দেখলে ভয় পেত। শিশুটির কোন আনন্দজনক অবস্থায়, অর্থাৎ যখন শিশুটি তার মায়ের সঙ্গে খেলা করছে বা খাবার খাচ্ছে, তখন বেড়ালটিকে তার কাছে নিয়ে আসা হতে লাগল। এইভাবে কয়েকদিন বেড়ালটিকে তার কাছে আনার পর, শিশুর ঐরূপ আনন্দজনক অবস্থায় বেড়ালটিকে আরও কাছে আনা হতে লাগল। অবশ্য শিশুর আনন্দজনক অবস্থায় যাতে কোনরূপ বাধা দেখা না দেয় তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। দেখা গেল, ক্রমশঃ শিশুটি আর বেড়াল দেখে ভয় পাচ্ছে না।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার সাহায্যে কিভাবে ভয় দূর করা যেতে পারে

ব্যবহারিক জীবনে ওয়াটসনের এই জাতীয় পরীক্ষণের বিশেষ তাৎপর্য আছে। কেননা, শিশুদের মনে নানা বিষয়ে ভয় জাগ্রত হয়। ওয়াটসনের পদ্ধতি অনুসরণ করে এভাবে সেই সব ভয় মন থেকে দূর করা চলে। শুধু অকারণ ভয় নয় অনেক সময় অনেক মন্দ অভ্যাস কেবলমাত্র সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করেই দূর করা যেতে পারে।

**শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবর্তক্রিয়ার পদ্ধতির অনুপযোগিতা (Disadvantages of Conditioned Response Method in Education):** প্যাভলভ এবং ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীরা শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা— ইচ্ছা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে মানসিকতা বর্তমান, তাকে বর্জন করে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়ার প্রয়োগের দোষ-ত্রুটি

জটিল শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকেও একাধিক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার দীর্ঘ শৃঙ্খল মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। শিক্ষণ সরল বা জটিল যাই হোক না কেন, নিছক দৈহিক প্রতিক্রিয়া নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষণের উদ্দেশ্য কোন লক্ষ্যসাধন করা এবং এই লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র দৈহিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে বোয়াজ (*Boaz*) বলেন, "সরল বা এমন কি জটিল অঙ্গসঞ্চালনমূলক ক্রিয়া ও নৈপুণ্য শিক্ষা করার জন্য এই ব্যাখ্যা কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু আমাদের সব রকম ভাবমূলক শিক্ষা ; যেমন, পদার্থবিদ্যার আপেক্ষিকতাবাদকেও সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলে, এই পদ্ধতিকে এর সীমার বাইরে প্রয়োগ করা হবে।[1]

সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষণের ঝুঁকিও আছে অনেক। কয়েকটি কারণ নীচে ব্যক্ত করা হচ্ছে :

(১) শিশুকে জন্মের পর থেকে ইচ্ছানুসারেই হোক বা অনিচ্ছাসত্ত্বেই হোক এই পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করতে হয়। শিশু চায় খাদ্য, ভালবাসা, আরাম। কিন্তু তার অভিভাবক বা তার চারপাশের পরিচিত ব্যক্তিরা এই সব

1. "........Of course, in the case of learning simple or even complex motor activities and skills this explanation may work very well. But it will be stretching the point beyond its limit, if an attempt is made to explain all our ideational learning, such as learning the theory of relativity in physics, as a process of conditioning."

—G. D. Boaz : Educational Psychology. Page 163.

স্বাভাবিক উদ্দীপকের পরিবর্তে বিকল্প উদ্দীপকের ব্যবস্থা করে শিশুকে সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমে শিক্ষণে বাধ্য করেন। ফলে, যদি এই সব অভিভাবক বা পরিচিত ব্যক্তিরা অবিবেকী হন তাহলে শিশুর ক্রমোন্নতি বা ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের পথে নানারূপ বাধার সঞ্চার হয়। এই পদ্ধতিই অনেক শিশুকে ভীরু, আক্রমণশীল, অপরিচ্ছন্ন স্বভাবসম্পন্ন বা বিদ্রোহী করে তোলে।

(২) অনেক সময় শিক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়াও যদি শিশুকে পরস্পর সংযুক্ত অভিজ্ঞতার অংশীদার করা হয় তাহলে এই সাপেক্ষীকরণের সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ চমকালেই যদি মাকে উত্তেজিত হতে শিশু দেখে, তাহলে সারা জীবন ধরেই বিদ্যুৎ চমকানোতে শিশুর মনে ভয়ের সঞ্চার হতে পারে।

(৩) কথাবার্তা এবং দেহগত পরিবর্তন অনেক সময় এমনভাবে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে পড়ে যে একটির উপস্থিতি অপরটির উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। ক্রুদ্ধ পিতা যদি প্রতিবারই সন্তানকে শাস্তি দেবার আগে তাকে মূর্খ বলে গালিগালাজ করেন তাহলে এমন হতে পারে যে, ভবিষ্যতে এরূপ গালিগালাজকে শিশু দৈহিক শাস্তির প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে পারে। কাজেই শাস্তি দেবার ফলে শিশুর মনে যে ভাব বা অনুভূতি জাগে, সেগুলি এই গালিগালাজের দ্বারাই তার মনে জাগতে পারে, পরবর্তী জীবনে যখন শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন কেউ গালিগালাজ করলে অনুরূপ অনুভূতি তার মনে সঞ্চারিত হতে পারে।

## শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষণের উপকারিতা (Usefulness of Learning by Conditioning) :

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির কোন উপযোগিতা নেই, একথা বলা চলে না।

সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতি সফল হলে, বিশেষ বিশেষ উদ্দীপকের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা যায়। এর ফলে আচরণে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে এবং আমরা বুঝতে পারি যে শিক্ষার্থী একটা বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্কুলের অনেক পাঠ্যবিষয়; যেমন-পড়া, লেখা, বানান অভ্যাস প্রভৃতি বেশ ভালভাবে আয়ত্ত করা যায়। এই সকল বিষয় শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষকেরা দেখতে পাবেন সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতি কতখানি মূল্যবান। সহজ কথায়, কতকগুলি এমন বিষয় আছে যাতে দক্ষতা অর্জন

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার উপযোগিতা

করতে গেলে স্বতঃস্ফূর্ততার প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন-ধারাপাতের নামতা মুখস্থ করা, বীজগণিতের বা পাটীগণিতের এমন অনেক বিষয় যেগুলি শিক্ষণের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

অনেক বিষয় সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারি এবং সে কারণেই কোন একটি ভাষা শিক্ষা করতে হলে, যে সমাজে সেই ভাষা ব্যবহার করা হয়, সে সমাজে থেকেই এই ভাষাকে সহজে আয়ত্ত করা যায়। সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা করা সহজতর হয়। সৎ মনোভাব, ভাল অভ্যাস, সৎগুণ এবং আদর্শ যেগুলি নিয়মানুবর্তিতার উপাদান সেগুলি এই সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সহায়তায় বেশ ভালভাবেই শিক্ষা করা যায়।[1]

আমাদের অনেক ভীতি বা আতঙ্কের মূলে রয়েছে কোন-না-কোন ধরনের সাপেক্ষীকরণ। সাপেক্ষীকরণের বিলুপ্তির সাহায্যে মন থেকে এই সব ভীতি বা আতঙ্ককে অপসারিত করা সম্ভব। আমাদের অনেক অসঙ্গতিমূলক প্রতি-ক্রিয়ার মূলেও এই সাপেক্ষীকরণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় সাপেক্ষীকরণ শৈশবেই ঘটে থাকে, যদিও এর যথার্থ কারণ অজ্ঞাত থাকে, তবু এর প্রভাব উত্তরজীবনে চলতে থাকে। এই সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে এই সব আচরণের কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং তার প্রতিবিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

**সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সমালোচনা** (Criticism of the Conditioning Theory): অনেক মনোবিজ্ঞানী এই সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। আমাদের ঐচ্ছিক ক্রিয়া, উন্নততর চিন্তন ও যুক্তি-পদ্ধতির কোন ব্যাখ্যা এই পদ্ধতি দিতে পারে না।

উন্নততর চিন্তন ও যুক্তি পদ্ধতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না

অবশ্য এই সমালোচনার উত্তরে একথা বলা যেতে পারে যে, উন্নততর শিক্ষার স্তরগুলি কিভাবে ব্যাখ্যাত হল শিক্ষকের কাছে তার গুরুত্ব সমধিক নয়। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী হবেন সারগ্রাহী মনোভাবাপন্ন। তাঁকে স্মরণ রাখতে হবে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণেরও প্রয়োজন আছে।

---

1. "Discipline may be caused through conditioning. Good sentiments, good habits, virtues and ideals etc., which are component of discipline are effectively learnt through the process of conditioning."
—R. P. Bhatnagar: A Study of Educational Psychology, page 160.

গেস্টাল্ট বা সমগ্রতাবাদীরাও এই পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে শিক্ষণ হল কোন বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ক্রিয়াকে পরিচালিত করা। উপায় ও লক্ষ্যের সংযুক্তিকরণ গেস্টাল্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। কিভাবে একটি পরিস্থিতির একটি উপাদানকে অপর একটি পরিস্থিতির অন্য একটি উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া-পদ্ধতি তার কোন উল্লেখ করে না এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির যদি উপস্থিতি না থাকে তাহলে সাপেক্ষীকরণ কিভাবে সম্ভব? শিশুদের মনে ভীতি সঞ্চার করার উপায় হল তাদের মাতাপিতার আবেগমূলক প্রতিক্রিয়াগুলি তাদের পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ দেওয়া। আবেগের যান্ত্রিক সাপেক্ষীকরণ সম্ভব নয়। শিশু কখনও কখনও কোন প্রাণী দেখে ভয় পায়। এর কারণ প্রাণীর আবির্ভাবেই বিকট চীৎকার শুরু হয়ে যায় বা অন্য কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এবং শিশু মনে করে প্রাণীটিই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভবের কারণস্বরূপ। সুতরাং গেস্টাল্টবাদের মতে শিক্ষার সাপেক্ষীকরণের জন্য বিভিন্ন উপাদানকে একটি সমগ্রতার মধ্যে সংযুক্তিকরণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

**গেস্টাল্টবাদীদের সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সমালোচনা**

### (ঙ) অনুকরণের সাহায্যে শিক্ষণ (Learning by Imitation) :

কি মানুষ, কি নিম্নতর প্রাণী সকলেই অপরের আচরণ অনুকরণ করে। মানব শিশুর শৈশবের অনেকখানিই সময় কেটে যায় অপরকে অনুকরণ করার ইচ্ছাতে। শিশুর কথা বলা, হাঁটা, খেলাধূলা, পড়া, লেখা প্রায় সব কিছুতেই বয়স্কদের ক্রিয়ার অনুকরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বৃদ্ধ এবং যুবকদের মধ্যেও অনুকরণের প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। অপরকে অনুকরণ করার প্রবণতা জীব মাত্রেরই প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে। জীবজন্তু বিশেষভাবে পক্ষীদের আচরণ লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, মানুষের মতনই জীবনের নিরাপত্তার ও সংরক্ষণের জন্য তারা অপরের অনুকরণ করে অনেক কার্য করে থাকে।

**মানুষ ও সকলেই অপরের অনুকরণ করে**

অনুকরণ কাকে বলে? অপর ব্যক্তি বা প্রাণীর আচরণের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে যখন কোন ব্যক্তি বা প্রাণী সেই একই জাতীয় আচরণ করে তখন তার আচরণকে আমরা অনুকরণ বলে থাকি। অধ্যাপক ভেলেনটাইন (*Vallentine*) বলেন, 'অনুভাবন প্রক্রিয়া যখন ভাবের সাহায্যে সাধিত না হয়ে ক্রিয়ার সাহায্যে সাধিত হয় তখনই তাকে

**অনুকরণের স্বরূপ ও সংজ্ঞা**

অনুকরণ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী রস (*Ross*)[1]-এর মতে অনুকরণ হল 'যূথ-প্রবৃত্তির ক্রিয়ামূলক দিক'। অনুকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'এ হল যূথচারী প্রাণীদের এক সহজাত প্রবৃত্তি, যার জন্য ব্যক্তিবিশেষ অপরের ক্রিয়াকলাপ নিজের মধ্যে নকল করার চেষ্টা করে।' যথাযথ অনুকরণকে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে ; যথা—(১) যে ক্রিয়াকে অনুকরণ করা হচ্ছে, তা অনুকরণকারীর কাছে অপরিচিত হবে। (২) পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুকরণজাত আচরণের প্রকাশ ঘটবে, প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে যেন আচরণ করা না হয়। (৩) যে আচরণ পর্যবেক্ষণ করে অনুকরণ করা হচ্ছে, অনুকরণজাত আচরণ যেন তার একটা পরিচিত অনুলিপি হয়। এই সব শর্তাধীনে যখন শিক্ষণ ঘটে তখন তাকে অনুকরণমূলক শিক্ষণ বলা চলে।

**যথাযথ অনুকরণের শর্ত**

মনোবিজ্ঞানী ড্রেভার (*Drever*) এবং ম্যাকডুগাল (*McDougall*)-এর মতে অনুকরণ হল সহজাত প্রবণতা (**innate tendency**)। বিশেষ বস্তু বা অবস্থার দ্বারা উদ্দীপিত না হয়ে যে প্রবণতা নিজেকে প্রকাশ করে তাকেই সহজাত প্রবণতা বলে। ছোট ছোট শিশুদের অনুকরণ-প্রবণতা লক্ষ্য করেই তারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইক (*Thorndike*) অনুকরণকে সহজাত প্রবণতা বলে গণ্য করতে নারাজ। তাঁর মতে অনুকরণ-মূলক ক্রিয়ার ভিত্তি কোন সহজাত প্রবণতা নয়। অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষণের উপরই এর ভিত্তি। কিন্তু ম্যাকডুগাল ও ড্রেভার থর্নডাইকের এই অভিমত স্বীকার করতে চান না। ছোট ছেলে যখন অপর ছেলেকে জিভ্ বার করতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে জিভ বার করে তখন সে অনুকরণ করেই এ কাজ করে থাকে, কোন প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে এই বিষয়টি সে শিক্ষা করেছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু ম্যাকডুগাল ও ড্রেভারের অভিমত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। অনুকরণ কোন সহজাত প্রবৃত্তি বা সহজাত প্রবণতা—এই মতবাদ এখন ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী বোরিং (*Boring*)[2] বলেন, "যখনই সুযোগ আসে তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুকরণ দেখা দেয় না, অনুকরণ বিশেষ অবস্থাতে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে তার দাদার

1. Imitation proper, the 'doing aspect' of gregariousness is the process in virtue of which all the members of a group act together."

—J. S. Ross : Groundwork of Educational Psychology, p. 254.

2. C. F. Boring and others : Foundations of Psychology.

বল খেলাকেই অনুকরণ করে, কোনমতেই তার ছোট বোনের পুতুল খেলাকে অনুকরণ করে না।"

মনোবিজ্ঞানী বোরিং (*Boring*)-এর অভিমতানুযায়ী অনুকরণ হল এমন এক স্পৃহা বা প্রবণতা যা অর্জন করা হয় এবং যা আমাদের কোন উদ্দেশ্য, চাহিদা বা প্রয়োজন মেটায়।

মানুষ শেখে, কখন অনুকরণ করবে আর কখন অনুকরণ করবে না। মানুষ তখনই অনুকরণ করতে শেখে যখন সে বোঝে এ অনুকরণের ফলে সে তৃপ্তি লাভ করবে। কিন্তু যেখানে অনুকরণ করে কোন তৃপ্তি লাভ করা যায় না বা যেখানে অনুকরণ কোন অপ্রীতিকর ফল নিয়ে আসে, সেখানে মানুষ অনুকরণ করার প্রবণতা দেখায় না।

জীবনে অনুকরণের মূল্য কতখানি বিচার করে দেখা যাক। সাধারণতঃ অনুকরণ-প্রবণতাকে আমরা খুব ভাল চোখে দেখি না। আমরা এর নিন্দা করে থাকি। নিছক অনুকরণ বলে জানতে পারলে আমরা তার বিশেষ কোন মূল্য দিই না। কিন্তু তা বলে অনুকরণমাত্রই হেয় একথা বলা যেতে পারে না। অনুকরণ ছাড়া জীবদেহের ক্রমবৃদ্ধি সম্ভব হত না বা জীবদেহ প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারত না। সৎ-অভ্যাস, সমাজ-অনুমোদিত আচরণ, মহৎ আদর্শ এবং উচ্চমানের জীবনযাত্রা অনুকরণের মাধ্যমেই শিক্ষা করা যেতে পারে। কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক—উভয় প্রকার উন্নতির ক্ষেত্রেই অনুকরণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। উইলিয়াম জেম্‌স (*William James*)-এর কথা উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে যে, "অনুকরণ এবং আবিষ্কার হল দুটি পা, যার সাহায্যে মানুষ হেঁটে বেড়িয়েছে[1]।" আমরা অপরের অভিজ্ঞতার অনুকরণ করে উপকৃত হই। পুরাতন সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং নতুন ধারার বিস্তার, অনুকরণের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। যাঁরা আমাদের থেকে উন্নত তাদের অনুকরণ করেই আমরা জীবনে উন্নতি লাভ করি। অনেকে মনে করে, অনুকরণ প্রবণতা মৌলিকতা শক্তি বিনষ্ট করে। মৌলিকতা এবং অনুকরণের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রতিকূলতা নেই। নান্ (*Nunn*) বলেন, "অনুকরণ প্রথম অবস্থায় জৈবিক এবং পরে চিন্তামূলক হয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রথম স্তর রচনা করে।' অনুকরণের পরিধিকে বাড়িয়ে ব্যক্তিত্ববোধকে উন্নত করা যেতে পারে। যে শ্রেণী বা জাতি শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক

**জীবনে অনুকরণের মূল্য**

[1] "Imitation and invention are the two legs on which human being has proverbially walked."—William James.

থেকে খুবই অনগ্রসর তারা উন্নততর শ্রেণী বা জাতিকে অনুকরণ করে নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধন করতে পারে। নেপোলিয়ান তাঁর সেনাপতিদের বলতেন, 'দীর্ঘদিন ধরে একই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করো না। তাহলে দেখবে তুমি তাদের সব যুদ্ধ-কৌশল শিখিয়ে দিয়ে বসে আছ।"

শিশুর অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত। শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশ ও বুদ্ধির ক্রমোন্নতি অনুকরণ করার উপর নির্ভর করে। এই কারণেই, বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের মধ্যে অনুকরণ প্রবণতা বেশী। শিশুদের মধ্যে এই অনুকরণ স্পৃহা যদি খুব প্রবল না হত, তাহলে মা, বা অন্যান্য পরিজনের পক্ষে শিশুকে এত সহজে কথা বলা, হাঁটা, পড়ান প্রভৃতি শেখাতে পারত না। যখন শিশুর দুই কি তিন বছর বয়স, তখন তার মধ্যে এই অনুকরণ প্রবণতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয়। অনুকরণ করাই তখন তার কাছে খেলা হয়ে দাঁড়ায়। রাস্তায় এক দল সৈনিককে কুচকাওয়াজ করে যেতে দেখলে শিশুর দল তার অনুকরণ করে। আবার কোন শিশু রাস্তায় কোন ব্যক্তিকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখে, নিজের লাঠিটাকে ঘোড়া মনে করে অশ্বারোহীর আচরণ অনুকরণ করে। অপরের অনুকরণে শিশু অভিনয় করে, মোটর চালায়, নৌকা চালায়, পুলিসের ভঙ্গীতে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামায়। এই সব ক্রিয়া শিশুকে ভবিষ্যতে জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। বস্তুতঃ, সমাজের বংশগতির সঙ্গে (Social heredity) শিশুর পরিচয় অনুকরণের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। সমাজের সঞ্চিত অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনুকরণের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে শিশু তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে সক্ষম হয়।

শিশুর জীবনে অনুকরণের স্থান

সমাজ-জীবনে অনুকরণের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সভ্য সমাজে এই অনুকরণস্পৃহা কি ভাবে বিস্তার লাভ করছে তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। পোশাক-পরিচ্ছদ, চলন-বলন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই অনুকরণস্পৃহা লক্ষ্য করা যায়। আবার সভ্য জাতির উন্নততর জীবনযাত্রা ও সমাজ-ব্যবস্থার অনুকরণে অনগ্রসর দেশগুলি কিভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে বর্তমান যুগের বিভিন্ন জাতিগুলির দিকে তাকালেই তা টের পাওয়া যায়। শিশু কি কি অনুকরণ করছে, তা আমাদের জানা থাকলে কোন ব্যক্তির ভবিষ্যত জীবন কিভাবে গড়ে উঠবে তার কিছুটা ধারণা করা যায়।

সমাজ-জীবনে অনুকরণের স্থান

## অনুকরণের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Imitation) :

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী অনুকরণকে নানাভাবে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন। আমরা এইবার এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে একে একে আলোচনা করব :

(i) মনোবিজ্ঞানীর ড্রেভার (*Drever*) অনুমানকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা—

**(ক) প্রাথমিক বা অচেতন এবং অনৈচ্ছিক অনুকরণ : (Primary or Unconscious and Involuntary Imitation) :** যখন কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত না হয়ে অবচেতনভাবে অপরের আচরণ অনুকরণ করে তখন তাকে অনৈচ্ছিক বা প্রাথমিক অনুকরণ বলা হয়। এই প্রকার অনুকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি তার পরিবেশ থেকে অনেক কিছুই শিক্ষা করে। শিশুর জীবনে এই ধরনের অনুকরণ অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে। শিশু অপরকে কাঁদতে দেখে কাঁদে, অপরকে হাসতে দেখে হাসে। শিশুর এই জাতীয় অনুকরণ প্রবণতার সদ্ব্যবহার করতে পারলে শিক্ষক তাকে অনেক কিছুই শিক্ষা দিতে পারেন।

**ড্রেভারের শ্রেণীবিভাগ —অচেতন ও সচেতন অনুকরণ**

**(খ) সচেতন অনুকরণ ( Deliberate Imitation ) :** এই ধরনের অনুকরণের বেলায় ব্যক্তি তার আদর্শস্থানীয় ব্যক্তির আচরণ অনুকরণ করে। এই প্রকার অনুকরণ ঐচ্ছিক এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। শৈশবে যেমন প্রাথমিক অনুকরণ বেশীমাত্রায় দেখা যায়, পরিণত জীবনে সচেতন অনুকরণেরই স্থান বেশী। শিশুর ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অচেতন অনুকরণ সচেতন অনুকরণে রূপান্তরিত হয়। শিশু যতই বড় হতে থাকে, ততই অপরকে অনুকরণ করার ভাল-মন্দ দিকটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার ফলে সে বিচার করে, অপরের কোন আচরণ বা ক্রিয়াকলাপ সে অনুকরণ করবে, কি করবে না।

(ii) মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল (*McDougall*) অনুকরণকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা—

**(ক) সহানুভূতিমূলক অনুকরণ (Sympathetic Imitation) :** কোন মানুষ যখন অপরের অনুভূতিকে অনুকরণ করে কোন ক্রিয়া করে তখন তাকে বলা হয় সহানুভূতিমূলক অনুকরণ। কোন ব্যক্তিকে দুঃখে কাঁদতে দেখে অনেক সময় অপর ব্যক্তিও তার অনুকরণে কাঁদতে শুরু করে বা সুখে হাসতে দেখে তার অনুকরণে হাসতে শুরু করে দেয়। এই ধরনের অনুকরণ হল অচেতন

অনুকরণ। ড্রেভারের শ্রেণীবিভাগের প্রথম ধরনের অনুকরণের সঙ্গে এর মিল লক্ষ্য করা যায়।

**(খ) ভাবজ অনুকরণ** (Ideo-motor Imitation): যখন কোন ভাব কোন ব্যক্তির অজ্ঞাতসারেই অনুকরণের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মে পরিণত হয় তখন তাকে বলা হয় ভাবজ অনুকরণ। ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে কোন দর্শক গোলের মুখে বল দেখে নিজের অজ্ঞাতসারেই পা ছোঁড়ে বা সার্কাস খেলোয়াড় যখন দড়ির উপরে নাচতে থাকে তখন সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তারই অনুকরণে কোন কোন দর্শকও দেহকে সঞ্চালিত করতে থাকে।

ম্যাকডুগালের শ্রেণী-বিভাগ—সহানুভূতি-মূলক, ভাবজ ও সচেতন

শিশুদের মধ্যে এ ধরনের অনুকরণ অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। যখন কোন শিশু অপরকে মাথা নাড়তে বা হাততালি দিতে দেখে তখন নিজের অজ্ঞাতসারেই তার অনুকরণ করে সেও মাথা নাড়তে বা হাততালি দিতে থাকে। অনেক সময় শিশু শিক্ষকদের মুখভঙ্গী দেখে তাঁর অনুকরণে মুখভঙ্গী করে। শিশুর শৈশবে যে সকল আচরণ নিত্য নতুন করে থাকে তার বেশীর ভাগই ভাবজ অনুকরণ।

**(গ) সচেতন অনুকরণ** (Deliberate Imitation): এ হল সেই ধরনের অনুকরণ যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আদর্শস্থানীয় মনে করে তাঁর আচরণ অনুকরণ করে। কোন কোন যুবকের মধ্যে তাদের প্রিয় নায়কদের ভাবভঙ্গী, কথাবার্তা বা অন্যান্য আচরণ অনুকরণ করার স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল।

ম্যাকডুগাল (*McDougall*) পূর্বোক্ত তিন প্রকার অনুকরণ ছাড়াও আরও দু প্রকার অনুকরণের কথা উল্লেখ করেছেন—এর মধ্যে প্রথমটি হল এমন এক ধরনের অনুকরণ যা ভাবজ অনুকরণ এবং সচেতন অনুকরণের মধ্যবর্তী। কেউ কেউ একে বলেছেন '*Image Imitation*' এবং আর এক ধরনের অনুকরণ আছে যাকে অর্থহীন অনুকরণ বা '*Meaningless Imitation*' বলা হয়।

এই দুই ধরনের অনুকরণের মধ্যে প্রথমটি দেখা যায় যখন শিশুরা যে আদর্শকে অনুকরণ করেছে সে সম্পর্কে সচেতন না হয়ে অনুকরণ করে যায়। তখন এই অনুকরণ সচেতন অনুকরণ ও ভাবজ অনুকরণের মধ্যবর্তী। অনেক সময় কোন শিশু কোন শিক্ষকের মুখের ভাবভঙ্গীর অনুকরণ করে। কিন্তু সেই শিক্ষককে আদর্শ মনে করার জন্যই যে সে অজ্ঞাতসারে তাঁকে অনুকরণ করে চলেছে, এ সম্পর্কে সে স্পষ্টভাবে সচেতন থাকে না।

**সচেতন ও ভাবজ অনুকরণের মধ্যবর্তী অনুকরণ**

অর্থহীন অনুকরণ খুব ছোট ছোট শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই ধরনের অনুকরণ সচেতন নয়, যেহেতু কোন আদর্শকে নকল করার তাৎপর্য সম্পর্কে এ বয়সে সে কিছুতেই অবহিত থাকতে পারে না বা একে ভাবজও বলা যায় না। কারণ কোন ভাবকে সচেতনভাবে কর্মে পরিণত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অর্থহীন অনুকরণ

(iii) মনোবিজ্ঞানী কার্কপ্যাট্রিক (*Kirkpatrick*) তাঁর 'Fundamentals of the Child Psychology' গ্রন্থে ক্রমবিকাশের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অনুকরণকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন :

কার্কপ্যাট্রিকের শ্রেণীবিভাগ

(ক) **যান্ত্রিক অনুকরণ** (Reflex Imitation) : এই ধরনের অনুকরণ হল বিশেষভাবে সংবেদী এবং এই ধরনের অনুকরণপ্রবণতা শিশুর জন্মাবার এক বছর পর্যন্ত তার মধ্যে বর্তমান থাকে। শিশু অপরের হাসি-কান্না অনুকরণ করে, অপরকে হাই তুলতে দেখলে হাই তোলে। এক বছর পরে এই ধরনের অনুকরণ অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে গেলেও সারা জীবন ধরে চলতে থাকে। এই কারণেই অপরকে ভাল বা খারাপ মেজাজে থাকতে দেখলে আমাদের মেজাজও সেরকম হয়ে যায়। অপরকে ভদ্র বা নম্র ব্যবহার করতে দেখলে আমরাও অনুরূপ ব্যবহার করি।

যান্ত্রিক অনুকরণ

(খ) **স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণ** (Spontaneous Imitation): যখন শিশু বিনা উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার পরিবেশের সব কিছুকেই অনুকরণ করে চলে তখন এই ধরনের অনুকরণ দেখা দেয়। রেলের এঞ্জিনের বাঁশির শব্দ শুনে তার অনুকরণে মুখে ঐরূপ শব্দ করা, বা জাহাজের ভোঁ শব্দ শুনে তার অনুকরণ করা, বা পাখীর ডাক শুনে তার অনুকরণ করা, সবই এই জাতীয় অনুকরণের অন্তর্ভুক্ত। শিশুর মধ্যে তিন থেকে চার বছর বয়স পর্যন্ত এই ধরনের অনুকরণস্পৃহা বর্তমান থাকে।

স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণ

প্রথম বছরের শেষাংশ থেকেই এই ধরনের অনুকরণ খুব উল্লেখযোগ্যভাবে শিশুর মধ্যে প্রকাশিত হয়। অনেক সময় যান্ত্রিক অনুকরণ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এই ধরনের অনুকরণ বিশ্লেষাত্মক বা সংশ্লেষাত্মক নয়। এ হল সব সময় সামগ্রিকভাবে কোন কিছু অনুকরণ করা। এই ধরনের অনুকরণের মাধ্যমে শিশু তার চারপাশের পরিবেশকে নিজের করে নেয়। যা শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে না, তাকে সে অনুকরণও করে না।

(গ) **নাটকীয় অনুকরণ** (Dramatic Imitation) : অনুকরণের এই স্তরে লক্ষ্য করা যায়, শিশু যা কিছু দেখে, শোনে, সবই সে অনুকরণ করে, তবে যেমনটি দেখে শোনে ঠিক তেমনটি নয়, কল্পনায় তাকে নতুন করে সাজিয়ে নেয়। অনুকরণ করার সময় শিশু নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে। সে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে তার কাল্পনিক অনুকরণের উপাদান সংগ্রহ করে। ছোট মেয়েরা অপরের সংসার করা দেখে নিজের পুতুলদের নিয়ে নতুন ঘর-সংসার সাজায়, পুতুলের বিয়ে দেয়। আবার ছেলেরা যুদ্ধের গল্প শুনে নকল যুদ্ধের অভিনয় করে। প্রায় তিন বছর বয়স থেকেই এই ধরনের অনুকরণ শিশুর মধ্যে দেখা দেয় এবং প্রায় সারা জীবন ধরেই চলতে থাকে। তবে চার থেকে সাত বছর বয়সে এই ধরনের অনুকরণ তার পূর্ণরূপে নিজেকে প্রকাশ করে।

নাটকীয় অনুকরণ

(ঘ) **ঐচ্ছিক অনুকরণ** (Voluntary Imitation) : সচেতন অনুকরণ আর ঐচ্ছিক অনুকরণ, একই প্রকার অনুকরণ। এই ধরনের অনুকরণের মূলে থাকে শিশুর কোন উদ্দেশ্যসাধনের ইচ্ছা।

এই ধরনের অনুকরণ কম-বেশী বিশ্লেষাত্মক ও সংশ্লেষাত্মক। লেখা, বাক্য-রচনা করা, শব্দ উচ্চারণ করা, ছবি আঁকা প্রভৃতি ঐচ্ছিক অনুকরণের দৃষ্টান্ত। স্মৃতি প্রতিরূপও (memory image) এই ধরনের অনুকরণ প্রক্রিয়াকে চালিত করে। শিশুর দুই কি তিন বছর বয়স থেকে এই ধরনের অনুকরণ শুরু হলেও এর পরিণত রূপ দেখা দেয় আরও বেশ কয়েক বছর পরে। কিভাবে অনুকরণ করা হচ্ছে, অর্থাৎ অনুকরণ পদ্ধতির উপরই এই ধরনের অনুকরণের সফলতা নির্ভর করে।

(ঙ) **আদর্শের অনুকরণ** ( Idealistic Imitation) : শিশুর অনুকরণ-প্রবণতার ক্রমবিকাশের সর্বশেষ স্তর হল এটি। এই স্তরে শিশু সেই রকম কোন আদর্শকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে, যে আদর্শকে শিশু যুক্তিযুক্ত বা অনুকরণের যোগ্য মনে করে। যে কোন ধারণাই (concept) আদর্শের কাজ করতে পারে। ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও সৌন্দর্য সম্পর্কীয় আদর্শের যে প্রকাশ বাস্তবে ঘটে, তার থেকেই শিশু তার আদর্শের ধারণা গঠন করে এবং তাকে অনুকরণ করার জন্য সচেষ্ট হয়। যেমন, কোন শিশু কোন ব্যক্তির জীবনকে আদর্শস্থানীয় মনে করে তার অনুকরণ করার চেষ্টা করতে পারে, কোন ছাত্রের শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিকে আদর্শ-

আদর্শের অনুকরণ

স্থানীয় মনে করে তার অনুকরণে সচেষ্ট হতে পারে। শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা তার মধ্যে আসে, তখনই এই ধরনের অনুকরণের নানাবিধ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

খুব ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অনুকরণ স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত। একটু বয়স্ক শিশুদের অনুকরণ হওয়া উচিত ঐচ্ছিক বা সচেতন, এবং বয়স বৃদ্ধি পেলে শিশুদের ক্ষেত্রে অনুকরণ হবে বিশ্লেষাত্মক বা নির্দিষ্ট পথে নিয়মানুযায়ী সচেতনধর্মী।

মনোবিজ্ঞানী স্টাউট (*Stout*) দুই ধরনের অনুকরণের কথা বলেছেন—**(ক) প্রক্ষেপক অনুকরণ** (Projective Imitation) এবং **(খ) নিক্ষেপক অনুকরণ** (Ejective Imitation)।

**প্রক্ষেপক ও নিক্ষেপক অনুকরণ**

প্রথম ধরনের অনুকরণের ক্ষেত্রে অনুকরণকারী তার আদর্শের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় ধরনের অনুকরণের বেলায় অনুকরণকারীর মনে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগে। প্রথম ধরনের অনুকরণের বেলায় অনুকরণ ততখানি সঠিক হয় না। অনুকরণকারী উপলব্ধি করে যে, সঠিক অনুকরণ করার ক্ষমতা তার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের অনুকরণের বেলায় অনুকরণকারী যাকে অনুকরণ করতে চায় তাকে সফলভাবে অনুকরণ করতে পারে। এই অনুকরণের বেলায় অনুকরণকারী অপরের মধ্যে নিজের অভিজ্ঞতাগুলিকে আরোপ করে; তাকে অনুকরণ করার ক্ষমতা অনুকরণকারীর নেই, একথা সে কখনও ভাবে না। প্রক্ষেপক অনুকরণের বেলায় অনুকরণকারী গ্রহণক্ষম, অনুগত এবং বিনীত: কিন্তু নিক্ষেপক অনুকরণের বেলায় অনুকরণকারীর মধ্যে আক্রমণাত্মক, দাম্ভিক এবং আত্মপরিতুষ্টির ভাব বর্তমান থাকে। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই দ্বিতীয় ধরনের অনুকরণ-স্পৃহা তার মধ্যে বাড়তে থাকে। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভীতির ভাব থেকে নিজেদের তাদের সমতুল্য মনে করার ইচ্ছা জাগে। অবশ্য বয়স্ক শিশুদের বেলায় এই অনুকরণ-প্রবণতা দেখা দেয়, খুব ছোট ছোট শিশুদের বেলায় এ রকম অনুকরণ পরিলক্ষিত হয় না।

মনোবিজ্ঞানী বোরিং (*Boring*) শিক্ষণের দিক থেকে তিন ধরনের অনুকরণের কথা উল্লেখ করেছেন—(১) **সরল অনুকরণ** (Simple Imitation), (২) **পরস্পর নির্ভরশীল আচরণ** বা **অনুকরণ** (Matched dependent Behaviour) এবং (৩) **নকল অনুকরণ** (Copying Imitat'on)।

শিশু ভাষা আয়ত্ত করতে গিয়ে যে অনুকরণের আশ্রয় গ্রহণ করে তা হল সরল অনুকরণ। পরস্পর নির্ভরশীল অনুকরণের উদ্ভব ঘটে থাকে আকস্মিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া থেকে। সিঁড়িতে বাবার পায়ের শব্দ শুনেই তারক দৌড়তে শুরু করে, কারণ, সে জানে বাবা টফি নিয়ে এসেছে। তারককে দৌড়তে দেখে তিতুও তার অনুকরণ করে, ফলে তার ভাগ্যেও টফি জোটে। পরবর্তীকালে যখনই তারককে দৌড়তে দেখে, তিতু তার অনুকরণ করে, যদিও কেন দৌড়োচ্ছে তার সঠিক উদ্দেশ্য তার জানা নেই।

**সরল অনুকরণ, পরস্পর নির্ভরশীল অনুকরণ ও নকল অনুকরণ**

নকলের বেলায় কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার পর তার মাধ্যমে কোন কিছু অনুকরণ করে, কিন্তু কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তার অনুকরণ সঠিক হচ্ছে বা হচ্ছে না তা সে জানে না। তাই এই ধরনের অনুকরণের ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থেকে তার অনুকরণের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে অন্য ব্যক্তির মধ্যস্থতা ছাড়াও যাতে সে অনুকরণ করতে পারে তার জন্য তাকে সহায়তা করা প্রয়োজন। যেমন, কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার পরে, কখন অনুষ্ঠানে দাঁড়াতে হবে, বা বসতে হবে কোন ব্যক্তির জানা না থাকলে সে অপর ব্যক্তিদের আচরণ নকল করে, তাদের দেখাদেখি দাঁড়ায় বা বসে। বিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে অবশ্য পরে অনুকরণকারী যথাযথ প্রতিক্রিয়া করতে শিক্ষা করে।

## শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণের গুরুত্ব (Importance of Imitation in Education) :

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে যাকে কোন মতেই উপেক্ষা করা চলে না। যুবক, বৃদ্ধ মাত্রই অনুকরণের মাধ্যমে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করে। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মনের ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে শিশু অনুকরণের মাধ্যমে সব কিছুই শেখে। সচেতন বা অনৈচ্ছিক অনুকরণের (spontaneous or unconscious imitation) সহায়তায় শিশু অনেক বিষয় শিক্ষা করে। শিশুর জীবনে অচেতন বা স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণের গুরুত্ব সচেতন অনুকরণের তুলনায় অনেক বেশী, কেননা, সচেতন অনুকরণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং এই অনুকরণ শিশু করে একটু বেশি বয়সে। তাই

**শিক্ষার ক্ষেত্রে অচেতন অনুকরণের গুরুত্ব**

শিক্ষকের উচিত হবে খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া। মাডাম মন্টেসরী (*Madam Montessori*) তাঁর শিক্ষা-সম্পর্কীয় পরিকল্পনায় এই ধরনের অনুকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শিশুকে যদি সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশে রাখা হয় তাহলে শিশু তার পরিবেশের ভাল জিনিসগুলি অনুকরণ করবে এবং তার চরিত্রও সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে; কিন্তু যদি শিশুকে নোংরা, কদর্য পরিবেশে রাখা হয় তাহলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অসামাজিক আচার-আচরণ অনুকরণ করে নিজের চরিত্রকে কলুষিত করবে। বেশ সুন্দর ভদ্র পরিবারের শিশুরা আচার-ব্যবহারে ভদ্র, শিষ্ট ও নম্র হয়। তার কারণ পারিবারিক পরিবেশ তাদের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শিশু পারিবারিক পরিবেশ থেকে যা কিছু ভাল ও সুন্দর তার অনুকরণ করে ভদ্র, শিষ্ট, নম্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বভাববিশিষ্ট ও অনুগত হয়। এই কারণেই পরিবার ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ খুব সুন্দর হওয়া দরকার যাতে শিশু সচেতন ভাবে সৎ জিনিসগুলি অনুকরণ করে নিজের জীবনকে সৎ পথে চালিত করতে পারে। শিশুর অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও কর্তব্য শিশুর সামনে সৎ আদর্শ, সৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা ও যথাযথ আচরণ করা যেগুলিকে শিশু সহজেই অনুকরণ করে নিজের চরিত্র গঠনে প্রয়াসী হবে।

**শিশুর উপর সুন্দর পরিবেশের প্রভাব**

শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক বা সচেতন অনুকরণের (deliberate imitation) গুরুত্বও কম নয়। শিশু শিক্ষককে অনুকরণ করে শব্দের নির্ভুল উচ্চারণ করতে শেখে, হাতের লেখা সুন্দর করতে শেখে, সুন্দর করে আঁকতে শেখে, গান বাজনা, খেলাধূলার দক্ষতা অর্জন করতে শেখে বা অন্যান্য কৌশল আয়ত্ত করতে শেখে। ঐচ্ছিক বা সচেতন অনুকরণের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তার তুলনায় উন্নততর কোন ব্যক্তিকে অনুকরণ করে। কাজেই শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর সামনে নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং অনুকরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করতে পারেন তাহলে ছাত্ররা তাঁর সৎ গুণ ও আচার ব্যবহার অনুকরণে প্রয়াসী হবে।

**শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক অনুকরণের গুরুত্ব**

অনুকরণ-স্পৃহা আবিষ্কারের স্পৃহা জাগ্রত করে। অনুকরণের পথ ধরে অগ্রসর হতে হতেই শিক্ষার্থীর মনে জাগবে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা। এ ছাড়া অনুকরণ-প্রবণতা শিশুর মনে সমাজ-চেতনার সঞ্চার করে। সমাজের আচার ব্যবহার

**অনুকরণ আবিষ্কারের স্পৃহা জাগ্রত করে**

রীতি-নীতি, সং আদর্শ, সংস্কৃতি ইত্যাদি অনুকরণের মাধ্যমেই সংরক্ষিত হয়।

অতীতে শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর অনুকরণ-প্রবণতার উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত। কিন্তু শিক্ষা বলতে যদি অপরের নিছক অনুকরণ বোঝায় তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন গবেষণা ও সৃজনশীলতার পথ রুদ্ধ হবে। এ মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই কারণে অনেক শিক্ষাবিদ অনুকরণ-প্রবণতাকে হেয় চক্ষে দেখে থাকেন, যেহেতু এই প্রবণতা মৌলিকতা নষ্ট করে দেয়। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। সামাজিক প্রগতি একদিনে সংগঠিত হয় নি। মানুষ প্রথমে অতীতকে অনুকরণ করেছে, তারপর নতুনকে আবিষ্কার করেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এই সত্য অতি সহজেই প্রমাণিত হয়। কোন বৈজ্ঞানিক অতীতের সূত্র ধরে প্রথমে অগ্রসর হয়েছেন, তাদের ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন এবং তারপর নিজের পদ্ধতি অনুকরণ করে নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের উপাদান বাড়িয়ে গেছেন। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী রস[1] (*Ross*)-এর ভাষায় "কোন আইনস্টাইনকে যদি নিউটনের চিন্তার অগ্রগতিসাধন করতে হয় তাহলে প্রথমে তাকে তাঁর অনুকরণ করতে হবে"। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী রসের মতে ছাত্রদের ভাল জিনিস অনুকরণ করতে দেখার সময় আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু ছাত্ররা যাতে অনুকরণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে ধারণা না করে তার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তাঁর ভাষায়, 'Imitation is only the process to original self-expression অর্থাৎ, "অনুকরণ মৌলিক আত্মপ্রকাশের উপায় মাত্র"[2]। সৃষ্টিমূলক আত্মবিকাশের উপায়রূপেই অনুকরণকে গণ্য করতে হবে। অনেক মৌলিক চিন্তাবিদ ও প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁদের পূর্বসূরীদের অনুকরণ করে যে আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছেন, শিক্ষাবিদ নান্‌[3] (*Nunn*) তা স্বীকার করেছেন।

অনুকরণ মৌলিকতা নষ্ট করে না

---

1. "An Einstin must first imitate the thought of a Newton before he can advance upon it."—J. S. Ross: Groundwork of Educational Psychology. P. 253.

2. Ibid, P. 255.

3. "The most original minds find themselves only in playing the sedulous ape to others who have gone before them along the same path of the self sertion."—Nunn, Education: Its Data and First Principles, P, 141,

## ৫। ইতর প্রাণীর শিক্ষণ ও মানুষের শিক্ষণ (Animal Learning and Human Learning) :

মানুষ ও ইতর প্রাণীর শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ইতর প্রাণী যেমন প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে, মানুষও অনেক ক্ষেত্রে ঐরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করে শিক্ষা লাভ করে। আবার মানুষ যেমন সাধারণতঃ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমগ্র পরিস্থিতির সঙ্গে অংশবিশেষের সংযোগ উপলব্ধি করে, সমস্ত সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে অবধারণ করার পর কোন উদ্দীপকের উপর প্রতিক্রিয়া করে, সেরূপ মাঝে মাঝে মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও এইরূপ অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, মানুষ কিংবা ইতর জীব উভয়ের শিক্ষণের মূলেই আছে প্রেষণা। কোন প্রতিক্রিয়া করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, প্রেষণা সেই শক্তিকে শক্তিশালী করে এবং বিশেষ একটি উদ্দেশ্যের অভিমুখে চালিত করে। ইতর প্রাণীদের নিয়ে যেসব পরীক্ষণকার্য চালান হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, ইতর প্রাণী দ্রুতগতিতে এবং নিপুণতার সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে যদি শিক্ষার পেছনে থাকে শক্তিশালী প্রেষণা। অবশ্য ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে খাদ্য, জল, শাবক-রক্ষা, আত্মরক্ষা এবং সঙ্গমেচ্ছা হল সাধারণ প্রেষণা।

**মানুষ ও ইতর প্রাণীর শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য**

**মানুষের শিক্ষণের মূলে প্রেষণার গুরুত্ব**

মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মূলে এই প্রেষণার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের ক্ষেত্রে জৈবিক তাড়নার প্রেষণা আছে বটে ; কিন্তু কেবলমাত্র জৈবিক তাড়নার প্রেষণাই মানুষকে কার্য করায় না। মানুষের শিক্ষণ-পদ্ধতির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি প্রেষণার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

(i) **আকাঙ্ক্ষার স্তর (Level of Aspiration) :** অন্যান্য অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে শিক্ষণের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার উপর। এই আকাঙ্ক্ষা যতই উচ্চ হয়, প্রেষণাও ততই বলবতী হয়। আবার অতীত সফলতা ও বিফলতার অভিজ্ঞতাও মানুষের শিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, অতীতের সাফল্য ও বিফলতা সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই আকাঙ্ক্ষার স্তর নির্ধারণ করে।

(ii) **শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ (The Intention to learning) :** প্রেষণার শক্তি তীব্র হলেই চলবে না, শিক্ষণের আগ্রহ মানুষের শিক্ষণ-

প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং আগ্রহ না থাকলে শিক্ষণ সম্ভব নয়।

(iii) **প্রয়োগ-দৃষ্টিভঙ্গী** (Pragmatic outlook) : শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার বিষয়টিও প্রেষণার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ব্যবহারিক চাহিদা ও সমাধান করার প্রয়োগমূলক দিক শিক্ষণের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে।

## ৬। ইতর প্রাণীর শিক্ষণ ও মানুষের শিক্ষণের তুলনামূলক আলোচনা (Animal Learning and Human Learning—A comparison) :

ইতর প্রাণী ও মানুষের শিক্ষণের ক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষণকার্য চালিয়ে উভয়ের শিক্ষণের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

**ইতর প্রাণী ও মানুষের শিক্ষণের মধ্যে তারতম্য**

(১) মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই তারতম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হবার কারণ মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতাসম্পন্ন জীব। স্মৃতিতে অতীত বিষয়ের পুনরুজ্জীবন এবং তার পুনরুদ্রেক মানুষের শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে।

**মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়**

(২) মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ইতর জীব যে পরিমাণে, প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা করে, মানুষ সেই পরিমাণে এই পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করে না।

**মানুষের উচ্চতর স্মৃতিশক্তি শিক্ষণের সহায়ক**

(৩) মানুষের স্মৃতিশক্তি উচ্চস্তরের, সেহেতু মানুষ কোন সমস্যা সমাধানের জন্য অতীত অভিজ্ঞতার যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম। এর ফলে মানুষ কম শক্তি প্রয়োগ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে কোন পরিস্থিতিতে যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করতে সমর্থ হয়। এর ফলে তার মূল্যবান সময় ও শক্তিকে অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

**উচ্চতর চিন্তনশক্তি**

(৪) মানুষ উচ্চতর চিন্তনশক্তির অধিকারী। অমূর্ত বিষয়ের চিন্তন, সম্বন্ধ-ঘটিত চিন্তন, পৃথকীকরণ, সামান্যীকরণ, অবরোহমূলক ও আরোহমূলক যুক্তিপদ্ধতি গঠন মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে। প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা গঠনের ক্ষমতা, ভবিষ্যৎদৃষ্টি এবং গঠনমূলক কল্পনাশক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য ইতর জীবের তুলনায় মানুষের শিক্ষাকার্য অনেক সহজে সম্পন্ন হয়।

(৫) মানুষ ইতর জীবের তুলনায় অনুকরণের সাহায্যে অধিকতর শিক্ষা লাভে সমর্থ। কোন কোন উচ্চতর ইতর জীব অনুকরণশক্তির অধিকারী, কিন্তু মানুষের অনুকরণশক্তির তুলনায় সে শক্তি একান্তই সীমাবদ্ধ।

অনুকরণের সাহায্যে শিক্ষা

(৬) ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতাও মানুষকে দ্রুত বিষয় আয়ত্ত করতে সহায়তা করে। মানুষ অপরের অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠ করেও নানা বিষয় শিক্ষা লাভ করে।

ভাষা ব্যবহারে ক্ষমতা

(৭) ইতর প্রাণীকে নিয়ে পরীক্ষণ চালাতে গিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের ক্ষেত্রে জৈবিক প্রেষণাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। মানুষ ইতর প্রাণীর তুলনায় তার প্রেষণাগুলিকে আরও ভালভাবে সংগঠিত করতে পারে।

জৈবিক প্রেষণার ইচ্ছানুরূপ নিয়ন্ত্রণ

(৮) মনোবিজ্ঞানী উডওয়ার্থ (*Woodworth*) ইতর প্রাণীর শিক্ষণের তুলনায় মানুষের শিক্ষণের উৎকর্ষ নির্ধারণপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানুষ উচ্চতর পর্যবেক্ষণ-শক্তির অধিকারী, সে কারণে মানুষ তার পরিবেশ, অন্যান্য ব্যক্তি, বিষয় ও ঘটনার এমন অনেক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয় যা ইতর জীবের পক্ষে সম্ভব নয়।

উডওয়ার্থ-এর অভিমত

**ইতর প্রাণীরা কি অনুকরণের মাধ্যমে শেখে বা অনুকরণ করতে পারে?**

আমরা সাধারণতঃ ধারণা করি যে, ইতর প্রাণীরা অনুকরণ করতে পারে এবং অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা করতে পারে। থর্নডাইক ইতর প্রাণীর উপর এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অপরকে দেখে শেখার সামর্থ্য ইতর প্রাণীদের নেই। যে বেড়াল ধাঁধা-বাক্স (puzzle box) থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল শিক্ষা করে নি, তাকে যখন অপর একটা বেড়াল, যাকে কৌশল আয়ত্ত করতে শেখান হয়েছে, তার আচরণ দেখান হল, তখন দেখা গেল প্রথম বেড়ালটির আচরণে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। কুকুর এবং মোরগছানা নিয়ে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে থর্নডাইক অনুরূপ

ইতর প্রাণী মধ্যে বানরেরাই অনুকরণ ক্ষমতার পরিচয় দেয়

(1) বিস্তারিত আলোচনার জন্য **H E. Garret** এর **Great Experiments in Psychology. PP. 46—63** দ্রষ্টব্য।

ফল লাভ করেছেন। তবে থর্নডাইক স্বীকার করেছেন যে, বানরেরা স্বভাবতই সক্রিয়, কৌতূহলী এবং মানুষের মতনই গতিসম্পন্ন। সে কারণে তারা এমন অনেক কিছু করে যা মানুষের আচরণের তুল্য। বানরদের উপরে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে, বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় বানররা যথেষ্ট অনুকরণ-প্রবণতার পরিচয় দিতে পারে; তবে অনুকরণের যথেষ্ট সুযোগ বানরকে দেওয়া প্রয়োজন।

## ইতর প্রাণীরা কি অন্তর্দৃষ্টির বা সমগ্রদৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষা করে?

থর্নডাইক ও আচরণবাদীদের অভিজ্ঞতানুযায়ী ইতর প্রাণীরা প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষা করে, অন্তর্দৃষ্টি বা সমগ্রদৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষা করে না। থর্নডাইকের ও আচরণবাদীদের অভিমতের তীব্র সমালোচনা করেছেন কোয়লার ও কফকা প্রমুখ গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা। শিম্পাঞ্জিকে নিয়ে যে পরীক্ষণকার্য চালান হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, সমস্যার মধ্যে সে সম্বন্ধ নিরূপণ করার বিষয় রয়েছে তাকে শিম্পাঞ্জি অন্তর্দৃষ্টি বা সমগ্রদৃষ্টির সাহায্যে আকস্মিকভাবে জেনে নিয়েছে। থর্নডাইকের মতে যেসব দ্রুত শিক্ষণের ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় সেসব হল এমন সমস্যা যেগুলি খুবই সরল, স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। কিন্তু জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে ইতর প্রাণীদের মধ্যে এরূপ কোন অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। কফকা (*Koffka*) তার উত্তরে বলেন যে, যেকোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেই ইতর প্রাণীদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির বা সমগ্রদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। মাইয়ারের (*Maier*)-এর মতে সমস্যা-সমাধানের জন্য দুটি বিষয় প্রয়োজন—(১) নির্বাচন (selection), যা অতীত অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি এবং (২) পথ বা গতি রেখা (direction)—এ হল সমস্যাটিকে সমাধান করার জন্য এক সামগ্রিক পরিকল্পনা। ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই শেষেরটিরই অভাব দেখা যায়।

ইতর প্রাণী কোন সামগ্রিক পরিকল্পনার সাহায্যে সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় না

## ইতর প্রাণীরা কি সমস্যা-সমাধানের জন্য চিন্তা বা বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করে?

থর্নডাইক ইতর প্রাণীদের উপরে পরীক্ষা-কার্য চালাবার সময় এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পান নি, যে ক্ষেত্রে কোন ইতর প্রাণী চিন্তা করে কোন সমস্যার সমাধান নিরূপণ করেছে—অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ সুস্পষ্ট ভাবে পর্যবেক্ষণ করা, ধারণা প্রয়োগ করা, অনুমান করা বা পারস্পরিক তুলনা

করা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সহায়তায় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। পরীক্ষক বানরের উপরে একটা বিশেষ পরীক্ষণকার্য চালান ; তিনি খাবার নিয়ে বানরের খাঁচার কাছে যেতেন। তিনি যখন বাঁ হাত দিয়ে খাবার তুলতেন তখন বানরটি খেতে পেত, আর যখন ডান দিয়ে খাবার তুলতেন তখন বানরটি খেতে পেত না। কখন খাবার দেওয়া হবে, কখন হবে না, এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালাতে গিয়ে থর্নডাইক বহু দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করার পরে দেখলেন যে, বানর চটপট সম্বন্ধ নিরূপণ করতে পারছে, কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে আবার পারছে না। এ পরীক্ষণ থেকে থর্নডাইক সিদ্ধান্ত করলেন যে, ভবিষ্যৎ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা সমস্যাটি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারে না।

কিন্তু কিছু পরবর্তীকালে আরও পরীক্ষণকার্য চালাবার ফলে দেখা গেছে যে, বানর বা অন্যান্য ইতর প্রাণী বিচারশক্তির দ্বারা সমস্যা সমাধান করে না, একথা সত্য নয়। যদি বিচারশক্তি বলতে প্রতীক অর্থাৎ ভাষা বা অঙ্কের চিহ্ন ব্যবহার করা বোঝায় তাহলে ইতর প্রাণীরা বিচারশক্তির ব্যবহার করে না, বা ব্যবহার করে কিনা তা প্রমাণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। আর বিচারশক্তি বলতে যদি অতীতে বিভিন্ন অবস্থায় অর্জিত অভ্যাসগুলিকে একত্র করে একটি কার্যে পরিণত করাকে বোঝায় তাহলে ইতর প্রাণীরা বিচারশক্তির সাহায্যে সমস্যা সমাধান করে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

**বিচারশক্তি বলতে যদি অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান বোঝায় তাহলে ইতর প্রাণীর মধ্যে সে শক্তি আছে**

## ৭। শিক্ষণ ও প্রেষণা (Learning and Motivation) :

প্রেষণা কাকে বলে? উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হলে যে সক্রিয় বা গতিশীল অবস্থায় (dynamic state) সৃষ্টি হয় তাকে প্রেষণা (Motivation) বলে। এই অবস্থায় উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য মনে তীব্র অনুরাগ, আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছার উদয় হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই জাতীয় অবস্থা চলতে থাকে। ম্যাকগগ (*McGoech*) প্রেষণার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "প্রেষণা হল ব্যক্তির যে কোন অবস্থা যা তাকে একটি প্রদত্ত কাজের অনুশীলন জন্য নির্দেশ দেয় এবং যা তার কর্মতৎপরতার প্রাচুর্য ও কাজের পরিসমাপ্তি নিরূপণ করে।"[1]

**প্রেষণার স্বরূপ**

---

1. "Any condition of individual which points or orien's him towards the practice of a given task and which defines the adequancy activities and the completion of the task."

—J. A. McGoch : The Psychology of Human Learning, Page 27.

প্রেষণা শিক্ষার এক অতি আবশ্যকীয় শর্ত। শিক্ষণকে বর্তমানে সক্রিয় প্রক্রিয়ারূপেই গণ্য করা হয়। শিক্ষণ নিষ্ক্রিয় জ্ঞান সঞ্চয়ন নয় বা বিষয়ের যথাযথ পুনরুল্লেখের জন্য কোন বই পড়া বা বক্তৃতা শোনা নয়। যথার্থ শিক্ষণ হল অভিজ্ঞতার পরিপুষ্টিসাধন। শিক্ষণ হল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবের আচরণে পরিবর্তন আনা। শিক্ষণের ক্ষেত্রে জীবদেহের সঙ্গে বাহ্য-পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জীবদেহ বাহ্য-পরিবেশের দ্বারা উদ্দীপিত হয় এবং বাহ্য-পরিবেশের উদ্দেশ্যে জীবদেহ প্রতিক্রিয়া করে। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মাধ্যমে যখন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রূপান্তর ঘটে তখনই শিক্ষণ ঘটে। শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার তিনটি শর্ত বা উপাদান আছে ; (১) মনস্তাত্ত্বিক উপাদান(Psychological factor), (২) দৈহিক উপাদান (Physiological factor) এবং (৩) পরিবেশগত উপাদান (Environmental factor)। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানই হল প্রেষণা। প্রেষণা হল শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কেন্দ্র-স্বরূপ (Motivation is the very heart of the learning process)। শিক্ষণের জন্য যে সক্রিয়তার প্রয়োজন প্রেষণা তাকে জাগরিত করে, এই সক্রিয়তাকে শিক্ষণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষিত করে এবং তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত করে। উপযুক্ত প্রেষণা শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, তার মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং পরিশ্রম করার জন্য তাকে উৎসাহিত করে।

শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার তিনটি শর্ত—(১) মনস্তাত্ত্বিক (২) দৈহিক (৩) পরিবেশগত

যে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ নেই তার মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করা, বা আগ্রহ থাকলেও যেখানে অনুভূতি অত্যন্ত ক্ষীণ, সেক্ষেত্রে তাকে তীব্র করে তোলা বা যেখানে আগ্রহ রয়েছে, তার যথাযথ অনুশীলনে সহায়তা করাই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা। মানুষের প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য হল কোন লক্ষ্যসাধন করা। মানুষের প্রতি কাজেই প্রেষণার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সব শিক্ষারই উদ্দেশ্য কোন লক্ষ্য সাধন করা, যেহেতু সব শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রেষণার আবশ্যকতা রয়েছে। কাজেই যে কোন শিক্ষণের ক্ষেত্রে যাতে যথোপযুক্ত প্রেষণা উপস্থিত থাকে তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। কারণ, প্রেষণার তীব্রতা, লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্টতা প্রভৃতির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভেদ আনয়ন করে। শিক্ষকের

প্রেষণা শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করে

কাজই হল কার্যকর বা সার্থক শিক্ষণের শর্তগুলির উন্নয়ন সাধন করা। প্রেষণার সাহায্যেই সে কাজ সাধিত হতে পারে।

শিক্ষণের জন্য প্রেষণা ছাড়াও আরও একটি বিষয়ের প্রয়োজন, সেটি হল প্ররোচক (incentive)। প্রেষণা ও প্ররোচক সমার্থক শব্দ নয়। প্ররোচক হল বস্তু বা অবস্থা যার সংস্পর্শে প্রেষণা কার্যকর হয়। উডওয়ার্থের মতে উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তির মধ্যে আর প্ররোচক থাকে বাইরে। প্ররোচক হল লক্ষ্যবস্তু (goal-object), যেটি উদ্দেশ্যের উপরে প্রভাব বিস্তার করে উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত করে। প্ররোচক লক্ষ্য নয়। তবে প্ররোচক লক্ষ্যে উপনীত হবার আগ্রহ বৃদ্ধি করে। যেমন—কোন খেলাধূলা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হল প্ররোচক। কিন্তু উদ্দেশ্য হতে পারে শুধু মাত্র জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা। যথাযথ শিক্ষণের জন্য প্রেষণা ও প্ররোচক উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

**প্রেষণা ও প্ররোচকের মধ্যে প্রভেদ**

প্রেষণা দুপ্রকারের হতে পারে—(১) আভ্যন্তরীণ (intrinsic) এবং (২) বাহ্যিক (extrinsic)। শিক্ষণের বিষয় যখন শিক্ষার্থীর কাছে অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সেটি শিক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থী যে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ অনুভব করে তাকেই বলা হয় আভ্যন্তরীণ প্রেষণা। শিক্ষণই শিক্ষণের একমাত্র পুরস্কার—এই বোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগে। শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যেই আগ্রহ নিহিত থাকে যা শিক্ষার্থীকে তার কাজের সঙ্গে একাত্ম করে তুলে। প্রেষণার এই দিকটি জাগিয়ে তোলার জন্য শিক্ষকের উচিত বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর কাছে অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা পাঠ্যবিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং লক্ষ্য রাখা যাতে শিক্ষণের বিষয়টি শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও ক্ষমতার বাইরে চলে না যায়। শিক্ষার্থীর মধ্যে এই আভ্যন্তরীণ প্রেষণা সৃষ্টি করাই শিক্ষকের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই আভ্যন্তরীণ প্রেষণা জাগ্রত হলে শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিক্ষণের পথে অগ্রসর হতে থাকবে, স্বয়ং শিক্ষণের (self-learning) দিকে শিক্ষার্থীর প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষার্থী শিক্ষায় মনোনিবেশ করবে।

**প্রেষণা দু প্রকার—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক**

যখন শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষণের জন্য এই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ এবং আনন্দ বর্তমান থাকবে না, তখন বাহ্য-প্রেষণার (external motivation) সহায়তায় শিক্ষণকার্যকে চালিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি বুদ্ধিগত অপরিপক্কতা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ

**বাহ্য-প্রেষণা**

সম্পর্কে চেতনার অভাব দেখা দেয় তাহলে আভ্যন্তরীণ প্রেষণা কার্যকর হবে না। তখনই প্রয়োজন বাহ্যিক প্রেষণার। এটাকে বাহ্যিক বলার কারণ, এটি শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে না। বাহ্য-প্ররোচকের সহায়তায় তার মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করতে হয় যাতে শিক্ষণীয় বিষয়টির প্রতি তার আগ্রহ জাগে। বাহ্যিক প্রেষণা কৃত্রিম, এরূপ ধারণা করলে ভুল করা হবে। শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রবণতা বা প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই একে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীর প্রকৃতি বা স্বভাবের মধ্যে একে প্রবিষ্ট করিয়েই একে কার্যকর করে তোলা যেতে পারে। যেসব বাহ্য-প্ররোচকের সহায়তায় শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করা হয় তার মধ্যে যেগুলি সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ তার উল্লেখ নিম্নে করা হচ্ছে ঃ

**(ক) প্রশংসা (Praise) ঃ** জীবনের সর্বস্তরে প্রশংসা বেশ ভালরকম প্ররোচকের কাজ করে। তবে প্রশংসা যখন শিক্ষার্থীর যথার্থ প্রাপ্য, তখন তাকে প্রশংসা করতে হবে। যারা প্রশংসা করেছেন তাঁদের উপরেই এর কার্যকারিতা নির্ভর করে। শিক্ষার্থীরা যাঁদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, প্রশংসা যদি তাঁদের কাছ থেকেই আসে তাহলে তা প্ররোচক হিসেবে ফলপ্রসূ হয়। এ সম্পর্কে পরীক্ষণ-কার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে, সাধারণ মানের বা নিম্নমানের শিশুদের ক্ষেত্রেই এটি কার্যকর হয়, কিন্তু উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের বেলায় এটি খুব ফলপ্রদ হয় না। ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের উপরে প্রশংসা বা ভর্ৎসনা কিভাবে কাজ করে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই একে প্ররোচক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। যাদের শক্তি বা সামর্থ্য কম তাদের সামান্যতম কৃতিত্বের জন্যও প্রশংসা করতে হবে। কিন্তু যাদের সামর্থ্য ও শক্তি বেশি তাদের দুরূহ কষ্ট সম্পাদনের জন্যই প্রশংসা করতে হবে।

প্রশংসা

**(খ) নিন্দা (Blame) ঃ** অনেক ক্ষেত্রে নিন্দা বেশ কার্যকর প্ররোচক। অবশ্য প্রশংসার মতো নিন্দাও তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন তা শিক্ষার্থীর যথার্থ প্রাপ্য। চটপট যারা শিখতে পারে না বা যাদের মেধা খুব তীক্ষ্ণ নয়, তাদের ক্ষেত্রে নিন্দা ততখানি কার্যকর হয় না ; হয়ত এই কারণেই যে প্রায় সব সময়ই তারা তাদের হতাশজনক কার্যের জন্য নিন্দিত হচ্ছে। কিন্তু মেধাবী ছাত্রদের ক্ষেত্রে নিন্দা বেশ কার্যকর প্ররোচক। আবার নিন্দার প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। যারা অন্তর্মুখী (introvert) তাদের ক্ষেত্রে প্রশংসা বেশী কার্যকর হয় আর যারা বহির্মুখী (extrovert) তাদের ক্ষেত্রে নিন্দা বেশী কার্যকর হয়। কাজেই নিন্দা করার পূর্বে শিক্ষকের উচিত হবে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি কিরূপ তা নিরূপণ করা।

নিন্দা

(গ) **পুরস্কার (Reward) :** পুরস্কার এবং শাস্তি, প্রশংসা ও নিন্দারই মূর্ত রূপ এবং প্রেষণা সৃষ্টি করার জন্য প্ররোচক হিসেবে এগুলি খুব বাঞ্ছিত নয়।

পুরস্কার দুরকমের হতে পারে। কোন প্রতীক বা চিহ্ন। যেমন, মেডেল, কাপ, ব্যাজ প্রভৃতি। এগুলি কৃতিত্ব ও সম্মানলাভের পরিচায়ক। পুরস্কার নিছক জড় বস্তুও হতে পারে—যেমন অর্থ। যদিও পুরস্কার অনেক ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্ররোচকের কাজ করে তবু শিক্ষাবিদরা পুরস্কারের সহায়তায় প্রেষণা সৃষ্টি করার পক্ষপাতী নন। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, পুরস্কার পাবার পর পূর্বের কর্ম-প্রেরণা আর শিক্ষার্থীর মধ্যে তেমন দেখা যায় না। সে কারণে পুরস্কার দেওয়া হলেও শিক্ষকের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীকে তার অধিকতর উপযুক্ততা ও জ্ঞানের কথা এবং তার বর্ধিত সামাজিক মর্যাদার কথা মনে করিয়ে দেওয়া, যার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। পুরস্কারের সাহায্যে প্রেষণা সৃষ্টি করার মধ্যে বিপদও আছে। *Hart-shorne* এবং *May* বিদ্যালয়ের শিশুদের সাধুতা সম্পর্কে একটি পরীক্ষণ-কার্য চালিয়ে দেখলেন যে, একদল শিশু যাদের পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে সাধু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করা হয়েছিল তারা সাধারণ শিশুদের তুলনায় অনেক বেশী অসাধু। পুরস্কারের প্রেষণা তাদের মধ্যে এত প্রবল হয়েছিল যে সাধুতার পুরস্কার লাভ করার জন্য তারা অসাধু উপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা বোধ করে নি।

পুরস্কার

(ঘ) **শাস্তি (Punishment) :** কোন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ আচরণে পরিবর্তন আনার জন্য তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়াই হল শাস্তি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগ করার প্রথা খুবই প্রাচীন। শারীরিক কষ্টের ও মর্যাদাহানির ভীতির উপরেই এর ভিত্তি। ভীতি হল খুব শক্তিশালী প্রেষণা, সে কারণে শাস্তি-প্রয়োগে অনেক সময় শিক্ষার্থীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কঠোর শাস্তি বা সামান্য কারণে শাস্তি-প্রদান অনেক সময় শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিহিংসা, ক্রোধ ও শত্রুতার ভাব সঞ্চার করে এবং শিক্ষণীয় বিষয়কে এড়িয়ে চলার প্রবণতা দেখা দেয়। তাছাড়া, ভীতির ভাব কেটে গেলে শাস্তি তার বাঞ্ছিত ফলদানে ব্যর্থ হয়।

শাস্তি

(ঙ) **যোগ্যতা অনুসারে বিন্যাসকরণ ও নম্বর-প্রদান (Garde and Mark) :** অনেক শিক্ষাবিদ যোগ্যতার ক্রমানুসারে শিক্ষার্থীর নাম সাজাবার ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন না, যেহেতু এ ব্যবস্থা পুরস্কার দেওয়া

ব্যবস্থারই অনুরূপ। কিন্তু বিচক্ষণতার সঙ্গে যদি এই কার্য সমাধা করা হয় তাহলে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণার সঞ্চার করা যেতে পারে। একই নীতির ভিত্তিতে যদি শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার ক্রমানুসারে সাজান হয় তাহলে কয়েকজন শিক্ষার্থী অতি সহজেই অপর শিক্ষার্থীর তুলনায় নিজেদের যোগ্যতর প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবে, ফলে তাদের অভ্যাস ও আচরণের মধ্যে কৃত্রিমতার আবির্ভাব ঘটতে পারে। অপরদিকে কোন কোন শিক্ষার্থী নিজেদের সাফল্য ও যোগ্যতা সম্পর্কে এতই হতাশ হয়ে পড়বে যে তাদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ দেখা দেবে এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতিও জাগবে তাদের দুর্বার বিতৃষ্ণা। কিন্তু শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, তার শারীরিক ও মানসিক অন্যান্য অবস্থার বিবেচনার ভিত্তিতে যদি এই ক্রমবিন্যাসকরণের ব্যবস্থাকে কার্যকরী রূপ দেওয়া হয়, তাহলে তা ছাত্রদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করতে পারে।

যোগ্যতার ক্রমানুসারে সাজান এবং নম্বর দেওয়া

**(চ) ক্রমোন্নতি সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge of Progress):** কতটুকু উন্নতি হল এ সম্পর্কে যদি শিক্ষার্থী অবহিত হয়, তাহলে তার সেই জ্ঞান প্রেষণা সঞ্চার করার ব্যাপারে শক্তিশালী প্ররোচকের কাজ করতে পারে। যে ছাত্রকে শিক্ষক তার উন্নতি সম্পর্কে অবহিত রাখেন, আরও পরিশ্রম ও উন্নতি করার জন্য তার মধ্যে আগ্রহ জাগে। এই সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে যে ফল পাওয়া গেছে তা পূর্ব অভিমতই সমর্থন করে। এই কারণেই প্রতিটি ছাত্রের, কার কতটুকু উন্নতি হচ্ছে, তা লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থার অসীম মূল্য আছে। নানাভাবে শিক্ষক ছাত্রকে তার সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। ইতিপূর্বে যোগ্যতার ক্রমানুসারে নাম সাজাবার যে ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারাও এই কার্য সাধিত হতে পারে। ছাত্রের উন্নতি সম্পর্কে বিবরণ দাখিল করার ব্যবস্থা, প্রশংসা, ছাত্র-শিক্ষক আলোচনার ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতির তালিকা প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যবস্থার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করা যায়।

ক্রমোন্নতি সম্পর্কে জ্ঞান

**(ছ) সাফল্য (Success):** সফলতা, নৈপুণ্য বা দক্ষতা প্রভৃতিও কাজের প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করে। প্রতি ছাত্র তার নিজ নিজ স্তরে যাতে সফলতা অর্জন করতে পারে, শিক্ষণীয় বিষয়কে সে ভাবেই, শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থিত করা দরকার। সফলতাই ছাত্রের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করে। এই আত্মবিশ্বাসই ছাত্রকে নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালিত করে।

সাফল্য

**(জ) প্রতিযোগিতা (Competition) :** কোন কোন অবস্থায় প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রেষণা সঞ্চারের ব্যাপারে বেশ কার্যকর প্ররোচক। যে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শত্রুতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা জাগিয়ে তোলে সে রকম প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত না করে, সুস্থ ও বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দানই শিক্ষকের কর্তব্য। তাছাড়া, প্রতিযোগীদের মধ্যে কিছুটা সমতা না থাকলে, প্রতিযোগিতা ফলপ্রসূ হয় না।

**প্রতিযোগিতা**

একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত। প্রত্যেক প্রতিযোগীরই যেন জয়লাভের সম্ভাবনা থাকে। প্রতিযোগিতা তিন প্রকারের হতে পারে—ব্যক্তিগত, দলগত এবং আত্মপ্রতিযোগিতা। আত্মপ্রতিযোগিতা বা নিজের কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতাই সবচেয়ে ফলপ্রসূ। এই প্রতিয়োগিতার বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার্থী নিজের পূর্বেকার যোগ্যতাকে অতিক্রম করে অধিকতর যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য সচেষ্ট হয়।

এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতার ভাব শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চার করাই হবে শিক্ষকের একমাত্র কর্তব্য। প্রতিযোগিতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলে শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য বিফল হবে। যদিও একাধিক গবেষণামূলক পরীক্ষণকার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে, প্রতিযোগিতা প্রেষণা সৃষ্টি করার ব্যাপারে বেশ কার্যকর প্ররোচক, তবুও শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এটিকে প্রয়োগ করার সময় এই পদ্ধতির অনুভূতিমূলক এবং সামাজিক ফলাফলগুলি শিক্ষকের ভাল করে বিবেচনা করে দেখা কর্তব্য।

**(ঝ) নতুনত্ব (Novelty) :** পরিচিতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে নতুনত্ব বা অভিনবত্ব সৃষ্টিতেও উপযুক্ত প্রেষণার সঞ্চার ঘটে। বৈচিত্র্যই জীবনের ধর্ম —শিক্ষার ক্ষেত্রে এই উক্তির যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য কম নয়। শিক্ষণীয় বিষয়কে যদি শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়, তাহলে শিক্ষণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

**(ঞ) শ্রবণ ও দৃষ্টি সম্বন্ধীয় সহায়ক (Audio-visual aids) :** শিক্ষণকার্যে প্রেষণা সঞ্চার করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে সহায়তা করে এরূপ উপাদান ব্যবহার করা হয়। যা করা হচ্ছে তা যদি চোখে দেখা যায় তাহলে সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে না এবং করণীয় কার্যকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলে। এগুলি প্রেষণাকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলে। শিক্ষাগ্রহণ কালে সিনেমা, রেডিও

টেলিভিশন, পরীক্ষণাগার, কারখানা প্রভৃতির ব্যবহার প্রেষণা সঞ্চারে যথেষ্ট সহায়তা করে।

**(ট) আকাঙ্ক্ষার স্তর (Level of Aspiration) :** যদিও প্রেষণা সঞ্চার করার ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষার স্তরের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই, তবু এর সঙ্গে প্রেষণার নিগূঢ় সম্পর্ক আছে বলে, এর আলোচনার প্রয়োজন আছে। অনেক ছাত্র রয়েছে যারা অঙ্ক, ইংরেজী ভাল বোঝে না। কেন তারা বোঝার চেষ্টা করে না, তা জানতে হলে শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষার স্তর সম্পর্কে শিক্ষকের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আকাঙ্ক্ষার স্তর বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর লক্ষ্য বা কার্যের দুরূহতা। এটি একই সঙ্গে প্রেষণার উপাদান এবং অন্য একটি প্রেষণার ফলশ্রুতি। শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, শিক্ষার্থীর লক্ষ্য যেন এমন না হয়, যা তার আয়ত্তের বাইরে। শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে ছাত্রদের কাছে এমনভাবে উপস্থিত করতে হবে, যা শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোন শিক্ষার্থী অধিকতর সামর্থ্যের পরিচয় দেওয়া মাত্রই তাকে অঙ্ক, ভাষা বা অন্যান্য কোন বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার জন্য শিক্ষকের ব্যস্ত হওয়া সমীচীন হবে না। শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষার স্তর যথাযোগ্যভাবে নিরূপিত হলেই প্রেষণা কার্যকর হয়।

## ৮। শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রেষণার কার্য (Functions of Motives in the Learning Process) :

মনোবিজ্ঞানী গ্যাট্স (*Gates*)-এর অভিমতানুসারে শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রেষণার কার্য হল তিনটি। যথা—

**(ক) প্রেষণা কার্যে শক্তি সঞ্চার করে :** শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার হলে তার মধ্যে অধিকতর শক্তি সঞ্চারিত হয়, শিক্ষার্থীর উদ্যম বাড়ে, তার মধ্যে কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ক্ষুধা বা তৃষ্ণার সময় পেশী ও গ্রন্থির প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়। প্রশংসা, নিন্দা, পুরস্কার, শাস্তি, অর্থ প্রভৃতি শক্তিশালী প্ররোচক (incentive), যা প্রেষণা সৃষ্টি করে। এই সব প্ররোচকের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থী বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া করে এবং এই সব প্ররোচক শিক্ষণকার্যে সহায়তা করে। কোন কোন সময় বাহ্য-প্ররোচকের সহায়তায় শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করা হলেও, শিক্ষার্থীর বাহ্য-প্রেষণা আভ্যন্তরীণ প্রেষণায় রূপান্তরিত হয়। কোন পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে কোন শিক্ষার্থীকে একটি

কার্যে শক্তি সঞ্চার করে

পুস্তক পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হল, কিন্তু শিক্ষার্থী সেই বই পড়ে যদি আনন্দ পায় বা অন্য কোন কার্য সমাধানের জন্য সেই পুস্তকের জ্ঞান প্রয়োজনীয় মনে করে স্বাভাবিকভাবেই বইটি পড়ার জন্য আগ্রহশীল হয়ে উঠে, সেক্ষেত্রে বাহ্য-প্রয়োচকের আর কোন কার্যকারিতা থাকে না।

**(খ) প্রেষণা নির্বাচনধর্মী :** শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার হলে শিক্ষার্থী বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় প্রতিক্রিয়া করে এবং অন্যান্য অবস্থাকে উপেক্ষা করে। কিভাবে শিক্ষার্থী একটি বিশেষ অবস্থায় প্রতিক্রিয়া করছে প্রেষণা তাও নির্ধারণ করে। যেমন, একটি খবরের কাগজ দেওয়া হলে, কেউ বা খেলাধূলার পৃষ্ঠাটি পড়ার আগ্রহ দেখায়, কেউ বা চাকরিখালির, আবার কেউ বা জমিজমা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। কোন একটি বক্তৃতার বিবরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন ব্যক্তি তার বিভিন্ন বিবরণ দিচ্ছে। কারণ, বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে হয়ত তারা সেই বক্তৃতা শুনেছে, হয়ত বিষয়টির প্রতি আগ্রহ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন বা হয়ত নিজ নিজ অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই বক্তৃতার তাৎপর্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

**নির্বাচনধর্মী**

**(গ) প্রেষণা আচরণকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে :** প্রেষণা কেবলমাত্র নির্বাচনধর্মী নয়, প্রেষণা আচরণকে একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত ক'রে শিক্ষার্থীর মানসিক তৃপ্তি সাধন করে। শিক্ষার্থীর উন্নতি তখনই ঘটে, যখন শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিক্ষণে আগ্রহ প্রকাশ করে না, যেহেতু শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে না যে তার বর্তমান শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তার আসল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সম্পর্ক কি ? উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞানের জন্য প্রাথমিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের কি প্রয়োজন, অনেক শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার সময় বুঝে উঠতে পারে না। সে কারণে শিক্ষকের সকল সময়ই কর্তব্য হবে ছাত্রকে বুঝিয়ে বলা যে, তার বর্তমান শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তার অভীষ্ট লক্ষ্যের কি সম্পর্ক ; তাহলেই বর্তমান শিক্ষণীয় বিষয়ে ছাত্রের আগ্রহের সঞ্চার হবে এবং ছাত্র সেই বিষয় অধ্যয়নে আগ্রহশীল হবে।

**আচরণকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে**

শিক্ষণ কখনই কার্যকর হতে পারে না যদি না তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়। যে অবস্থা শিক্ষার্থীর প্রতিটি অভিজ্ঞতাকেই অর্থপূর্ণ করে তোলে সেই অবস্থা

যাতে যথাযথভাবে সৃষ্ট হয় সেদিকে শিক্ষকের অবশ্যই মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। শিক্ষার্থীর শিক্ষণ তখনই অর্থপূর্ণ হবে যদি তার সঙ্গে শিক্ষার্থীর আগ্রহের সংযোগ থাকে। তাছাড়া, সেগুলি কেবলমাত্র তার বর্তমান প্রয়োজন না মিটিয়ে ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যসাধনের পরিপন্থী হবে। তখন সেগুলি শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে নতুন কোন সমস্যা সমাধানে ও নতুন বিষয়বস্তু আবিষ্কারের জন্য প্রেরণা দেবে এবং তার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যুগ্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা যা এরূপ শিক্ষাকে সম্ভব করে তুলবে এবং তার উপায় নির্ধারণ করা যা লক্ষ্য সাধনের উপযোগী হবে। এটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তাহলেও শিক্ষণের প্রারম্ভিক স্তরগুলিকে অবহেলা করলে সমস্ত শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

## ৯। কার্যকর শিক্ষণের শর্তাবলী (Conditions of Effective Learning) :

শিক্ষণের যে কোন প্রচেষ্টাই যে সব সময় কার্যকর হয়, তা নয়। শিক্ষণকে কার্যকরী করতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করা প্রয়োজন।

(১) **আগ্রহ বা প্রেষণা :** এটি কার্যকর শিক্ষণের একটি অতি আবশ্যকীয় শর্ত। শিক্ষার্থীর অনুরাগ এবং প্রচেষ্টা প্রেষণার উপর নির্ভরশীল। প্রেষণাই শিক্ষার্থীর মধ্যে কর্মতৎপরতা বা কর্মশক্তির সঞ্চার করে, শিক্ষার্থীর আচরণকে নির্বাচনধর্মী করে তোলে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে তাকে চালিত করে। শিক্ষার্থীর মধ্যে শুধু শিক্ষণের আগ্রহ থাকলেই চলবে না, নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা আদর্শ থাকা প্রয়োজন। শুধু শিক্ষার্থীর বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ করাই শিক্ষার যথার্থ লক্ষ্য নয়। বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ করেও, যদি ভবিষ্যতের কোন লক্ষ্যসাধনে শিক্ষণ উপযোগী না হয়, তাহলে সেই শিক্ষণ কখনও কার্যকর হতে পারে না।

আগ্রহ বা প্রেষণা

(২) **কার্যের মাধ্যমে শিক্ষণ :** কোন কিছু করা মানেই হল তা শেখা। যদি কোন শিশু নিজে কোন কাজ করে তাহলে সে যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তা তার শিক্ষণের পক্ষে খুবই উপযোগী হয়। সে কারণে শিক্ষণকে কার্যকর করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীকে নিজের হাতে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

কার্যের মাধ্যমে শিক্ষণ

(৩) **উপযুক্ত পরিবেশ :** মনোরম পরিবেশ, উপযুক্ত আলো, বাতাসের ব্যবস্থা এবং অবসাদ-সৃষ্টিকারী বিষয়ের অনুপস্থিতি কার্যকর শিক্ষণের প্রয়োজনীয় শর্ত। সুন্দর সহজ পরিবেশ শিক্ষণকে কার্যকর করে তোলে।

উপযুক্ত পরিবেশ

(৪) **শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা :** শিক্ষার উপযোগী মানসিক অবস্থা যদি শিক্ষার্থীর না থাকে, তা হলে শিক্ষণ কখনও কার্যকরী হতে পারে না। শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব তার কর্মতৎপরতা বিনষ্ট করে। তাছাড়া, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ভ্রান্ত ধারণা, মানসিক অস্থিরতা, কুসংস্কার, মানসিক ব্যাধি প্রভৃতিও কার্যকরী শিক্ষণের প্রতিবন্ধক।

শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা

(৫) **পরিপক্কতা :** কার্যকর শিক্ষণের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর পরিপক্কতা। শিক্ষার্থী যা শিক্ষা করতে চায় তা শিক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক পরিণতি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করার জন্য যদি শিক্ষার্থীর ক্ষমতা বা সামর্থ্য না থাকে, বা তা যদি শিক্ষার্থীর ক্ষমতার নাগালের বাইরে হয় তাহলে কার্যকর শিক্ষণ সম্ভব হতে পারে না।

পরিপক্কতা

(৬) **শিক্ষাদানের ব্যবস্থা :** শিক্ষণীয় বিষয়ের তাৎপর্য ও অর্থ যদি শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরা না হয়, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানর জন্য যে পথ বিশেষভাবে উপযোগী তা যদি শিক্ষার্থীকে না বলে দেওয়া হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর শিক্ষণ কখনও সার্থক হতে পারে না। শিক্ষণের ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য অনেক শিক্ষার্থীই শিক্ষণকে কার্যকর করে তুলতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

(৭) **শিক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান :** শিক্ষার্থী যদি নিজ প্রচেষ্টার ফলাফল সতর্কভাবে প্রত্যক্ষণ করে তাহলে প্রচেষ্টার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সজাগ হতে পারে এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে আরও সতর্ক হয়ে দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে শিক্ষণকে সার্থক করে তুলতে পারে।

শিক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান

(৮) **অনুশীলন :** কার্যকর শিক্ষণের জন্য প্রয়োজন আন্তরিকভাবে বার বার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাকে আয়ত্ত করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। একবার-দুবার চেষ্টা করার পর যদি শিক্ষার্থী সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়ে তাহলে শিক্ষণ কোনমতেই কার্যকর হতে পারে না।

অনুশীলন

(৯) **কার্যকালের পরিসর ঃ** শিক্ষার্থীর কার্যকালের পরিসর খুব দীর্ঘ বা খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। সামর্থ্য, বয়স, কাজের প্রকৃতি অনুসারে কোন কাজ আয়ত্ত করতে কিছু সময় লাগে। একটা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার পরও যদি একটা কাজে বিরতি না দেওয়া হয় তাহলে মনোযোগ বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। ফলে, সার্থক শিক্ষণ ব্যাহত হয়।

কার্যকালের পরিসর

(১০) **মনোযোগ ঃ** কার্যকর শিক্ষণের অন্যতম প্রয়োজনীয় শর্ত হল শিক্ষণীয় বিষয়ে যথোপযুক্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করা। শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং বাহ্য পরিবেশগত অবস্থা —যেগুলি মনোযোগ নির্ধারণে সহায়ক, সবগুলিই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

মনোযোগ

শিক্ষণকে কার্যকর করে তুলতে হলে ব্যক্তিগত বৈষম্যের (individual difference) কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক প্রস্তুতি, পরিপক্কতা এবং দৈহিক ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষার্থীর পাঠক্রম নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। তাছাড়া, শিক্ষণের ক্ষেত্রে উন্নতি কি কারণে ব্যাহত হচ্ছে বা কিছু উন্নতি হবার পর কেন অচলাবস্থার (Plateau) সৃষ্টি হচ্ছে, তার কারণগুলি নির্ণয় করে এর উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করাও সার্থক শিক্ষণের পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

## ১০। শিক্ষার উন্নতি (Improvement in Learning) :

শিক্ষার উন্নতি কতকগুলি শর্তের উপরে নির্ভরশীল। এগুলি হল অনুশীলনের মাত্রা, আগ্রহ, মনোযোগ, শিক্ষণ-পদ্ধতির উপযোগিতা, পূর্বজ্ঞান, সবিরতি শিক্ষণ-প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীর বয়স, তার বংশগত গুণাগুণ, অবসাদ, দৈহিক অবস্থা, সফলতা ও বিফলতা সম্পর্কে জ্ঞান, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতির অনুপস্থিতি ইত্যাদি। শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ দেখা দেয়, এর কারণ সব ব্যক্তির শিক্ষণের ক্ষমতা এক নয়।

শিক্ষার উন্নতি কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল

শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে আমাদের যে সাধারণ অভিজ্ঞতা হয়, তাহল এই যে, শিক্ষার্থীর উন্নতি সমান গতিতে চলে না, সময় সময় দেখা যায় বেশ দ্রুত উন্নতির পর আর মোটেই উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না—একটা বিশেষ স্তরে এসে উন্নতি থেমে যায়। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভাণ্ডারে আর নতুন সঞ্চয়ন হয় না। উন্নতির ক্ষেত্রে একটা অচল অবস্থা বা স্থিতিশীল অবস্থা দেখা দেয়। মনোবিজ্ঞানীরা এই অচল অবস্থাকেই শিক্ষার উন্নতি রেখায় উপত্যকা (Plateau of learning) বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য এই অচল অবস্থায় যে কোন

পরিবর্তন ঘটে না, তা নয়। অধিকতর কার্যকর প্রতিক্রিয়া উদ্ভাবনের ফলে বা শিক্ষার্থীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বর্ধিত অনুরাগের ফলে হয়ত এই অচলাবস্থার অবসান ঘটে, আবার কিছু উন্নতি দেখা দিতে পারে। এর পরে আসে আগের মতো সচলাবস্থা, আবার কিছুটা উন্নতি দেখা দেয়। অচলাবস্থার পর যে উন্নতি দেখা দেয় তাকে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন 'spurt'. এইভাবে চলতে চলতে শিক্ষণের উন্নতি এমন একটি অবস্থায় এসে থেমে যায় যে, শিক্ষার্থীর পক্ষে আর কোন উন্নতি করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীর উন্নতির পথে বার বার যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই শিক্ষার উন্নতি রেখার উপত্যকা (Plateau of learning) বলা হয়।

**শিক্ষার উন্নতি-রেখার উপত্যকা**

টাইপিং ও টেলিগ্রাফি শিক্ষা সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে এই অচলাবস্থার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

ব্রায়ান ও হার্টার (*Bryan and Hartar*) টেলিগ্রাফি শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষণকার্য চালাতে গিয়ে শিক্ষার উন্নতির এই অচল অবস্থার বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, শিক্ষার ফলে বেশ

ব্রায়ান ও হার্টার-এর পরীক্ষণকার্য
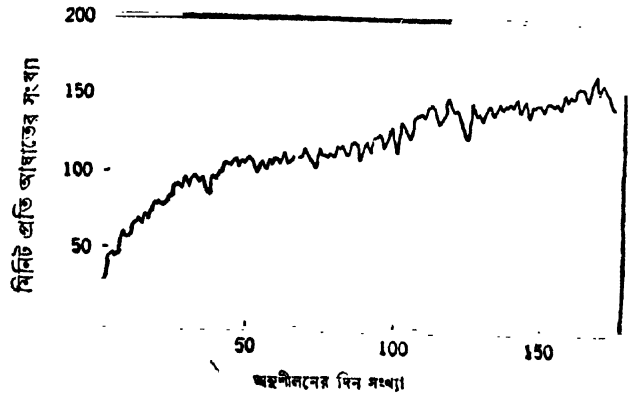
একটি যুবকের টাইপরাইটিং শিক্ষণের বক্ররেখা, (Learning Curve)। বক্ররেখায় প্রতিটি ধাপ, মিনিট প্রতি আঘাতের সংখ্যার এক দিনের হিসাব। ৫০ থেকে ৯০ প্রচেষ্টা পর্যন্ত শিক্ষণের পথে উপত্যকা (Plateau) দেখা যাচ্ছে, যার পরে কিছুদিন ধরে দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

কিছুদিন উন্নতির পর একটা অচল অবস্থা দেখা দেয়। তবে এ অবস্থা সাময়িক, কেননা, উন্নত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। আবার কিছুটা উন্নতি দেখা দেয়, আবার আসে অচল অবস্থা।

এইভাবে অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থা আসে যখন আর কোন উন্নতি হয় না। টাইপরাইটিং সম্বন্ধে পরীক্ষণকার্য চালিয়েও অনুরূপ ফল লক্ষ্য করা গেছে। পূর্বপৃষ্ঠার রেখাচিত্রটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। স্যাণ্ডিফোর্ড (*Sandiford*) টয়নেটার হাই স্কুল অব কমার্স এর টাইপরাইটিং-এর ছাত্রের উপরে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে যে ফলাফল পেলেন তা তিনি তাঁর *Edncationl Psychology*[1] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষার উন্নতির পথে এই স্থিতিশীল অবস্থার আবির্ভাব ঘটে। অনেক সময় শিক্ষার্থী প্রথম অচলাবস্থা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে শিক্ষণের শেষ সীমা মনে করে শিক্ষণকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে। তারা ধারণা করে শিক্ষায় আর উন্নতি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে কারণে হতাশ হয়ে তারা শিক্ষণ থেকে বিরত হয়। এই কারণে শিক্ষার উন্নতিপথে এই অচলাবস্থার আবির্ভাবের কারণগুলি কি এবং সেগুলিকে কি ভাবে দূর করা যেতে পারে তা জানা প্রয়োজন।

উন্নতির পথে অচলাবস্থা শিক্ষার্থীর মনে হতাশা সৃষ্টি করে

## ১১। শিক্ষার উন্নতিপথে উপত্যকার অর্থাৎ অচলাবস্থার আবির্ভাবের কারণ (Causes for the Formation of the Plateau):

নিম্নলিখিত কারণে শিক্ষার উন্নতিপথে অচল বা স্থিতিশীল অবস্থা দেখা দেয়:

১। **আগ্রহের অভাব:** শিক্ষার্থীর আগ্রহের অভাবের জন্য যদি অচলাবস্থার আবির্ভাব ঘটে তাহলে উপযুক্ত প্ররোচকের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটান যেতে পারে। অবশ্য অনেক সময় অন্যান্য কারণে এই আগ্রহের অভাব দেখা যায়। যেমন, শিক্ষার্থী যদি অসুস্থ হয় বা শিক্ষণীয় বিষয় যদি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে হয় তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের অভাব দেখা যায়।

আগ্রহের অভাব

২। **শিক্ষণীয় বিষয়ের দুরূহতা:** শিক্ষণীয় বিষয় যদি শিক্ষার্থীর কাছে খুব দুরূহ মনে হয়, তাহলেও শিক্ষার উন্নতিপথে এই উপত্যকা দেখা দেয়। দুরূহ বিষয় এড়িয়ে শিক্ষণীয় বিষয়কে যথাযথ ভাবে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থিত করে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটান যেতে পারে।

বিষয়ের দুরূহতা

1. Sandiford...Educational Psychology, P. 209-10

(৩) **মন্দ অভ্যাস :** মন্দ অভ্যাসও 'শিক্ষার উন্নতিপথে এই স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ঠিকমত কলম ধরতে না শেখা, অনেক সময় লেখার উন্নতিপথে স্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, সেক্ষেত্রে কলম ধরার যথার্থ পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে দেখিয়ে দিলে এই স্থিতিশীল অবস্থার বিলোপ ঘটে।

মন্দ অভ্যাস

(৪) **শিক্ষণীয় বিষয়ের অংশবিশেষের দিকে মনোযোগ :** শিক্ষণীয় বিষয়ের বিভিন্ন অংশের দিকে সমানভাবে নজর না দিয়ে যদি অংশ বিশেষের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয় তাহলে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় না, ফলে উন্নতির পথে স্থিতাবস্থা দেখা দেয়। শিক্ষণীয় বিষয়ের সব অংশের প্রতি সমান মনোযোগ নিবদ্ধ করে এই স্থিতাবস্থাকে দূর করা যেতে পারে।

অংশবিশেষের দিকে মনোযোগ

(৫) **কার্যের একটি দিক থেকে অপর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ-করণ :** কার্যের একটি দিক থেকে যদি আর এক দিকে মনোযোগ ধাবিত হয়, অর্থাৎ কাজের গতি থেকে যদি কাজকে কিভাবে নিখুঁত করা যায়, সেদিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয় তাহলেও এই স্থিতিশীল অবস্থা দেখা দেয়। উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে এইরকম স্থাণু অবস্থার অবসান ঘটান যেতে পারে।

কার্যের একটি দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে নিবদ্ধ করা

(৬) **কাজের এক অংশের ভুল অন্য অংশে স্থানান্তরিত করা :** কোন ছাত্র পরিসংখ্যান শিক্ষা করতে গিয়ে শুরুতে বেশ উন্নতি দেখাল, কিন্তু কিছু পরে যেই জটিল সমস্যার আলোচনাতে উপনীত হল, তার উন্নতি থেমে গেল। কারণ গণনার ভুল, যোগ-বিয়োগের ভুল এবার আসল কাজের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হল।

কাজের এক অংশের ভুল অন্য অংশে স্থানান্তরিত হওয়া

(৭) **কোন জটিল বিষয় আয়ত্ত করার সময় তার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব :** কোন একটি জটিল বিষয় শিক্ষা করার সময় তার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে শিক্ষার উন্নতিতে স্থিতাবস্থা দেখা দিতে পারে।

জটিল বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব

(৮) **শিক্ষণের ক্ষেত্রে অফলপ্রদ পদ্ধতির অনুসরণ :** শিক্ষাদান পদ্ধতি যদি যথার্থ না হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর উন্নতি ব্যাহত হতে পারে। সঠিক পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষণই শিক্ষার উন্নতিতে সহায়তা করে।

অফলপ্রদ পদ্ধতির অনুসরণ

**(৯) সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতির অনুসারে অনুশীলনের অভাব:** যদি এক সময় এক পদ্ধতি অনুসারে, অপর সময় অন্য পদ্ধতি অনুসারে কোন বিষয় শিক্ষা করা হয়, অর্থাৎ কোন বিষয়ে শিক্ষণের জন্য যদি স্থিরভাবে একটি যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা না হয়, তাহলে শিক্ষার উন্নতি স্থলে স্থিতাবস্থা দেখা দেয়।

সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে অনুশীলনের অভাব

**(১০) দৈহিক অবস্থা:** দৈহিক অবস্থা, যেমন ক্লান্তি বা অবসাদ, বা দর্শনেন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি হেতুও শিক্ষার উন্নতি পথে স্থিতিশীল অবস্থা দেখা দিতে পারে।

দৈহিক অবস্থা

**(১১) নতুন পদ্ধতি বা প্রাথমিক সূত্র সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব:** কোন নতুন পদ্ধতি বা প্রাথমিক সূত্র সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব হেতুও কোন শিক্ষার্থীর উন্নতির পথে অচলাবস্থার আবির্ভাব ঘটতে পারে।

নতুন পদ্ধতি বা প্রাথমিক সূত্র সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব

**(১২) বিচ্ছিন্ন এককের পরিবর্তে সমগ্রের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া করতে না শেখা:** যে লোক টাইপ করতে শিখছে সে গোটা শব্দ টাইপ করতে না শেখার জন্য, প্রথম কিছুদিন পরেই তার উন্নতির পথে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। যখন একটা অক্ষর আলাদা-আলাদা ভাবে টাইপ না করে, গোটা অক্ষর টাইপ করতে শেখে তখনই অচলাবস্থা কেটে যায় এবং শিক্ষার্থীর আবার উন্নতি দেখা দেয়।

বিচ্ছিন্ন এককের পরিবর্তে সমগ্রের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া করতে না শেখা

## ১২। নৈপুণ্য এবং জ্ঞান (Skill and Knowledge):

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে। শিক্ষার লক্ষ্য হল: (১) জ্ঞান-অর্জন (Acquisition of knowledge) এবং (২) নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জন (Acquisition of skill)।

শিক্ষার লক্ষ্য—জ্ঞান অর্জন ও নৈপুণ্য অর্জন

প্রত্যক্ষণ (Perception), প্রত্যয় বা সামান্য ধারণার মাধ্যমে চিন্তন (Conception), সামান্যীকরণ (Generalisation), অনুষঙ্গমূলক শিক্ষণ (Associative learning) এবং মূল্যনিরূপণ (Appreciation)—এই সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়। কোন বিশেষ মুহূর্তে বা অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয় উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে উত্তেজিত হলে আমাদের কোন বিষয় বা ঘটনার প্রত্যক্ষণ হয় এবং সেই বিষয় বা

ঘটনা সম্পর্কে আমরা সুনির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জন করি। প্রত্যয় বা সামান্য ধারণার (Concepts or General ideas) মাধ্যমেও আমরা কোন বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত জ্ঞান অর্জন করি। রাম, শ্যাম, যদু, মধু, হল ব্যক্তিবিশেষ, কিন্তু 'মানুষ' হল একটি প্রত্যয়। প্রত্যয় সংবেদনের বিষয়বস্তু নয়, প্রত্যয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোগের কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমরা ব্যক্তিবিশেষকেই ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু 'মানুষ' এই প্রত্যয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযোগ সংগঠিত হতে পারে না। প্রত্যয় বলতে আমরা একটা জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝি বা তাদের যে সাধারণ গুণাবলী আছে তাদের বুঝি। প্রত্যক্ষরূপ (Percept) এবং প্রত্যয়ের (Concept) মধ্যে পার্থক্য আছে। জাতি এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলিকে নিয়ে প্রত্যয়ের সম্পর্ক। প্রত্যক্ষরূপের সম্পর্ক হল ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে। প্রত্যয় হল সার্বিক এবং অমূর্ত। প্রত্যক্ষরূপ হল বিশেষ এবং মূর্ত। অনুষঙ্গমূলক শিক্ষণের সম্পর্ক স্মৃতির সঙ্গে। স্মৃতি বলতে এখানে স্বেচ্ছায় কোন বিষয়কে মনে জাগিয়ে তোলা এবং তাকে পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে চিনতে পারা ও অনুষঙ্গের নিয়মানুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন বিষয়ের মনে উদ্রেক—এই উভয় প্রক্রিয়াকেই বোঝাচ্ছে। মূল্য-নিরূপণ হল জ্ঞানের অনুভূতির দিক। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা আদর্শের জ্ঞান অর্জন করি।

প্রত্যক্ষণ, চিন্তন, সামান্যীকরণ, অনুষঙ্গ-মূলক শিক্ষণ ও মূল্য নিরূপণ—এই সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়

**নৈপুণ্য অর্জন** (Acquisition of Skill) : কর্মনৈপুণ্য বা কর্মদক্ষতা বলতে কি বোঝায়? যেকোন কাজ করতে গিয়ে আমাদের আনুক্রমিকভাবে কতকগুলি আচরণ বা প্রতিক্রিয়া করতে হয়। যখন সুসংবদ্ধ কতকগুলি আনুক্রমিক প্রতিক্রিয়া বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পন্ন করার পারদর্শিতা শিক্ষার মাধ্যমে আমরা অর্জন করি, তখনই আমাদের কর্মদক্ষতা প্রকাশ পায়।[1] যেমন—নিপুণতার বা দক্ষতার সঙ্গে পিয়ানো বাজানো, উড়োজাহাজ চালান বা কবিতা আবৃত্তি করা। কোন কাজে নিপুণতা বা দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য হল, সেই কাজটি নির্ভুলভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সম্পাদন করা। মোটর গাড়ি চালনা করতে গিয়ে

নৈপুণ্যের স্বরূপ

1. "When we acquire through learning a co-ordinated series of responses which are performed with proficieny, we speak of the accomplishment of skill."—Boring & others : Foundations of Psychology.

যদি কোন ব্যক্তির পদে পদে ভুল হয় তাহলে সেই ব্যক্তি গাড়ি চালনায় দক্ষতা অর্জন করছে এ কথা আমরা বলব না। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের প্রশ্ন আসে। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের কথা আমরা বলি না। যে ব্যক্তি নিখুঁত ভাবে কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারে, গাড়ি চালনা করতে পারে, কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, টাইপ করতে পারে, সে সেই কাজে নৈপুণ্য অর্জন করেছে এ কথা আমরা বলব। কিন্তু বিদ্যুতের স্পর্শে দ্রুত পা সরিয়ে নেওয়া বা ঝলসানো আলো চোখে এসে পড়াতে চোখবোজা—এগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex action)। এগুলিতে ব্যক্তিবিশেষের দক্ষতা বা নৈপুণ্য প্রকাশ পায় না। পড়া, লেখা, গানবাজনা, ভাষা আয়ত্তীকরণ (বাচনিক), অঙ্কন এবং সাধারণ শিল্পকলা (arts in general) প্রভৃতি সংবেদন-ক্রিয়াজনিত প্রক্রিয়াগুলির (sensori-motor process) পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষের দক্ষতা বা নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়। সাধন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা বা নৈপুণ্য অর্জিত হয়। অর্জিত বিষয়েই নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের কথাই বলা হয়ে থাকে, সহজাত প্রবণতার ক্ষেত্রে নৈপুণ্যের প্রশ্ন আসে না। নিপুণ হাঁটিয়ে একথা আমরা বলি না, কিন্তু দড়ির উপর দিয়ে নিপুণভাবে হাঁটতে পারে একথা আমরা বলি।

দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রতিক্রিয়ার আনুক্রমিক সংগঠন

নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার আনুক্রমিক সংগঠন (serial organisation)। অর্থাৎ, কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হলে আনুক্রমিক শিক্ষণের (serial learning) প্রয়োজন। যে ক্ষেত্রে আনুক্রমিকভাবে বা ধারাবাহিকভাবে আচরণ বা প্রতিক্রিয়া করা হয়, সে ক্ষেত্রেই আনুক্রমিক শিক্ষণ নামটি প্রয়োগ করা হয়।[1] এই আনুক্রমিক শিক্ষণের একটা সাধারণ উদাহরণ হল কোন কবিতা আবৃত্তি করা। যেসব ক্ষেত্রে ক্রিয়াজ দক্ষতা (motor skill) প্রকাশ পায়, সে-সব ক্ষেত্রেও আনুক্রমিক শিক্ষণের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ গোলকধাঁধার (maze) উল্লেখ করা যেতে পারে। নিম্নতর প্রাণী এবং মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই গোলকধাঁধার সহায়তায় আনুক্রমিক শিক্ষণের বিষয়টি লক্ষ্য করা হয়। গোলোকধাঁধাঁর এক প্রান্তে খাদ্য রক্ষিত হয় এবং আর এক প্রান্তে থাকে একটি

1. "The name serial learning as applied to the process of learning means a sequence of responses."—Boring : Foundation of Psychology.

ক্ষুধার্ত প্রাণী, ধরা যাক কোন ক্ষুধার্ত বিড়াল। ক্ষুধার্ত বিড়ালটিকে গোলক-ধাঁধার নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার পথটি খুঁজে বার করে, নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে হয়। প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে কিভাবে নিম্নতর প্রাণী শিক্ষা করে, সে সম্পর্কে থর্নডাইক ক্ষুধার্ত বিড়াল নিয়ে যে পরীক্ষণ কার্য চালান, এ পরীক্ষণও তারই অনুরূপ; তবে পার্থক্য এই যে, থর্নডাইকের শিক্ষণ-পরীক্ষণের মূল কথা একটি মাত্র আচরণ—সমস্যার সামগ্রিক রূপটিকে কল্পনায় মনের সামনে উপস্থিত করে সমস্যা ও সমাধানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, আর পূর্বোক্ত গোলকধাঁধার ক্ষেত্রে একটিমাত্র আচরণ নয়, আচরণের পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতা বা আচরণের ক্রম লক্ষ্য করতে হয়।

অনেক সময় কাজে নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে, উত্তরোত্তর দক্ষতা বা নৈপুণ্যের মাত্রা যতই বাড়তে থাকে, কাজটিও পরিবর্তিত হতে থাকে। টাইপরাইটিং ও টেলিগ্রাফ, এই দুই শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। টাইপরাইটিং শেখা যখন ধীর-গতিতে অগ্রসর হয় তখন শিক্ষার্থীকে প্রতিটি অক্ষরের জন্য একটা নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া করতে হবে, যেমন, 'Bat' শব্দটি টাইপ করতে গিয়ে প্রথমে 'B' তারপরে 'a, তারপরে 't'। কিন্তু যতই শিক্ষার্থীর নৈপুন্য বা দক্ষতা বাড়তে থাকবে, তখন শিক্ষার্থী একসঙ্গে সম্পূর্ণ কথাটি টাইপ করার জন্য প্রতিক্রিয়া করতে সমর্থ হবে এবং অধিকতর অনুশীলনের ফলে যখন আরও দক্ষতা জন্মাবে তখন সম্পূর্ণ বাক্য বা বাক্যাংশ একক হিসেবে টাইপ করতে সমর্থ হবে।

নৈপুণ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজের পরিবর্তন

আনুক্রমিক শিক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষার ক্রমের সব অংশগুলি আয়ত্ত করার পক্ষে সমান কঠিন নয়। প্রথম দিকের এবং শেষের দিকের প্রতিক্রিয়াগুলি সবচেয়ে সহজ এবং মাঝেরগুলি সব চেয়ে কঠিন। এই ফলাফলগুলিকে দুটি নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। একটি হল প্রাথমিক অভিজ্ঞতার সূত্র (the 'principle of primacy) এবং দ্বিতীয়টি হল সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার সূত্র (the principle of recency)। প্রথম সূত্রানুসারে অন্যান্য বিষয় যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রথম অভিজ্ঞতা অতি দ্রুত আয়ত্ত করা যায়। দ্বিতীয় সূত্রানুসারে প্রথম অভিজ্ঞতার তুলনায় সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা অতি সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করা যায়। যেহেতু প্রথম ও সব শেষের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে

আনুক্রমিক শিক্ষণের স্বরূপ

প্রতিবন্ধকের মাত্রা খুবই কম, সেহেতু এই প্রতিক্রিয়া খুব সহজে করা যায়। শিক্ষার ক্রমের মধ্যবর্তী অংশটুকুতেই প্রতিবন্ধকতার মাত্রা সবচেয়ে বেশী।

আনুক্রমিক শিক্ষণের স্তরগুলি সর্বক্ষেত্রে একপ্রকার নয়। কোন মানুষ যখন কবিতা শেখে তখন তাকে আনুক্রমিক শিক্ষণের স্তরগুলি অতিক্রম করতে হয়। যখন কোন ইঁদুর ধাঁধার নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থলে পৌছবার পথ খুঁজে বার করতে চায়, তখন তার ক্ষেত্রে শিক্ষণের স্তরগুলি ভিন্ন। মানুষ যখন কোন কবিতা শেখে তখন কবিতাটির প্রথম পংক্তির সহায়তায় কবিতাটিকে স্মরণ রাখে। কিন্তু ইঁদুর যখন ধাঁধার পথটির কথা স্মরণ রাখে তখন আনুক্রমিক শিক্ষণের শেষ স্তরটির কথাই সে স্মরণ রাখে। কারণ এই পথ অতিক্রম করেই সে খাদ্য লাভ করেছিল। কাজেই আনুক্রমিক শিক্ষণের সব স্তর সবার কাছে সমান মূল্যবান নয়।

দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে অনুকরণের গুরুত্ব খুব বেশি। কোন ব্যক্তি অপরকে একটি কাজ করতে দেখে, সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা করে এবং কাজটি সম্পন্ন করার জন্য উপায়ও নির্ধারণ করে, যদিও উপায় সম্পর্কে তার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তারপর প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে কাজটির অনুকরণ করা হয়। প্রথম প্রথম চেষ্টা করতে গিয়ে চেষ্টা খুব এলোমেলো হয়, অনেক অনাবশ্যক ক্রিয়াও দেখা দেয়, তারপর দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো প্রচেষ্টা সুসংহত হয় এবং সকল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়।

**নৈপুণ্য অর্জনের মৌলিক নীতি (Basic principles in the acquisition of skills) :** শিক্ষার সব নীতিগুলিই নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ। কিন্তু এই সব নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে, কতকগুলি কার্যকর নীতি গঠন করা হয়েছে—যেগুলি নৈপুণ্য অর্জনে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। এই নীতিগুলি নীচে পর পর আলোচনা করা হচ্ছে :

**(১) নির্ভুলভাবে কর্মসম্পাদনের উপর প্রথম থেকেই জোর দিতে হবে (Stress the correct performance from the start) :** অনেক সময় ইচ্ছা করেই শুরুতে আমরা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করি না। প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার করে নেব, এই আমাদের ইচ্ছা। এর ফলে অনুশীলন সত্ত্বেও কাজ নিখুঁত হয় না, এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ অনুশীলনের ফলে

নির্ভুলভাবে কর্মসম্পাদন

তখনই কাজ নিখুঁত হয় যদি সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুশীলন করা যায়। যেখানে সঠিক পদ্ধতি জানা নেই, সেক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির (trial and error method) মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু যেখানে ভুল না করেও শেখার মতো প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মজুত রয়েছে, সেখানে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। সঠিক পদ্ধতি জানা সত্ত্বেও যদি ভুল পদ্ধতি ধরে কোন কিছু অনুশীলন করা যায় তাহলে ভুল অভ্যাস গঠিত হয়ে যাবে, সেগুলিকে আর সহজে বর্জন করা যাবে না।

এছাড়া, অনেক সময় দেখা যায় অনুশীলন সত্ত্বেও কাজে উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। সেই সব ক্ষেত্রে যাঁরা দক্ষ (expert) তাদের উপদেশ এবং নির্দেশ অনুসরণ করে চলতে হবে। যে শিক্ষার্থী টাইপ শিখছে কিন্তু শেখাতে তেমন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না, দক্ষ শিক্ষক তাকে প্রতিক্রিয়ার নির্ভুল পদ্ধতিটি শিখিয়ে দেবেন, তাহলেই সে সঠিক পদ্ধতি এবং ত্রুটিযুক্ত পদ্ধতির পার্থক্যটুকু বুঝে নিতে পারবে।

**(২) শিক্ষণীয় বিষয়টির উপর মনঃসংযোগ করতে হবে (concentrate on the actual task to be learned):** এই নীতিটি প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষণকে যদি ফলপ্রসূ হতে হয় তাহলে করণীয় বিষয়টির উপর মনকে নিবদ্ধ রাখতে হবে। টাইপ শিখতে হলে সাধারণতঃ যে টাইপ মেসিন ব্যবহার করা হয় তাতে শেখাই যুক্তিযুক্ত। ভাল ফুটবল খেলা শিখতে হলে কোন ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শেখার অভ্যাস করাই উচিত। শুধু টাইপযন্ত্রটি একটু-আধটু ব্যবহার করতে শিখলেই চলবে না, দক্ষতা অর্জন করতে হলে নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া করার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, তা না হলে ভবিষ্যতে পুরনো অভ্যাস কর্মদক্ষতার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

শিক্ষণীয় বিষয়ে মনঃসংযোগ

**(৩) স্বাভাবিক অংশে ভাগ করে নিয়ে শিখতে হবে, খণ্ড খণ্ড অংশে নয় (Learn in natural units, not piece-meal):** খণ্ড খণ্ড অংশে ভাগ করে শিক্ষা না করে সম্পূর্ণভাবে কোন বিষয় শিক্ষাকরার চেষ্টাই অধিকতর ফল প্রদান করে। অনেক সময় খুঁটিনাটি বিষয়ের অনুশীলনের দিকেই অধিকতর মনঃসংযোগ করা হয়। সামগ্রিকভাবে কর্মসম্পাদনের দিকে নজর থাকে না। এর ফলে শিক্ষার্থী খুঁটিনাটি বিষয়ে নিজের দক্ষতা প্রকাশ করতে পারলেও, বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একত্রে সমন্বিত করে সম্পূর্ণ কাজটি সমাধা করতে পারে না।

স্বাভাবিক অংশে ভাগ করে নিয়ে শিখতে হবে, খণ্ড অংশে নয়

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, প্রয়োজন হলে শিক্ষণীয় বিষয়টির সুবিধাজনক অংশে বিভক্ত করে নেওয়া হবে না। আসল কথা হল, অংশগুলি যেন কৃত্রিম না হয়ে স্বাভাবিক হয় এবং অংশগুলির মধ্যে যেন একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে। টাইপ শিক্ষা করতে গিয়ে সাধারণতঃ শিক্ষার্থীরা এক একটি শব্দকে 'একক' হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষা করতে থাকে। কিন্তু যদি টাইপ যন্ত্রের 'Key board' সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করে প্রথম থেকেই এক একটি অক্ষর টাইপ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে প্রচেষ্টার সংখ্যা প্রায় অর্ধেক নেমে আসে। অনুরূপভাবে, মোটর গাড়ি চালাবার সময় যদি তার খুঁটিনাটি অংশগুলি বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা করার চেষ্টা না করে, অংশগুলির একত্র পরিচালনা শিক্ষা করার উপর জোর দেওয়া হয় তাহলে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। কেননা, গাড়ি চালনা করার সময় একই সময়ে বিভিন্ন অংশগুলি চালনা করে তাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হয়।

(৪) **সময়ের ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি (Space learning trials) :** কোন বিষয়ের দক্ষতা বা নৈপুণ্য অর্জন করতে হলে, এক নাগাড়ে একটি বিষয় শিক্ষা করার চেয়ে কিছু সময়ের ব্যবধানে সেটি পুনরাবৃত্তি করাই অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। যেমন, একটি কবিতা একবারে মুখস্থ করার চেষ্টা না করে যদি কয়দিন ধরে দিনে দু' তিনবার করে পড়া যায় তাহলে সেটি সহজেই মুখস্থ হয়। এর কারণ, একটানা পরিশ্রমে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অবসাদ জাগে, শিক্ষণীয় বিষয়টি একঘেঁয়ে মনে হয়। ফলে, শিক্ষণের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। সময়ের ব্যবধানে শিক্ষা করলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াশক্তি বর্ধিত হয়, অবসাদ আসে না, একঘেঁয়েমির ভাবটা কেটে যায়।

সময়ের ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি

(৫) **শিক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাছাড়াও অধিশিক্ষণের দরকার (Over-learn, do not count on barely learning the task) :** কাজে নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের অর্থ হল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য-জনক ও ত্রুটিহীন সমন্বয়সাধন। এর জন্য শুধু সঠিকভাবে কর্ম-সম্পাদন করতে হলে যতটুকু শিখতে হয়, ততটুকু শিখলেই চলবে না, আরও কয়েকবার বেশি অনুশীলন করে, বিষয়টিকে ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে। একেবারে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু শিক্ষা করলে আয়ত্ত বিষয়টি ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকবে এবং অল্পের জন্যও যদি মন বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ হয় তাহলে কর্মে প্রতিবন্ধকের সঞ্চার হবে। কুচকাওয়াজে যতই পারদর্শিতা

অধিশিক্ষণ

আসুক না কেন, তবু সৈন্যদের নিয়মিত কুচকাওয়াজ করে যেতে হয় যাতে ঐ ব্যাপারে দক্ষতা হ্রাস না পায়। দশজনের সামনে কোন বিষয়ে নিজের দক্ষতা দেখাতে হলে দক্ষ ব্যক্তিকেও নিয়মিত অনুশীলন করে যেতে হয় যাতে দশের সামনে দাঁড়াতে গিয়ে কোন স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা না দেয়। বাস্তব জীবনে এই অধিশিক্ষণের মূল্য আমরা সকল সময়ই উপলব্ধি করি।

**(৬) দক্ষতা অর্জনে কর্মের গতি বা নিপুণতা কোন্‌টি প্রয়োজন? (Speed or Accuracy ?):** কর্মে গতি বা নির্ভুলতা, কোনটির উপর প্রথম জোর দেওয়া হবে তা নির্ভর করে যে পরিবেশে কাজটি করা হয় তার উপর। তবু সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, কর্মের গতির তুলনায় নির্ভুল কর্ম-সম্পাদনের উপরই জোর দেওয়া উচিত। যেমন, টাইপ শেখার সময় প্রথম নির্ভুলভাবে শেখার উপর জোর দিতে হবে তারপর ধীরে ধীরে গতি বাড়াতে হবে, তাহলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন—ইট তৈরী করার সময় গতির দিকে নজর দিলেই ভাল হয়।

**গতির তুলনায় নির্ভুলতাই বেশী প্রয়োজনীয়**

**(৭) দক্ষতা অর্জনে উপদেশ বা তত্ত্বাবধানের কতটুকু প্রয়োজন? (How much guidance ?):** এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন, তবে কাজের শুরুতে ভুলভ্রান্তি পরিহার করে সঠিকভাবে কর্ম-সম্পাদনের জন্য যে বিচক্ষণ ব্যক্তির উপদেশ বা তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন আছে তা স্বীকার করতেই হবে। তবে শিক্ষার্থী পরে যেভাবে কাজটি সম্পাদন করবে সেভাবে শিক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ পরবর্তী সময় অপরের উপর নির্ভর না করে নিজেকেই কাজ করতে হবে। পরনির্ভরতা উত্তরকালে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাসের প্রতিবন্ধক হতে পারে। সবচেয়ে ভাল নীতি হল, শিক্ষার্থী শিক্ষণের সময় আত্মনির্ভরতা অনুশীলন করবে, শুধু বিশেষ প্রয়োজনে অপরের উপদেশ বা নির্দেশ গ্রহণ করবে।

**নির্দেশ ও আত্ম-নির্ভরতা উভয়ই প্রয়োজন**

**(৮) ক দক্ষতার জন্য প্রেষণা থাকা দরকার (Motivation):** উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হলে যে সক্রিয় বা গতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় প্রেষণা। এই অবস্থায় উদ্দেশ্যকে লাভ করার জন্য মনে তীব্র অনুরাগ বা আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। নৈপুণ্য অর্জনের জন্য এই প্রেষণার সমধিক প্রয়োজন। দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর দৃঢ়সংকল্প

**প্রেষণা**

ও উৎসাহ থাকা দরকার। অবশ্য উৎসাহ, বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। অতি উৎসাহের ফলে ভুলগুলিও শেখা হয়ে যেতে পারে। কাজের ফলাফল, নিজের সঙ্গে ও অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা প্রভৃতি প্রেষণার কাজ করতে পারে।

## ১৩। অভ্যাস (Habit) :

ঐচ্ছিক ক্রিয়া থেকেই অভ্যাস উদ্ভূত। ঐচ্ছিক ক্রিয়া বার বার সম্পাদিত হলে, সেটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। কোন একটি ঐচ্ছিক ক্রিয়া বার বার করাতে কাজটি সহজে সম্পন্ন করার একটা প্রবণতা অর্জিত হয়, যার ফলে ভবিষ্যতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কাজটি সম্পন্ন হয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে চিন্তা এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বার বার করার জন্য পরে কাজটি এতই সহজ হয়ে পড়ে যে আগের মতন মনোযোগ এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না : পরবর্তীকালের যান্ত্রিকভাবেই সেটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এইভাবে একটি ঐচ্ছিক ক্রিয়া অভ্যাসে পরিণত হয়। লেখা, গান করা, নাচা, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা এগুলি অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়ার (Habitual action) উদাহরণ। অভ্যাস হল অর্জিত ক্রিয়া, সহজাত (Innate) নয়। অভ্যাস হল স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া, কারণ অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে একই ধারায় বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয় বলে এ একরূপ স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া। বস্তুতঃ, অভ্যাস হল মাধ্যমিক স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া (Secondarily automatic action)। সেজন্য অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া হল যান্ত্রিক, স্বতঃসঞ্জাত বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া। অভ্যাস হল শিক্ষানির্ভর, শিক্ষানিরপেক্ষ নয়।

ঐচ্ছিক ক্রিয়া বার বার সম্পাদিত হলে অভ্যাসে পরিণত হয়

**অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য (The Characteristics of Habit) :**

(ক) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া হল একই প্রকৃতিবিশিষ্ট (uniform)। ঐচ্ছিক ক্রিয়া বিভিন্নভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া একই ভাবে সম্পন্ন হয়। একজন লোক একই ভাবে কথা বলে, একই ভাবে লেখে।

(খ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়। অভ্যাস যত ভালভাবে গঠিত হয়, তা তত দ্রুত সম্পন্ন হয়।

(গ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া কেবল যে দ্রুত সম্পন্ন হয় তা নয়, যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয়। যত ভালভাবে অভ্যাস গঠিত হয় অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়াও তত সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।

(ঘ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন হয় যদিও অভ্যাস গঠনের জন্য মনোযোগের দরকার। অভ্যাস একবার গঠিত হলে বিশেষ বা আদৌ কোন মনোযোগের আর প্রয়োজন হয় না।

(ঘ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া বেশ সহজভাবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়। অভ্যাস সুগঠিত হলে কাজে ক্লান্তির ভাব আর থাকে না বা কম থাকে।

(চ) অভ্যাস যতই ভালভাবে গঠিত হয়, ততই সেই অভ্যাস পরিহার করা কঠিন হয়ে পড়ে। মদ্যপানে যে ব্যক্তি বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তার পক্ষে সহজে সে অভ্যাস ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

**অভ্যাস ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (Habit and Reflex Action) : অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

**অভ্যাস ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মধ্যে সাদৃশ্য**

অভ্যাস যদিও ঐচ্ছিক ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত তবুও অভ্যাসটি গঠিত হবার পর সেটি অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার রূপ লাভ করে। প্রতিবর্ত ক্রিয়াও ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়া, উভয়ই দ্রুত সম্পন্ন হয়। উভয় ক্রিয়াই একটি বিশেষ ধারায় সম্পন্ন হয়। উভয় ক্রিয়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। উভয় ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই চেতনা, মনোযোগ এবং ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না।

তবে অভ্যাসের সঙ্গে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নিম্নলিখিত বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় :

(ক) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া হল জটিল, কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়া হল সরল।

**অভ্যাস ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য**

সাঁতার দেওয়া হল অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া। এটি একটি জটিল ক্রিয়া, কিন্তু হাঁচা হল একটি সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়া।

(খ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া হল অর্জিত ক্রিয়া (Acquired action)। সক্রিয় প্রচেষ্টার সাহায্যেই অভ্যাস গঠিত হয়, কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়া হল সহজাত (Innate)।

(গ) কোন অভ্যাস গঠিত হবার পর ব্যক্তি ইচ্ছা করলে নিজের চেষ্টায় সেই অভ্যাস বর্জন করতে পারে, কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়া বর্জনের কোন প্রশ্ন ওঠে না, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে এর প্রকাশ রোধ করা যায়।

(ঘ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া গঠিত হবার প্রথম স্তরে ঐচ্ছিক, কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়া সর্বস্তরেই অনৈচ্ছিক।

**অভ্যাস ও সাহজিক ক্রিয়া** (Habit and Instinctive Action) :

অভ্যাস ও সাহজিক ক্রিয়ার সাদৃশ্য

অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া এবং সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে দু'এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয় ক্রিয়াই জটিল এবং উভয় ক্রিয়াই কোন-না-কোন উদ্দেশ্যসাধন করে।

কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

(ক) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া হল অর্জিত বা শিক্ষালব্ধ (acquired)। চেষ্টার দ্বারা অভ্যাস গঠন করতে হয়, কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া সহজাত বৃত্তির জন্যই ঘটে। সহজাত প্রবৃত্তি হল জন্মগত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, অর্জিত নয়।

অভ্যাস ও সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য

(খ) ঐচ্ছিক ক্রিয়া থেকেই অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়ার উদ্ভব, কিন্তু জৈব অভাব এবং প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত এক প্রকার অস্বস্তিবোধ বা চেতনা সাহজিক ক্রিয়ার উৎস।

(গ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া ব্যক্তিগত (individual); বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অভ্যাস দেখা যায়, কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া হল জাতিগত (racial)। সহজাত প্রবৃত্তি হল জাতিগত বৈশিষ্ট্য; খাদ্য ,অন্বেষণ, বাসা নির্মাণ, শাবক প্রতিপালন, এসব ক্রিয়া কোন এক শ্রেণীর সকল জীবের মধ্যেই দেখা যায়।

(ঘ) অভ্যাস গঠিত হলে তাকে প্রয়োজনবোধে বর্জন করা চলে, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিকে একেকবারে বর্জন করা সম্ভব নয়, তবে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সাহজিক ক্রিয়াকে অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত করা যায়।

(ঙ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া অনৈচ্ছিক হলেও গঠনের প্রথম স্তরে ঐচ্ছিক; কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া সর্ব অবস্থাতেই অনৈচ্ছিক, কোন পূর্বকল্পিত উদ্দেশ্য দ্বারা সাহজিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত নয়। বার বার চেষ্টা করে অভ্যাস গঠন করতে হয়, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি হল জন্মগত বিষয় এবং সহজাত প্রবৃত্তিই সাহজিক ক্রিয়ার মূলে বর্তমান।

**সহজাত প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রভাব** (Influence of Habit on Instinct) : সহজাত প্রবৃত্তি কি অভ্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে জেম্‌স এবং ম্যাক্‌ডুগাল দুটি ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন :

**জেম্‌সের অভিমত (Jame's View) :** জেম্‌সের মতে সহজাত প্রবৃত্তি অভ্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। প্রথমতঃ, জেম্‌স মনে করেন অভ্যাস কোন একটি সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে একটি নির্দিষ্ট পথে চালিত করে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে, বা কোন সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশের পথে বাধার সঞ্চার করতে পারে। বছরের পর বছর পাখি একই গাছের শাখায় বাসা বাঁধে। অভ্যাসের জন্যই সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ একটি নির্দিষ্ট সীমিত পথে চালিত হয়। আবার অভ্যাসের জন্য সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। সদ্যোজাত মুরগীশাবককে প্রথম থেকেই যদি মানুষের পিছু পিছু চলতে অভ্যস্ত করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে তার ভয় প্রবৃত্তিটি দূর হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে 'ভয়' এই সহজাত প্রবৃত্তিটির প্রকাশ অভ্যাসের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হল। অনেক সময় কুকুর, বিড়াল, মুরগী প্রভৃতি প্রাণীগুলিকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, তারা সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে—এর মূলেও অভ্যাসের প্রভাব।

**সহজাত প্রবৃত্তি অভ্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে**

দ্বিতীয়তঃ, জেম্‌সের মতে আমাদের অনেক সহজাত প্রবৃত্তি আছে যেগুলি দীর্ঘস্থায়ী নয়। তিনি বলেন যে, যদি অভ্যাসের দ্বারা এই সব প্রবৃত্তির প্রকাশকে আরও দৃঢ় করা যায়, তাহলে সহজাত প্রবৃত্তিটির যখন আর কোন প্রয়োজন নেই তখনও সেটি চলতে থাকবে। আর যদি অভ্যাসের দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ বন্ধ করা যায় তাহলে সেটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ শিশুদের স্তন্যপানের বিষয়টিকে গ্রহণ করা যাক: শৈশব থেকেই যদি এই সহজাত প্রবৃত্তিটিকে অভ্যাসের দ্বারা দৃঢ় করা যায় তাহলে যখন এর আর কোন প্রয়োজন নেই বা স্বাভাবিকভাবে এই প্রকাশ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত, তখনও এটি সমানভাবে কার্যকর হয়; আবার ছোট থেকেই কোন শিশুকে যদি মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত করে, চামচ দিয়ে দুধ খাওয়ান অভ্যাস করা হয় তাহলে অতি শৈশব থেকেই এ প্রবৃত্তির প্রকাশ বিলুপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কারও দিনে পাঁচবার ক্ষিধে লাগে, কারও বা একবার ক্ষিধে লাগে। সহজাত প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রভাব কতখানি তা উদাহরণের সাহায্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অভ্যাসের দ্বারা সাহজিক ক্রিয়ার নিরোধ ঘটতে পারে বা তা পরিবর্তিত হতে পারে বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

**সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষণস্থায়িত্ব**

**ম্যাকডুগালের অভিমত (McDougall's View) :** ম্যাকডুগালের মতে জেম্‌স ব্যবহারিক জীবনে অভ্যাসের প্রভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার উপরে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি স্বীকার করেন যে, অভ্যাস সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে কিছু পরিমাণে দৃঢ়তর করে তুলতে পারে এবং কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু প্রধান প্রধান সহজাত প্রবৃত্তিগুলি ক্ষণস্থায়ী নয়, সেগুলি আজীবন স্থায়ী হয়। বিপরীত অভ্যাসের দ্বারা সেগুলিকে লুপ্ত করে দেওয়া সম্ভব নয়, যদিও তাদের প্রকাশকে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করা যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে জীবের মৃত্যুও ঘটতে পারে। যেমন, পশুপক্ষীর স্বাভাবিক সঙ্গমেচ্ছাকে যদি রোধ করা হয় তাহলে তাদের মৃত্যু ঘটা সম্ভব। যদি সাময়িকভাবে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে রুদ্ধ করাও হয়, তাহলে সুযোগ পাওয়া মাত্রই সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। ম্যাকডুগাল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেন যে, বন্য হাঁসের জন্মাবার পরেই যদি ডানা কেটে দেওয়া হয় এবং সাময়িকভাবে তাদের উড়ে বেড়াবার সহজ প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে ডানা গজান মাত্রই তারা উড়তে শুরু করছে।

প্রধান প্রধান সহজাত প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী নয়

সুতরাং ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তির কাছে অভ্যাস একান্তই শক্তিহীন। বস্তুতঃ, অভ্যাস সহজাত প্রবৃত্তির অধীন।

**অভ্যাস গঠনের নিয়ম (Formation of the Laws of Habit) :** উইলিয়াম জেম্‌স অভ্যাস গঠনের জন্য কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন। এই নিয়মগুলি নীচে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

(ক) নতুন অভ্যাস গঠনের জন্য প্রয়োজন দৃঢ়সঙ্কল্প। দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে যদি কাজ শুরু করা যায় তাহলে সহজেই অভ্যাসটি গঠিত হয়। যদি কোন ছাত্র খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবার অভ্যাস আয়ত্ত করতে চায় তাহলে সর্বপ্রথমে সেটি করার জন্য মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করতে হবে।

দৃঢ়সংকল্প

(খ) মনের সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করার জন্য প্রথম সুযোগটিরই সদ্ব্যবহার করতে হবে। ছাত্রটির ভোরে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করার জন্য পরের দিন থেকেই তাকে কাজ শুরু করতে হবে। নইলে অনাবশ্যক বিলম্ব করলে সঙ্কল্প দুর্বল হয়ে যেতে পারে এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনের অভাব দেখা দিতে পারে।

প্রথম সুযোগের সদ্ব্যবহার

(গ) অভ্যাসটি আয়ত্ত করার সময় কোন ব্যতিক্রম যাতে না ঘটে সেদিকে নজর রাখতে হবে। ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আয়ত্ত করতে হলে দিনের পর দিন সেটি করে যেতে হবে। কোন ওজর দেখিয়ে যদি ব্যতিক্রম ঘটান হয় তাহলে অভ্যাস গঠনের পথে বাধা দেখা দেবে।

**অভ্যাস আয়ত্ত করতে গিয়ে ব্যতিক্রম ঘটান চলবে না**

(ঘ) যে অভ্যাসের প্রত্যহ অনুশীলন সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে সুযোগমত কাজটির অনুশীলন করা উচিত। যেমন, বন্দুক দ্বারা লক্ষ্যভেদ।

**অনুশীলন**

(ঙ) অপর ব্যক্তিকে দিয়ে যদি কোন অভ্যাস গঠন করতে হয় তাহলে সেই ব্যক্তির সামনে নিজের অভ্যাসটির অনুশীলন করা উচিত। মাতাপিতা যদি চান যে তাঁদের সন্তান সত্য কথা বলা অভ্যাস করুক, তাহলে মাতাপিতার উচিত হবে কখনও সন্তানের সামনে মিথ্যা কথা না বলা।

**অপরের সামনে অভ্যাস আয়ত্ত করা**

**কু-অভ্যাস বর্জনের নিয়ম (Rules of breaking bad habits) :** উইলিয়াম জেম্‌স (*W. James*), কু-অভ্যাস বর্জন করার জন্য কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন :

(ক) কোন কু-অভ্যাস যদি বর্জন করতে হয় তাহলে অবিলম্বে তা করার জন্য দৃঢ়সংকল্প গঠন করতে হবে। ভবিষ্যতে সুযোগমত কু-অভ্যাসটি বর্জন করব, বা সেটিকে ধীরে ধীরে বর্জন করব, এ জাতীয় ওজর করলে সেটিকে আর দূর করা যাবে না। ধূমপানের অভ্যাস যে বর্জন করতে চায়, কোন অজুহাতে যদি তা করতে বিলম্ব হয় তাহলে সেই অভ্যাস আর বর্জন করা সম্ভব হয় না।

**কু-অভ্যাস বর্জনে বিলম্ব করা চলবে না**

(খ) কু-অভ্যাসটি বর্জন করার জন্য কেবলমাত্র সেটিকে দূর করার চেষ্টা না করে অপর একটি সুঅভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন সিনেমা দেখায় অভ্যস্ত, সে ব্যক্তি যদি অভ্যাসটি দূর করতে চায় তাহলে যে সময় সে সিনেমায় যায় সে সময় তার সাহিত্যপাঠ বা সঙ্গীত চর্চা প্রভৃতির অভ্যাস করা ভাল।

**সুঅভ্যাস গঠন করা**

(গ) কু-অভ্যাস বর্জন করার জন্য এমন একটি পরিবেশে নিজেকে রাখার চেষ্টা করতে হবে যাতে প্রলোভনের দ্রব্য চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে না পারে। যে ব্যক্তি মদ্যপানের কু-অভ্যাস বর্জন করতে চায়, মদ্যপায়ীদের সঙ্গ বর্জন করে তার পক্ষে উচিত সৎব্যক্তির সঙ্গলাভ করা।

অভ্যাস গঠনের উপযোগী পরিবেশ

(ঘ) কু-অভ্যাস বর্জনের জন্য যেমন মনের দিক থেকে প্রস্তুতির প্রয়োজন তেমনি দেহের দিক থেকেও প্রস্তুতির প্রয়োজন। কু-অভ্যাস বর্জনের জন্য দেহকেও মনের সঙ্গে সঙ্গে উপযোগী করে নিতে হবে। কারও কারও মতে অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করার ফলে মস্তিষ্কে স্নায়ুপথ (nervous pathways) রচিত হয়। বিপরীত অভ্যাস গঠন করে সেই স্নায়ুপথগুলিকে পরিবর্তিত করে দিতে পারলে অভ্যাসটিকে বর্জন করা সহজ হয়।

দৈহিক প্রস্তুতি

**অভ্যাসের সুফল ও কুফল** (Uses and Abuses of Habit): **সুফল:** (১) যে-সব কাজ পরিশ্রমসাপেক্ষ, অভ্যাস গঠিত হলে সেসব কাজ সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে সম্পন্ন করা যায়। (২) অভ্যাস দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপচয় নিবারণ করে এবং সেই শক্তিকে প্রয়োজন বোধে অন্যত্র নিয়োগ করে আমরা কোন জটিল কার্য সম্পন্ন করতে পারি। (৩) অভ্যাস গঠনের ফলে বিনা মনোযোগেই কাজ করা যায়। (৪) কোন অভ্যাস ভালভাবে গঠিত হলে, আমরা কাজটি সুষ্ঠুভাবে অল্প আয়াসে সম্পন্ন করতে পারি, তার ফলে কাজ করার জন্য কোন ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করি না বা কম অনুভব করি। (৫) অভ্যাসের ফলে কাজ বেশ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা যায়, তার ফলে মূল্যবান সময়ের অযথা অপচয় বন্ধ হয়। (৬) অভ্যাসের জন্য কাজে যোগ্যতা এবং দক্ষতা জন্মে। (৭) আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্পর্কীয় কতকগুলি সুঅভ্যাস যদি শৈশবেই আয়ত্ত করা যায় তাহলে আমাদের সামাজিক জীবন সুন্দর ও প্রীতিকর হয়। (৮) অভ্যাস আমাদের মানসিক উন্নতিবিধানেও সহায়তা করে।

দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাসের সুফল

শিক্ষার ক্ষেত্রে সুঅভ্যাস গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। যে ছাত্র সৎ আচরণে অভ্যস্ত, নিয়মিতভাবে পাঠ প্রস্তুত করে ও দৈনন্দিন জীবনের করণীয় কাজগুলি সময়মত করে, তার ভবিষ্যৎ জীবন যে খুব উজ্জ্বল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের সুফল

শৈশবের অভ্যাসই ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। (৯) অভ্যাস গঠনের ফলে সাধারণ কাজগুলি করার জন্য বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন হয় না, ফলে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, নীতি প্রভৃতি উচ্চতর বিষয়গুলির চর্চায় মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়।

কু অভ্যাস সহজে বর্জন করা যায় না

**কুফল:** (১) অভ্যাস একবার গঠিত হলে তাকে বর্জন করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। এই কারণে শৈশব থেকেই যারা কু অভ্যাসের দাস, আত্মসংযম ও কঠিন মনোবলের সহায়তায় সেই সব কু-অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে প্রায় সম্ভব হয় না। (২) কু-অভ্যাস অনেক ক্ষেত্রে মানসিক উন্নতির অন্তরায় হয়ে পড়ে। অভ্যাস মানুষের মনকে চিন্তা ও ক্রিয়ার নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমিত করে রাখে। এতে মানুষের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাবের সৃষ্টি হয়, যার জন্য মানুষ নতুনকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না। অভ্যাসের ধর্ম হল গতানুগতিকতা, সংরক্ষণশীলতা, কিন্তু জীবনে যদি অভিনবত্ব না থাকে, নতুন পরিবেশ, নতুন অবস্থায় যদি মন প্রতিক্রিয়া করতে না পারে, তবে তাতে জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

কু-অভ্যাস মানসিক উন্নতির অন্তরায়

অভ্যাস অভিনবত্বের অন্তরায়

## ১৪। শিক্ষার্থীর মধ্যে পঠনের অভ্যাস কিভাবে গড়ে তোলা যায়? (How to develop reading haibt in pupils):

নিয়মিত অনুশীলন ও পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহ

**প্রথমতঃ,** নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থী যাতে পাঠ্যবিষয়টি অনুশীলন করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দ্বিতীয়তঃ, পাঠ্য বিষয়টির প্রতি শিশুর আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। পাঠ্যবিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য যাতে শিক্ষার্থীর কাছে বোধগম্য হয় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। সেকারণে প্রয়োজন শিশুর উপযোগী পাঠ্যবিষয়ের ব্যবস্থা করা। পাঠ্যবিষয় যদি দুর্বোধ্য, নীরস, অতৃপ্তিকর এবং বিরক্তিজনক হয় তাহলে শিশু তার প্রতি মনোযোগী হতে পারে না, এবং সেই পাঠ্যবিষয়কে শিশু এড়িয়ে চলতে চায়, ফলে পঠনের অভ্যাস গড়ে ওঠে না। তৃতীয়তঃ, পাঠ্যবিষয়টি যাতে শিশুর কৌতূহল উদ্রেক করে তার জন্য শিক্ষককে যত্নবান হতে হবে। কৌতূহলই শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তুলবে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে পঠনের অভ্যাস গড়ে তুলবে। চতুর্থতঃ, শিক্ষার্থী যাতে সুন্দর ভাবে উচ্চারণ করে, ধীরে ধীরে পাঠ্যবিষয়টি আয়ত্ত করে তার দিকে লক্ষ্য

রাখতে হবে। তাহলে পাঠ্যবিষয়ের তাৎপর্য শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রয়োজনে শিশুকে সরবে বা নীরবে পাঠ্য আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষা দিতে হবে। পঞ্চমতঃ, পঠনের উপযোগী পরিবেশ, শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি ও পঠনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য খুবই প্রয়োজন। বিরক্তিকর ও অমনোরম পরিবেশে শিশু কখনও পাঠ্যবিষয় অনুশীলনে সমর্থ হয় না। পঠনের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতি গঠনের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। পঠনের সার্থকতা সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তুলতে হবে। ষষ্ঠতঃ, পঠনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে হবে। অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি কিছুটা শিথিলতা প্রথম স্তরে লক্ষ্য করা যায় তাহলে অযথা তিরস্কার, শাস্তি, নিন্দা উপাখ্যানের দ্বারা তাকে নিরুৎসাহ করলে চলবে না। অভ্যাস গঠনের জন্য তার মনে দৃঢ়সঙ্কল্প জাগিয়ে তুলতে হবে। সপ্তমতঃ, শিক্ষক যদি পাঠ্যবিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে নিয়মিতভাবে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে, তাহলেও শিশুর পঠনের অভ্যাস গড়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর সঙ্গে সঙ্গে যদি অপর কোন ব্যক্তিও নিয়মিতভাবে পঠনের অভ্যাস করেন তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজেই পঠনের অভ্যাস গড়ে ওঠে। পঠনের অভ্যাসের কার্যকারিতা শিক্ষার্থীর কাছে ব্যাখ্যা করা হলে শিক্ষার্থী অভ্যাস অর্জন করার সার্থকতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

## ১৫। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যাসগঠন (Formation of useful habits in school children) :

ছাত্রজীবনে ছাত্ররা যাতে নিজেদের উপযুক্ত করে তুলতে পারে সেজন্য পাঠ্যজীবনে ছাত্রদের মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় অভ্যাসগঠনের প্রয়োজন। এই সব অভ্যাসের মধ্যে প্রথমেই নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার আদেশ যাতে ছাত্ররা শৃঙ্খলার সঙ্গে মেনে চলে তার অভ্যাস ছাত্রদের অর্জন করা দরকার; নতুবা বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে পাঠ শিক্ষা করা ছাত্র-ছাত্রীর প্রধান কর্তব্য, সে কারণে নিয়মিত শিক্ষণের অভ্যাস প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে গড়ে তোলা দরকার। শ্রমশীলতার ও সহনশীলতার অভ্যাস যে কোন ছাত্রের মধ্যেই থাকা প্রয়োজন। ছাত্রজীবনে নানারকম বাধা-বিপত্তি বিদ্যা অর্জনে বাধার সঞ্চার করতে পারে। শ্রমশীল ও সহনশীল ছাত্র নির্ভয়ে বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে বিদ্যার্জনে দুরূহ পথে অগ্রসর হতে পারে।

সময়নিষ্ঠার অভ্যাসও ছাত্রজীবনে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময়মত পাঠ অভ্যাস করা, সময়মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজে অংশ গ্রহণ করার অভ্যাস ছাড়া ছাত্রজীবনের লক্ষ্য কখনও সিদ্ধ হতে পারে না। প্রতিটি ছাত্রের প্রয়োজন সহযোগিতার অভ্যাস অর্জন করা। বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজে, খেলাধূলায় ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকা প্রয়োজন। একক প্রচেষ্টায় সকল সময় বাঞ্ছিত ফললাভ ঘটে না, দলগত প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দেয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজই সম্পন্ন হয় না।

ছাত্রদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ও স্বাস্থ্য চর্চার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। এ ছাড়াও যাবতীয় সদভ্যাসও ছাত্রদের অর্জন করা দরকার যাতে তাদের ছাত্রজীবন সুন্দর ও সার্থক হয়।

## ১৬। শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের মূল্য (The Importance of habit formation in Education) :

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, অভ্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই তা উপলব্ধি করা যাবে। অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া দ্রুত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। অভ্যাসের জন্য কাজে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে এবং অভ্যাসসিদ্ধ কাজ সহজভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কোন বিষয় চিন্তা করতে আরম্ভ করা মাত্রই শিশু তা সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ত করতে পারে না, একমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই বিষয়টিকে ক্রমশঃ আয়ত্ত করতে থাকে। যেমন, কোন শিশু যখন লিখতে শেখে তখন প্রথম প্রথম কাজটি তার কাছে দুরূহ মনে হয় কিন্তু নিয়মিত লেখা অভ্যাস করতে করতে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে লিখতে পারে। কোন বিষয় দুরূহ মনে হলে শিক্ষার্থীর তা শিক্ষা করতে প্রথমে মানসিক অবসাদ জাগে এবং শেষ পর্যন্ত যে দুরূহ বিষয়টি তার আয়ত্তের মধ্যে এসে যায়, কারণ হল অভ্যাস। সঙ্গীত বা অন্যান্য ললিতকলায় যাঁরা পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, তাঁরা জানেন যে তাঁদের এই পারদর্শিতার মূলে রয়েছে শুধুমাত্র আগ্রহ নয়, নিয়মিত শিক্ষণের অভ্যাস। সে কারণে শিক্ষণের অন্যতম কর্তব্য হল শিশুর মধ্যে শিখবার অভ্যাসটি গড়ে তোলা। মনোবিজ্ঞানী জেম্‌স (*James*)-এর মতে যথোচিত অভ্যাস গঠন করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য।

অভ্যাসের দ্বারাই শিক্ষণীয় বিষয়কে আয়ত্ত করা যায়

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন যার দ্বারা শিক্ষার্থী তার আচরণে পরিবর্তন এনে কোন অবস্থায় যথোচিত প্রতিক্রিয়া করতে পারে। কিন্তু শেখা আচরণগুলি যদি অভ্যাসের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা না হয়, তাহলে অবস্থানুসারে প্রতিক্রিয়া করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয় না। একমাত্র অভ্যাসের অভাবের জন্যই অনেক বিষয় শেখা সত্ত্বেও আমরা প্রয়োজনমত তার সদ্ব্যবহার করতে পারি না।

অভ্যাসের জন্যই শিক্ষার অগ্রগতি সাধিত হয়

অভ্যাসের জন্যই শিক্ষার অগ্রগতি সাধিত হয়, যে বিষয়টি শেখা হল, তাকে যদি অভ্যাসের দ্বারা বিশেষভাবে আয়ত্ত করে নেওয়া না হয়, তাহলে নতুন বিষয় শিক্ষা করা সম্ভব হবে কি ভাবে? সমস্ত জীবন ধরে যে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হবে, তাকে যদি বিশেষ কয়েকটি প্রতিক্রিয়া করার কৌশল আয়ত্ত করার দিকেই নজর রাখতে হয় তাহলে নতুন নতুন প্রতিক্রিয়া করার কৌশল সে আয়ত্ত করবে কি ভাবে? কাজেই অভ্যাস শিক্ষার্থীর সময়ের ও শক্তির অপচয় রোধ করে, তাকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা নয় দক্ষতা বা নৈপুণ্য অর্জন করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে কোন শিক্ষণীয় বিষয়ের নিয়মিত অনুশীলনের অভ্যাস যদি কোন শিক্ষার্থীর না থাকে, তাহলে সে বিষয়ে তার পক্ষে দক্ষতা অর্জনকরা কোন মতেই সম্ভব নয়। যে শিক্ষার্থী টাইপরাইটিং-এ দক্ষতা অর্জন করতে চায় তাকে নিয়মিতভাবে তা অভ্যাস করতে হবে, তবেই তার অভিলাষ পূর্ণ হবে।

অভ্যাসের দ্বারাই নৈপুণ্য অর্জিত হয়

শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস ক্রমবিকাশ। শিশুর মধ্যে সৎ অভ্যাস গঠিত হলেই শিক্ষার এই লক্ষ্য সিদ্ধ হয়। নিয়মানুবর্তিতা, শ্রমশীলতা, ন্যায়-পরায়ণতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি অভ্যাসগুলি যদি শিশুর মধ্যে শৈশবেই গঠিত না হয়, তাহলে উত্তরকালে যথোচিত অভ্যাস গঠন শিশুর ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং মন্দ অভ্যাসের দূরীকরণও কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। মাতাপিতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের অবহেলার জন্য শিশু শৈশবে এমন কতকগুলি মন্দ অভ্যাস গঠন করে যেগুলি তার ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস গঠনের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এক কারণ কোন্ অভ্যাস বর্জনীয় এবং কোন্ অভ্যাস অবাঞ্ছনীয় শিশুর পক্ষে তা

সৎ অভ্যাস ব্যক্তি সত্তার সুষ্ঠু সংগঠনে সহায়তা করে

নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। যাঁরা শিশুর অভিভাবকস্থানীয় তাঁদের উচিত শিশুকে যথোচিত আচরণটি অনুকরণ করতে এবং অভ্যাস করতে সহায়তা করা। সুতরাং শিক্ষকের কাছে এই বিষয়টির শিক্ষাগত তাৎপর্য সমধিক। যে শিশুর মধ্যে সৎ অভ্যাস গঠিত হয়, সে শিশু অসীম শক্তির আধার এবং এই শক্তির সদ্ব্যবহারের দ্বারা শিক্ষক তার ব্যক্তিসত্তাকে সুষ্ঠুভাবে গঠনে প্রয়াসী হতে পারেন।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। শিক্ষার্থীর শিক্ষণকার্য সেই লক্ষ্যাভিমুখেই পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষণকার্য কখনও উদ্দেশ্যহীন হওয়া উচিত নয়। শিক্ষার্থীর অভ্যাসের সঙ্গে এই উদ্দেশ্যের যাতে নিগূঢ় সম্পর্ক থাকে শিক্ষকের উচিত হবে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

**উদ্দেশ্যহীনভাবে অভ্যাস গঠন যুক্তিযুক্ত নয়**

কোন শিক্ষার্থী যদি উদ্দেশ্যহীন ভাবে কতকগুলি অভ্যাস অর্জন করে, তাহলে সে অভ্যাস গঠন কখনও ফলপ্রসূ হয় না। সে কারণে প্রয়োজন শিক্ষকের পক্ষে প্রতিটি অভ্যাসের কার্যকারিতা শিক্ষার্থীর কাছে ব্যাখ্যা করা, যাতে শিক্ষার্থী অভ্যাস অর্জন করার সার্থকতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। উদ্দেশ্যহীনভাবে অভ্যাস গঠনের কোন সার্থকতা নেই—তাতে শিক্ষার্থীর মূল্যবান সময়ের ও মানসিক শক্তির অপচয় ঘটে।

কি কারণে শিশু অবাঞ্ছনীয় অভ্যাস অর্জন করেছে, সেই কারণগুলি জেনে, সেগুলির দূর করার জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। তা না হলে শিশুর

**শিশুর অবাঞ্ছনীয় অভ্যাস দূরীকরণের জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে**

শিক্ষার ক্রমোন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষককে অত্যন্ত সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে, কারণ নিন্দা, শাস্তি, ভীতি প্রদর্শন, ভর্ৎসনা অনেক সময় শিশুর মন্দ অভ্যাস বর্জনে সহায়ক না হয়ে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ শিশুর মধ্যে এমন এক হীনমন্যতা বোধ দেখা দেয় যা শিশুর সুস্থ ব্যক্তিসত্ত্বা গঠনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শুধুমাত্র আচরণ নয়, শিক্ষার্থী যাতে কোন বিষয় সুসঙ্গত ভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করতে পারে তার অভ্যাসও শিক্ষার্থীর অর্জন করা প্রয়োজন। তার ফলে শিক্ষার্থী অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রয়োজন হলেই বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবে, এবং সহজেই কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

আবার এমনও দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও সামর্থ্য থাকলেও তার মধ্যে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা থাকে না; বা ইচ্ছাকে কর্মে প্রয়োগ করার অভ্যাস

গঠিত হয়নি। শিক্ষার্থীর পক্ষে তাই অভ্যাস গঠনেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে, যার ফলে নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুকরণ করে নিজ লক্ষ্যের অভিমুখে নিজেকে পরিচালিত করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হবে।

## ১৭। স্বয়ং শিক্ষণ ও দলগত শিক্ষণ (Self-Learning and Learning in a Group):

শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাকে অর্থাৎ তার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তিকে বিকশিত করা যাতে তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠন হয়। শিক্ষাই শিশুর মধ্যে সামাজিক গুণের সৃষ্টি করে তাকে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে শেখায় অর্থাৎ তাকে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। শিক্ষার এই লক্ষ্য তখনই ব্যাহত হবে যদি কতকগুলি তথ্য দিয়ে শিশুর মন ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। শিশুকে আত্ম-সক্রিয় হয়ে পর্যবেক্ষণ করতে, চিন্তা করতে, সমস্যার সমাধান করতে এবং সিদ্ধান্ত গঠন করতে সুযোগ দেওয়া উচিত।

শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তি-সত্তার সুষ্ঠু সংগঠন

যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, তবুও শিক্ষা বিশেষ করে স্ব-নির্ভর। শিক্ষা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও সক্রিয়তা ছাড়া কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ যদি না থাকে, শিক্ষা গ্রহণে যদি শিক্ষার্থীর উৎসাহ ও ইচ্ছা না থাকে, তাহলে শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন কিছুই শেখা সম্ভব হয় না। সুতরাং স্বয়ংশিক্ষণই শিক্ষার মূলকথা। অন্যের যত সহযোগিতা শিশু লাভ করুক না কেন, শিক্ষার্থীকে নিজের চেষ্টায় শিক্ষণ সম্পূর্ণ করতে হবে। একথা শিক্ষার্থীকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, নব্য শিক্ষা-পদ্ধতি, মণ্টেসরী, কিণ্ডারগার্টেন, ডাল্টন পরিকল্পনা, ডিউই-র প্রকল্প পদ্ধতি প্রভৃতি পরিকল্পনাতে স্বয়ংশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মণ্টেসরী পদ্ধতি হল খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষণ; এখানেও স্বয়ংশিক্ষণের (auto-education) উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাবিদ নান্ (*Nunn*) বলেন যে, "ম্যাডাম মণ্টেসরী শিশুর শিক্ষার দায়িত্বভার সাহসের সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে শিশুর উপরই অর্পণ করেছেন।" এই শিক্ষা পরিকল্পনার প্রতি শিশুকে ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় হতে হয় এবং শিক্ষক ও সহপাঠীদের উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করে যেতে হয়। এই পদ্ধতিতে শিশু নিজের চেষ্টাতেই পড়তে,

শিক্ষা বিশেষ করে স্ব-নির্ভর

মণ্টেসরী পদ্ধতি

লিখতে, সংখ্যা গণনা করতে শেখে, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ গতি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সে নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করতে পারে। মিস্ হেলেন প্যার্কহার্স্ট (*Miss Helen Parkhurst*) ডাল্টন পরিকল্পনা রচনা করেছেন।

ডাল্টন পরিকল্পনা

এই শিক্ষাব্যবস্থাতেও শিশুর স্বয়ংশিক্ষণ ও ব্যক্তিগত ও সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুকে উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়া যে হয় না তা নয়, কিন্তু শিশুকে নিজের প্রচেষ্টাতেই শিখতে হয়। প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ হয়ে ওঠে যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত এক-একটি গবেষণাগার। শিক্ষক শ্রেণীতে যান না। তাঁর কাজ শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা করা নয়, প্রয়োজনমত তত্ত্বাবধান করা, উপদেশ দেওয়া ও নির্দেশ দেওয়া। আর একটি পদ্ধতি আছে যাকে হিউরিস্টিক পদ্ধতি (Heuristic method) নামে

হিউরিস্টিক পদ্ধতি

অভিহিত করা হয়। সেই পদ্ধতিও শিশুর স্বয়ংশিক্ষণের উপর জোর দেয়। এই পরিকল্পনায় শিশুর ভূমিকা হল আবিষ্কারের ভূমিকা। শিশু নিজেই অনুসন্ধান করে বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে সাধারণ (general) এবং অমূর্ত জ্ঞান (abstract knowledge) অর্জন করে। শিক্ষকের কাজ হল শিশুকে প্রয়োজনমত নির্দেশ দেওয়া, বক্তৃতা দেওয়া নয় বা করণীয় কার্য করার জন্য শিশুকে বাধ্য করা নয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সব শিক্ষা-পরিকল্পনাতেই শিশুর স্বয়ংশিক্ষণের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বচেষ্টায় যদি শিশু শিক্ষা করে তাহলে তার

স্বয়ংশিক্ষণের সুফল

মধ্যে মৌলিক চিন্তন ও কল্পনাশক্তি জাগ্রত হয়। কোন সমস্যা সমাধান করার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা জাগে, নিজের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার হয়। স্বাধীনভাবে কোন কিছু শিক্ষা করার সুযোগ লাভ করাতে শিক্ষণীয় বিষয় তার কাছে বিরক্তিকর বা আকর্ষণহীন হয়ে ওঠে না। এর ফলে উত্তর জীবনে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে চলতে শেখে এবং বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকায় নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য সুসঙ্গত ভাবে সম্পন্ন করতে পারে। নিজ নিজ রুচি, প্রবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী শিক্ষা করার সুযোগ লাভ করাতে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। বস্তুতঃ, শিক্ষার্থীর সমস্ত জীবন ধরেই স্বয়ংশিক্ষণ চলতে থাকে, জন্মের সময় থেকেই শিশুর এই শিক্ষণ শুরু হয় এবং জীবনের পরিসমাপ্তিতেই এই স্বয়ংশিক্ষণের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বয়ংশিক্ষণের যেমন মূল্য আছে তেমনি দলগত শিক্ষারও মূল্য আছে। শিশু যেমন নিজেই শেখে তেমনি দলের মধ্যে থেকেও

শিক্ষা লাভ করে। দলের মধ্যে থাকলে শিশু অন্যান্য শিশুদের অনুকরণ করে শিক্ষণীয় বিষয় সহজে আয়ত্ত করতে পারে, সৎ অভ্যাস অর্জন করতে পারে। অবশ্য শিক্ষকের লক্ষ্য থাকা উচিত যাতে শিশু মন্দ কোন কিছু অনুকরণ না করে। দলগত শিক্ষায় প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতা করার এবং সমকক্ষতা লাভের প্রবণতা শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। সুস্থ প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে। প্রতিযোগিতা যদি সমকক্ষদের মধ্যে হয় তাহলে দলের মধ্যে নিজের অবস্থা বুঝে নেবার অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগ্রত হয় এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী শিক্ষার উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হয়। দলগত শিক্ষা শিশুর মধ্যে সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করে। এর ফলে শিশু মিলেমিশে কাজ করতে শেখে, শিশুর মধ্যে সামাজিক চেতনা জাগ্রত হয়। দলগত শিক্ষা শিশুর মধ্যে অপরের সমকক্ষ হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করে। সেসব সময় অপর শিশুদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে এবং তাদের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হয়। দলগত শিক্ষায় শিক্ষার্থী নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সেগুলি সংশোধনের জন্য যত্নবান হয়।

**দলগত শিক্ষণের মূল্য**

এই দলগত শিক্ষা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। (১) দলের মধ্যে থেকেও শিক্ষার্থী স্বয়ংশিক্ষা লাভ করতে পারে। দলের মধ্য থেকে শিক্ষা লাভ করলে শিক্ষার্থীর শিক্ষার যে উন্নতি হয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু যদি একই ছাত্রকে দলের মধ্যে রেখে এবং দলের বাইরে রেখে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য বলা হয় তাহলে দলগত শিক্ষার উৎকর্ষের তুলনায় ব্যক্তিগত শিক্ষার উৎকর্ষ অধিকতরভাবে পরিলক্ষিত হয়। (২) দলগত শিক্ষার আর একটি রূপ হল, একটি বা দুটি ছেলে বোর্ডে লেখে, অন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের ডেস্কে বসে কাজ করে। এতে শিক্ষার্থীর কাজের গতি বাড়ে, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বড় একটা দেখা যায় না। (৩) দলগত শিক্ষার আর একটি রূপ হল, একটি ছাত্র বোর্ডে কাজ করছে, আর ক্লাসের সব ছাত্র তার কাজ লক্ষ্য করছে। প্রশ্ন হল, ছাত্রটি নিজে ডেস্কে কাজ করার সময় যে কাজ করত, তার তুলনায় তার কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে কী? দেখা গেছে, এতে শিক্ষার্থীর কাজের পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ হ্রাস পায়।

**দলগত শিক্ষার প্রকারভেদ**

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা (individual competition) দলগত প্রতিযোগিতার (group competition) তুলনায় বেশী কার্যকর। যদি

প্রতিটি শিশু অপর শিশুর দক্ষতাকে অতিক্রম করার ইচ্ছা নিয়ে প্রতিযোগিতা করে তখন ভাল ফল পাওয়া যায়। আবার যখন একটি শ্রেণী অপর শ্রেণীর দক্ষতাকে অতিক্রম করতে চায়, তখন প্রতিযোগিতার প্রভাব তেমনভাবে পরিদৃষ্ট হয় না। যখন একদল ছেলে এবং একদল মেয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় তখন প্রতিযোগিতা খুবই ফলপ্রসূ হয়।

**ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতা**

সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে ব্যক্তি, না দল, কার বেশি কৃতিত্ব তা নিরূপণ করার জন্য ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটসন (*Watson*) একটি পরীক্ষণকার্য চালান। তিনি একটি বড় শব্দ (যেমন—**regeneration**) যতগুলি অক্ষরের দ্বারা গঠিত (r, e, g, ইত্যাদি), সেই অক্ষরগুলি দিয়ে কতকগুলি নতুন শব্দ গঠন করা যায় (যেমন—**nation, ration** ইত্যাদি) তা পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে তা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি তাদের ২০ জন করে এক একটি দলে বিভক্ত করে, একটি নতুন শব্দ নিয়ে সেই কাজটি করতে বললেন। ঐ একই বিষয়টি আবার ব্যক্তিগতভাবে ও দলগতভাবে পরীক্ষা করে দেখা হল। তিনি দেখলেন, এক একটি দল যে পরিমাণ শব্দ গঠন করেছে তা ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার তুলনায় অনেক বেশি। এই বিষয়টি থেকে অনেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে, সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার তুলনায় দলগত প্রচেষ্টার উৎকর্ষ অধিক। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, ওয়াটসন আরও একটি বিষয় আবিষ্কার করেছিলেন। সব ব্যক্তিদের পৃথক পৃথক ভাবে করা সমাধানগুলি গণনা করে দেখা গেল যে, দলের তুলনায় একা কাজ করতে গিয়ে ব্যক্তি সব চেয়ে বেশী সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের তুলনায় দলের কৃতিত্ব এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। বরং দলের মধ্যে থাকলে ব্যক্তির মৌলিক রচনাশক্তির প্রকাশ তেমন পরিদৃষ্ট হয় না। পরে এ সম্পর্কে (১৯৩২ এবং ১৯৩৩ খ্রীঃ) পরীক্ষণকার্য চালিয়ে অনুরূপ ফলাফলই লক্ষ্য করা গেছে।

**সমস্যার সমাধানে ব্যক্তি না দল, কার কৃতিত্ব অধিক**

কোন সমস্যার সমাধান হোক বা কোন রুটিন বাঁধা কাজ হোক, দলের কাজের পরিমাণ কোন দল-বহির্ভূত বিশেষ ব্যক্তির কাজের তুলনায় শ্রেষ্ঠ; কিন্তু যেসব ব্যক্তি একা একা কাজ করছে, তাদের কাজের পরিমাণের সমষ্টি ও গুণগত উৎকর্ষ, সেই সব ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত দলের কাজের তুলনায় অনেক বেশি।

যেসব শিক্ষার্থী জড় বা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন (idiot) অর্থাৎ বুদ্ধির সোপানে যারা সর্বনিম্নে, তারা দলগত শিক্ষায় বিশেষ লাভবান হয় বলে মনোবিজ্ঞানী সেগুঁই (*Seguin*) উল্লেখ করেছেন। দলগত শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেমন—উইনেট্‌কা পদ্ধতি(Winnetka method), যৌথ-পদ্ধতি (Co-operative method), আলোচনামূলক পদ্ধতি (Discussion method) ইত্যাদি। উইনেটকা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর স্বয়ং-শিক্ষণ ও দলগত শিক্ষণ উভয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। শিক্ষার্থী একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিজেই শিখে নেয় তেমনি দলগত কাজের ভিত্তিতেও অনেক বিষয় শেখে। সঙ্গীত, সাহিত্য, অভিনয়, খেলাধূলা প্রভৃতির মাধ্যমে এই দলগত কাজগুলি সম্পন্ন হয়। এই প্রকার দলগত কাজের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক চেতনা, সহযোগিতার ভাব ও সৃজনমূলক বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। 'যৌথ-পদ্ধতি'ও পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে শিক্ষা গ্রহণ করার পদ্ধতি। আলোচনামূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে কোন একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তার সমাধানের সূত্রটি নিরূপণে সচেষ্ট হয়।

দলগত শিক্ষার লাভ

উইনেটকা পদ্ধতি

যৌথ-পদ্ধতি

আলোচনামূলক পদ্ধতি

## ১৮। প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা (Competition and co-operation) :

প্রতিটি ব্যক্তির জীবনেই এমন কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন তাকে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়, আবার অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয়। অতি শৈশব থেকেই শিশুর জীবনে এই প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। শৈশবে শিশুকে পরিবারের অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। যখন শিশু দেখতে পায় পরিবারের মধ্যে আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী শিশু রয়েছে যে মাতাপিতার স্নেহ-ভালবাসা ও মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করছে, অথচ যা পুরোপুরি সে নিজেই পাবার বাসনা করে, তখনই তার মনে ঈর্ষার ভাব জাগে। এই ঈর্ষার সঙ্গে জড়িত থাকে ক্রোধ, ভয় এবং দুঃখের অনুভূতি। সব শিশুরই মনে কম বেশি ঈর্ষার ভাব জাগে। নানাবিধ অবস্থা এই মনোভাবকে আরও তীব্র করে তোলে। যখন শিশু দেখে মাতাপিতা অন্য শিশুর প্রতি খুব বেশি মাত্রায় পক্ষপাত দেখাচ্ছে,

অতি শৈশব থেকেই শিশুকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়

বা, যেখানে নতুন শিশুর আবির্ভাব তাকে মাতাপিতা অবহেলা করছে বা তার থেকে ছোটা অথচ বেশি বুদ্ধিমান কোন শিশুর সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারছে না, তখন বা অন্যান্য কোন কারণে শিশু নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভীত হয়ে ওঠে।

শিশু যখন বড় হয় এবং অপরের সঙ্গে তার সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে পরিবার-বহির্ভূত অন্যান্য শিশুদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে, বিশেষ ভাবে যারা তার থেকে দৈর্ঘ্যে, শারীরিক শক্তিতে, মর্যাদায় এবং প্রতিপত্তিতে অনেক বড়। তখনই তার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব জাগে, সে অপরের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে চায়। এই প্রতিযোগিতার মনোভাব বিদ্যালয়ে যাবার পূর্বেই তার মধ্যে দেখা দেয় এবং সারা জীবন ধরেই চলতে থাকে।

প্রতিযোগিতার মনোভাব সারা জীবন ধরে চলে

অনেক সময় মাতাপিতা নিজেদের আকাঙ্ক্ষা সন্তানদের মধ্যে দিয়ে পূরণ করতে চান। সে কারণে শিশু যদি প্রতিযোগিতায় হেরে যায়, জয়লাভে বঞ্চিত হয় তাহলে সেই ব্যর্থতার জন্য শিশুমনে যে দুঃখবোধের সঞ্চার হয়, তা মাতাপিতা যেন আর না বাড়িয়ে দেন। পুরস্কার, পরীক্ষার নম্বর, ক্রমোন্নতি অনুসারে নাম সাজাবার ব্যবস্থা প্রভৃতি সব সময়ই শিশুকে তার প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যান্য প্রভাবের তুলনায় প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও, কম নয়। বিদ্যালয়-জীবনে খেলাধূলার মাধ্যমে, বা অন্যান্য কাজের মাধ্যমে শিশুরা অপরের সঙ্গে নিজেদের দক্ষতা ও শক্তির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় মর্যাদা ও জনপ্রিয়তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং অপরের সমকক্ষ হবার বাসনা করে। এমন কি যেসব বিদ্যালয়ে সম্মান-তালিকায় নাম বসাবার ব্যবস্থা, স্কুলের কাজে নম্বর দেবার রীতি বা পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা রহিত করা হয়েছে সেখানেও ছাত্ররা অন্য প্রকারের স্বীকৃতির জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।

বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা

তারপর বিদ্যালয় বা কলেজ জীবন শেষ করে শিশু যখন বৃহত্তর সমাজ জীবনে প্রবেশ করে তখনও তার প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, সম্মানের জন্য, মর্যাদার জন্য, জনপ্রিয়তার জন্য, খ্যাতির জন্য, তাকে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন-না-কোন ভাবে তাকে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে যেতে হয়।

বৃহত্তর সমাজ-জীবনে প্রতিযোগিতা

ব্যক্তির জীবনে প্রতিযোগিতার যেমন স্থান রয়েছে তেমনি রয়েছে সহযোগিতার স্থান। পরিবারে শিশু যেমন অন্য শিশুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, তেমনি প্রয়োজনে সহযোগিতাও করে। একই পরিবারে শিশুদের অনেক সময়েই মাতাপিতার নির্দেশে মিলেমিশে কাজ করতে হয়।

পরিবারের বাইরেও শিশুরা যখন অন্য শিশুদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলাধূলা করে তখন প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার ভাবও দেখা দেয়। দলগত খেলাধূলা সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। বিদ্যালয়েও যেমন প্রতিযোগিতার স্থান আছে, তেমনি সহযোগিতার স্থান রয়েছে। শিক্ষকের নির্দেশে অনেক সময় বিভিন্ন কাজ শিশুদের একত্র মিলেমিশে করতে হয়। বয় স্কাউট (Boy's Scout), এন. সি. সি. (N. C. C.) প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থা বিদ্যালয় ও কলেজ-জীবনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করে। বৃহত্তর সমাজ-জীবনে এই সহযোগিতার প্রশ্ন আরও তীব্র ভাবে দেখা দেয়। জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য, জনমূলক কাজ সম্পাদন করার জন্য, সমাজ-জীবনের সংরক্ষণের জন্য পারস্পরিক সহ-যোগিতার একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়।

**পরিবারে ও পরিবারের বাইরে সহযোগিতার স্থান**

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়ে প্রেষণা সঞ্চার করার ব্যাপারে প্রতি-যোগিতা উল্লেখযোগ্য প্ররোচক হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে শিক্ষকদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং বিদ্বেষমূলক বা শত্রুতামূলক প্রতিযোগিতার ভাব যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে না জাগে। প্রতিযোগিতার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রতিযোগিতা সমানে সমানে হয়। প্রতিযোগিতা যদি একই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হয় তবেই ভাল হয় এবং প্রতিযোগিতায় যেন প্রতি ছাত্রেরই জয়ের সম্ভাবনা থাকে। প্রতিযোগিতা তিন প্রকারের হতে পারে। যথা—

**প্ররোচক হিসেবে প্রতিযোগিতা**

(১) **ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা (Personal Competition):** এই প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীর মধ্যে তীব্র সক্রিয়তা সৃষ্টি করে; কিন্তু মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদরা এই ধরনের প্রতিযোগিতা সমর্থন করেন না।

**ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা**

(২) **দলগত প্রতিযোগিতা (Group Competetion):** এই প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীর মধ্যে সক্রিয়তা সৃষ্টি করে এবং এ ধরনের প্রতিযোগিতা শিক্ষাবিদ্‌রা সমর্থন করলেও করতে পারেন।

**(৩) আত্মপ্রতিযোগিতা (Competition with self) :** অনেক সময় শিক্ষার্থী নিজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। সে তার পূর্ববর্তী যোগ্যতা বা কৃতিত্বকে অতিক্রম করে নতুন কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই প্রকার প্রতিযোগিতা সুস্থ এবং বিশেষভাবে সমর্থনযোগ্য।

**সহযোগিতা ও স্বাভাবিক প্ররোচক**

সকলের সঙ্গে মেলামেশা করার কামনা, অপরের সমর্থন লাভের বাসনা, ভালবাসা দেবার ও পাবার আকাঙ্ক্ষার জন্য সহযোগিতা, প্রতিযোগিতার মতনই, এক স্বাভাবিক প্ররোচক। অনেকে মনে করেন সমাজে শুধু তীব্র প্রতিযোগিতারই স্থান রয়েছে এবং শিশুদের কিভাবে প্রতিযোগিতা করতে হয় কেবল তাই শেখান উচিত। কিন্তু অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন, সমাজের পক্ষে নির্বিচারে প্রতিযোগিতাকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। কেননা, সমাজের প্রধান কাজই হল সহযোগিতা। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মূল্য থাকলেও, সহযোগিতামূলক আচরণের মূল্যই এখানে বেশি। মনোবিজ্ঞানীরাও একে সমর্থন করেন এই কারণে যে, সহযোগিতার মাধ্যমেই মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির পূরণ ঘটে।

**প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতার মূল্য (Value of Compitetion and Co-operation) :** কোন কোন সময় প্রতিযোগিতা বাঞ্ছনীয়। যখন কোন শিশুর মধ্যে প্রতিযোগিতায় জয়লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়, অথচ সে ব্যর্থ হয় এবং এই ব্যর্থতা তার মনে ভীষণভাবে রেখাপাত করে, তখন প্রতিযোগিতা তার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে সাধারণতঃ খুবই ক্ষতিকর। কিন্তু প্রতিযোগিতার মূল্যও রয়েছে। যেসব কাজ অনেক সময় বিরক্তিকর, প্রতিযোগিতাই সেসব করার জন্য শিক্ষার্থীর মনে উৎসাহের সঞ্চার করে।

**প্রতিযোগিতার মূল্য**

অনেক সময় কোন শিশু প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে পুরস্কার লাভের আশায় কোন কাজ শিক্ষা করে যাতে তার বিশেষ কোন অনুরাগ বা আগ্রহ নেই। অনেক সময় শিশু নিজের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা করে। অনেক সময় প্রতিযোগিতা ব্যক্তিকে পূর্বাপেক্ষা আরও বেশি যোগ্যতা এবং ক্ষমতা প্রদর্শন করার জন্য উৎসাহিত করে। আবার অনেক সময় ব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট মানকে নিজের সামনে রেখে তার সমকক্ষ হতে সচেষ্ট হয়।

কোন কোন অবস্থায় ব্যক্তি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহযোগিতা করে। দলগত খেলাধূলায় এটি লক্ষ্য করা যায়। যদি কোন ফুটবল দল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে চায়, তাহলে তার সভ্যদের সহযোগিতার অবশ্যই প্রয়োজন এবং এ জাতীয় খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করে শিশু সহযোগিতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আবার অনেক সময় ব্যক্তি সহযোগিতামূলক কাজে প্রতিযোগিতা করে। যখন কোন প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিমাণ ও উৎবর্ষ বাড়াবার উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠতালাভের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তখন এই মনোভাব পরিদৃষ্ট হয়। উদ্যমশীল ব্যক্তি প্রতিযোগিতাও করতে পারে, সহযোগিতাও করতে পারে, প্রয়োজন হলে একই সময়ে উভয়ই করতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, কিভাবে অপরকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ করব, এ ধারণা সব সময়েই যদি কোন ব্যক্তির মন অধিকার করে থাকে তাহলে জীবনের অনেকখানি আনন্দ নষ্ট হয়ে যায় এবং পরিমাণে অনেক দুঃখভোগ করতে হয়।

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহযোগিতা

সহযোগিতামূলক কাজে প্রতিযোগিতা

প্রশ্ন হল, শিক্ষার দিক থেকে প্রতিযোগিতার প্রতি আমাদের মনোভাব কি হবে? শিক্ষার দিক থেকে যথার্থ মনোভাব হবে প্রতি-যোগিতামূলক মনোভাবকে সংগঠনমূলক পথে চালিত করা এবং যাতে অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা না দেয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা। প্রতিটি ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ দিতে হবে যাতে তার মধ্যে কোন ভুল প্রবণতার সৃষ্টি না হয়। শিশুদের মধ্যে সামর্থ্যের নানা পার্থক্য থাকে, সেই পার্থক্যের কথা বিচার করে তাদের সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষকদের কখনই উচিত হবে না শিশুদের এমন প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে বলা, যাতে তারা কখনই জয়লাভ করতে পারবে না। কৃত্রিম পুরস্কার থেকে যথার্থ পুরস্কারের মূল্য যাতে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করে তার জন্যই শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। যখনই প্রতিযোগিতা হবে তখন যেন সমানে সমানে প্রতিযোগিতা হয় তার দিকেও শিক্ষকের বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মপ্রতিযোগিতার ভাব জাগিয়ে তোলাই সবচেয়ে শ্রেয়। তবে প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনে ও শিক্ষা-জীবনে সহযোগিতার মূল্য সম্পর্কে যাতে শিক্ষার্থী সচেতন হয়, তার দিকেও শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

শিক্ষার দিক থেকে প্রতিযোগিতার প্রতি মনোভাব

প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে সংগঠনমূলক পথে চালিত করা

## ১৯। শিক্ষণের সঞ্চালন (Transfer of Training):

### (ক) শিক্ষণের সঞ্চালন কাকে বলে? (What is transfer of training):

কোন একটি বিষয় শিক্ষণের পর পরবর্তী একটি বিষয়ে শিক্ষণের বা সম্পাদনের উপর প্রথম শিক্ষণের ফলাফল বা প্রভাবকেই শিক্ষণের সঞ্চালন বলা হয়।[1] শিক্ষণের সঞ্চালন মতবাদ অনুসারে একটি বিষয়ের শিক্ষণের ফলাফল পরবর্তী অপর একটি বিষয়ের শিক্ষণ বা সম্পাদনে সঞ্চালিত হয়। এই মতবাদ অনুসারে শিক্ষার মাধ্যমে কোন বিষয়ের অর্জিত জ্ঞান বা পারদর্শিতা অন্য বিষয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হতে পারে। এক পরিস্থিতিতে যা শিক্ষা করা যায় পরবর্তী কোন পরিস্থিতিতে তাকে প্রয়োগ করা যায় বা কাজে লাগানো যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি প্রথমে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করল। তারপর ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করল। শিক্ষণের সঞ্চালন মতবাদ অনুসারে ল্যাটিন ভাষার শিক্ষণ ইংরেজী ভাষার শিক্ষণকে কিছুটা প্রভাবিত করবে।

**কোন বিষয় শিক্ষণের ফলাফল পরবর্তী অপর একটি বিষয়ের শিক্ষণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে**

এই সঞ্চালন বা প্রভাব দু প্রকারের হতে পারে, সদর্থক বা নঙর্থক। যদি প্রথম বিষয়ের শিক্ষণ দ্বিতীয় বিষয়ের শিক্ষণকে সহায়তা করে তাহলে সেই প্রভাবকে সদর্থক সঞ্চালন (Positive Transfer) বলা হবে। ল্যাটিন ভাষার শিক্ষণ যদি ইংরেজী ভাষার শিক্ষণের সহায়তা করে বা সহজ করে তোলে তাহলে সেই প্রভাবকে সদর্থক সঞ্চালন বলা হবে। আর যদি ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষণ ইংরেজী ভাষার শিক্ষণে বাধা সঞ্চার করে তাহলে সেই প্রভাবকে নঙর্থক সঞ্চালন (Negative Transfer) বলা হবে। আর যদি ল্যাটিন ভাষার শিক্ষণ ইংরেজী ভাষার শিক্ষণে সহায়তা না করে বা বাধারও সঞ্চার না করে তাহলে তাকে শূন্য বা অনির্দিষ্ট সঞ্চালন (Nil or Indefinite Transfer) বলা হয়।

**সঞ্চালন দু প্রকার— সদর্থক ও নঙর্থক**

শিক্ষণের সঞ্চালন সম্ভব, কি অসম্ভব, এই প্রশ্নটি শিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কমূলক প্রশ্ন। দৈনন্দিন জীবনে বা বাস্তব অভিজ্ঞতায় শিক্ষণের

1. "When we speak of transfer of training we mean the effect which some particular course of training has on learning or execution of a second performance"

—K. Lovell: Educational Psychology and Children. Page 141.

সঞ্চালনের সম্ভাব্যতা এবং অসম্ভাব্যতা, উভয় প্রত্যক্ষ করা যায়। কোন কোন পরিস্থিতিতে শিক্ষণের সঞ্চালন সম্ভব, আবার কোন কোন পরিস্থিতিতে শিক্ষণের সঞ্চালন অসম্ভব মনে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তির বিশেষ এক ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান বা পারদর্শিতা অন্য এক ধরণের যন্ত্রপাতির প্রয়োগ কৌশল শিক্ষণকে সহজতর করে তোলে। আবার দেখা যায় যে ব্যক্তি বাংলা কবিতা মুখস্থ করার ব্যাপারে খুবই দক্ষ তিনি ইংরেজী কবিতা শিক্ষণের ব্যাপারে তেমন দক্ষ নন। অর্থাৎ কিনা, একটা বাংলা কবিতা মুখস্থ করার পরে একটি ইংরেজী কবিতা মুখস্থ করতে গিয়ে তিনি দেখেন যে, তাঁর প্রথম শিক্ষণ দ্বিতীয় শিক্ষণকে মোটেই সহজতর করে তোলেনি, বা দ্বিতীয় শিক্ষণের উপর প্রথম শিক্ষণের কোন প্রভাব নেই।

**(খ) শিক্ষণ সঞ্চালনের পরিমাপ পদ্ধতি (Measurement of Transfer of Training):**

শিক্ষণ সঞ্চালন মতবাদের যথার্থ পরীক্ষণ করার জন্য এই শতাব্দীর প্রথম দিকে অনেক পরীক্ষণকার্য চালান হয়। পরীক্ষণকার্যে সাধারণতঃ কতকগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করা হত।

পরীক্ষার্থীরা কোন্ বিষয়বস্তু কতখানি স্মরণ রাখতে পারে, সে সম্পর্কে একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে তাদের সাফল্যাঙ্ক (scores) নির্ধারণ করা হত, এবং ঐ সাফল্যাঙ্কের ভিত্তিতে দুটি দল 'ক' এবং 'খ' নির্বাচন করা হত যারা স্মরণ-শক্তির ব্যাপারে সমতুল্য। 'ক' দলকে বলা হত পরীক্ষণ দল (Experimental Group) বা সঞ্চালন পরীক্ষণ দল (Transfer Group)। এবং 'খ' দলকে বলা হত নিয়ন্ত্রিত দল (Control Group)। প্রথম দলের স্মরণ রাখার দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়েছে। এরপর তাদের অন্য কোন বিষয় যেমন, কোন কবিতা, গদ্যাংশ, ওজন বা মাপের তালিকা মুখস্থ করতে বলা হয়। দ্বিতীয় দলকে তা করার সুযোগ দেওয়া হয় না বা এমন কোন কাজে নিযুক্ত করা হয়, যাতে স্মরণশক্তির অনুশীলনের কোন ব্যাপার নেই। কিছু সময় পরে উভয় দলকেই প্রথমে যে বিষয় সম্পর্কে তাদের স্মরণশক্তির দক্ষতা পরীক্ষণ করা হয়েছিল, তার পুনঃ পরীক্ষা করা হয়। শিক্ষার সঞ্চালন যদি হয়ে থাকে তাহলে আশা করা যায়, দ্বিতীয় পরীক্ষণের ফলাফলে 'খ' দলের সাফল্যাঙ্কের তুলনায় 'ক' দলের সাফল্যাঙ্ক বেশী হবে।

পরীক্ষণ দল ও নিয়ন্ত্রিত দল

## পরীক্ষণের বিভিন্ন স্তর

| দলের নাম | প্রথম স্তর | দ্বিতীয় স্তর | তৃতীয় স্তর |
|---|---|---|---|
| 'ক'-পরীক্ষণ দল (Experimental Group) | 'গ' বিষয় সম্পর্কে স্মরণশক্তির দক্ষতা পরীক্ষা | 'গ' ছাড়া অন্য বিষয় সম্পর্কে স্মরণশক্তির অনুশীলনে নিযুক্ত করা | 'গ' বিষয় সম্পর্কে স্মরণশক্তির দক্ষতা পুনঃ পরীক্ষা ( অর্থাৎ 'গ' বিষয় স্মরণ রাখার ব্যাপারে দক্ষতা বাড়ল, কি কমলো পরীক্ষা করা। ) |
| 'খ'—নিয়ন্ত্রিত দল (Control Group) | ঐ | — | ঐ |

**(গ) শিক্ষার সঞ্চালনসম্পর্কে দুটি প্রাচীন মতবাদ :** মানসিক শক্তিবাদ এবং মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Theory of Mental Faculties and Theory of Formal or Mental Discipline) :

(i) **মানসিক শক্তিবাদ** (Theory of Mental Faculties) :

গত শতাব্দীর শেষভাগে মানসিক শক্তিবাদ প্রচার লাভ করে। এই মতবাদ অনুসারে আমাদের মন কতকগুলি শক্তির সমষ্টি। এই শক্তিগুলি হল চিন্তন, স্মৃতি, বিচার, যুক্তি, বিশ্লেষণ, অবধারণ, ইচ্ছা, কল্পনা ইত্যাদি। এই মতবাদ অনুসারে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে যেমন উপযুক্ত ব্যায়ামের সাহায্যে শক্তিশালী করা যায়, তেমনি উপযুক্ত অনুশীলনের সাহায্যে এই শক্তিগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করা যায়। যেমন, মন যদি চিন্তনশক্তির উন্নতি করতে চায় তাহলে চিন্তনের চর্চা হয় এরূপ বিষয় পাঠের প্রয়োজন, স্মরণশক্তির উন্নতির জন্য স্মরণশক্তিকে উন্নত করে এমন বিষয় অর্থাৎ কিনা ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন।

বিশেষ বিশেষ বিষয় চর্চা করিলে মনের শক্তির উন্নতি ঘটে

বর্তমানে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রথমতঃ, মন বিচ্ছিন্ন শক্তির সমষ্টি নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদে যাদের শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের অনেকগুলিই মানসিক প্রক্রিয়ামাত্র।

(ii) **মানসিক শৃঙ্খলাবাদ** (Theory of Formal or Mental Discipline) :

প্রাচীনকালে 'মানসিক শক্তিবাদের' প্রভাবে অপর একটি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, যেটি শিক্ষণের সঞ্চালন মতবাদের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই মতবাদ অনুসারে স্মৃতি, বিচারকরণ, মনোযোগ, অবধারণ, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি

মানসিক শক্তিগুলিকে অনুশীলনের সাহায্যে উন্নত বা শক্তিশালী করে তোলা যায়, যার ফলে বিশেষ কোন পেশার জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা দেবার প্রয়োজন হয় না। কারণ অনুশীলনের ফলাফল এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া থেকে ঠিক অনুরূপ অপর এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়াতে সঞ্চালিত হয়, অবশ্য ভিন্ন এক ক্ষেত্রে। এই মতবাদ অনুসারে স্মৃতি, মনোযোগ, প্রত্যক্ষণ, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক শক্তিগুলিকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অনুশীলনের দ্বারা শক্তিশালী করে তোলা যেতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি মূল শিক্ষণীয় বিষয় আছে, যেগুলির অনুশীলনে বোধশক্তি উন্নততর হয়, বুদ্ধি শাণিত হয় এবং স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। অর্থাৎ কিনা বিশেষ বিশেষ বিষয়ের চর্চায় বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির বিকাশ ও উন্নতি সাধিত হয়। যেমন, প্রাচীনকালে ধারণা করা হত ল্যাটিন ও গ্রীক চর্চায় স্মৃতিশক্তির উন্নতি এবং সামগ্রিকভাবে মনের উন্নতি সাধিত হয়। গণিতের চর্চা বিচারশক্তিকে উন্নত করে, বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণের শক্তিকে উন্নত করে, ন্যায়শাস্ত্র বিচারশক্তিকে উন্নত করে, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতির চর্চায় কল্পনার উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্লেটোর যুগ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের অনেক শিক্ষাবিদই ছিলেন এই মতবাদে বিশ্বাসী।

শিক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলি মূল বিষয় শিক্ষণের প্রয়োজন হয় যার ফলে বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতির উন্নতি সাধিত হয়

প্লেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন একজন ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে যদি জ্যামিতি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে তার বুদ্ধি শাণিত হবে। দার্শনিক লক (*Locke*) যদিও মানসিক শক্তিবাদের একজন সমালোচক ছিলেন তবু তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে 'মানসিক শৃঙ্খলাবাদের' অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, গণিতের শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জ্ঞানী এবং বিচারকরণে দক্ষ করে তোলে, যাতে শিক্ষার্থী অন্য বিষয় শিক্ষা করার সময় তার বিচারকরণের শক্তিকে সঞ্চালিত করতে পারে। এই মতবাদ প্রসারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে উপযোগিতা নীতির ভিত্তিতে (on the principle of utilitarianism) শিক্ষা-পাঠক্রমে শিক্ষণীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হতে লাগল। বিচারশক্তিকে উন্নত করার জন্য গণিতের, কল্পনাশক্তিকে উন্নত করার জন্য সাহিত্যের, স্মৃতিকে উন্নত করার জন্য ভাষার অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হল।

প্লেটো, লক প্রভৃতির অভিমত

মানসিক শক্তিবাদের অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হওয়াতে 'মানসিক শৃঙ্খলাবাদও' বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাতেও প্রমাণ

পাওয়া যায় যে, কোন বিশেষ শাস্ত্র পাঠ করে কোন মানসিক শক্তির উন্নতি সাধিত হলেও, ভিন্ন ক্ষেত্রে ঐ শক্তি যে উৎকর্ষের পরিচয় দেবেই এমন কোন কথা নেই। ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করে যিনি যুক্তিতর্কে পারদর্শী হয়েছেন, দৈনন্দিন জীবনে যুক্তিতর্ক করার সময় তিনি যে সমান পারদর্শিতা দেখাতে পারবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সে যা হোক, বিশেষ পাঠ্যবিষয়ের দ্বারা যে মনের বিশেষ শক্তিকে উন্নত করা যায় এবং এই উৎকর্ষ অন্য বিষয় পাঠ করার সময় বা নতুন কোন পরিস্থিতিতে প্রকাশিত হয়, এই নীতির ভিত্তিতে এক সময় বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-পাঠক্রমে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

**(ঘ) শিক্ষণ সঞ্চালনের উপর কয়েকটি পরীক্ষা (Some Experiments on Transfer of Training):**

**(i) জেম্‌স[1] পরিচালিত পরীক্ষা:**

শিক্ষণ সঞ্চালনসম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করেন মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক উইলিয়ম জেম্‌স (*Willian James*)। তিনি নিজেই পরীক্ষণ-পাত্রের ভূমিকা অবলম্বন করে নিজের উপর পরীক্ষা পরিচালনা করেন। তিনি প্রথমে ভিক্টর হুগোর লেখা 'স্যাটির' (*Satyr*) কবিতা থেকে ১৫৮ লাইন মুখস্থ করলেন, যাতে তাঁর সময় লাগল ১৩১$\frac{5}{6}$ মিনিট। তারপর তাঁর মুখস্থ-শক্তির উন্নতিসাধনের জন্য তিনি দৈনিক কুড়ি মিনিট করে আবৃত্তি করে ৩৮ দিনে মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট (Paradise Lost)-এর অনেকটা অংশ আয়ত্ত করলেন। তারপর তিনি হুগোর স্যাটির কবিতার আগের মুখস্থ করা অংশের পরবর্তী ১৫৮ লাইন মুখস্থ করতে গিয়ে দেখলেন যে, তাঁর মোট সময় লাগল ১৫১$\frac{1}{2}$ মিনিট, অর্থাৎ প্রথম বারের থেকে ২০ মিনিট বেশী সময় লেগেছে। প্যারাডাইস লস্টের অংশবিশেষ মুখস্থ করার পর হুগোর কবিতার অংশবিশেষ মুখস্থ করতে গিয়ে তিদি দেখলেন যে, তাঁর মুখস্থ শক্তির কোন উন্নতি হয় নি। অন্যান্য ব্যক্তিদের দিয়ে তিনি স্বতন্ত্রভাবে ঐ পরীক্ষণটি করালেন এবং তাঁদের ক্ষেত্রে ঐ একই ফল লক্ষ্য করে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, শিক্ষণের কোন সঞ্চালন হয় না এবং মুখস্থ চর্চা করলেই মুখস্থশক্তি বাড়ে না। এইভাবে মানসিক শৃঙ্খলা মতবাদটির অসারতাও প্রমাণিত হল।

1. William James: Principles of Psychology, VI. I. P. 666—668.

**(ii) শ্লেট পরিচালিত পরীক্ষা ঃ**

শ্লেট (*Sleight*) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী স্মৃতির উপরে একাধিক পরীক্ষণকার্য চালিয়েছিলেন। তিনি কয়েকজন ব্যক্তিকে পদ্য এবং গদ্য থেকে কয়েক পংক্তি মুখস্থ করতে দিলেন। তারপর তিনি সেই একই ব্যক্তিকে কতকগুলি তারিখ এবং অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করতে দিলেন। এই পরীক্ষণ-কার্য পরিচালনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে মুখস্থ চর্চা করলেই মুখস্থশক্তির উন্নতি হয় না এবং কোন একটি বিষয় মুখস্থ করলে অন্য বিষয় মুখস্থ করার ব্যাপারে যে তা সহায়ক হবে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা হয় না অর্থাৎ কিনা বিভিন্ন বিষয় মুখস্থ করার প্রক্রিয়াগুলি পরস্পরনির্ভর নয়।

**(iii) ওয়েব-পরিচালিত পরীক্ষা ঃ**

ওয়েব (*Webb*) একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দুটি দলে ভাগ করলেন এবং একটি দলকে পাটিগণিতের প্রশ্নের ভিত্তিতে দশ সপ্তাহ ধরে বিচারকগণ শিক্ষা দিলেন। অপর দলটি অন্যান্য সাধারণ বিষয় পাঠ করতে লাগল। পরে উভয় দলকে একই ধরনের প্রশ্ন করে তাদের বিচারকরণ-শক্তির পরীক্ষা নেওয়া হল। পরীক্ষণ থেকে দেখা গেল যে, পাটিগণিতের প্রশ্নের ভিত্তিতে যে ছাত্রদল বিচারকরণের চর্চা করেছিল তারা অন্যদলের তুলনায় শতকরা ৩৩ ভাগ অধিকতর উৎকর্ষ দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এ থেকে ওয়েব সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিচারকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার সঞ্চালন সম্ভব। ওয়েব আরও লক্ষ্য করলেন যে, কোন বিশেষ বিষয় অনুশীলনে যে ছাত্র যত্ন নেয়, সে অন্যান্য বিষয় অনুশীলনেও যত্ন নেয়। এই ধারণার ভিত্তিতে তিনি কয়েকটি পরীক্ষণ পরিচালনা করেন এবং সিদ্ধান্ত করলেন যে আদর্শ ও নীতির (ideas and principles) ক্ষেত্রে শিক্ষার সঞ্চালন ঘটে থাকে।

**(iv) জাড-পরিচালিত পরীক্ষা ঃ**

জাড (*Judd*) পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর দু দল ছেলেকে নিয়ে একটি পরীক্ষা পরিচালিত করেন। দু দলের মধ্যে একটি হল পরীক্ষণ-দল এবং আর একটি হল নিয়ন্ত্রিত দল। তিনি উভয় দলকেই জলের নিম্নে অবস্থিত একটি লক্ষ্যের প্রতি তীর ছুড়তে বললেন। আলোর প্রতিসরণের (refraction) জন্য জলের নীচে অবস্থিত খণ্ডটিকে ঠিক যে জায়গায় অবস্থিত সেই জায়গায় দেখা যায় না, একটু দূরে অবস্থিত মনে হয়। আলোর প্রতিসরণের এই নিয়মটি জানা না থাকার জন্য উভয় দলেরই লক্ষ্যচ্যুতি ঘটল। এর পরে পরীক্ষণ দলকে অপর দলটি থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, আলোর প্রতিসরণের মূল নীতিটি তাদের কাছে

ব্যাখ্যা করা হল। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দলের কাছে সেটি ব্যাখ্যা করা হল না। এর পর উভয় দলকে লক্ষ্যভেদ করতে বলা হলে, পরীক্ষণ-দলটি নিয়ন্ত্রিত দলের তুলনায় অনেক কম ভুল করল। এর থেকে জাড সিদ্ধান্ত করলেন যে, ব্যক্তি যদি অভিজ্ঞতা সামান্যীকরণের নীতিকে সচেতনভাবে অনুসরণ করে অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যক্তি যদি সামান্য সূত্র গঠন করতে পারে তাহলে শিক্ষার সঞ্চালন হয়।

**(v) থর্নডাইক পরিচালিত পরীক্ষা ঃ**

ল্যাটিন শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য নির্ণয় করার জন্য থর্নডাইক একটি বিশেষ ধরনের পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করেন। তিনি অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন যে, যেসব ছাত্র-ছাত্রী ল্যাটিন শিক্ষা করে বুদ্ধি পরীক্ষায় তাদের সাফল্যাঙ্ক বেশি হয় কিনা। পরীক্ষণের ফলাফল থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, যে সব ছাত্র ল্যাটিন শিক্ষা করেছে তাদের বুধ্যঙ্ক, যেসব ছাত্র ল্যাটিন শিক্ষা করে নি তাদের বুধ্যঙ্কের তুলনায় অধিক। অবশ্য এর কারণ ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধির উৎকর্ষ, না তাদের ল্যাটিন শিক্ষার পারদর্শিতা, বিচার করা মুস্কিল। যেসব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শিক্ষা করেছে, তারা ল্যাটিন না-জানা ছাত্রদের তুলনায় উন্নত হলেও, এই সঞ্চালন বেশি দিন স্থায়ী হয় না, কারণ অল্পকাল পরে দেখা যায়, ল্যাটিন-জানা এবং ল্যাটিন না-জানা শিক্ষার্থী সব বিষয়েই সমান দক্ষতা প্রকাশ করে।

**(vi) উড্রো হারবার্ট পরিচালিত পরীক্ষা ঃ**

উড্রো হারবার্ট মুখস্থ করা সম্পর্কে কতকগুলি পরীক্ষা পরিচালনা করেন। তিনি একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনটি দলে ভাগ করেন। প্রথম দলটিকে তিনি মুখস্থ করা সম্পর্কে কোন নির্দেশ বা শিক্ষা দিলেন না। দ্বিতীয় দলটিকে তিনি কবিতা এবং অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করতে বললেন। কিন্তু কি ভাবে মুখস্থ করতে হবে সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিলেন না। দ্বিতীয় দলটি, তিন ঘণ্টা ধরে প্রায় চার সপ্তাহ, কোন নির্দেশ ছাড়াই মুখস্থ করার কাজে নিজেদের নিযুক্ত রাখল। তৃতীয় দলটিকে উপরিউক্ত সময়ের শতকরা ৪৮ ভাগ সময় তিনি মুখস্থ করার যথাযথ পদ্ধতি শিক্ষাদান করলেন এবং অবশিষ্ট সময় কতকগুলি কবিতা এবং অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করতে দিলেন। এর পর তিনটি দলেরই স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করা হল। প্রথম দুটি দলের সাফল্যাঙ্ক প্রায় সমান সমান হল, কিন্তু তৃতীয় দলটির সাফল্যাঙ্ক প্রথম এবং দ্বিতীয় দলের প্রত্যেকের থেকে বেশি হল। উড্রো সিদ্ধান্ত করলেন যে, তৃতীয় দলটিকে মুখস্থ করা সম্পর্কে

বিশেষ শিক্ষা বা নির্দেশ-দানের জন্যই তাদের ফলাফল অপরের থেকে ভাল হয়েছে। তাঁর এই বিশেষ শিক্ষাদানের অন্তর্ভুক্ত ছিল কয়েকটি বিষয়; যেমন, অংশ হিসেবে মুখস্থ না করে সমগ্র হিসেবে মুখস্থ করা, ছন্দযুক্ত করে এবং দলবদ্ধ করে শিক্ষা করা, নিজে নিজে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয়তা অবলম্বন করা, শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থের প্রতি মনোযোগী হওয়া (এই প্রসঙ্গে অর্থ বোঝাতে সহায়তা করে এরূপ প্রতিরূপ বা সঙ্কেত চিহ্নের ব্যবহার করা), মুখস্থ করার দক্ষতার বিকাশসাধন এবং ঐ দক্ষতাতে বিশ্বাস স্থাপন করা। এই পরীক্ষণ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, একই ধরনের বিষয়ে শিক্ষণ সঞ্চালিত হয় যদি সেই বিষয় পাঠ করা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে যথাযথ পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

### (vii) ব্রুস্-পরিচালিত পরীক্ষা :

কোন একটি শব্দ মুখস্থ করলে ঐ জাতীয় শব্দ বা অন্যান্য শব্দ মুখস্থ করার পক্ষে পূর্বোক্ত শিক্ষা কতখানি সহায়ক হয় অর্থাৎ কিনা শিক্ষার সঞ্চালন কতখানি সম্ভব হয় ব্রুস্ (*Bruce*) সে সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করেন। মুখস্থ করা শব্দটিকে দুবার উচ্চারণ করার পরে নতুন শব্দ মুখস্থ করার চেষ্টা করা হল, কিন্তু বিশেষ সাফল্য লাভ করা গেল না। আবার মুখস্থ করা শব্দটি ছয়বার উচ্চারণ করার পরে নতুন শব্দ মুখস্থ করা হল। এইবার অধিকতর ফললাভ ঘটল। মুখস্থ করা শব্দটি ১২ বার উচ্চারণ করার পরে, যখন নতুন শব্দ মুখস্থ করার চেষ্টা করা হল তখন দেখা গেল যে, সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করা গেছে। এই পরীক্ষণ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুখস্থ করা কোন শব্দ যদি সম্পূর্ণ স্মরণ করা যায়, তাহলে ঐ একই ধরনের শব্দ সহজে মুখস্থ করা যায়।

### (viii) মূর পরিচালিত পরীক্ষা :

অর্জিত জ্ঞান এবং জীবনে তার সদ্ব্যবহারের ক্ষমতা, এদুটি কতখানি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, এই বিষয়টি লক্ষ্য করার জন্য মূর (*Moore*) একটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপরে একটি পরীক্ষণ পরিচালনা করলেন। প্রতিটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা লাভ করেছে। মূর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, যে জ্ঞানের সঙ্গে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগানোর ক্ষমতার কোন সম্পর্ক নেই এবং অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাবার দক্ষতা, আগ্রহ, বিশ্বাস ও চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বাড়ে বা কমে। মূর-এর পরীক্ষণ থেকে প্রকাশ পেল যে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদান করাই যথেষ্ট নয়, দৈনন্দিন জীবনে তাকে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে সে বিষয়ও তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

### (xi) কক্স পরিচালিত পরীক্ষা :

শিল্পের ক্ষেত্রেও শিক্ষার সঞ্চালনকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা যেতে পারে। একজন শিক্ষানবীশকে সাধারণ ধরনের শিক্ষা দিলেই কি যথেষ্ট হয় বা তাকে খুঁটিনাটি প্রতিটি কার্যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ; এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য কক্স (*Cox*) তিনটি দলকে নির্বাচন করলেন। এই তিনটি দলই প্রদীপের অংশ জোড়া লাগান এবং পৃথক করার কাজে অনুশীলনে রত। প্রথম পরীক্ষায় দেখা গেল সব কয়টি দলই কাজে সমান দক্ষ। প্রথম দলকে সাধারণ ধরনের কাজ করতে দেওয়া হল, দ্বিতীয় দলকে কাজ করতে দেওয়া হল কিন্তু কোন নির্দেশ দেওয়া হল না। প্রায় ১১ দিন ধরে তাদের কতকগুলি অংশ জোড়া লাগাতে এবং পৃথক করতে বলা হল। তৃতীয় দলটিকে এই ১১ দিন ধরে প্রত্যেক দিনটিতে বিশেষ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হল। যেমন, কিভাবে জিনিসটাকে সাজাতে হবে, কোন্ কাজ করার সময় কোন্ দিকে নজর দিতে হবে, বিভিন্ন অংশের আকারের দিকে এবং তাদের স্থানগত সম্পর্কের প্রতি কতখানি মনোযোগী হতে হবে, কাজের সময় মনোযোগ ও প্রচেষ্টার ব্যাপারে কতখানি মিতব্যয়ী হওয়া যায় ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে যখন তিনটি দলেরই পরীক্ষা নেওয়া হল তখন দেখা গেল প্রথম দুটি দলের তুলনায় তৃতীয় দলের কাজের উৎকর্ষ অধিক। দ্বিতীয় দল প্রথম দলের তুলনায় কোন উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারে নি। কক্স সিদ্ধান্ত করলেন যে, কোন বিষয়ের শিক্ষণে সেই বিষয় সম্পর্কিত সাধারণ সূত্র বা নিয়মগুলি যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে শিক্ষণের সদর্থক সঞ্চালন (**positive transfer**) ঘটে। যাঁরা হস্তশিল্পে বা খেলাধূলার শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত তাদের পক্ষে এই পরীক্ষণের ফলাফল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিছক অনুশীলনের তুলনায় সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান অনেক বেশী মূল্যবান।

### অন্যান্য পরীক্ষণের ফলাফল :

সমস্যা-সমাধান শিক্ষাসম্পর্কে শিক্ষাবিদ্ জে. ডি. উইলিয়মস বলেন সাধারণতঃ শিক্ষকেরা ধারণা করেন যে, শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবার সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় নীতিগুলি জানতে পারে এবং অন্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সেই শিক্ষাকে সঞ্চালিত করতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কে নানা গবেষণা চালিয়ে দেখা যায় যে, কোন একটি মাত্র সমস্যা সম্পর্কে অল্প শিক্ষা দেওয়া হলে শিক্ষার সঞ্চালন ভাল হয়। আবার একাধিক সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হলে শিক্ষার সঞ্চালন ভাল হয়। কাজেই, যখন সময় সংক্ষিপ্ত, শিক্ষার্থীরা স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন বা কাজের

কলাকৌশল কঠিন, তখন অল্প সমস্যাসম্পর্কে অধিকতর শিক্ষা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। যখন শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা বা পারদর্শিতা বেশি তখন সমস্যার বৈচিত্র্য যত অধিক হয় ততই ভাল। উইলিয়ম-এর মতে বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে যখন শিশু কোন একটি সমস্যার সমাধান নিজেই আবিষ্কার করতে পারে তখন অন্যান্য সমাধানের ক্ষেত্রে সেই কলাকৌশল প্রয়োগের ব্যাপারে শিক্ষার সঞ্চালন তার পক্ষে অনেক বেশি সম্ভব হয়।

কোন কোন লেখক শিক্ষা সঞ্চালনের ব্যাপারে আদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, কোন একটি বিষয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষাকে আদর্শ বা লক্ষ্যরূপে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করতে পারলে, সেই শিক্ষা অন্য বিষয়েও সঞ্চালিত হতে পারে। কিন্তু আদর্শরূপে উপস্থাপিত না করলে, শিক্ষার্থী হয়ত পাটিগণিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য নম্বর পেতে পারে, কিন্তু ভূগোলে নাও পেতে পারে। আসলে শিক্ষণ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে সচেতন সামান্যীকরণের (cautious generalisation) যথেষ্ট মূল্য আছে। পদ্ধতি নীতি এবং আদর্শের সঞ্চালনের সম্ভাব্যতা বেশী যখন শিক্ষার্থী তাদের প্রকৃতি, এবং সাধারণ প্রয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সচেতন থাকে।

জেমসের শিক্ষণ-সঞ্চালন সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণার পর শিক্ষণ-সঞ্চালন সম্পর্কে অনেক পরীক্ষণ সম্পাদিত হয়েছে। এই সকল পরীক্ষণের ফলাফল, প্রকৃতি এবং পরিমাণের দিক থেকে ভিন্ন ধরনের হয়েছে। প্রকৃতির দিক থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে সঞ্চালন হয়েছে সদর্থক (positive), কোন কোন ক্ষেত্রে নঙর্থক (negative) এবং কখনও হয়েছে শূন্য বা অনির্দিষ্ট (nil or indefinite)। পরিমাণের দিক থেকে এই সঞ্চালন কখনও খুব বেশী, কখনও কম আবার কখনও মাঝামাঝি।

**উপরিউক্ত গবেষণার ভিত্তিতে শিক্ষণ-সঞ্চালন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত * :**

শিক্ষণ সঞ্চালন তত্ত্বটির উপর সম্পাদিত বিভিন্ন পরীক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে মনোবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষণ সঞ্চালিত হয়। তবে এটি একটি সার্বিক ঘটনা নয়। কোন বিষয় শিক্ষ করার পর পরবর্তী বিষয় শিক্ষণের সময় পূর্ববর্তী শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করা যাবেই, এমন কোন কথা নেই। কোন বিষয় শিক্ষণের পর, পরবর্তী কোন বিষয় শিক্ষণের উপর বা পরবর্তী কোন কার্য সম্পাদনের উপর সেই শিক্ষণ সঞ্চালিত

* K. Lovell : Educational Psychology and Children. Page. 195.

হবে কিনা, সে সম্পর্কে পূর্ব থেকে কোন ভবিষ্যৎ বাণী করা সম্ভব নয়। শিক্ষণের সঞ্চালন সীমিতভাবে ঘটে এবং বিশেষ বিষয়, ব্যাপক নীতি, পদ্ধতি, আদর্শ, মনোভাব এগুলিই সঞ্চালিত হয়। কিন্তু যদি এই সব বিষয়গুলির দিকে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা না হয় এবং তাদের মূল্য ও প্রয়োগসম্পর্কে তাদের অবহিত করান না হয় এগুলিরও তবে সঞ্চালন ঘটে না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সদর্থক সঞ্চালন (positive transfer) ঘটে কিনা, অর্থাৎ কিনা এক পরিস্থিতিতে যে দক্ষতা অর্জন করা হয় তা অন্য পরিস্থিতিতে কোন বিষয়ের শিক্ষণে বা সম্পাদনে সহায়ক হয় কিনা, এই প্রশ্নই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষণের সদর্থক সঞ্চালন কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, অধীত বিষয় এবং অধীতব্য বিষয়, এই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে সদর্থক সঞ্চালন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। থর্নডাইক (*Thorndike*)-এর মতে, যোগে দক্ষতা গুণনে দক্ষতালাভে সহায়তা করে। পুরাতন পরিস্থিতির ও নতুন পরিস্থিতির, মধ্যে সাদৃশ্য সদর্থক সঞ্চালনে সহায়তা করে উদ্দীপক সামান্যীকরণের (Stimulus generalisation) জন্য। নতুন পরিস্থিতি বা উদ্দীপক এবং পুরাতন পরিস্থিতি বা উদ্দীপক, উভয়ের সাদৃশ্যই ব্যক্তির কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, উভয়ের পার্থক্যের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। নতুন পরিস্থিতিকে ব্যক্তি পুরাতন পরিস্থিতির সঙ্গে এক করে দেখে। কাজেই ব্যক্তি পুরাতন পরিস্থিতিতে যেভাবে প্রতিক্রিয়া করেছে নতুন পরিস্থিতিতে সেভাবে প্রতিক্রিয়া করে বলেই সদর্থক সঞ্চালন ঘটে থাকে। অবশ্য সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া না করে, উভয় উদ্দীপকের পশ্চাতে যে মূল নীতি বর্তমান তার জ্ঞানই সদর্থক সঞ্চালনকে সম্ভব করে তোলে।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষণের সদর্থক সঞ্চালনের ব্যাপারে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে শিশু যত বুদ্ধিমান হয়, সে শিশু তত শিক্ষণকে সঞ্চালিত করতে পারে।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষণ-সঞ্চালনের ব্যাপকতা নির্ভর করে মূল শিক্ষণের ব্যাপকতা, গভীরতা এবং সম্পূর্ণতার উপর। যদি মূল শিক্ষণের পরিমাণ খুব কম হয় তাহলে খুব স্বল্প পরিমাণে সঞ্চালন ঘটতে পারে।

চতুর্থতঃ, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার্থীর আগ্রহের দিকে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হলে, শিক্ষণ-সঞ্চালনের সম্ভাব্যতা বেশি থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, ভূগোল পাঠ করার পর শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেন দৈনন্দিন জীবনে ভূগোলের জ্ঞানকে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে শিক্ষণ-সঞ্চালনের সম্ভাব্যতা অনেক বেশি থাকে।

পঞ্চমতঃ, শিক্ষাদানের সময় যদি যন্ত্রপাতি এবং নানারকম উপাদানের ব্যবহার করা হয়, তাহলে এগুলির প্রয়োগবিধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া শিক্ষণ-সঞ্চালনের পক্ষে সহায়ক হয়। নীতিগুলির প্রয়োগের ব্যাপারেও শিক্ষার্থীর কিছুটা অনুশীলনের প্রয়োজন যার ফলে শিক্ষার্থী এমন একটি কৌশল আয়ত্ত করতে পারে, যা ঐ ধরনের অন্য কাজে সদর্থক সঞ্চালনকে সম্ভব করে তোলে।

ষষ্ঠতঃ, শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব প্রভৃতিও শিক্ষণ-সঞ্চালনে সহায়তা করে।

সর্বশেষে বলা যেতে পারে যে, কোন বিষয় বা কলাকৌশল সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান পারদর্শিতা ব্যক্তির মনোবল এমনভাবে গঠিত করে যে অন্য শিক্ষণে বা অন্য কোন কার্য-সম্পাদনে শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারে। আরও দেখা গেছে যে শিক্ষণ পরিস্থিতিতে নির্ভুল সমাধানের ইঙ্গিতটা খুঁজে বার করার কৌশল কিভাবে আয়ত্ত করা যায় তা যদি শিক্ষা করা যায় তাহলে সেই শিক্ষণ অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হতে পারে।

**(৬) শিক্ষণ-সঞ্চালন কিভাবে ঘটে? (How is Training Transferred ?) :**

শিক্ষণ-সঞ্চালন কিভাবে ঘটে, তার ব্যাখ্যারূপে আমরা কয়েকটি মতবাদের সন্ধান পাই। নীচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ আলোচনা করা হচ্ছে :

**(i) অভিন্ন উপাদান মতবাদ (Theory of Identical Elements) :** থর্নডাইক (*Thorndike*) এই মতবাদের প্রবর্তক। একটি শিক্ষণ-পরিস্থিতি আর একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে ততটুকুই প্রভাবিত করতে পারে, যতটুকু অভিন্ন উপাদান এ দুটি পরিস্থিতির মধ্যে বর্তমান থাকে। অর্থাৎ, পুরাতন পরিস্থিতি ও নতুন পরিস্থিতির মধ্যে যে উপাদানটুকু অভিন্ন, পূর্বপরিস্থিতি থেকে নতুন পরিস্থিতিতে সেই উপাদানটুকুরই সঞ্চালন ঘটবে। এই মতবাদ অনুসারে শিক্ষণের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, উদ্দেশ্যের অভিন্নতাও এক পরিস্থিতি থেকে আর এক পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন ছাত্রের যোগ অঙ্কে ব্যুৎপত্তি তাকে গুণ অঙ্কে পারদর্শী করে তুলবে। গুণ অঙ্কের একটা

অংশের সঙ্গে যোগ অঙ্কের পুরোপুরি অভিন্নতা রয়েছে। থর্নডাইকের মতে এই অভিন্ন অংশটির ক্ষেত্রেই শিক্ষার সঞ্চালন ঘটবে। একটি ছাত্র দুটি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেল। থর্নডাইকের মতে উক্ত দুটি বিষয়ের একটি আর একটিতে সহায়তা করতে পারে যদি দুটির মধ্যে কিছু অংশ অভিন্ন থাকে, তা না হলে নয়। একটি ছাত্র ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ করতে পারলেই যে ইতিহাসের সন তারিখ সহজে মুখস্থ করতে পারে এমন কোন কথা নেই। কেননা, দুটি বিষয়ের পাঠে অভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার অভাব। যদি কোন ছাত্র ব্যবসায়ী হতে চায় তাহলে অর্থনীতি তাকে যতখানি সাহায্য করতে পারবে, ইতিহাস ততখানি পারবে না। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্র পাঠ না করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠেই একজন রাজনীতিবিদ্ বেশী উপকৃত হবেন।

### (ii) সামান্যীকরণ মতবাদ (Theory of Generalisation) :

সামান্যীকরণ মতবাদের ভিত্তিতে জাড (*Judd*) শিক্ষণ-সঞ্চালনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জাড-এর মতে উপাদানের অভিন্নতার জন্য শিক্ষণ-সঞ্চালন ঘটে না। ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার কতটা সামান্যীকরণ করতে পারল তারই উপর শিক্ষণ-সঞ্চালন নির্ভর করে। অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের অর্থ হল বিভিন্ন অভিজ্ঞতার অবান্তর লক্ষণগুলি বর্জন করে, সেগুলির সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলিকে পৃথক করে নিয়ে ঐগুলি সম্পর্কে সামান্য সূত্র (general principles) গঠন করা। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছাত্র রসায়ণাগারে একটি পরীক্ষণকার্যে সফলতা লাভ করল। যদি ছাত্রটি ঐ পরীক্ষণকার্যে যে সূত্রগুলি কার্যকর হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত না হয়, তাহলে তার শিক্ষণকে নতুন পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত করতে পারবে না।

এই মতবাদের সমর্থনে জাড যে পরীক্ষণকার্যটি সম্পাদন করেছিলেন, সেটি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আলোর প্রতিসরণের নীতিটি পরীক্ষণ দলকে বুঝিয়ে বলার জন্যই, তাদের ভুলত্রুটি নিয়ন্ত্রিত দলের তুলনায় অনেক কম হয়েছিল। জাডের উক্ত পরীক্ষণ থর্নডাইকের উপাদানের অভিন্নতা মতবাদের অযাথার্থ নির্দেশ করে। উপাদানের অভিন্নতার উপর যদি শিক্ষণ-সঞ্চালন নির্ভর করে তাহলে নিয়ন্ত্রিত দলকে যখন দ্বিতীয়বার লক্ষ্য ভেদ করতে দেওয়া হল তখন প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পরিস্থিতিতে উপাদানের অভিন্নতার জন্য, নিয়ন্ত্রিত দলের শিক্ষণের সঞ্চালন ঘটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আসলে তা

ঘটে নি। পরীক্ষণ দলের সাফল্যের মূলে ছিল আলোর প্রতিসরণ সূত্রটি সম্বন্ধে যে শিক্ষণ হয়েছিল সেটিকে দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত করা। উপাদানের অভিন্নতাই যদি কারণ হত তাহলে নিয়ন্ত্রিত দলও লক্ষ্যভেদে সফলতা লাভ করত।

**(iii) অভিস্থাপন মতবাদ বা গেস্টাল্ট মতবাদ (Transposition Theory or Gestalt Theory):**

গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষণ হল অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কোন বিশেষ সমস্যার সমগ্র রূপটি বুঝে নিয়ে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে সেটি জানা। অন্তর্দৃষ্টি হল কোন সমস্যার বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে পূর্ণ সমস্যাটির সম্বন্ধ সমগ্ররূপে উপলব্ধি করা। এইভাবে যে শিক্ষণ ঘটে সেই শিক্ষণই সঞ্চালিত হয়। প্রথম শিক্ষণ-পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ এবং তাদের মধ্যে যে অখণ্ড সমগ্রতার প্রত্যক্ষণ ঘটে, পরবর্তী পরিস্থিতিতে তার অভিস্থাপন (Transposition) হল সঞ্চালন। প্রথম পরিস্থিতিতে সমগ্র এবং অংশের পারস্পরিক সংযোগ অবধারণকে দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে অভিস্থাপন করতে পারাই শিক্ষণের সঞ্চালন।

কোহলার (*Kohler*)-এর পরীক্ষণে দেখা গিয়েছিল, শিম্পাঞ্জীটি অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার যে সম্বন্ধ এবং তাদের পারস্পরিক তাৎপর্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছিল। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এই শিক্ষণ আয়ত্ত করার জন্য শিম্পাজীটি ভবিষ্যতে নতুন পরিস্থিতিতে তার শিক্ষণকে সহজেই সঞ্চালিত করতে সমর্থ হত। শিম্পাজীটি যখন তার প্রথম দিনের শিক্ষণ-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের, যেমন—দুটি বাঁশের টুকরা, খাঁচা, কলা প্রভৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করেছিল এবং বিভিন্ন উপাদানগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অংশরূপে প্রত্যক্ষ না করে তাদের মধ্যে একটি অখণ্ড সমগ্রতা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল তখন সেই প্রত্যক্ষণকেই দ্বিতীয় দিনের পরিস্থিতিতে অভিস্থাপনে সমর্থ হল এবং তার ফলে সহজেই সমস্যার সমাধানে সমর্থ হল।

গেস্টাল্টবাদীদের অভিস্থাপন মতবাদ থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদান মতবাদের বিরোধী মতবাদ। থর্নডাইকের মতবাদ অনুসারে শিক্ষণ-সঞ্চালনের জন্য প্রথম শিক্ষণ-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় শিক্ষণ-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের অভিন্নতা নির্দ্ধারণ করতে হবে।

আর গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষার সঞ্চালন ঘটাতে গেলে দরকার শিক্ষণ-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে, তার সমগ্র রূপটি

উপলব্ধি করে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। জাডের সামান্যীকরণ মতবাদের সঙ্গে মূল বিষয়ের দিক থেকে এই মতবাদের মিল লক্ষ্য করা যায়।

**বিভিন্ন মতবাদের সমালোচনা :**

থর্নডাইকের 'অভিন্ন উপাদানের মতবাদ' শিক্ষণ-সঞ্চালনের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয় না, কেননা অনেক সময় দুটি শিক্ষণ-পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের অভিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও, শিক্ষণ সঞ্চালিত হয় না। জাডের পরীক্ষণকার্য থর্নডাইকের 'অভিন্ন উপাদান মতবাদের' অসারতাই প্রমাণ করে। অনেক পরীক্ষণে দেখা গেছে, উপাদানের অভিন্নতা শিক্ষণ-সঞ্চালনকে ব্যাহত করে।

জাডের অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ মতবাদ শিক্ষণের বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর কোন মূল্য আরোপ না করে শিক্ষণের পদ্ধতির উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। শিক্ষণ-সঞ্চালনের জন্য যথাযথ শিক্ষণ-পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকৃতির জ্ঞানও উপেক্ষার বিষয় নয়।

গেস্টাল্টবাদে বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি উভয়ের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষণ-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক সংযোগের উপলব্ধি এবং সমগ্র শিক্ষণ-পরিস্থিতির অখণ্ড সামগ্রিক রূপটির জ্ঞানই হল যথার্থ শিক্ষণ যা সঞ্চালনকে সম্ভব করে তোলে। গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টি, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিকে একটা নীতি বা সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে ব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়া করার কথা বলা হলে প্রকৃতপক্ষে 'অন্তর্দৃষ্টি' শব্দটির যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। অন্তর্দৃষ্টির উৎস যে 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন-পদ্ধতি' তা কোন মতেই, উপেক্ষা করা চলে না।

**(চ) শিক্ষণ-সঞ্চালন ও শিক্ষকের কর্তব্য :**

যেহেতু শিক্ষণ-সঞ্চালন মতবাদ অসার মতবাদ নয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে শিক্ষণ-সঞ্চালিত হয়, সেহেতু শিক্ষণ-সঞ্চালনের ব্যাপারে শিক্ষকের কর্তব্য কতটুকু তা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু শিক্ষণ-সঞ্চালন সম্পর্কে এমন কোন মতবাদ আবিষ্কৃত হয় নি, যার সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষণ-সঞ্চালনের নির্ভুল সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে, সেহেতু শিক্ষণ-সঞ্চালন সম্পর্কে এযাবৎ যে সমস্ত পরীক্ষণকার্য পরিচালিত হয়েছে তার ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষণ-সঞ্চালনের ব্যাপারে শিক্ষককে অগ্রসর হতে হবে।

আমাদের মনের মধ্যে পৃথক পৃথক শক্তি আছে, কতকগুলি মূল শাস্ত্র অধ্যয়নে মনের স্থায়ী উৎকর্ষ সাধিত হয়—এই মতবাদ অসার মতবাদ, কাজেই এই লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষকের শিক্ষার্থীকে কোন বিষয় শিক্ষাদান করা উচিত হবে না। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, যে কোন বিষয় শিক্ষাদানের মাধ্যমেই মানসিক উন্নতি সম্ভব। যথাযথ ভাবে শিক্ষা দিলে কোন পাঠ্যবিষয়ই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যে কোন বিষয় যথাযথ শিক্ষাদানে মানসিক উন্নতি সম্ভব

শিক্ষণ-সঞ্চালন সম্পর্কে শিক্ষকের করণীয় হল ; প্রথমতঃ, শিক্ষণ-সঞ্চালনের ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করা। অর্থাৎ কিনা, কোন্ পরিস্থিতিতে কি শিক্ষা করলে সেটি অন্য পরিস্থিতিতে কোন বিষয় শিক্ষণে সহায়ক হয় এবং শিক্ষণ-সঞ্চালন মোটামুটি কি কি শর্তের উপরে নির্ভরশীল, সেগুলি সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা দরকার। শিক্ষণ-সঞ্চালন সম্পর্কে বিজ্ঞান-ভিত্তিক আধুনিক গবেষণার ফলাফলগুলি সম্পর্কেও শিক্ষকের অবহিত হওয়া দরকার। দ্বিতীয়তঃ, সব মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন যে শিক্ষণ-সঞ্চালনের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষণের গভীরতা ও সম্পূর্ণতার উপরে, কাজেই এই ব্যাপারে শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে, তৃতীয়তঃ, যে পরিস্থিতি থেকে শিক্ষণ অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হবে, সেই দুটি পরিস্থিতির পশ্চাতে যে মূল সূত্র ক্রিয়া করছে সেটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করাতে হবে। ক্রোন্‌বাক (*Cronback*)-এর মতে শিক্ষার্থীকে সেই সূত্রটি নির্ভুল ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, যে যে ক্ষেত্রে সূত্রটি প্রয়োগ করা যায় সেসব দিকে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করাতে হবে। বিচিত্র এবং জটিল পরিস্থিতিতে সেই সূত্রটির প্রয়োগ শিক্ষার্থীকে চিনে নিতে হবে। চতুর্থতঃ, পাঠ্যবিষয়ের অর্থ অবধারণ। বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ বোধ, দুটি পরিস্থিতির অভিন্ন উপাদানগুলি অনুধাবন করার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রী যাতে সমর্থ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। পঞ্চমতঃ, শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে পাঠ্যবিষয়ের সংগঠন সুসঙ্গতিপূর্ণ ও সুপরিকল্পিত হয়, তাহলে শিক্ষার্থী পাঠ্য-বিষয় সম্পর্কে মূলগত ধারণা এবং মতবাদগুলি সহজে অনুধাবন করতে পারবে। ষষ্ঠতঃ, অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ শিক্ষণ-সঞ্চালনের সহায়ক প্রক্রিয়া। সে কারণে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে হবে যাতে পাঠ্যবিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে সামান্য সূত্র গঠন করার ক্ষমতা শিক্ষার্থী লাভ করে। সপ্তমতঃ, পদ্ধতি, নীতি, আদর্শ, প্রভৃতিই এক পরিস্থিতি থেকে অন্য

পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়, কাজেই এগুলির প্রয়োগের উপর শিক্ষকের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সর্বশেষে, মনোযোগী হওয়ার অভ্যাস, পর্যবেক্ষণ করা, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করার ক্ষমতা, বিচারকরণের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি যাতে শিক্ষার্থী ঠিকমত সম্পাদন করতে পারে সে সম্পর্কে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রয়োজনমত সে সম্পর্কে নির্দেশ দিতে হবে।

## প্রশ্নাবলী

1. What is Learning? What do you mean by the learning process?

Ans. ( পৃঃ ২২২—পৃঃ ২২৪ )

2. How is learning usually defined? What do you understand by 'Trial and Error' method of learning? Give examples. [B. A. 1964

Ans. ( পৃঃ ২২২-৪ —পৃঃ ২৩২-৩৪ এবং ২৩৬-৩৯ )

3. Explain fully the Gestalt Theory of Learning. Add your own comment. [ B. A. 1968

Ans. ( পৃঃ ২২৬ – ২৩২ )

4. Discuss Thorndike's major laws of learning and show how they can be utilised in helping pupils to learn school subjects. [ B. A. 1963, 1967

Ans ( পৃঃ ২৩৬—২৪১ )

5. Define learning. Briefly explain the main theories of learning.

Ans. ( পৃঃ ২২২—এবং মতবাদের সংক্ষিপ্তসার ) [ B.A. 1970

6. Discuss the place of maturation and learning in the development of a child. [ B.A. 1966

Ans. ( পৃঃ ২২৪—২২৫ )

7. How are learning and maturation related to each other? Discuss three principal laws of learning of Thorndike. [ B. T. 1947 ]

Ans. ( পৃঃ ২২৪-২৫—২৩৬-৩৯ )

8. Give examples of 'Conditioned reflex' method of learning. How is fear response conditioned in the child? [ B. A. 1866

Ans. ( পৃঃ ২৩১-৩২ – ২৪৮, ২৫০-৫১ )

9. Discuss the conditioned response theory of learning and show how you would utilise this in helping boys to learn school subjects. [ B. A. 1962 ]

Ans. ( পৃঃ ২৩১-৩২—২৫০-৫২ )

10. What do you mean by skills? How are they acquired?

Ans. (পৃ: ২৮৪—২৯০)

11. What are the factors upon which the progess of learning depends? What is a plateau in learning? Explain its causes.

Ans. (পৃ: ২৭৯—২৮৩)

12. On what does efficiency in learning depend? How can you use the devices of effective learning for the education of the child?

Ans. (পৃ: ২৭৭—পৃ: ২৭৯)

13. Compare human learning with animal learning. What lesson has a teacher to gain from this comparison?

Ans. (পৃ: ২৬৫—পৃ: ২৬৮)

14. What is imitative learning? What are the different types of imitation? Discuss the role of imitation in Education.

Ans. (পৃ: ২৫২—পৃ: ২৬৩)

15. What are habits? How are they distinguished from instincts? State the laws habit formation. [B. A. 1965

Ans. (পৃ: ২৯১, ২৯৩—২৯৫-৯৬)

16. What are the conditions of habit formation? How can you develop the reading habit in pupils? [B. A. 1963

Ans) (পৃ: ২৯৫-৯৬—২৯৮ ৯৯)

17. Bring out the uses and abuses of habit formation. What useful habits should be formed in school childen?

Ans. (পৃ: ২৯৭-৯৮—২৯৯-৩০০)

18. What are habits? How are they formed? Explain how bad habits can be eradicated.

Ans. (পৃ: ২৯১-৯২—২৯৫-৯৭)

19. Do animals solve problems by insight? Do animals think or reason in solving problems?

Ans. (পৃ: ২৬৭—২৬৮)

20. Write what you know about the methods of self-learning and learning in a group.

Ans. (পৃ: ৩০৩—পৃ: ৩০৭)

21. What are the benefits of competition in a school community? How can a teacher encourage the desirable competitive behaviour?

Ans. (পৃ: ৩১০—পৃ: ৩১১)

22. What is the importance of competetion and co-operation in school live.

Ans. (পৃ: ৩০৭—পৃ: ৩০৯)

23. What is the relation between learning and Motivation? What are the functions of motives in learning process?

Ans. (পৃ: ২৬৮-৭০—পৃ: ২৭৫-৭৭)

24. What is transfer of learning? How far is transfer possible? Discuss with reference to the ancient and modern views on the subject.

Ans. (পৃ: ৩১২-১৩—৩১৪, ৩২১-২৭)

25. What do you understand by transfer of training? Is transfer of training possible? Give some illustrations.

Ans. (পৃ: ৩১২-১৩—পৃ: ৩১৬-২০)

26. What is the present day opinion of the psychologists on the problem of transfer of learning? How can transfer be measured?

Ans. (পৃ: ৩২১-২৩—পৃ: ৬১৩)

27. Write an essay on transfer of training. [B. T. 1952, '59

Ans. (পৃ: ৩১২—পৃ: ৩২৮)

28. Discuss citing experimental evidences, the problem of transfer of training. [B. A. Hons 1959

Ans. (পৃ: ৩১৬—পৃ: ৩২১)

29. Discuss the different theories of transfer of training and their implications in education.

Ans. (পৃ: ৩২৩—পৃ: ৩২৮)

30. What is meant by 'transfer of training'? Discuss in the light of the latest experimental findings when and to what extent transfer takes place. [B. T. 1964

Ans. (পৃ: ৩১২-১৩—পৃ: ৩১৬-২৩)

31. Explain :—

(a) Plateau in a learning curve. [B. A. 1965, '67, '70

(b) Learning and Maturation. [B. A. 1965, '70

(c) Gestalt. [B. A. 1966, '69

(d) Imitation. [B. A. 1966

(e) Conditioned Reflex. [B. A 1968

# নবম অধ্যায়

## ব্যক্তিত্ব

## (Personality)

### ১। ব্যক্তিত্ব বলতে কি বোঝায়? (What is Personality?)

'ব্যক্তিত্ব' শব্দটির লৌকিক ব্যাখ্যা তার মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা থেকে পৃথক। সাধারণতঃ স্বাতন্ত্র্য (Individuality) এবং অনন্যতা (uniqueness) ব্যক্তিত্বের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি ব্যক্তির সেই বৈশিষ্ট্য যার জন্য সে অন্য ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র। এ কারণে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, ব্যক্তিত্ব হল সেই বৈশিষ্ট্য যা একই ধরনের বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে একই অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া করায়।

**ব্যক্তিত্বের লৌকিক ব্যাখ্যা**

দৈনন্দিন জীবনে 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটিকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। যে ব্যক্তি তার কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে, চালচলনে অপরের মনের উপর একটা ছাপ রেখে যায়, সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আছে বলে আমরা মনে করি। ইংরেজী 'Personality' শব্দটির আদি অর্থের সঙ্গে এই জাতীয় লৌকিক ব্যাখ্যার একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজী পার্সোনালিটি শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে ল্যাটিন শব্দ পার্সোনা (*Parsona*) থেকে। পার্সোনা শব্দটির অর্থ হল 'মুখোশ'। প্রাচীনকালে রোমে অভিনেতারা মুখোশ পরে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্য অবতীর্ণ হতেন। সুতরাং পার্সোনালিটি শব্দটির উৎপত্তি যে শব্দটি থেকে সেটি আদিতে একটা ছদ্ম, মিথ্যা বা বিকৃত রূপ বা ব্যক্তি যেভাবে অপরের কাছে প্রকাশিত হয়, তাকেই বোঝাত। পরবর্তীকালে পার্সোনা শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। শব্দটির অর্থ হয়ে দাঁড়ায় নাটকের অভিনেতা। এই অর্থেও ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির আসল স্বরূপকে না বুঝিয়ে নাটকে অভিনীত রূপকে বোঝাত।

**ব্যক্তিত্ব শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার**

আবার ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা মনে করি ব্যক্তির কতকগুলি অসাধারণ গুণ যা ব্যক্তিকে অপরের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। আবার কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে, ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির সেই অন্তর্নিহিত সারবত্তা (inner

essence) বা আসল সত্তা যা ব্যক্তির পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এই অর্থ অনুসারে ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ এবং ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না, সকল প্রকাশের অন্তরালে অজ্ঞাত থেকে যায়।

মনোবিদ্যার দিক থেকে ব্যক্তিত্বের পূর্বোক্ত লৌকিক ব্যাখ্যা এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। স্বাতন্ত্র্য ও অসাধারণত্ব ছাড়াও ব্যক্তি তার চিন্তা, প্রবণতা, গুণ, আগ্রহ এবং জীবনাদর্শ নিয়ে এক বিস্ময়কর জটিল সংগঠন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মূলে আছে ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং জাগতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির উপযোজন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যায় এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা কোনমতেই যুক্তিসংগত নয়। কাজেই অপরের মনের উপর রেখাপাত করা বা অপরের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলাকেই ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণ বলা চলে না।[1]

ব্যক্তিত্বের লৌকিক বা দার্শনিক ব্যাখ্যা মনোবিদ্যায় গ্রহণ করা হয় না

অনেক সময় ব্যক্তিত্ব বলতে ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবধারাকে বোঝান হয়। আবার সময় সময় ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র এ দুটিকে সমার্থক শব্দ মনে করা হয়। কিন্তু ব্যক্তিত্বের এ জাতীয় ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তিত্ব বলতে যদি বুঝি ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবধারা, তাহলে ব্যক্তিত্বের মানসিক দিকটিরই উল্লেখ করা হবে, যে আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তার কোন উল্লেখ করা হবে না। ব্যক্তিত্বকে 'চরিত্রের' সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাও যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তিত্ব চরিত্র থেকে ব্যাপকতর এবং চরিত্রকে ব্যক্তিত্বের একাধিক উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান মনে করা যেতে পারে।[2] ব্যক্তিত্বের সব উপাদানের নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা হয় না। অলপোর্টের (*Allport*) মতে, 'ব্যক্তিত্বের যখন নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তখন তা হয় চরিত্র, আর চরিত্র থেকে নৈতিক

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সমার্থক শব্দ নয়

1. "Colloquial speech influenced by the idols of the theatre and the market place, equate personality with charm, with 'It', with superficial attractiveness." —G. Allport: Personality—Page 40.

"......Personality is conceived by most people as an intengible quality that makes an individual attractive or unattractive to his fellows. Psychology uses the word personality in a much broader meaning".

—Boring and others: Foundations of Psychology, page 487

2. "......Personality is the broader term including character as one of its aspects", —Thorpe: Psychological Foundation of Personality.

মূল্যায়নের বিষয়টুকু যখন বাদ দেওয়া হয় তখন আমরা পাই ব্যক্তিত্ব।[1] যদি বলা হয়, বাহ্যিক কার্যাবলী যার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে, তার সমন্বয়ই ব্যক্তিত্ব, তাহলে ব্যক্তির দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হল না। 'অপরিবর্তনশীল আত্মাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব'—ব্যক্তিত্বের এ জাতীয় ব্যাখ্যা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় ; এরকম দার্শনিক আলোচনা মনোবিদ্যার মধ্যে টেনে না আনাই যুক্তিযুক্ত।

## ২। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা (Definition of Personality) :

ব্যক্তিত্ব জটিল বিষয় এবং ব্যক্তিত্বের নিখুঁত সংজ্ঞা নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন।[2]

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিভিন্ন মনোবিদ্ ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। অলপোর্ট তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর লেখা গ্রন্থে প্রায় পঞ্চাশটি প্রচলিত সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সংজ্ঞাগুলি দেওয়া হয়েছে বলে কোন সংজ্ঞাই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্বরূপটিকে প্রকাশ করতে পারেনি।

মনোবিদ্ **উডওয়ার্থ** (*Woodworth*) ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ব্যক্তিত্ব হল 'ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক প্রকৃতি।'[3] কিন্তু সামগ্রিক প্রকৃতিটি বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের এই ঐক্যসূত্রটি কি, তা উডওয়ার্থ ব্যাখ্যা করেন নি। কোন কোন মনোবিদ্ তাঁদের সংজ্ঞাতে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্যসাধন বা উপযোজনের শক্তিকেই ব্যক্তিত্বের লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন। মনোবিদ্ **ওয়াটসন্** (*Watson*)-এর মতে উদ্দীপক জীবদেহের উপর ক্রিয়া করার জন্য যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেই প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিই হল ব্যক্তিত্ব ; কিন্তু ওয়াটসনের সংজ্ঞাতে ব্যক্তিত্বের মানসিক এবং উদ্দেশ্যমূলক দিককে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। মনোবিদ্ **বোরিং** (*Boring*) ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—ব্যক্তিত্ব হল, 'ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে এক বিশেষ ধরনের সঙ্গতিপূর্ণ উপযোজন।'[4]

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা

1. "Character is personality evaluated and personality is character devaluated." —Allport : Personality ; Page 52.

2. "Personality is intrinsically complex : we can offer no simple formula for reducing its rich variety to a dry definition." —Stagner : Psychology of Personality.

3. "Personality can be broadly defined as the total quality of an individual's beheviour," —Woodworth : Psychology : Page 139.

4. "It is defined as an individual's typical or consistent adjustment to his environment." —Boring : Foundations of Psychology : Page. 488.

মনোবিদ্ **ম্যাকডুগাল** (*McDougall*)-এর মতে ব্যক্তিত্ব কতকগুলি সহজাত বৃত্তির ক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। কেউবা ব্যক্তিবিশেষের অর্জিত প্রবণতা ও বৃত্তিকে, কেউবা ব্যক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা গুণের সমষ্টিকে (sum total of different traits) ব্যক্তিত্ব মনে করেছেন ; আবার কোন কোন মনোবিদ্ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সংহতি বা ঐক্য আছে তাকেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব রূপে নির্দেশ করেছেন। পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি অসম্পূর্ণ, কারণ এগুলিতে ব্যক্তিত্বের কোন একটি বিশেষ দিকের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অলপোর্ট বলেন, "ব্যক্তিত্ব মানুষের অন্তঃস্থিত দৈহিক-মানসিক তন্ত্রের সেই গতিশীল সংগঠন যা পরিবেশের সঙ্গে তার অভিনব উপযোজন নির্ধারণ করে।"[1] অন্যান্য সংজ্ঞার তুলনায় অলপোর্টের সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক। কারণ, তিনি ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনশীল রূপকে স্বীকার করেছেন। তিনি বাহ্য-প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে আভ্যন্তরীণ দিক এবং ব্যক্তিত্বের সামাজিক দিকের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে চেয়েছেন।

মনোবিদ্ অলপোর্ট ও মান্-এর সংজ্ঞা

মনোবিদ্ **মান্** (*Munn*)-ও তাঁর সংজ্ঞার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে ঐক্য বা সংহতি আছে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞায় বলেছেন—"বিশেষ করে সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য ব্যক্তির গঠন, আচরণের ধরন, আগ্রহ, ভাবভঙ্গি, ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং প্রবণতার বিশেষ সংহতি বা ঐক্য হল ব্যক্তিত্ব।"[2]

আসলে ব্যক্তিত্ব দেহমনের এক জীবন্ত ঐক্য। ব্যক্তির দৈহিক বৈশিষ্ট্য, সহজাত প্রবৃত্তি, মানসিক প্রবণতা ও ব্যক্তির আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, আগ্রহ, জীবনাদর্শ, অভ্যাস, অভিজ্ঞতা, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, দোষ-গুণ প্রভৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের ক্ষমতা এবং বাহ্য-প্রতিক্রিয়া —এই সব কিছুর সংমিশ্রণেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি নয়, বা শুধুমাত্র সংহতি বা ঐক্য নয়, ব্যক্তিত্ব হল সেই সত্তা যা গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে উপস্থিত থেকে তাদের সংহত বা ঐক্যবদ্ধ করে।

1. "Personality is the dynamic organisation within the individual of those psycho-physical systems that determine his unique adjustment to his environment," —Allport : Personality ; Page 48.

2. "Personality may be defined as the most characteristic integration of an individual's structure, modes of behaviour, interests, attitudes, abilities and aptitudes, especially from the standpoint of adjustment in social situations."—Munn.

### ৩। ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Personality) :

এখন সংক্ষেপে ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে আমরা ব্যক্তিত্বের স্বরূপটিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

(১) ব্যক্তি যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত থাকে অনন্ত সম্ভাবনা ও বিচিত্র শক্তি এবং সেই সম্ভাবনা ও শক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ব্যক্তির এক দৈহিক-মানসিক সংগঠন আছে। জন্মের পর থেকেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিগুলি ব্যক্তির উপর ক্রিয়া করে। এর ফলে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি, ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা এবং পরিবেশের শক্তির মধ্যে যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয় তার থেকেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশলাভ করে। কাজেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে উপযোজনের (adaptation) জন্য ব্যক্তির কার্যাবলী তার ব্যক্তিত্বের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ।

(২) ব্যক্তির সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের এই উপযোজনের পেছনে আছে ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, ভাবধারা, কামনা, বাসনা, জীবনাদর্শ, এবং ব্যক্তির সহজাত প্রবণতা ও বৃত্তি।

(৩) আবার মানসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে দৈহিক বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিত্ব দেহমনের এক জীবন্ত ঐক্য।

(৪) মানসিক এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা সুসমঞ্জস রূপ লাভ করে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে আছে একটা সমগ্রতা, একটা সংহতি, একটা সুসমঞ্জস সংগঠন।

(৫) যে আত্মসচেতন জীব নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ, তিনিই ব্যক্তি। সুতরাং আত্মচেতনা (self-consciousness) এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-determination) ক্ষমতাই ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি।

(৬) ব্যক্তিত্ব স্থির বা নিশ্চল নয়, ব্যক্তিত্বের গঠন ক্রমবর্ধমান ও গতিধর্মী (dynamic)। পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য এবং এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিসাধনের প্রচেষ্টার জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। ব্যক্তিত্ব স্থির বা নিশ্চল নয়; এ চির-পরিবর্তনশীল, সদা-বিকাশমান ও গতিধর্মী।

(৭) ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান হলেও এর মধ্যে একটা স্থায়িত্ব আছে, যার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বুঝে নেওয়া যায়। প্রতিটি ব্যক্তি এক

বিশেষ ব্যক্তি এবং এই হিসেবে সে অদ্বিতীয়, অন্য কারও সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

(৮) সর্বশেষে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, কৃষ্টি ও ভাবধারা প্রভৃতি সামাজিক উপাদান ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে, সে কারণে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজের উপর নির্ভরশীল।

## ৪। ব্যক্তিত্বের উপাদান (Factors of Personality) :

ব্যক্তিত্ব হল একটা সুসংহত সামগ্রিক সত্তা, বহু উপাদানে গড়া কমবেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ঐক্যবদ্ধ জটিল সংগঠন। প্রশ্ন হল, যে বহুবিধ উপাদানে এই ব্যক্তিত্ব গঠিত, সেই উপাদানগুলি কী ? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ঠিক কোন্ কোন্ উপাদানের দ্বারা ব্যক্তিত্ব গঠিত তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। প্রাণহীন ও অচেতন জড়বস্তুর উপাদানগুলিকে সহজে জানা যায় এবং জড় পদার্থের বিভিন্ন উপাদানগুলির বর্ণনার মাধ্যমেই জড় পদার্থের স্বরূপটিকে মোটামুটি বুঝে নেওয়া যায়। তাছাড়া জড় পদার্থের উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথক পৃথক ভাবে পাওয়া সম্ভব হয়। ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলিকে ঠিক সেভাবে পাওয়া সম্ভব নয়; কেননা, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সামগ্রিকভাবে কার্য করে। জড় পদার্থ তার উপাদান-গুলির সমষ্টিমাত্র, কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্ন উপাদানের সমষ্টিমাত্র নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এক চলমান জীবন্ত ঐক্য। বহুবিধ বিচিত্র উপাদানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠিত। আমাদের দৃষ্টির অগোচরে এবং অজ্ঞাতসারে বহুবিধ ঘটনা ব্যক্তির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ব্যক্তিত্ব দৈহিক ও মানসিক সমস্ত রকম শক্তি ও সম্ভাবনার এক সুষম সমন্বয় এবং সংগঠন।

**ব্যক্তিত্বের উপাদানের সঠিক বর্ণনা সম্ভব নয়**

**উপাদান দু'প্রকার—প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত**

ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা চলে—(ক) **প্রাকৃতিক উপাদান**, এবং **(খ) পরিবেশগত উপাদান।**

**(ক) প্রাকৃতিক উপাদান :** এই উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম হল বংশধারা বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কতকগুলি বৈশিষ্ট্য (Hereditary factors); দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক গঠন (Physique); তৃতীয়তঃ, অনালী বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়া (Function of ductless glands)।

(i) **বংশধারা বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্য :** আমাদের ব্যক্তিত্বের উপর বংশপ্রভাব কিভাবে ক্রিয়া করে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বংশধারা বা উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা কি কি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হই, তা জানতে হলে খুব সংক্ষেপে প্রাণীর জন্মরহস্য সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন।

**পিতৃকোষ ও মাতৃকোষ**

মাতৃগর্ভে যে ডিম্বকোষে জীবনের সর্বপ্রথম আবির্ভাব ঘটে, সেই ডিম্ব-কোষটি হল দুটি জননকোষের (germ-cell) মিলনের ফল। এই দুটি জননকোষের মধ্যে একটি হল পিতৃকোষ এবং আর একটি হল মাতৃকোষ। প্রথমটি আসে পিতার কাছ থেকে, দ্বিতীয়টি আসে মায়ের কাছ থেকে। প্রতি জননকোষে চব্বিশটি করে ক্রোমোসোম (chromosome) থাকে এবং মাতৃগর্ভে
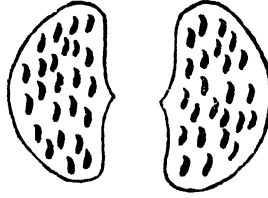
দুটি অর্ধ-কোষ, যার প্রত্যেকটিতে চব্বিশটি করে ক্রোমোসোম আছে

যে ডিম্বকোষের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে মোট আটচল্লিশটি ক্রোমোসোম থাকে। এই ক্রোমোসোম হল সূক্ষ্ম সুতার মতো পদার্থ। পূর্বে এই ক্রোমোসোমকেই বংশগত সংলক্ষণের (hereditary traits) বাহক বলে

**জিনই বংশগত সংলক্ষণের প্রধান বাহক**

ধারণা করা হত। কিন্তু গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, প্রত্যেকটি ক্রোমোসোমের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মতো রাসায়নিক পদার্থ থাকে যাকে বলা হয় 'জিন' (gene)। এই জিনই হল বংশগত সংলক্ষণের যথার্থ বাহক।[1] পিতৃকোষের এবং মাতৃকোষের জিনগুলির পারস্পরিক মিলনের উপরই শিশুর বংশধারার স্বরূপ নির্ভর করে। এই জিনগুলিই শিশুর দৈহিক এবং মানসিক প্রকৃতি নির্ধারণ করে। মাতাপিতার বৈশিষ্ট্য এবং গুণরাজি এই জিনগুলির মাধ্যমেই শিশুর মধ্যে সংক্রমিত হয়।

1. "Since, however, each cromosome 'thread' is composed of numerous infinitesimal units called genes, it is more proper as Gilliland suggests to regard the latter as the real basis of inheritance".

—Thorpe : Psychological Foundations of Personality : Page 46.

ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, স্বভাবগত—সব রকম সহজাত বৈশিষ্ট্যই এই জিনগুলির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, সেহেতু বংশগতির ক্ষেত্রে এই জিনগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জিনগুলি সব সময় জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে; একটি জিন পিতৃকোষের, অপরটি মাতৃকোষের। যেহেতু এক জোড়ার জিন একই ধরনের কাজ করে এবং যেহেতু প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম, সেজন্য কোন একটি জিন ত্রুটিপূর্ণ হলেও, অন্যটি সমস্ত কাজ একাই করতে পারে।[1] জিনগুলি কিভাবে জোড় বাঁধবে, সেই 'জোড় বাঁধার উপরই নির্ভর করে বংশগতি। প্রত্যেক মাতাপিতার জিনের মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়। সে কারণে একই মাতাপিতার সন্তানদের মধ্যে দৈহিক, মানসিক ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের নানা প্রকার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ প্রত্যেক সন্তানের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জিনের সম্মেলন ঘটে। প্রত্যেক সন্তানের মধ্যে জিনের বিশেষ সম্মেলনের জন্য তার বংশগতিও এক বিশেষ ধরনের হয়ে থাকে। এই কারণে জেনিংস (*Jennings*) বলেন, "যে ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির বিকাশ ঘটে, যে বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের মধ্যে দেখা যায়, তথাকথিত বংশগতির নিয়মগুলি, মাতাপিতা ও সন্তানের মধ্যে অসাধারণ রকমের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য—এই সব কিছুই জিনের বিন্যাস এবং ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।"[2] সুতরাং জিনের যে সংগঠন নিয়ে মানবশিশু জন্মেছে, তার উপরই নির্ভর করছে পরিণত জীবনে সে কি হবে। "একটি রাসায়নিক মিশ্রণের প্রকৃতি যেমন যে যে উপাদানে মিশ্রণটি গঠিত তার উপরে নির্ভর করে, তেমনি ব্যক্তির প্রকৃতি গঠনে যে যে জিনের সমাবেশ হয়েছে সেগুলির উপরই ব্যক্তির প্রকৃতি নির্ভর করে।"[3]

ব্যক্তির সব বৈশিষ্ট্য জিনের উপর নির্ভর করে

1. "Since each pair of genes is concerned with same function and since either is capable of performing the function in question independently, it follows that if one gene is defective or otherwise inadequate in its work, its mate can perform the entire function......"

—Thorpe: Psychological Foundations of Personality.

2. "The way diverse individuals develop the peculiarities that they show, the so-called laws of heredity, the extra-ordinary resemblances and differences between parents and offsprings—all these things depend largely in the arrangement and behaviour of the genes."

—H, S. Jennings: The Biological Basis of Human Nature—Page 8.

3. "Just as the character of a chemical solution depends upon the substance of which it is composed, so human characteristics depend upon the genes that co-operated in their formation."

—W. Rand, M. E. Sweeny and E. L. Vincent: Growth and Development of the young child.

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—শারীরিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং মানসিক প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলির অন্তর্গত হল দৈহিক গঠন, উচ্চতা, মুখ-চোখের গড়ন, দেহের রঙ ইত্যাদি। অনালী গ্রন্থিগুলির ক্ষরণের ফলে যে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় সে-গুলিও এর অন্তর্ভুক্ত। মানসিক বৈশিষ্ট্য হল চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছা, কল্পনা ও মানসিক শক্তি প্রভৃতি। মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল শিশুর মেজাজ বা মুড (Mood)।

(ii) **দৈহিক গঠন:** দৈহিক গঠনের উপর ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে। ব্যক্তির নিজস্ব ব্যবহার এবং অপরের সঙ্গে তার আচরণ দৈহিক গঠনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। ক্রেসট্‌মার (*Kretschmer*) এবং সেল্‌ডন (*Sheldon*) দেহের গঠনের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের গভীর সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মনোবিদ্‌ অ্যাডলার (*Adler*)-এর মতে শারীরিক ত্রুটিযুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ দেখা যায়।

(iii) **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি:** আমাদের দেহের মধ্যে কতকগুলি বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (duct gland) আছে, যেমন লালাগ্রন্থি, স্বেদগ্রন্থি, অশ্রুগ্রন্থি, মূত্রগ্রন্থি ইত্যাদি। যদিও এগুলি ব্যক্তির আচরণের উপর ক্রিয়া করে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তবুও আমাদের দেহের মধ্যে যেসব অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (ductless glands) আছে, ব্যক্তিত্বের বিকাশে সেগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অনালী গ্রন্থিগুলি রক্তের মধ্যে যে রস ক্ষরণ করে, সেই রস সমস্ত দেহের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। দেহের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার সমন্বয়-সাধন করা ছাড়াও, দেহ ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই গ্রন্থিগুলির উপযুক্ত ক্ষরণ একান্ত প্রয়োজনীয়। ব্যক্তির মানসিক জীবনে এই গ্রন্থিগুলি অসীম প্রভাব বিস্তার করে। থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ব্যাহত হলে শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়, ব্যক্তির মধ্যে উৎসাহের অভাব, বিষণ্ণতা ও অবসন্নতা দেখা দেয়। থাইরয়েড পিটুইটারি এবং যৌনগ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হলে ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের ক্ষমতা কমে যায়। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তির মধ্যে চপলতা, উত্তেজনা ও মানসিক উদ্বেগ অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই সব অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থির সংযোগ বাইরে থেকে সহজে পরিমাপ করা যায় না, কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন এই সব গ্রন্থির বিকাশ হয়,

খুব কম বা অধিক মাত্রায় ঘটে থাকে তখনই ব্যক্তিত্বের উপর তাদের প্রভাব আমরা উপলব্ধি করতে পারি।[1]

**(খ) পরিবেশগত উপাদান:** ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে মাতাপিতা এবং পূর্বপুরুষদের অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত থাকে বিচিত্র সম্ভাবনা, অনন্ত শক্তি; তবে অনুকূল পরিবেশেই ব্যক্তির এই সম্ভাবনা ও শক্তি বাস্তবে রূপায়িত হয়। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগঠিত বিধান এবং সেই সঙ্গে নিজের শক্তি ও সম্ভাবনার সুষম সমন্বয়ের ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। **এই পরিবেশ দু ধরনের—প্রাকৃতিক এবং সামাজিক।** প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical environment) ব্যক্তির মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। জলবায়ু, মৃত্তিকা, গাছপালা, জীবজন্তু, খাদ্য—এ সব কিছুর প্রভাব ব্যক্তির উপর আছে। এগুলির প্রভাবে ব্যক্তি হয় কর্মঠ বা আয়েসী, শক্তিমান বা দুর্বল, পরিশ্রমী বা কুঁড়ে।

**সামাজিক পরিবেশ**

সামাজিক পরিবেশের (Social environment) মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য হল **গৃহের বা পরিবারের পরিবেশ।** পরিবারের সুস্থ ও মনোরম পরিবেশ শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষভাবে উপযোগী। পরিবারের মাতাপিতা, ভ্রাতাভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের কার্যকলাপ, চিন্তাধারা, আদর্শ, শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।[2] মাতাপিতা যদি শিশুকে স্বাধীনভাবে কর্ম করার সুযোগ দেন, তাহলে শিশুর মধ্যে আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, সাহস, স্বাধীনভাবে কর্ম করা ও চিন্তা করার ক্ষমতা দেখা দেয়; তার ফলে শিশু স্থির ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। আবার অপরপক্ষে মাতাপিতা যদি শিশুকে কেবল চোখে চোখে রাখতে চান, তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করা ও চিন্তা করার সুযোগ না দেন, তাহলে শিশুর মধ্যে এক দুর্বল ও ভীরু ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। আবার মাতাপিতা যদি শিশুর প্রতি নির্মম ব্যবহার করেন, বা মাতাপিতা যদি খেয়ালী, উৎপীড়ক বা অত্যাচারী হন, তাহলেও শিশু বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন, অসংযত, ভীরু, অসামাজিক ও রুক্ষ মেজাজের হয়ে

1. "Only in dramatic cases, when these glands are grossly under-developed or over-developed can we see their effects on personality."
—C. T. Morgan: Introduction to Psychology, Page 232.

2. "Parents, finally, influence personality development by being models. Much of a child's learning is by imitation. By watching his father, a son learns how to act like a man, and the daughter learns how to assume the role of wife and mother by watching her mother."
—C. T. Morgan: An Introduction to Psychology; Page 239.

থাকে। কাজেই গৃহের পরিবেশ যত মনোরম, যত স্বাস্থ্যকর, যত স্নেহপূর্ণ হবে, পরিবারের ছেলেমেয়েরা সেভাবেই ব্যক্তিত্ব অর্জন করবে।

এর পরে উল্লেখ করা যেতে পারে **বিদ্যালয়ের পরিবেশ** অর্থাৎ শিশুমনের উপর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং শিশুর সহপাঠীদের প্রভাব। শিক্ষকদের সদয় ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, শিক্ষা দেবার আগ্রহ, তাঁদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, চালচলন শিশুর জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। অপরপক্ষে, শিক্ষকের কঠোর ব্যবহার, নির্মমতা শিশুমনকে বিদ্রোহী করে তোলে, তার মধ্যে উদাসীন ভাব সৃষ্টি করে।[1] সহপাঠীদের সাহচর্যে শিশু তার সুপ্ত ক্ষমতা ও শক্তির স্বাধীন বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হয়। কোন কোন শিশুর মধ্যে নেতৃত্ব করার প্রবণতা জাগে। দলের অপর ছেলেদের সে নেতা সাজে। বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন সহজাত ক্ষমতা 'দলের' প্রভাবে বিশেষভাবে ক্রিয়া করবার সুযোগ পায়। সুতরাং শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশের মূলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

**শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের মূলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা**

তারপর শিশু যখন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয় তখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, সমাজের আচার, রীতি-নীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, অফিস প্রভৃতি সংগঠনগুলি ব্যক্তির চিন্তাধারা ও আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এই প্রভাবের তারতম্য অনুযায়ী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

বংশগতি বা পরিবেশ, কোন্‌টি ব্যক্তিত্বের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে?—এর উত্তরে কোন কোন মনোবিদ্‌ বংশগতির উপর, আবার কোন কোন মনোবিদ্‌ পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বস্তুতঃ, কোন চরম মতবাদের প্রতি সমর্থন না জানিয়ে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিত্বের উপর, উভয়ের প্রভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি, প্রবণতা ও ক্ষমতার অধিকারী হয় সত্য, কিন্তু প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ গুণগুলি বিকাশলাভ করে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উপাদানগুলি পরিবেশের

**বংশগতি বা পরিবেশ—কোন্‌টির প্রভাব অধিকতর?**

1. "The effect of an autocratic school system, like the authoritarian family structure, is generally harmful to the children. It tends to create unnecessary aggressiveness and to prevent the development of independent habits of thinking." —Stagner: Psychology of Personality; Page 389.

মাধ্যমেই নিজেকে বিকশিত করে। সহজ কথায়, ব্যক্তির মধ্যে যে শক্তি ও সম্ভাবনা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, উপযুক্ত পরিবেশে তা' সম্যকভাবে সুপরিস্ফুট হয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে একটি দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করে।

## ৫। ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ (Traits of Personality):

সংলক্ষণের পরিচয়

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ বলতে বোঝায় ব্যক্তির এমন কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য যার সাহায্যে আমরা একটি ব্যক্তিত্বকে অন্য ব্যক্তিত্ব থেকে পৃথক করি। যেমন—'সদাশয়তা', 'পরিশ্রমশীলতা,' 'সামাজিকতা,' 'বিষণ্ণতা,' 'প্রফুল্লতা,' 'উদারতা' ইত্যাদি।

সংলক্ষণকে আমরা জানি

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের ধারণা আমরা কিভাবে করি এবং কিভাবে তার নামকরণ করি, কোন কোন মনোবিদ্ তার একটা যুক্তিশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। প্রথম স্তরে ব্যক্তির আচরণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা কোন একটি ক্রিয়া-বিশেষণের (adverb) ব্যবহার করি। যেমন, অমুক লোক বেশ সতর্কতার সঙ্গে বা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করেছে। দ্বিতীয় স্তরে, এই গুণটিকে ব্যক্তির আচরণের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ না করে, ব্যক্তির বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তখন এটি ক্রিয়াবিশেষণ না হয়ে হয় বিশেষণ (adjective)। যেমন, লোকটি সাবধানী বা আত্মবিশ্বাসী। তৃতীয় স্তরে, আমরা এই বিশেষণটিকে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করি এবং মনে করি ব্যক্তির মধ্যে এই বিশেষ গুণটির অস্তিত্ব আছে। তখন বলি এই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে 'সাবধানতা' এবং 'আত্মবিশ্বাস' এই দুই সংলক্ষণের অস্তিত্ব রয়েছে। কোন কোন মনোবিদ্ এইভাবে অমূর্ত বিষয়কে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু এই বিষয়টি এখানে আমাদের আলোচ্য করা সমীচিন নয়। সংলক্ষণ বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি ব্যক্তির মধ্যে একটা কমবেশী স্থায়ী গুণ যার জন্য কোন ব্যক্তির কাছে আমরা বিশেষ এক ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করি, অনুরূপ প্রত্যাশা করি না।

কিন্তু ব্যক্তির আচরণ-নির্দেশক যে কোন গুণবাচক শব্দকেই ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণরূপে গণ্য করা যেতে পারে না। ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণরূপে গণ্য হবার জন্য যে কোন গুণবাচক শব্দের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন।

1. "Although a trait is a description of human behaviour, not every word that describes behaviour defines a trait."
—Boring: Foundations of Psychology: Page 490.

প্রথমতঃ, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের দুটি দিক আছে—একটি মানসিক ও অপরটি আচরণমূলক, যেমন—ভদ্রতা; মনের দিক থেকে ভদ্রতা মার্জিত রুচিসম্পন্ন মনোভাবকে বোঝায় এবং আচরণের দিক থেকে শিষ্ট-সভ্য আচরণকে বোঝায়।

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের দুটি দিক—মানসিক ও আচরণমূলক

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের এই সংলক্ষণগুলি কমবেশী পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন গুণই চরম মাত্রায় বিদ্যমান থাকে না; যেমন, সামাজিকতা। কোন ব্যক্তি কম সামাজিক, কোন ব্যক্তি বেশী সামাজিক।

সংলক্ষণগুলি কম বেশী পরিমাণে বিদ্যমান

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির জন্মগত প্রবণতা ও পরিবেশ—এই উভয়ের প্রতিক্রিয়া থেকেই ব্যক্তিত্বের এই সংলক্ষণগুলির জন্ম।

চতুর্থতঃ, বাহ্য-অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের এই সংলক্ষণগুলির পরিবর্তন ঘটলেও ব্যক্তির স্বভাবের মধ্যে এগুলি কমবেশী স্থায়ী। এই সংলক্ষণগুলি থেকে যে আচরণের উদ্ভব হয় সেই আচরণের মধ্যে এই সংলক্ষণের প্রকাশ অনেকটা সামঞ্জস্য-পূর্ণ ও সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন, যে ব্যক্তি উদার মনোভাবসম্পন্ন, মোটামুটি সব অবস্থায় তার আচরণের মধ্যে উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

সংলক্ষণগুলি কমবেশী স্থায়ী

পঞ্চমতঃ, ব্যক্তিত্বের অধিকাংশ সংলক্ষণই দ্বিমুখী, অর্থাৎ, একটি গুণ এবং তার বিপরীত গুণ—এ দুটিকে নিয়েই ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের দ্বিমুখী সত্তা গঠিত হয়। এজন্য কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কোন বিশেষ সংলক্ষণ নির্ণয় করতে হলে দুটি পরস্পরবিরোধী গুণকে দুদিকে রেখে তাদের একটি কাল্পনিক সরলরেখার দ্বারা যুক্ত করতে হবে এবং তারপর নির্ধারণ করতে হবে ব্যক্তির ঐ 'গুণটি' ঐ সরলরেখার কোন্ জায়গায় অবস্থিত। এই কাল্পনিক রেখাটিকে বলা হয় **ব্যক্তিত্বের পরিসর (dimension of personality)**। যেমন, সামাজিকতা বনাম অসামাজিকতা, প্রফুল্লতা বনাম বিষণ্ণতা। কোন ব্যক্তিকে প্রফুল্ল না হলেই যে বিষণ্ণ হতে হবে বা সামাজিক না হলে অসামাজিক হতে হবে এমন কোন কথা নেই। এর অর্থ হল, সামাজিকতা থেকে অসামাজিকতা, এই পরিসরের মধ্যে সংলক্ষণটি বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিদ্যমান। যে ব্যক্তির মধ্যে এই সংলক্ষণটি অধিক পরিমাণে থাকবে তাকে সামাজিক এবং যার মধ্যে খুব কম পরিমাণে আছে তাকে অসামাজিক বলা হবে। তেমনি একটি লোককে যখন ভীরু বলা

ব্যক্তিত্বর পরিসর

হচ্ছে তখন তার অর্থ এই নয় যে, তার মধ্যে সাহসিকতা নেই। তবে যেটুকু সাহসিকতা আছে তা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সামগ্রিকভাবে কাজ করে এবং তার একটা সুসংবদ্ধ, সুসমঞ্জস ও ঐক্যবদ্ধ রূপ আছে। সুতরাং ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণগুলির যোগফলমাত্র নয় বা সংলক্ষণগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে পরিমাপ করলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বোঝা যাবে না।

প্রশ্ন হল, ব্যক্তিত্বের এই সংলক্ষণগুলির সংখ্যা কত? এই প্রশ্নের কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। অভিধানে প্রায় ১৭,৯৫০টি গুণবাচক এবং দোষবাচক শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল, মৌলিক সংলক্ষণগুলির সংখ্যা কত? ক্যাটেল ২০ জোড়া প্রধান প্রধান বাহ্য-সংলক্ষণ এবং ১২ জোড়া আভ্যন্তরীণ সংলক্ষণের একটা তালিকা দিয়েছেন।

ব্যক্তিত্বের এই অসংখ্য ও অনির্দিষ্ট গুণগুলির পৃথক পৃথক বর্ণনা বা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এই কারণে ক্যাটেল (*Cattell*), উড্‌ওয়ার্থ ও মারকুইস (*Woodworth and Marquis*), আলপোর্ট, আইসেঙ্ক প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ ব্যক্তিত্বকে শ্রেণীবদ্ধ করতে চেয়েছেন।

**ক্যাটেলকৃত সংলক্ষণের শ্রেণীবিভাগ**

**ক্যাটেল-এর প্রদত্ত ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ:** সংলক্ষণগুলির স্থায়িত্বকে কেন্দ্র করে ক্যাটেল তাদের দুভাগে ভাগ করেছেন—(১) **বাহ্য-সংলক্ষণ** (surface traits) এবং (২) **আভ্যন্তরীণ সংলক্ষণ** (source traits)। বাহ্য-সংলক্ষণ বলতে ক্যাটেল বোঝেন সেই সব গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি যেগুলি ব্যক্তির বাহ্য-কার্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফুট হয়; যেমন—সামাজিকতা (sociality), সাহসিকতা (boldness), একগুঁয়েমি ইত্যাদি। আভ্যন্তরীণ সংলক্ষণগুলিকে ব্যক্তির বাহ্য-কার্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না। এগুলির অস্তিত্ব রয়েছে অনেক গভীরে। এগুলি পরোক্ষভাবে বাহ্য-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই আভ্যন্তরীণ সংলক্ষণগুলিই বাহ্য-সংলক্ষণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং এগুলিই কমবেশী স্থায়ী; যেমন, 'নিরাপত্তার অভাববোধ' (feeling of insecurity)। এই সংলক্ষণটি একটি আভ্যন্তরীণ সংলক্ষণ; একে সোজাসুজি বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সংলক্ষণটি কতকগুলি বাহ্য-সংলক্ষণ, যেমন—অস্থিরতা, ভীরুতা, অত্যধিক উত্তেজনা প্রভৃতির মাধ্যমে নিজকে প্রকাশ করে। অন্যান্য মনোবিদ্ সংলক্ষণের উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগকে

পরিবর্তিত করে 'মুখ্য সংলক্ষণ' (Cardinal traits) এবং 'গৌণ সংলক্ষণ' (Secondary traits)—এই ভাবে শ্রেণীভুক্ত করতে চান।

**উডওয়ার্থ ও মারকুইস প্রদত্ত ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ:** উডওয়ার্থ ও মারকুইস ব্যক্তিত্বের বারটি মৌলিক সংলক্ষণের নিম্নোক্ত তালিকাটি দিয়েছেন।

| মৌলিক সংলক্ষণ | বিপরীত |
|---|---|
| ১। আয়াসী, স্ফূর্তিবাজ, দরদী, উদার-প্রকৃতি (Easygoing, genial, warm, generous)। | ১। অনমনীয়, অনুরাগবিহীন, ভীরু, শত্রুভাবাপন্ন, লাজুক (Inflexible, coid, timid. hostile, shy)। |
| ২। বুদ্ধিমান, স্বাধীনচেতা, নির্ভরযোগ্য (Intelligent, independent, reliable)। | ২। নির্বোধ, অপরিণামদর্শী, ছেবলা (Foolish, unreflective, frivolous)। |
| ৩। ধীরস্থির, বাস্তববাদী, একাগ্র (Emotionally stable, realistic, steadfast)। | ৩। স্নায়ুরোগাক্রান্ত, এড়ানো স্বভাব ও অস্থিরচিত্ত (Neurotic, evasive, emotionally changeable)। |
| ৪। প্রভুত্বকামী, প্রভাবশালী এবং আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী (Dominant, ascendant, self-assertive)। | ৪। বশ্যতা স্বীকারপ্রবণ, আত্মলোপকারী (Submissive, self-effacing)। |
| ৫। শান্ত, প্রফুল্ল, মিশুক, গল্পপ্রিয় (Placid. cheerful, sociable, talkative)। | ৫। বিষণ্ণ, ভগ্নোদ্যম, নির্জনতাপ্রিয়, (Sorrowful, depressed, seclusive, agitated)। |
| ৬। অনুভূতিপ্রবণ, কোমল হৃদয়, সহানুভূতিসম্পন্ন (Sensitive, tenderhearted, sympathetic)। | ৬। কঠিন হৃদয়, উদাসীন, স্পষ্টভাষী, দয়ামায়াশূন্য (Hard boiled.poised, frank, unemotional)। |
| ৭। মার্জিত, রুচিসম্পন্ন, এবং সৌন্দর্যপ্রিয় (Trained and cultured mind, sympathetic)। | ৭। অমার্জিত ও স্থূলরুচিসম্পন্ন (Boorish, uncultured)। |
| ৮। বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, কষ্টসহিষ্ণু (Conscientious, responsible, pains-taking)। | ৮। পরনির্ভর, আবেগপ্রবণ ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্য (Emotionally dependent, impulsive, iresponsible)। |
| ৯। দুঃসাহসী, নিরুদ্বেগ ও সদয় Adventurous, carefree and kind)। | ৯। চাপা, সংযত, সতর্ক ও অসরল (Inhibited, reserved, cautious, withdrawn)। |
| ১০। তেজস্বী, উদ্যমযুক্ত, অধ্যবসায়ী, তৎপর (Vigorous energetic, persistent, quick)। | ১০। নিস্তেজ, ঢিলে, স্বপ্নবিলাসী (Languid, slack, day-dreaming)। |
| ১১। অতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবণ, অতি-অভিমানী, উত্তেজনাপ্রবণ (Emotionally, hypersensitive, high-strung, excitable)। | ১১। নির্জীব, সহনশীল (Phelgmatic, Tolerant)। |
| ১২। বন্ধুভাবাপন্ন, বিশ্বাসপরায়ণ, (Friendly, trustful)। | ১২। সন্দিগ্ধমনা, পরছিদ্রান্বেষী (Suspicious, hostile) |

**আলপোর্টপ্রদত্ত ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ :**

মনোবিদ্ আলপোর্ট (*F. H. Allport*) ব্যক্তিত্বের পাঁচটি প্রধান সংলক্ষণ এবং এই সংলক্ষণগুলির অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করেছেন।

ফ্রয়েড-আলপোর্টের সংলক্ষণের শ্রেণীবিভাগ

(১) **বুদ্ধি (Intelligence) :** বুদ্ধি হল জীবনের সমস্যাগুলির মুখোমুখী হবার এবং সেগুলি সমাধান করার সামর্থ্য। স্মৃতিশক্তি, বিচারশক্তি, মনোযোগ, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা, গঠনমূলক কল্পনাশক্তি এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা প্রভৃতিও বুদ্ধির অঙ্গীভূত।

(২) **গতীয়তা (Mobility) :** স্বতঃস্ফূর্তভাবে-কর্ম সম্পাদন করার যে মনোভাব তাই হল গতীয়তা। কোন কোন লোকের মধ্যে কর্ম করার জন্য উৎসাহ, উদ্দীপনা, সংকল্প প্রভৃতি দেখা যায়। আবার কারও মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা, আলস্য, শৈথিল্য প্রভৃতি গুণগুলি দেখা যায়।

(৩) **মানস-প্রকৃতি (Temperament) :** আবেগমূলক সংলক্ষণগুলি ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয় উপাদান। কেউ বা শান্ত, কেউ বা উত্তেজনাপ্রবণ, কেউ বা প্রফুল্ল, কেউ বা বিষণ্ণ, কেউ বা সাহসী, কেউ বা ভীরু। ব্যক্তির জীবনে ভাবাবেগের যে পরিবর্তন, আবেগের তীব্রতা বা সাধারণ কথায় যাকে বলি মেজাজ বা মুড— এই মানস-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত।

(৪) **আত্মপ্রকাশ (Self-expression) :** কোন ব্যক্তি নিজেকে প্রচার করতে চায়; আবার কেউ বা নীরবে কাজ করতে ভালবাসে। অন্তর্মুখীতা, বহির্মুখীতা, প্রভুত্ব, বিনয় প্রভৃতি সংলক্ষণগুলি আত্মপ্রকাশের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) **সামাজিকতা (Sociability) :** ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সুতরাং সামাজিকতা ব্যক্তিত্বের একটি প্রয়োজনীয় সংলক্ষণ। সহানুভূতি, দয়া, বিনয়, কর্তব্য-পরায়ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা প্রভৃতি সামাজিকতার অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন মনোবিদের মতে উপরিউক্ত তালিকার সঙ্গে দৈহিক সংলক্ষণ-গুলি (Physical traits); যেমন, দৈহিক আকৃতি, মুখশ্রী, উচ্চতা, দেহের রঙ, পোশাক, পরিচ্ছদ প্রভৃতি যুক্ত হলেই তালিকাটি সম্পূর্ণাঙ্গ হত।

ডেসিয়েল-এর তালিকা

ছয়টি প্রধান সংলক্ষণ এবং তার অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির একটা তালিকা দিয়েছেন ডেসিয়েল (*Deshiel*)। এই ছয়টি সংলক্ষণ হলো —(১) দেহ (Physique), (২) বুদ্ধি (Intelligence), (৩) গতীয়তা বা সংকোচনীয়তা (Mobility), (৪) মানস-প্রকৃতি (Temperament), (৫) প্রেষণা (Motivation) এবং (৬) সামাজিকতা (Sociability)।

**ফ্রাই ও হেগার্ড এবং রোশানফপ্রদত্ত ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ ঃ**

মনোবিদ্‌ ফ্রাই এবং হেগার্ড[1] (*Fry* and *Haggard*) সংলক্ষণের যে তালিকা করেছেন সেই তালিকায় আছে—(১) দেহ (Physique), (২) তাড়না বা পরিচালনাশক্তি (Impulse or Driving force), (৩) বুদ্ধি (Intelligence), (৪) মানস-প্রকৃতি (Temperament) এবং (৫) অহং যা ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান (Ego as constituting the prime element of personality)।

ফ্রাই এবং হেগার্ড-এর তালিকা

যদিও রোশানফ[2] (*Rosanoff*) ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের তালিকায় মানস-প্রকৃতিগত উপাদানের (Temperamental factor) উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তবুও তিনি বুদ্ধি (Intelligence), যৌনতা (Sexuality), দৈহিক উপাদান (Physical factors) এবং অন্যান্য গৌণ উপাদান ; যেমন, গাণিতিক বা সঙ্গীত সম্পর্কীয় দক্ষতা (such mere minor components as mathematical and musical talent) প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

রোশানফ-এর তালিকা

এছাড়া, উপাদান বিশ্লেষণ (Factor Analysis) রূপ গাণিতিক পদ্ধতির সহায়তায় ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলির স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। গিলফোর্ড এবং তাঁর অনুগামীরা এই পদ্ধতির সহায়তায় ব্যক্তিত্বের তেরটি উপাদান আবিষ্কার করেছেন।

**মন্তব্য ঃ**

মনোবিদ্‌ গর্ডন আলপোর্টের মতে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অভিনব (unique), সে কারণে সাধারণ সংলক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের স্বরূপের যথার্থ উপলব্ধি হয় না। তাঁর মতে, ব্যক্তিরই সংলক্ষণের কথা বলা চলে, সমাজের সংলক্ষণের কথা বলা চলে না।[3]

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত নিখুঁত তালিকা তৈরী করা এবং পরিমাপ করা খুবই কঠিন। তার কারণ হল :

1. C. C. Fry and H. W. Haggard : The Anatomy of Personality ; Page 17-30
2. A. J. Rosanoff : Manual of Psychiatry, 6th edition ; Page 333-354
3. "......Only the individual trait is true (a) because traits are always in individuals and not in the community at large........"
G. D. Allport ; Personality ; Page 399

প্রথমতঃ, এগুলি অত্যন্ত দুর্বোধ্য এবং বিভিন্ন ব্যক্তি, ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের আচরণমূলক বৈশিষ্ট্যকে একই সংলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করেন।

দ্বিতীয়তঃ, এই সব সংলক্ষণের নির্ধারণ ব্যাপারটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কোন পিতা তার ছেলেটির দুষ্টুমি দেখে মনে করতে পারেন যে ছেলেটি অবাধ্য। আবার কোন প্রগতিশীল পিতা তার ছেলের মধ্যে এই রকম আচরণ দেখে মনে করতে পারেন যে তার ছেলে উদ্যোগী।

**ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত তালিকা গঠন ও পরিমাপের অসুবিধা**

তৃতীয়তঃ, সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংলক্ষণের পরিমাপ করা হলে তা অনেকটা কৃত্রিম এবং কল্পনাপ্রসূত ব্যাপারে পরিণত হয়।

চতুর্থতঃ, মানুষের সকল আচরণ এতই জটিল এবং বিচিত্র উপাদান নির্ভর যে সব সময় লোক একই সংলক্ষণের জন্য ক্রিয়া করছে এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত নয়।[1]

উল্লিখিত অসুবিধা সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত তালিকা গঠন করা যদি কখনও ভবিষ্যতে সম্ভব হয় তবে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই সুস্পষ্ট হবে। আবার অপর দিকে এই পদ্ধতি এতই বিশ্লেষণাত্মক যে এই জাতীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের মতো একটা গতিশীল জটিল সংগঠনকে বুঝে ওঠা কঠিন।

## ৬। ব্যক্তিত্বের টাইপ (Personality Type) :

অনেক মনোবিদ্ মনে করেন যে, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ (traits)-এর সাহায্যে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ যথাযথভাবে জানা যায় না। ব্যক্তিত্ব এক সুসংহত সামগ্রিক সত্তা, পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলির বিশ্লেষণ ও বর্ণনার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের এই সামগ্রিক রূপ ধরা পড়ে না। সে কারণে অনেক মনোবিদ্ ব্যক্তিত্বের কতকগুলি নমুনা বা টাইপ (Type) নির্ধারণ করে, তারই ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের স্বরূপকে জানার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। **'টাইপ' বলতে আমরা বুঝি, মানস-প্রকৃতি এবং দেহগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের শ্রেণীকরণ।**

**ব্যক্তিত্বের টাইপ কাকে বলে ?**

1. "Any particular piece of behaviour depends on such a multiplicity of factors in the personality structure and the environment that no one reacts in accordance with a trait all the time."

—P. E. Vernon : Personality Tests and Assessments ; Page 7

অতীতে দার্শনিকেরা মানুষের চরিত্র অনুযায়ী তাদের শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ, বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের যে বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন তা মোটামুটি ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা ছাড়া কিছুই নয়। যেমন—কৃপণ, উদারচেতা বা নীচ প্রকৃতির ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্বের এক বিশেষ নমুনা (Typical personality) হিসাবে গ্রহণ করা হত। বস্তুতঃ, ব্যক্তির একটি কেন্দ্রীয় সংলক্ষণকে কেন্দ্র করে তাদের যে চরিত্র বর্ণনা করা হত তাই ছিল ব্যক্তিত্বের নমুনা।

**অতীতে দার্শনিককৃত মানুষের চরিত্রের শ্রেণীবিভাগ**

## হিপোক্রেটিস-এর মতে ব্যক্তিত্বের চারটি টাইপ ঃ

দৈহিক উপাদানের (Physiological factors) সঙ্গে চরিত্রগত স্বভাবকে যুক্ত করে ব্যক্তিত্বের নমুনা নির্ধারণের চেষ্টা করলেন হিপোক্রেটিস্ (*Hippocrates*)। তার মতে ব্যক্তিত্বের প্রধান চারটি টাইপ হল—**দৃঢ় প্রত্যয়ান্বিত** (Sanguine), **মন্থর** (Phlegmatic), **সহজক্রোধী** (Choleric) এবং **বিষাদপ্রবণ** (Melancholic)। কোন্ ব্যক্তি কোন্ টাইপের অন্তর্ভুক্ত তা নির্ভর করছে তার দেহে রক্ত, শ্লেষ্মা, হলুদ রঙের পিত্ত বা কৃষ্ণবর্ণের পিত্তের প্রাধান্যের উপর। যার মধ্যে রক্তের প্রাধান্য সে ব্যক্তি দৃঢ়প্রত্যায়ান্বিত, যার মধ্যে শ্লেষ্মার প্রাধান্য সে মন্থর, যার মধ্যে হলুদবর্ণের পিত্তের প্রাধান্য সে সহজক্রোধী এবং যার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের পিত্তের প্রাধান্য সে বিষাদপ্রবণ হয়; আবার মস্তিষ্কতত্ত্ববিদরা (Phrenologists) মুখের ভাব এবং মস্তিষ্কের স্ফীতি দেখে ব্যক্তিত্বের তারতম্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এই সব মতবাদ হল মনোবিস্থার ক্ষেত্রে প্রাক-বৈজ্ঞানিক যুগের কথা। বর্তমানে এসব মতবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে।

**হিপোক্রেটিস-এর মতে ব্যক্তিত্বের চারটি টাইপ**

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং ব্যক্তিত্বের শ্রেণীকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে মানসিক প্রকৃতি এবং দেহগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বক্তিত্বের টাইপ নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

## মানস-প্রকৃতির ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের টাইপ নির্ধারণ ঃ

**(ক) য়ুঙ-এর টাইপ (Jung's Type) :** প্রসিদ্ধ মনোবিদ্ সি. জি. য়ুঙ (*Jung*) ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের কথা বলেছেন—(i) **অন্তর্মুখী** (Introvert), (ii) **বহির্মুখী** (Extrovert) এবং (iii) **উভয়মুখী** (Ambivert)।

(i) **অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব :** এই জাতীয় লোকেরা নিজেদের নিয়েই থাকতে ভালবাসেন; বাইরের জগতের প্রতি এদের আকর্ষণ কম। কাজেই আত্ম-কেন্দ্রিকতা, বাহ্যবস্তুর প্রতি উদাসীনতা, স্বার্থপরতা, আত্মসচেতনতা প্রভৃতি এই জাতীয় লোকের বৈশিষ্ট্য। বাইরের জগতের কর্মকোলাহলের এরা অংশ গ্রহণ করতে চায় না। সাধারণতঃ এই সব মানুষ অত্যন্ত চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল হয়। আত্মবিশ্লেষণে এরা খুব পটু এবং এদের মধ্যে সামাজিকতা-বোধের একান্ত অভাব। নতুন পরিবেশের সঙ্গে এরা সহজে সঙ্গতিসাধন করতে পারে না; এদের পলায়নী মনোবৃত্তির জন্য এরা অলীক কল্পনা এবং দিবাস্বপ্নে আত্মনিয়োগ করে। অনেক কবি, দার্শনিককে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

(ii) **বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব :** এই জাতীয় লোকেরা নিজেদের ভাবধারণা ছেড়ে দিয়ে অপরকে নিয়েই থাকতে ভালবাসে। বাইরের জগতের কর্ম কোলাহলেই এরা অংশ গ্রহণ করতে চায়। এরা হল সামাজিক প্রকৃতির এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যোগদান করতে ভালবাসে। এরা স্বভাবতঃ চটপটে এবং কর্মপ্রিয় হয়ে থাকে। এই জাতীয় লোক নতুন পরিবেশের সঙ্গে অতি সহজে খাপ-খাওয়াতে পারে এবং এরা খুব আবেগপ্রবণ।

(iii) **উভয়মুখী :** এই জাতীয় লোকেরা অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী—এই উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা একদিকে যেমন আত্মসচেতন তেমনি অপরদিকে সামাজিক পরিবেশের প্রতিও মনোযোগী অর্থাৎ এরা আত্মকেন্দ্রিক এবং সমাজকেন্দ্রিক উভয়ই। বেশীর ভাগ লোকই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

য়ুঙ (*Jung*) উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও আরও চার ধরনের টাইপের কথা বলেছেন—**বিচার-প্রবণ** (Sensing type), **চিন্তাশীল** (Thinking type), **অনুভূতি-প্রবণ** (Feeling type) এবং **অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন** (Intuitive type)।

**(খ) এ আর. য়ানেশ-এর টাইপ (E. S. Janensch's Type) :** জার্মান মনোবিদ্ এ আর য়ানেশ[1]-এর ভাব-প্রতিরূপের (Eidetic Image) উপরই তাঁর ব্যক্তিত্বের টাইপ মতবাদের ভিত্তি। ভাব-প্রতিরূপ হল এমন একটি দৃষ্টিগত প্রতিরূপ যাকে বাস্তব প্রত্যক্ষণ থেকে পৃথক করা কষ্টকর হয়ে

---

1. "Eidetic Images were noticed by Janensch who even tried to classify people according to their capacity for having eidetic images."

—Boaz : General Psychology : Page 348.

দাঁড়ায়। সাধারণতঃ দশ থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েরা এই প্রতিরূপ দেখতে পায়। এই ভাব-প্রতিরূপ গঠন করার ভিত্তিতে তিনি ব্যক্তিকে 'B' type বা (Basedowid type) এবং 'T' Type বা (Tetanoid type)-এ শ্রেণীভুক্ত করেছেন। প্রথম জাতের মধ্যে কুশলী মনোভাব থাকে এবং দ্বিতীয় জাতের মধ্যে য়ুঙ্-এর বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্ট হয়।

(গ) **স্প্রানগার-এর টাইপ (Spranger's Type)**[1] : যে জীবনদর্শন মানুষের আচরণ এবং ব্যবহারের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করে তার ভিত্তিতে মানুষকে শ্রেণীভুক্ত করার জন্য চেষ্টা হয়েছে। মানুষ জীবনে কিছু মূল্যকে স্বীকার করে নেয় যা তার ব্যক্তিত্বকে সুসংবদ্ধ করে। এই মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্প্রানগার মানুষের ছয়টি টাইপের কথা বলেছেন ; যথা—

(১) **তাত্ত্বিক** (Theoretical)—এই ধরনের ব্যক্তি হল সত্যানুসন্ধানী ; চিন্তামূলক বা বুদ্ধিগত কাজেই এদের আগ্রহ।

(২) **হিসাবী** (Economic)—জাগতিক প্রয়োজনের দিকেই এদের নজর।

(৩) **সৌন্দর্যবোধ সম্পন্ন** (Aesthetic)—এরা সুন্দরের ধ্যান করে এবং জীবনকে আনন্দময় ও সুন্দর করে গড়তে চায়।

(৪) **সামাজিক** (Social)—এই ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি মানুষের প্রতি ভালবাসাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্য বলে ধারণা করেন। মানবোচিত গুণ এবং মানবিক সম্পর্কের প্রতিই এঁদের আগ্রহ বেশী।

(৫) **রাজনৈতিক** (Political)—এই জাতীয় ব্যক্তি ক্ষমতালোভী এবং অপরের উপর নিজেদের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক।

(৬) **ধার্মিক** (Religious)—জীবনের মধ্যে যে ঐক্য আছে তাকে কোন বৃহত্তর সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করতে চায় এই ধরনের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক।

স্প্রানগার-এর পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ অনেক মনোবিদ্ স্বীকার করে নিতে সম্মত হন নি। স্প্রানগার-এর শ্রেণীবিভাগের দোষ হল, তাঁর টাইপগুলি এত ব্যাপক যে এই এক একটি টাইপের অন্তর্ভুক্ত আরও অসংখ্য ব্যক্তিত্বের সন্ধান মেলে। আলপোর্ট তাই মন্তব্য করেছেন যে, এজাতীয় স্থূল শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে যায় (Individual becomes lost in such coarse classification)।

1. Spranger : Types of Men ; Page 395.

(ঘ) **ফ্রয়েড-এর ব্যক্তিত্বের টাইপ (Freud's Type):** শিশুর যৌন বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির ভিত্তিতে ফ্রয়েড ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের উল্লেখ করেছেন।

(১) **মুখ-কামী** (Oral-erotic Type)-এর দুটি রূপ আছে, মর্ষকামী (sadistic) এবং নিষ্ক্রিয় (passive)। যারা মর্ষকামী তারা পিতামাতার স্নেহ-ভালাবাসা বঞ্চিত হয় এবং এই কারণে শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে একটা ব্যর্থতা ও হতাশার ভাব থাকে। ভবিষ্যৎ জীবনে এরা দুঃখবাদী, বিদ্বেষপরায়ণ এবং ব্যঙ্গকারী হয়। আবার যারা নিষ্ক্রিয় মুখ-কামী (oral-passive) হয়, তারা আশাবাদী, নির্ভরশীল এবং অপরিণত থাকে।

**(২) পায়ু-কামী** (Anal Erotic)—শৈশবে যদি শিশুর পিতামাতার প্রতি বিরাগ বা আক্রমণাত্মক ভাব দেখা দেয়, তাহলে শিশু পায়ু-কামী হয়। পায়ু-কামী ব্যক্তিত্বের লোক একগুঁয়ে, খুঁতখুঁতে, বেয়াড়া, কৃপণ ও সুবিধাবাদী হয়।

**(৩) উপস্থ-কামী** (Genital Type)—এর দুটি রূপ আছে, ফ্যালিক টাইপ এবং জেনিট্যাল টাইপ। প্রথম অবস্থায় শিশু মনে করে অপরের মত তারও লিঙ্গ আছে। সাধারণ যৌন সম্পর্কের প্রশ্ন এ স্তরে আসে না। এই স্তরে শিশু আত্মকামী ও দুরাকাঙ্ক্ষী হয়, একটুতেই হতাশ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় স্তরে স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্ন থাকে। এই স্তরে শিশুর মধ্যে সৃজনশীলতা, অনুযোজনের ক্ষমতা, নির্ভরতাবোধ ও সহযোগিতার ভাব দেখা দেয়।

ফ্রয়েডের উপরিউক্ত ব্যক্তিত্বের টাইপ সম্পর্কে বলা যেতে পারে, কামই ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের একমাত্র উপাদান নয়। ফ্রয়েড স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের তুলনায় অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাছাড়া কোন শিশু পায়ু-কামী হলেই যে ভবিষ্যতে একগুঁয়ে, খুঁতখুঁতে বা কৃপণ স্বভাবের হবে, এ বোঝা কষ্টসাধ্য।

## দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের টাইপ নির্ধারণ :

(ক) **ক্রেৎসমার-এর টাইপ (Kretschmer types):** মানসিক ব্যাধি চিকিৎসক ক্রেৎসমার মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসা করাকালীন লক্ষ্য করলেন যে, মানসিক বিকারের সঙ্গে দৈহিক বৈশিষ্ট্যর সংযোগ আছে। তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে, যারা সিজোফ্রেনিয়া বা চিত্তভ্রংশী বাতুলতা রোগে আক্রান্ত তারা স্বভাবত; অন্তর্মুখী হয় এবং তারা ঢেঙ্গা, দীর্ঘওষ্ঠযুক্ত এবং ডিম্বাকার মুখবিশিষ্ট হয়; আর যারা খেদোন্মত্ত বাতুলতা

রোগে ভুগছে (manic depressive), তারা স্বভাবতঃই বহির্মুখী হয় এবং তাঁরা বেঁটে, স্থূলাকার এবং গোলাকার মুখবিশিষ্ট হয়। চিকিৎসাগারের বাইরে তাকিয়ে তিনি দেখলেন স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তি, যাদের সঙ্গে মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে, তাদের মধ্যেও উপরিউক্ত ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ক্রেৎসমার সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করে তাদের চারটি ভাগে ভাগ করলেন। যথা—(১) **পিকনিক** (Pyknik), (২) **এস্থেনিক** (Aesthenic), (৩) **এথলেটিক** (Athletic) এবং (৪) **ডিসপ্লাষ্টিক** (Dysplastic)। পিকনিক টাইপের ব্যক্তিরা বেঁটে, স্থূলাকায় এবং গোলাকারবিশিষ্ট হয় এবং এই শ্রেণীর লোকেরা বহির্মুখী হয়। এস্থেনিকেরা দীর্ঘকায়, দীর্ঘ হস্তপদযুক্ত ও রুগ্নদেহবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এথলেটিক (Athletic) মাঝামাঝি আকারের দেহবিশিষ্ট হয়। এদের অস্থি ও পেশীগুলি পুষ্ট হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত হয়। এদের পেশী দৃঢ়, বুক চওড়া, ঘাড় প্রশস্ত এবং হাত পা বড় হয়। দেহ ও মনের দিক থেকে এরাই সুস্থ ও স্বাভাবিক এবং আদর্শ মানুষ। ডিসপ্লাষ্টিক শ্রেণীর লোকের দৈহিক বৃদ্ধি সম্পূর্ণতা লাভ করে না, সেহেতু এরা হীনমন্যতাবোধ রোগে ভোগে। এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বিরল।

ক্রেৎসমার-এর টাইপ

অন্য ধরণের নীতির ভিত্তিতে ক্রেৎসমার দুপ্রকার ব্যক্তিত্বের টাইপের কথা বলেছেন—(১) **সিজোথিম** (Schizothyme) বা **চিত্তভ্রংশী রূপ** এবং (২) **সাইক্লোথিম** (Cyclothyme) বা **খেদোন্মত্তরূপ**। পিকনিক (*Pyknik*) শ্রেণীর লোকেরা হল সাইক্লোথিম টাইপের লোক। এরা হল অন্তর্মুখী। এই শ্রেণীর লোক অতি সহজেই উৎফুল্ল হয় আবার সহজেই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই টাইপের লোকেরা নিজেদের আবেগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে এবং এরা হল সামাজিক, উত্তেজনাপ্রবণ, বাস্তববাদী এবং সহিষ্ণু।[1] এই শ্রেণীর লোকেরা যখন মানসিক বিকারে ভোগে তখন এদের খেদোন্মত্ত বাতুলতা (manic depressive) রোগ দেখা দেয়। এস্থেনিকেরা হল সিজোথিম টাইপের লোক। এই টাইপের লোকেরা গম্ভীর, স্বাবলম্বী, সাবধানী, আদর্শবাদী, অসহিষ্ণু এবং পলাতক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। এই টাইপের লোকেরা যখন মানসিক বিকারগ্রস্ত হয় তখন তাদের মধ্যেও সিজোফ্রেনিয়া রোগ বা চিত্তভ্রংশী বাতুলতা দেখা দেয়।

সিজোথিম ও সাইক্লোথিম

1. G. D. Boaz: General Psychology; Page 896.

এথলেটিক শ্রেণীভুক্ত লোকদের মানসিক প্রকৃতি স্বাভাবিক এবং এরা সিজোথিম টাইপের অন্তর্ভুক্ত। যারা ডিসপ্লাষ্টিক তারাও সিজোথিম টাইপের অন্তর্ভুক্ত।

ক্রেৎসমার-এর টাইপের এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার কিছু সাদৃশ্য থাকলেও মনোবিদ্‌রা এই শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা করেছেন। এই শ্রেণীবিভাগ নিখুঁত নয়, কেননা, মানুষকে এত সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মানুষকে এভাবে শ্রেণীভুক্ত করা গেলেও, মানুষের মানসিক প্রকৃতি বিচিত্র, সে কারণেও এগুলিকে এত সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণীভুক্ত করা চলে না।

**(খ) সেলডন-এর টাইপ (Sheldon's Types)ঃ** ডব্লু. এইচ. সেলডন-এর ব্যক্তিত্বের টাইপ সম্পর্কীয় তত্ত্বটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও সেলডন ক্রেৎসমারের পথেই তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়েছিলেন, তবু তিনি ক্রেৎসমারকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর মতে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যখন ব্যক্তিত্বের নির্ধারণ করা হবে তখন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাপ গ্রহণের প্রয়োজন আছে। তিনি প্রায় চারশত নগ্নদেহ যুবকের ছবি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তোলেন এবং তারই ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের উল্লেখ করেন।

এণ্ডোমর্ফ, মেসোমর্ফ ও একটোমর্ফ

প্রথম টাইপ হল **এণ্ডোমর্ফ** (Endomorph)। এই শ্রেণীর লোকের বৈশিষ্ট্য হল, এরা গোলাকার, কোমল দেহবিশিষ্ট এবং এদের উদর-প্রদেশ বিশেষ স্ফীত; এরা ক্রেৎসমারের পিক্‌নিকদের সঙ্গে তুলনীয়। দ্বিতীয় টাইপ হল, **মেসোমর্ফ** (Mesomorph)। এই শ্রেণীর লোকদের দেহ সুগঠিত ও পেশীবহুল। এরা প্রশস্ত স্কন্ধবিশিষ্ট; এরা ক্রেৎসমারের অ্যাথলেটিকদের সঙ্গে তুলনীয়। তৃতীয় টাইপ হল, **একটোমর্ফ** (Ectomorph)। এই শ্রেণীর লোকেরা ক্ষীণদেহী এবং দীর্ঘকায়; এরা ক্রেৎসমারের এসথেটিকদের সঙ্গে তুলনীয়।

দৈহিক টাইপকে তিন ধরনের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ

সেলডন ব্যক্তিদের দৈহিক পরিমাপের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি সাত মাত্রার স্কেলে পরিমাপ করেন। এভাবে দৈহিক পরিমাপ নির্ধারণ করার পর সেলডন এ দৈহিক টাইপকে তিন ধরনের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। এ তিন ধরনের ব্যক্তিত্ব হল—**ভিসেরোটোনিক** (*Viscerotonic*), **সোমাটোটোনিক** (*Somatotonic*) এবং **সেরিব্রোটোনিক** (*Cerebrotonic*)।

এণ্ডোমর্ফ'রা মানস-প্রকৃতির দিক থেকে ভিসেরোটোনিক টাইপের। এরা বিশ্রাম ও আরামপ্রিয়, ভোজনবিলাসী ও সামাজিক। এরা আমোদ-প্রমোদ, হৈ-চৈ ভালবাসে। তাছাড়া, এরা সহিষ্ণু, অপরের স্নেহ-ভালবাসার প্রত্যাশী এবং নিজেদের আবেগকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করে।

মেসোমর্ফ'রা মানস-প্রকৃতির দিক থেকে সোমাটোটোনিক টাইপের। এরা উদ্যমী ; দুঃসাহসিক কাজ করতে চায়, বেপরোয়া এবং উত্তেজনা ভালবাসে। এরা অপরের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু অপরের অনুভূতির প্রতি এরা উদাসীন। এরা আত্মপ্রতিষ্ঠ, সংকল্পে দৃঢ় এবং সোজাসুজি কাজ করতে ভালবাসে।

একটোমর্ফ'রা মানস-প্রকৃতির দিক থেকে সেরিব্রোটোনিক টাইপের। এরা গোপনতাপ্রিয়, সাবধানী ও মনোযোগী। এদের চলাফেরা সংযত ও আড়ষ্ট। এরা মনের অনুভূতিকে গোপন রাখতে চায় এবং আবেগকে দমন করতে চায়। সামাজিক মেলামেশা এদের পছন্দ নয়। এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-সংযমের অভাব। এদের আচরণ যুবজনোচিত নয় এবং অসুবিধায় পড়লে এরা নির্জনতা খুঁজে বেড়ায়।

সেলডন দাবি করেন যে, আরও বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি যে পরীক্ষণকার্য চালিয়েছেন, তার দ্বারা দৈহিক টাইপের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের খুব স্পষ্ট সহযোগ লক্ষ্য করা যায়।

**ক্রেৎসমারের টাইপের ও সেলডনের টাইপের পারস্পরিক তুলনা**

ক্রেৎসমারের টাইপতত্ত্বের তুলনায় সেলডনের টাইপতত্ত্ব অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে সেলডনের মতবাদের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কেউ কেউ সেলডনের গাণিতিক পদ্ধতিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হল, পরবর্তীকালে যেসব ব্যক্তিরা অন্য ব্যক্তিদের স্কেলে মেপে তাদের দৈহিক পরিমাপ ও মানস-প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন, তারা সকলেই সেলডনের মতবাদের সঙ্গে পূর্বপরিচিত। পূর্বপরিচয় পরীক্ষণকার্য নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

**(গ) আইসেঙ্ক-এর আয়তন (Eysenck's Dimensions) :** ব্রিটিশ

**ব্যক্তিত্বের তিনটি মৌলিক আয়তন**

মনোবিদ্ আইসেঙ্ক ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিত্বের তিনটি মৌলিক উপাদান বা আয়তন আছে। যথা—**অন্তর্মুখীতা-বহির্মুখীতা** (Introversion-Extroversion), **মনোবিকার-প্রবণত**

(Neuroticism) এবং উন্মত্ততা-প্রবণতা (Psychoticism)। আইসেঙ্ক-এর মতে এই তিনটি আয়তনের মধ্যে কোন পারস্পরিক সংযোগ নেই; সে কারণে কোন একটি আয়তনের মধ্যে ব্যক্তির অবস্থা জানা গেলেও, অন্য দুটি আয়তনের মধ্যে তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। আইসেঙ্ক-এর মতে প্রতিটি ব্যক্তি এই তিনটি আয়তনের মধ্যে কোন-না-কোন স্থানে অবস্থিত। এই অভিমতানুযায়ী সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির সঙ্গে উন্মত্ত ব্যক্তির যে পার্থক্য তা মাত্রাগত, জাতিগত নয়। সব লোকের মধ্যেই যে মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি আছে, উন্মত্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও সেগুলি আছে, তবে অধিক মাত্রায় আছে।

**মৌলিক উপাদান ছাড়াও আরও কয়েকটি উপাদানের অস্তিত্ব**

পূর্বোক্ত মৌলিক উপাদান ছাড়াও, ব্যক্তিত্বের মধ্যে আরও কয়েকটি উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, পূর্বোক্ত উদাহরণগুলির মতো এগুলি এত ব্যাপক নয়। এই সব অপ্রধান উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে রক্ষণশীলতা-প্রগতিশীলতা (Conservatism-Radicalism), সরলতা-জটিলতা (Simplicity-Complexity) এবং দৃঢ়চিত্ততা—কোমলচিত্ততা (Toughmindedness-Tendermindedness)।

**নিছক পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ সম্ভব নয়**

আইসেঙ্ক এবং তাঁর অনুগামীদের মতে পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণ (Statistical analysis) এবং বস্তুগত পরীক্ষণের (Objective tests) উপর ভিত্তি না করে, যেসব পদ্ধতি ব্যক্তিত্বের স্বরূপ আলোচনা করতে চায়, সেগুলিকে খুব সন্তোষজনক মনে করা যেতে পারে না। নিছক পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য অপর মনোবিদ্‌রা মনে করেন যে, এই পদ্ধতি অধিক মাত্রায় কঠোর। তাঁদের মতে অন্তর্দৃষ্টির সহায়তা ছাড়া কেবলমাত্র উপাদান-বিশ্লেষণের (Factor-analysis) সাহায্যে যদি ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা হয় তাহলে ব্যক্তিত্বের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অবশ্য উভয় মতের মধ্যে এইভাবে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে যে, অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে যে প্রকল্প রচিত হবে, বস্তুগত পরীক্ষণের ভিত্তিতেই কেবলমাত্র সেই প্রকল্পগুলির যাথার্থ প্রমাণিত হতে পারে।

## ৭। ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা ও পরিমাপ (Personality Tests and Measurements) :

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপের চেষ্টা বহু অতীতকাল থেকেই চলে আসছে। ব্যক্তির দৈহিক গঠন ও বাহ্য-আচরণ লক্ষ্য করে, তার সম্পর্কে অপরের অভিমত সংগ্রহ করে বা ব্যক্তির চিন্তা, ভাবধারা, বিশ্বাস, আদর্শ, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিরূপণের চেষ্টার পদ্ধতি অনেকটা সুপরিচিত পদ্ধতি। কিন্তু বর্তমানে আরও নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের চেষ্টা করা হচ্ছে।

**বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সাহায্যে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের প্রচেষ্টা**

কি পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হবে, সে সম্পর্কেও মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন মনোবিদের মতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার পক্ষে হোলিস্টিক (*Holistic*) পদ্ধতিই বিশেষভাবে উপযোগী। এই পদ্ধতি অনুসারে ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করে, তার ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা হয়। এঁদের মতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যে একটি ঐক্যবদ্ধ সুসংহত জটিল সংগঠন, সে বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়। আবার অনেকে মনে করেন যে, এই পদ্ধতি এত বেশী ব্যক্তিসাপেক্ষ (subjective) যে তার দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয় না। সে কারণে অনেক মনোবিদ্ ব্যক্তিত্বের পরিমাপের জন্য ব্যক্তিনিরপেক্ষ (objective) পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী।

**হোলিস্টিক পদ্ধতি**

বর্তমান যুগে ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করার জন্য যে বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি নীচে আলোচনা করা হচ্ছে :

**(ক) সাক্ষাৎকার (Interview) :** ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি খুব পুরাতন পদ্ধতি। ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়, কথবার্তায় এবং তাকে নানারকম প্রশ্ন করে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। এই সাক্ষাৎকার চার রকমের হতে পারে; যথা—'Unstandardized Interview', 'Standardized Interview,' 'Stress Interview' এবং 'Exhaustive Interview'। দুটি লোকের মধ্যে যে সাধারণ কথোপকথন হয় তার সঙ্গে প্রথম ধরনের সাক্ষাৎকারকে তুলনা করা চলে। দ্বিতীয় ধরনটি নানারকমের হতে পারে, তবে সাক্ষাৎকারী কতকগুলি

নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তৃতীয় ধরনের সাক্ষাৎকারের সময় ব্যক্তিকে উত্তেজিত করা হয় এবং লক্ষ্য করা হয় যে, ব্যক্তি উত্তেজনার মুহূর্তে কতখানি নিজেকে সংযত রেখে নিজের উপাদানগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারে। শেষের ধরনটি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়।

এই পদ্ধতির উপকারিতাকে অস্বীকার করা না গেলেও, সাক্ষাৎকার পদ্ধতিটি কোন সুনির্দিষ্ট নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার জন্য এর মধ্যে একটি প্রধান ত্রুটি দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মনোভাব ক্রিয়া করার জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।[1]

সাক্ষাৎকারের বিবরণগুলি অনেক সময় পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ এবং স্মৃতি-শক্তি ও অধিকমাত্রায় সক্রিয় কল্পনার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তাছাড়া, যদি বিশেষ একটা শান্ত পরিবেশে কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার করা হয় তাহলে তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের যথার্থ রূপ ধরা না পড়তেও পারে, সে কারণে বর্তমানে **'Stress Interview'** পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ব্যক্তিকে উত্তেজিত করে, সমালোচনা করে, তার মধ্যে চিত্তবিক্ষেপের সৃষ্টি করে, সেই অবস্থায় তার ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা হয়।[2] বর্তমানে সাক্ষাৎকারের সময় কোন্ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে, সেগুলি পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করে এবং কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করে এই পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দান করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

**(খ) জীবন-ইতিহাস অনুসরণ পদ্ধতি (Case History Method ):** এই পদ্ধতি অনুসারে ব্যক্তির আচরণ, শৈশবকালের অভিজ্ঞতা, অভ্যাস, বংশগত বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশ, ব্যক্তির গৃহের পরিবেশ,

1. "The peace and quiet of a personal office may bring out in the subject behavioral tendencies quite different from those that he will show under pressure. Hence Freeman et al (1962) developed the stress interview to study personality under pressure of criticism, distruction and excitement."

— Stagner : Psychology of Personality ; Page 39.

2. "The stress interview was introduced to determine how well an individual can keep command of his resource when he is emotionally excited and also to determine how quickly he recovers after the pressure is off"

—J. P. Guilford : Personality ; Page 161.

ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশী, ব্যক্তির যৌন-বিকাশের বিবরণ প্রভৃতি সবগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করে, তারই ভিত্তিতে তার ব্যক্তিত্ব মাপ করার জন্য চেষ্টা করা হয়। মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়।

**জীবন-ইতিহাস অনুসরণ পদ্ধতি**

(গ) **রেটিং স্কেল** (Rating Scale): গুণের পরিমাণ অনুসারে ব্যক্তিত্ব বিচার করা এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য ব্যক্তিত্ব পরিসর রেখার ঠিক কোন্ পর্যায়ে তার গুণটি অবস্থিত সেটি পরিমাপ করা হয়। সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির দুটি বিপরীত গুণকে একটি রেখার দুই প্রান্তে রেখে, রেখাটিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। একেই স্কেল বলা হয়। যেমন, 'সহযোগিতা' এই বৈশিষ্ট্যটির রেটিং স্কেল নিম্নোক্তভাবে তৈরী করা যেতে পারে। আমাদের প্রশ্ন হল, ব্যক্তি সহযোগী (co-operative) না, অসহযোগী (non-co-operative)?

| অতিরিক্ত সহযোগী | বেশ সহযোগী | মাঝামাঝি সহযোগী | কম সহযোগী | অসহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| রাম—··· | × | ···· | ···· | ··· |
| শ্যাম—× | ···· | ··· | ···· | ···· |
| যদু—··· | ···· | ···· | ···· | × |

উপরিউক্ত স্কেলটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 'সহযোগিতা' এই গুণটি তিনজন ব্যক্তির মধ্যে কি পরিমাণে আছে এবং ব্যক্তিত্ব পরিসর রেখায় কার স্থান কোথায় তা নির্দেশ করা হয়েছে। উপরের দৃষ্টান্তটি একটি পাঁচ মাত্রার স্কেলের দৃষ্টান্ত, তবে এই স্কেল তিন মাত্রার, পাঁচ মাত্রার, সাত মাত্রার বা কখনও কখনও দশ মাত্রারও হতে পারে।

এই অভীক্ষার একটা দোষ হল যে, পরীক্ষক তার পরিচিত ব্যক্তির কোন গুণ পরিমাপ করতে গিয়ে স্কেলের একটা বিশেষ উপযোগী স্থানে তাকে বসিয়ে দিতে পারেন। একে *Woodworth* বলেছেন, 'generosity error'. আবার কোন একটি গুণের ব্যাপারে ব্যক্তির উৎকর্ষ পরীক্ষককে এমন ভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে যে, তিনি অন্য গুণ সম্পর্কেও সেরূপ ধারণা করতে পারেন। একে বলা হয় 'halo-effect'.

**(ঘ) প্রশ্নতালিকা পদ্ধতি (Questionnaire):** এই পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের একটি তালিকা দেওয়া হয় এবং পরীক্ষণ-পাত্রকে বলা হয় প্রশ্নগুলির পাশে তার স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে সেগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য। সাধারণতঃ প্রশ্নের পাশে 'হাঁ' বা 'না' এই দুটি উত্তরের মধ্যে যে-কোন একটি লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই সব প্রশ্নাবলীর উত্তর থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক জানা যায়। যেমন, ব্যক্তি অর্ন্তমুখী, না বহির্মুখী; সে মিশুকে, না নির্জনতাপ্রিয়, সামাজিক, না আত্মকেন্দ্রিক ইত্যাদি। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বার্ট (*Burt*) সর্বপ্রথম এই ধরনের একটা প্রশ্ন-তালিকা রচনা করেন।

প্রশ্ন-তালিকায় নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করা যেতে পারে—

(১) আপনি কি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসেন? হাঁ—না

(২) আপনি কি সব সময় চেষ্টা করেন যাতে অপর লোকে আপনার কথায় সায় দেয়? হাঁ—না

(৩) অপরিচিত লোকের মাঝে আপনি কি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন? হাঁ—না

(৪) সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনি যোগ দিতে ভালবাসেন কি? হাঁ—না

(৫) অপর লোকে আপনার সম্পর্কে কি ভাবে তা নিয়ে মাথা ঘামান কি? হাঁ—না

(৬) অপর লোকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনি কি সন্দেহপ্রবণ? হাঁ—না

প্রশ্নতালিকা-পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলি জানা গেলেও সংলক্ষণের যে অনুপম প্রকৃতি তাকে জানা যায় না। যেমন, দেখা গেল রাম এবং শ্যাম দুজনেই অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করার ব্যাপারে খুবই দক্ষ, কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে এই সংলক্ষণটি ঠিক এক নয়। রাম প্রভুত্ব বিস্তার করে তার হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণের দ্বারা, আর শ্যাম করে তার স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণের দ্বারা।

**(ঙ) অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি এবং স্বপ্ন বিশ্লেষণ (Free Association Method and Dream Analysis):** এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির অবচেতন মনের রহস্য উদ্ঘাটন করে তার ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা। মনঃসমীক্ষক অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি এবং স্বপ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তির মনের নির্জ্ঞান স্তরে যেসব কামনা, বাসনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সামাজিক আদর্শের সঙ্গে বিরোধিতার জন্য বা অন্যান্য কারণে অবদমিত হয়ে থাকে, সেগুলিকে

সচেতন স্তরে টেনে নিয়ে আসেন এবং তার ব্যক্তিত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করেন। পরীক্ষক প্রথমে ব্যক্তির বিশ্বাস অর্জন করেন এবং তারপর ব্যক্তিকে বেশ আরাম করে বসিয়ে তার মনের গোপন কথা স্বাধীনভাবে নিঃসঙ্কোচে বলে যাবার নির্দেশ দেন। এর ফলে মনঃসমীক্ষক বুঝতে পারেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কোন্ কোন্ সংলক্ষণ অবদমিত হওয়ার জন্য স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না। আবার মনঃসমীক্ষক স্বপ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে যেসব নির্জ্ঞান প্রেষণা ক্রিয়া করে সেগুলিও জানতে পারেন।

**(চ) কৃতি পরীক্ষা (Performance Test):** এই পদ্ধতিতে কোন একটি বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তিকে কোন একটি কাজ করতে বলা হয় এবং তার কাজ লক্ষ্য করে ব্যক্তিত্বের কোন একটি সংলক্ষণ তার মধ্যে কি পরিমাণে আছে তা লক্ষ্য করা হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা খুব কার্যকর হয়। যেমন, শিশুরা অন্তর্মুখী, না বহির্মুখী তা নির্ধারণ করার জন্য কয়েকটি শিশুকে যাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হল। দেখা গেল, কয়েকটি শিশু প্রদর্শিত দ্রব্যগুলির দিকে বড় বেশী নজর দিচ্ছে না, খুব ধীরে ধীরে একটি থেকে আর একটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বভাবতঃই এই ধরনের শিশুরা অন্তর্মুখী (introvert)। অপর কতকগুলি শিশুর মধ্যে বেশ স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল। এরা চটপট একটার পর একটা দেখে যাচ্ছে এবং বেশী মনোযোগ দিয়ে দেখছে। স্বভাবতঃই এই ধরনের শিশুরা বহির্মুখী (extrovert)।

**(ছ) প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Test):** এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হল এই যে, এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির কাছে একটি উদ্দীপক উপস্থাপিত করা হয় এবং ব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়া করার জন্য বলা হয়। এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা হয়। ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে তার ব্যক্তিত্বকে পরীক্ষার মধ্যে প্রতিফলিত করে। এই প্রতিফলন পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

**(i) রোরশাক ইঙ্কব্লট অভীক্ষা (Rorschach Inkblot Projective Test):** সুইজারল্যাণ্ডবাসী একজন মনোবিদ্ চিকিৎসক হের্মান রোরশাক (*Hermann Rorschach*) রোরশাক ইঙ্কব্লট পদ্ধতির প্রবর্তক। এই পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষণ-পাত্রকে কয়েকটি কালির ছাপ দেখান হয় এবং তারপর পরীক্ষণ-পাত্রকে তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে বলা হয় অর্থাৎ কালির

ছাপ দেখে পরীক্ষণ-পাত্র তার যা অর্থ নিরূপণ করে সেটি পরীক্ষককে জানায় এবং পরীক্ষক পরীক্ষণ-পাত্রের বর্ণনা থেকে তার মানসিক সংগঠন কি প্রকার, তার মধ্যে আবেগ বা প্রেরণার আধিক্য আছে কিনা, কিংবা তার আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত বা সাবলীলভাবে আত্মপ্রকাশ করে কিনা, তার চিন্তাধারার পদ্ধতি

রোরশাক পরীক্ষণ-পদ্ধতিতে ব্যবহৃত একটি কালির ছাপ। কলেজের দুটি ছাত্র ও দুটি ছাত্রীকে এই ছাপ দেখান হয় এবং তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে বলা হয়। ছাত্রী দুটির মধ্যে একজন বলেছিল—এটি কুমীর, হাতী, খরগোশ, প্রজাপতি ইত্যাদি, আবার আর একজন বলেছিল—দুটি ইঁদুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে; মানুষের হৃৎপিণ্ড, প্রজাপতির ডানা ইত্যাদি। ছাত্র দুজনের মধ্যে একজন বলেছিল—দুজন নর্তক, দুটি উড়ন্ত ঘোড়া, জন্তুর কঙ্কাল ইত্যাদি। আর একজন বলেছিল—দুটি নর্তকী, দুটি নর্তক, অস্ট্রেলিয়ার মানচিত্র, উড়ন্ত ঘোড়া, জন্তুর কঙ্কাল ইত্যাদি।

অমূর্ত, না মূর্ত (concrete or abstract), তার মনোভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা করেন এবং তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন।

(ii) **কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ পরীক্ষণ-পদ্ধতি (Thematic Apperception Test বা TAT):** মর্গান ও মারে (*C. D. Morgan & H. A. Murray*) উপরিউক্ত পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রবর্তক। এই পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষণ-পাত্রের সামনে একটি ছবি উপস্থাপিত করা হয়। ছবিটির নানারকম ব্যাখ্যা । পরীক্ষণ-পাত্রকে ছবিটি দেখে তার মনে যে গল্পের উদয় হয় সেটি বলতে

বলা হয়। যেমন, নীচের ছবিটিতে দেখান হয়েছে যে, একটি মেয়ে হাতের উপর মুখটি রেখে জানালার দিকে তাকিয়ে বসে আছে এবং তার কাছে একজন বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। এই ছবিটি দেখে কেউ বলতে পারে যে মেয়েটির কোন্ কারণে গম্ভীর হয়ে বসে থাকার জন্য মহিলাটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে, কিংবা মহিলাটি তরুণীটির মা, কোন্ কারণে তাকে ভৎর্সনা করেছে, যার জন্যে মেয়েটি হাতের উপর মুখটি রেখে বসে আছে ইত্যাদি। পরীক্ষণ-পাত্র ছবিটি দেখে যে কাহিনীটি বর্ণনা করে, সেই বর্ণনার মাধ্যমে পরীক্ষক পরীক্ষণ-পাত্রের আশা, আকাঙ্ক্ষা, অপরিতৃপ্ত ইচ্ছা, মনোভাব, আবেগ, মানসিক দ্বন্দ্ব ও কল্পনাশক্তি

কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ পরীক্ষণ-পদ্ধতিতে উপরের ছবিটির অনুরূপ ছবি ব্যবহৃত হয়

প্রভৃতি জানবার চেষ্টা করে এবং তার সাহায্যে তার ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করেন। অবশ্য এখানে যে ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছে তা এই পরীক্ষণের জন্য যে নির্দিষ্ট ছবিগুলি ব্যবহার করা হত সে রকম কোন ছবি নয়। এই ছবিটি ঐ জাতীয় ছবির অনুরূপ একটি ছবি।

(iii) **শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা** (Word Association Test): এই পদ্ধতিতে কতকগুলি ব্যক্তিত্বসূচক 'শব্দ' (word) একটির পর একটি উদ্দীপক হিসেবে পরীক্ষণ-পাত্রের কাছে উপস্থাপিত করা হয় এবং কোনরকম চিন্তা না

করেই যে শব্দটি প্রথম মনে আসে সেটি বলে প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়। পরীক্ষণ-পাত্র কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে এবং প্রতিক্রিয়া করতে কত সময় লাগে উভয়ই লক্ষ্য করা হয়। পরীক্ষার্থীর উত্তরের সাহায্যে তার নির্জ্ঞান মনের বহু রহস্য উদ্ঘাটিত হয় এবং তার আবেগ প্রবণতা, তার মনোভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি জানা যায়।

(জ) **পরিস্থিতি অভীক্ষা** (Situation Test)ঃ এই অভীক্ষায় কোন ব্যক্তিবিশেষ এক পরিস্থিতিতে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে কিভাবে আচরণ করে, তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা হয়। শিশুরা সাধু কি অসাধু এই অভীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়; বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে শিশুদের এমন ভাবে আচরণের সুযোগ দেওয়া হয় যাতে তারা ইচ্ছা করলে অপরকে ঠকাতে পারে, কিন্তু পরীক্ষকের নজর তারা এড়াতে পারে না। পরীক্ষক শিশুদের আচরণ দেখে বুঝতে পারেন তারা সাধু কি অসাধু।

**সমালোচনা:**

**অভীক্ষাগুলির ত্রুটি**

পূর্বোক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব পরিমাপক পদ্ধতিগুলির সাহায্যে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার চেষ্টা করা হলেও এই পদ্ধতিগুলির কতকগুলি দোষ বা ত্রুটি আছে।

(১) প্রথমতঃ, ব্যক্তি-প্রভাব সঠিক ব্যক্তিত্ব পরিমাপের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ধারণা বা মনোভাব, পূর্ব-ধারণা, সংস্কার ও বিশ্বাস পরীক্ষণ-পাত্রের ব্যক্তিত্বের বিচারকে দোষদুষ্ট করে তুলতে পারে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ক্রমবিকাশমান; গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা ব্যক্তিত্বের ধর্ম। কতকগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে গতানুগতিকভাবে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের প্রচেষ্টায় ব্যক্তিত্বের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি উপেক্ষিত হয়।

(৩) তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের একটা সামগ্রিক রূপ আছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র সংলক্ষণগুলির সমষ্টিমাত্র নয়, কেননা, বিভিন্ন সংলক্ষণগুলি একত্রে কার্য করে ব্যক্তিত্বের রূপটি গড়ে তোলে। সুতরাং সংলক্ষণগুলিকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায়, তাহলে ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বকে বুঝে ওঠা যায় না।

(৪) বিভিন্ন পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি সুনির্দিষ্ট, নির্ভরযোগ্য ও উপযুক্ত হওয়া উচিত নতুবা বিচার ত্রুটিযুক্ত হতে বাধ্য। তাছাড়া, পরীক্ষণ-পাত্রের বয়স, ক্ষমতা, শক্তি, এগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে এই পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি রচিত হওয়া প্রয়োজন।

(৫) যে সমস্ত পরীক্ষণ-পদ্ধতিগুলি ভাষাভিত্তিক, অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে পরীক্ষণ-পাত্রকে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়, সেসব ক্ষেত্রেও ব্যক্তিত্বের বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে, কেননা ভাষা ভাবের বাহক হলেও, সব সময় মনের ইচ্ছা, অবস্থা, আকাঙ্ক্ষা ভাষার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না।

(৬) পরীক্ষণ-পাত্রও সত্য গোপন করে এবং প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিয়ে পরীক্ষকের যথার্থ বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, পরীক্ষণ-পাত্র নিজের দুর্বলতা গোপন করার জন্য পরীক্ষকের কাছে দেখাবার চেষ্টা করতে পারে যে, সে মহৎ ব্যক্তিত্ব-গুণের অধিকারী।

পূর্বোক্ত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিত্ব পরিমাপক বিভিন্ন পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলির কোন উপকারিতা নেই, এরূপ ধারণা করলে ভুল হবে। ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের জন্য প্রতিফলন অভীক্ষাগুলি (Project Methods) আমাদের অনুসন্ধান ক্ষেত্রকে এতখানি বিস্তৃত করেছে যে ফ্র্যাঙ্ক (*Frank*) এই অভিক্ষাগুলির প্রবর্তনকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে রঞ্জনরশ্মির (X-ray) প্রবর্তনের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং এই তুলনা খুবই যুক্তিযুক্ত। রঞ্জনরশ্মির আলোকচিত্রের মতো প্রতিফলন অভীক্ষাগুলি দেহের কোন ক্ষতি না করে দেহের আভ্যন্তরীণ অংশকে জানতে সহায়তা করে। বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপযোগী সুনির্দিষ্ট নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি রচনা করে, গুণগত দৃষ্টিভঙ্গীর সংযোগসাধন দ্বারা ব্যক্তিত্ব পরিমাপক পরীক্ষণ-পদ্ধতিগুলিকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার কাজে আরও বেশী উপযোগী করে তোলা যেতে পারে।

**অভীক্ষাগুলির গুণ**

## ৮। ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of Personality) :

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কোন স্থির বস্তু নয়, উহা একটি গতিশীল ঐক্য। শিশু যখন জন্মায়, তখন তার মধ্যে কোন ব্যক্তিসত্তা লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু তার জন্মের পর থেকেই তার মধ্যে পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাব সক্রিয় হয়ে উঠে, আর শিশু তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে।

পরিবেশও আপন অন্তর্নিহিত শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকেই শিশুর ব্যক্তিত্ব জন্মলাভ করে।

শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ কোন নিশ্চল বস্তু নয়, সমগ্র জীবন ধরে ব্যক্তিত্বের বিকাশ-প্রক্রিয়া চলে। কিন্তু এই গতি ও পরিবর্তনধর্মী ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি ঐক্য ও স্থায়িত্ব ধরা পড়ে—যার উপর নির্ভর করে আমরা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি।

ব্যক্তিত্ব-বিকাশে ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি (factors) সহায়ক ও আংশিক কারণ। যে প্রাকৃতিক উপাদান অর্থাৎ বংশধারা, দৈহিক গঠন, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সহায়ক, সেসব উপাদানের ত্রুটি ব্যক্তিত্ব-বিকাশে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে সামাজিক উপাদানও ব্যক্তিত্ব-বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ-ভূমিকা অবলম্বন করে। সে যা হোক, শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশে আমরা সাধারণতঃ দুটি প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে থাকি, একটি পৃথক্করণ, অন্যটি সমন্বয়ন। এখন এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি:

(ক) **পৃথককরণ** (Differentiation): শিশু তার জীবনের শুরুতেই কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণ করে থাকে, কিন্তু কোন বিশেষ আচরণ সম্পাদন তার পক্ষে তখন সম্ভব নয়। তার সকল আচরণই তখন দেহধর্মী, কোন বিশেষ আচরণ স্বতন্ত্রভাবে সে করতে পারে না। শিশু সাধারণতঃ সহজাত এবং প্রক্ষোভমূলক আচরণই করে, আর এই আচরণগুলি বয়স্কদের আচরণের মতো স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে না। বিশেষ উদ্দীপকে বিশেষ আচরণ শৈশবে শিশুর পক্ষে করা সম্ভব নয়। শিশুর যখন বয়স বাড়তে থাকে, তখন সে পৃথক পৃথক ভাবে আচরণ করতে শেখে। বিভিন্ন উদ্দীপকের জন্য যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া করা প্রয়োজন, শিশুর বয়োবৃদ্ধিতেই তা করা সম্ভব হয়। পৃথক বা স্বতন্ত্র উদ্দীপকের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়াকেই আমরা এখানে পৃথককরণ বলে উল্লেখ করেছি। পৃথককরণের ফলেই ধীরে ধীরে শিশুর আচরণ সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র ধারায় সংগঠিত হতে থাকে।

(গ) **সমন্বয়ন** (Integration): শিশু যে উপাদানগুলি নিয়ে জন্মায়, সে উপাদানগুলি তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে। শৈশবের শুরুতে এসব মানসিক অবস্থা থাকে সুপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব মানসিক অবস্থা একটি ঐক্যবদ্ধ, সামগ্রিক ও সমন্বিত রূপ পরিগ্রহ করে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমন্বয়ন

(Integration) প্রক্রিয়া, এ সমন্বয়ন দীর্ঘকাল চলে এবং ব্যক্তিসত্তার মূল রূপটি এ সমন্বয়নেই ধরা পড়ে। আবার এ সমন্বয়ন প্রক্রিয়া নানা ধাপে জীবনে চলে। আমরা এ ধাপগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করছি :

প্রথম স্তরে, শিশু অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ায় (conditioned reflex) নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে এবং সে সঙ্গে নির্দিষ্ট উদ্দীপকের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট উদ্দীপকের প্রতিও প্রতিক্রিয়া করে। এ অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু বিভিন্ন পরিবর্তিত নতুন নতুন উদ্দীপকের ( বা পরিস্থিতির ) সঙ্গে সঙ্গতি-বিধান করতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় স্তরে, শিশুর জীবনে অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি বিশেষ প্রতিক্রিয়া বার বার সম্পাদনের নামই অভ্যাস। প্রথম স্তরে প্রতিবর্তিত ক্রিয়াগুলি থাকে অসংগঠিত, ধীরে ধীরে অসংহত প্রতিবর্তিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি সুসংহত ও সমন্বিতরূপে দেখা দেয়। অভ্যাস হল সেই সমন্বিত রূপ।

সমন্বয়ের তৃতীয় স্তরে নানা মানসিক প্রলক্ষণ (traits) সৃষ্টি হয়। নানা আগ্রহ, মনোভাব, প্রক্ষোভ শিশুর মনে দেখা দেয়। এগুলি শিশুর আচরণের গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। এই মানসিক প্রলক্ষণগুলি ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে।

চতুর্থ স্তরে, বিভিন্ন প্রলক্ষণের মধ্যে সমন্বয় দেখা যায় এবং অহংবোধের সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে বিভিন্ন প্রলক্ষণগুলি থাকে অসংলগ্ন ও সম্পর্কহীন। কিন্তু পরে এদের মধ্যে একটি ঐক্য বা সংহতি ধরা পড়ে এবং এর মধ্যে শিশুর মনে অহংবোধ (Ego or Self) জাগ্রত হয়। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুরুতে এই অহংবোধ কোন পূর্ণ বা সুসংগঠিত রূপ নেয় না, বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ভাবে এ অহংবোধ আত্মপ্রকাশ করে।

পঞ্চম স্তরে, এ অহংবোধ একটি একক অনন্য (unique) ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি করে। এক অর্থে ব্যক্তিত্ব এই অহংবোধের প্রসার। সকল পরিবর্তন, বিভিন্ন পরিবেশ, সবকিছুর মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্বকে একটি স্বতন্ত্র ও স্থির বস্তুরূপে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ, মানসিক প্রলক্ষণ, অহংবোধ, সবকিছু তখন একটি সামগ্রিক ও একীভূত রূপ লাভ করে। সমন্বয়ের এই পঞ্চম রূপই ব্যক্তিত্বের বিকাশ-প্রক্রিয়ার পরিণতি।

## প্রশ্নাবলী

1. What is Personality ? What are its characteristics ?

Ans. ( পৃঃ ২৮৪—২৯০ )

2. What are the factors of Personality ? Is Personality a product ( resultant ) of heredity or of environment or of both ?

Ans. ( পৃঃ ২৭৯—২৮৩ )

3. What is maent by personality ? Bring out the factors which influence the development of personality. [ C. U. 1966

Ans. ( পৃঃ ২৭৭—পৃঃ ২৭৯ )

4. Discuss the various types of personality ?

Ans. ( পৃঃ ২৬৫—পৃঃ ২৬৮ )

5. What is meant by 'types of personality' ? Distinguish in this connection between the Introvert and the Extrovet. Give illustrations.

Ans. ( পৃঃ ২৫২—পৃঃ ২৬৩ )

6. What are the traits of Personality ?

Ans. ( পৃঃ ৩২৩—পৃঃ ৩২৮ )

7. Write an essay on measuring Personality ?

Ans. ( পৃঃ ৩১৬—পৃঃ ৩২১ )

8. Explain how personality develops in a child.

# দশম অধ্যায়

# বুদ্ধি

# (Intelligence)

## ১। বুদ্ধির সংজ্ঞা ও স্বরূপ (Definition and Nature of Intelligence) :

বিভিন্ন মনোবিদ্ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা আলোচনা করব এবং এই সংজ্ঞাগুলির যাথার্থ বিচার করব।

বুদ্ধির বিভিন্ন সংজ্ঞা

কোন কোন মনোবিদ্ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের ক্ষমতাকেই বুদ্ধি বলে অভিহিত করেছেন। উইলিয়াম স্টার্ন (*W. Stern*) বলেন, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সচেতনভাবে চিন্তার সামঞ্জস্যসাধনের জন্য ব্যক্তির সাধারণ ক্ষমতাই হল বুদ্ধি। উডওয়ার্থ (*Woodworth*) বলেন, 'বুদ্ধি হল এমন ধী (intellect) যাকে কাজে লাগান হয় (Intelligence is intellect put to use')।' কোন কাজ সম্পাদন করার জন্য বা কোন পরিস্থিতি সামলাবার জন্য মানসিক শক্তিকে প্রয়োগ করা হল বুদ্ধি।' বাকিংহাম (*Buckingham*) বলেন, 'বুদ্ধি হল শিক্ষালাভের ক্ষমতা।' ডিয়ারবর্ন (*Dearborn*) বলেন, 'বুদ্ধি হল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হবার ক্ষমতা।' টারম্যান (*Terman*) বলেন, 'বুদ্ধি হল অমূর্ত চিন্তা করার শক্তি।' এবিংহাউজ (*Ebbinghaus*) বলেন, 'বিভিন্ন বস্তু, ঘটনা এবং গুণকে মনের মধ্যে একীভূত করার ক্ষমতা হল বুদ্ধি।' আলফ্রেড বিনে (*A. Binet*) বলেন, 'বুদ্ধি হল বোধশক্তির সম্পূর্ণতা, উদ্ভাবনপটুতা, কোন কাজে অধ্যবসায় এবং সমালোচনামূলক বিচার-শক্তি।' থর্নডাইক (*Thorndike*) বলেন, 'অনুষঙ্গ বা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগসাধনের ক্ষমতাই বুদ্ধি।' থার্সটোন (*Thurstone*) বলেন, 'সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সামাজিক দিক থেকে কার্যকর করে তোলাই হল বুদ্ধির লক্ষণ।' আচরণবাদী ওয়াট্‌সনের :(*Watson*) মতে, 'বুদ্ধি হল গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়া।' স্পীয়ারম্যানের (*Spearman*) মতে, "বুদ্ধি হল

নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলিকে লক্ষ্য করার ক্ষমতা, জ্ঞানের বিষয়ের প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ আবিষ্কারের ক্ষমতা, পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কোন্‌টি অনুরূপ বা কোন্‌টি বিপরীত বলতে পারার ক্ষমতা।" গেস্টাল্ট-মতবাদীরা বিচ্ছিন্ন বস্তু বা ঘটনার সংযোগসূত্র আবিষ্কার করার ক্ষমতাকেই বুদ্ধির লক্ষণ মনে করেন।

**সমালোচনা :**

পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, কোন সংজ্ঞাই বুদ্ধির যথার্থ স্বরূপের ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দেশ করার জন্য সংজ্ঞাগুলি বুদ্ধির কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। উইলিয়ম স্টার্ন-এর সংজ্ঞানুযায়ী বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, কিন্তু বুদ্ধিকে কেবলমাত্র বাহ্য-পরিবেশের সঙ্গতিসাধনের ক্ষমতা বলা হলে বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা হয় না। বুদ্ধি শিক্ষালাভের ক্ষমতা একথা বলা হলে বুদ্ধির বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। টারম্যানের সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা, অমূর্ত চিন্তা করার জন্য যেমন বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার অর্থ উপলব্ধির জন্যও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। থর্নডাইকের সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নয়; কেননা, বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করার ক্ষমতাকেই কেবলমাত্র বুদ্ধি বলা চলে না; বিভিন্ন সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা, তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এবিংহাউজের সংজ্ঞা সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ওয়াটসন যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুদ্ধির ব্যাখ্যা দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, সে কারণে তাঁর সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। বুদ্ধি হল মানসিক শক্তি, তাঁকে দৈহিক ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রতিটি সংজ্ঞা বুদ্ধির কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে

একটিমাত্র বাক্যে বুদ্ধির সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা না করে আমরা বুদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করে বুদ্ধির স্বরূপটুকু বুঝে নেবার চেষ্টা করতে পারি।

বুদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

প্রথমতঃ, বুদ্ধি হল মৌলিক মানসিক শক্তি বা ক্ষমতা যা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি স্নায়ুতন্ত্রনির্ভর হলেও, কোন দৈহিক প্রক্রিয়া নয়।

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধি আমাদের বাহ্য-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে সমর্থ করে। অতীত অভিজ্ঞতাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বুদ্ধি আমাদের নতুন এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে সমর্থ করে।

তৃতীয়তঃ, কোন বস্তুর বা অবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিরূপণ করে, সেই বস্তুর বা অবস্থার সামগ্রিক রূপটুকু অবধারণ করতে বুদ্ধি আমাদের সমর্থ করে।

চতুর্থতঃ, বাস্তব অভিজ্ঞতার তাৎপর্য নির্ধারণ এবং অমূর্ত চিন্তনশক্তি বুদ্ধির পরিচায়ক। শুধু অমূর্ত চিন্তনশক্তি নয়, চিন্তনশক্তির উন্নত ব্যবহার বুদ্ধির জন্যই সম্ভব হয়।

পঞ্চমতঃ, লক্ষ্যে উপনীত হওয়া বা উদ্দেশ্যসাধন করা এবং তার জন্য উপযুক্ত উপায় নির্বাচন বুদ্ধির পরিচায়ক।

ষষ্ঠতঃ, বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে বুদ্ধি।

সপ্তমতঃ, মানসিক কাজ দ্রুত সম্পাদন করা বুদ্ধির জন্যই সম্ভব হয়।

বুদ্ধির কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা না করলেও পূর্বোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে বুদ্ধির স্বরূপ বোঝা যাবে।

## ২। বুদ্ধিবৃত্তি এবং বুদ্ধি (Intellect and Intelligence) :

এ দুটি শব্দ সমার্থক নয়। ধী বা বুদ্ধিবৃত্তি হল একটা স্থায়ী মানসিক বৃত্তি যেটি শিক্ষা এবং অভ্যাসের সহায়তায় গড়ে ওঠে এবং এই স্থায়ী মানসিক বৃত্তিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য যে মানসিক শক্তি ক্রিয়া করে তাই হল বুদ্ধি। মনোবিদ্ উডওয়ার্থ (*Woodworth*)-এর ভাষায় 'Intelligence means Intellect put to use'. উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তি বা ধীসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও, কোন ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির দৈন্য পরিলক্ষিত হতে পারে, আবার বুদ্ধির চমক লক্ষ্য করা গেলেও কোন ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি বা ধী উচ্চস্তরের নাও হতে পারে। ধী বা বুদ্ধিবৃত্তি হল তাত্ত্বিক। বুদ্ধি তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয়ই।

## ৩। বুদ্ধি এবং জ্ঞান (Intelligence and Knowledge) :

বুদ্ধি হল সহজাত মানসিক ক্ষমতা আর জ্ঞান হল অর্জিত বিদ্যা। বুদ্ধির সাহায্যে আমরা জ্ঞান অর্জন করি এবং সেই জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। জ্ঞানকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই হল বুদ্ধি।

বুদ্ধি এবং জ্ঞানের পারস্পরিক সম্বন্ধ খুবই গভীর। সাধারণতঃ ব্যক্তির অর্জিত বিদ্যা বা জ্ঞান লক্ষ্য করে আমরা তার বুদ্ধির পরিমাপ করার চেষ্টা করি,

যদিও বুদ্ধির অভীক্ষা এবং অর্জিত বিদ্যা সম্পর্কীয় অভীক্ষাগুলির (Achievement test) মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। তবে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের বুদ্ধির পরীক্ষায় অর্জিত বিদ্যাকে একেবারে বর্জন করা সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে, কোন ব্যক্তি যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে তার বুদ্ধি যে তার জ্ঞান অর্জনের পক্ষে সহায়ক, তা আমরা মনে করি।

## ৪। বুদ্ধি-অভীক্ষা বা বুদ্ধি-পরীক্ষা (Intelligence Test) :

যদিও বুদ্ধির যাথার্থ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন এবং বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে যদিও বিভিন্ন মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়, তত্ত্বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা (Intelligence Test) রচনা করেছেন। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও বিভিন্ন কর্ম প্রতিষ্ঠানে এই অভীক্ষার বহুল ব্যবহারের সাহায্যে ব ক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়।

**ল্যাভেটর, গল এবং স্পারঝিম-এর বুদ্ধি পরিমাপের প্রচেষ্টা।**

বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধি অভীক্ষাগুলি প্রবর্তিত হবার পূর্বে অতীতে ল্যাভেটর দৈহিক আকৃতি দেখে, গল (*Gall*) এবং স্পারঝিম (*Spurzhim*) মস্তিষ্কের গঠন দেখে বিভিন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই সব পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয় বলে পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়েছে।

**বিনে-সিমোঁ স্কেল**

ফরাসী মনোবিদ্‌ আলফ্রেড বিনে ১৯০০ সালে তাঁর বুদ্ধি অভীক্ষা প্রথম তৈরী করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আলফ্রেড বিনে (*A. Binet*) এবং তাঁর সহকর্মী সিমোঁ (*Simon*) বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির মান নির্ণয় করার জন্য সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য একটি স্কেল বা একটি বুদ্ধি পরিমাপক অভীক্ষা তৈরী করেন। এই অভীক্ষাটি 'বিনে-সিমোঁ স্কেল' (*Binet-Simon Scale*) নামে প্রসিদ্ধ। কোন স্কেলে যেমন ক্রমবর্ধমান ধারায় কতকগুলি একক পর পর সাজানো থাকে, তেমনি বিনের এই অভীক্ষার ক্ষেত্রেও কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা—সহজ থেকে কঠিন, কঠিন থেকে কঠিনতর এইভাবে ধাপে ধাপে সাজান ছিল। প্রশ্নগুলি নানা ধরনের। শিশুদের বিভিন্ন বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করা, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারণ করা বা বস্তুর পারস্পরিক তুলনা করা, ছবি দেখে বর্ণনা করতে বলা, কোন কিছু দেখে নকল করতে পারা, কোন কিছু শুনে

পুনরায় বলা, বিচার করা, ভুল বা অসঙ্গতি নির্ণয় করা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বা সমস্যা সমাধান করতে বলা হত। এই সব পরীক্ষায় বুদ্ধির নানা দিক প্রকাশিত হত।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিনে এবং সিমোঁ প্রশ্নগুলির পরিবর্তন ও সংশোধন করেন এবং শিশুদের বয়স অনুযায়ী প্রশ্নগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করেন। স্কেলের প্রথম ধাপে ছিল তিন বৎসর বয়সের শিশুদের উপযুক্ত নির্ধারিত প্রশ্ন বা সমস্যা, তারপর চার বছরের, তারপর পাঁচ বছরের এবং এইভাবে পনের বছরের উপযুক্ত প্রশ্ন গুচ্ছ। তেমনি প্রথম প্রশ্নগুলি ছিল সোজা, পরের প্রশ্নগুলি আর একটু কঠিন এবং এইভাবে শেষ প্রশ্নগুলি ছিল সবচেয়ে কঠিন। এর থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, শিশুদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধিও বেড়ে যায় এবং বিভিন্ন শিশুর মানসিক ক্ষমতার মধ্যে তারতম্য আছে।

বয়সানুসারে প্রশ্নের ক্রম নির্ণয়

বিনের বুদ্ধি অভীক্ষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় 'মানসিক বয়স' (*Mental Age*)-এর ব্যবহার। বিনের অভীক্ষায় শিশুদের বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশ্ন বা সমস্যা থাকত। যে ছেলে বা মেয়ে যে বয়সের উপযোগী প্রশ্নের শতকরা পঞ্চাশটির অধিক উত্তর দিতে পারত, তার প্রকৃত বয়স যাই হোক না কেন, তার মানসিক বয়স ঐ বছরের ধরা হত। যেমন, ৬ বছরের ছেলে যদি ৮ বছরের ছেলের উপযোগী প্রশ্নে শতকরা পঞ্চাশটির অধিক উত্তর দিতে পারে, তাহলে তার প্রকৃত বয়স ৬ হলেও, তার মানসিক বয়স ৮ ধরা হত; অর্থাৎ বুদ্ধির দিক থেকে এ ছেলে কিছুটা এগিয়ে আছে। আবার ৯ বছরের ছেলে যদি ৭ বছরের ছেলের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে, তাহলে তার প্রকৃত বয়স ৯ হলেও, মানসিক বয়স হবে ৭; অর্থাৎ তার বুদ্ধির মান ৯ বছরের ছেলের উপযোগী নয়।

মানসিক বয়সের ব্যবহার

## ৩। স্ট্যানফোর্ড-বিনে-স্কেল (Stanford-Binet Scale):

বিনের অভীক্ষাটি প্রথম তৈরী হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর জীবদ্দশায় ১৯০৫, ১৯০৮ এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অভীক্ষাটি তিনবার সংশোধিত হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিনে মারা যান। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Stanford University) অধ্যাপক টারম্যান এই অভীক্ষাটির একটি সংস্করণ করেন। এই সংশোধিত সংস্করণটি স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ (*Stanford Revision of the Binet-*

স্ট্যানফোর্ডের সংস্করণ

*Simon Scale*) বা স্ট্যানফোর্ড-বিনে-স্কেল (*Stanford-Binet-Scale*) সংস্করণ নামে পরিচিত। যেহেতু টারম্যান স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং মূলতঃ বিনে-কে অনুসরণ করে এই নতুন স্কেল বা অভীক্ষা তৈরী করেছেন, সেই কারণে একে স্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেল আখ্যা দেওয়া হয়। এই স্কেলেই সর্বপ্রথম বুদ্ধ্যঙ্ক বা I. Q. সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে টারম্যানের সহকারী মেরিল (*Merrill*)-এর সহযোগিতায় এই অভীক্ষাটির আর একটি পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় যাকে টারম্যান-মেরিল স্কেল (*Terman Merrill Scale*) আখ্যা দেওয়া হয়।

স্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেল

এই সংশোধিত নতুন সংস্করণটিতে সর্বপ্রথম রয়েছে ২ বৎসর বয়সের জন্য নির্ধারিত প্রশ্ন এবং একেবারে শেষের ধাপে রয়েছে পনের বৎসরের উর্ধ্বে পরিণত বয়স্ক (adult)-দের জন্য প্রশ্ন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের বিনে পরীক্ষায় প্রশ্নসংখ্যা ছিল চুয়ান্ন, স্ট্যানফোর্ড সংশোধনে এই সংখ্যা বেড়ে হল নব্বই এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণে দাঁড়াল একশ উনত্রিশটিতে।

## ৬। বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষা (The Binet Simon Intelligence Test):

বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বুদ্ধির পরিমাপ করার জন্য ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিনে বয়স অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান দুরূহতার নীতির ভিত্তিতে কতকগুলি প্রশ্নের তালিকা রচনা করেন। এই প্রশ্নতালিকার প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে ছেলেমেয়েদের সাধারণ জ্ঞান, স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, কারণ নিরূপণ করার ক্ষমতা, ভাষামূলক অসঙ্গতি নির্ণয় করার ক্ষমতা প্রভৃতি জানা যায়। সাধারণতঃ প্রত্যেক স্তরে ছয়টি করে প্রশ্ন দেওয়া হয়। এই প্রশ্ন তালিকার কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হল:

বিনে পদ্ধতি

**তিন বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন:**

(ক) নাক, চোখ, মুখ, দেখাতে বলা।

(খ) দুই অঙ্কের সংখ্যা শুনে পুনরাবৃত্তি করতে বলা।

(গ) কোন ছবির বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা করতে বলা।

(ঘ) নিজের পদবী বলতে বলা।

(ঙ) ছয়টি পদ বিশিষ্ট একটি বাক্য শুনে সেটি পুনরাবৃত্তি করতে বলা। যেমন—'এখন খুব গরম, আমায় যেতে দাও'।

**চার বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :**

(ক) নিজে ছেলে না মেয়ে বলতে বলা।
(খ) চাবি, ছুরি এবং পেনির নাম বলতে বলা।
(গ) তিনটি সংখ্যা শুনে পুনরায় বলতে বলা।
(ঘ) দুটি সরল রেখার দৈর্ঘ্যের তুলনা করতে বলা।

**পাঁচ বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :**

(ক) দুটি ওজন তুলনা করতে বলা।
(খ) কোন জ্যামিতিক চিত্র, যেমন বর্গক্ষেত্র দেখে ঐরকম চিত্র অঙ্কন করতে বলা।
(গ) দশটি পদ দ্বারা গঠিত একটি বাক্য শুনে পুনরায় বলতে বলা।
(ঘ) দুটি ত্রিভুজ দেখে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বলা।
(ঙ) চারটি মুদ্রা গণনা করতে বলা।

**ছয় বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :**

(ক) সকাল এবং বিকালের মধ্যে পার্থক্য করতে বলা।
(খ) ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরিচিত শব্দের সংজ্ঞা দিতে বলা।
(গ) একটি হীরক দেখে তার আকার নকল করতে বলা।
(ঘ) তেরটি পেনি ( বা অনুরূপ মুদ্রা ) গণনা করতে বলা।
(ঙ) সুন্দর এবং কুৎসিত মুখের ছবির পার্থক্য করতে বলা।

**সাত বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :**

(ক) ডান হাত এবং বাম কান দেখাতে বলা।
(খ) ছবির বর্ণনা করতে বলা।
(গ) একই সঙ্গে করা হয়েছে এমন তিনটি আদেশ কার্যে পরিণত করা।
(ঘ) ছয়টি 'sous' ( বা অনুরূপ মুদ্রা )-এর মূল্য গণনা করা, যার মধ্যে তিনটি হল দ্বিগুণ মূল্যের।
(ঙ) চারটি প্রধান রঙের নাম করতে বলা।

**আট বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :**

(ক) কোন্ ছবিতে কি কি অংশ বাদ পড়েছে সেগুলি বলতে বলা।
(খ) কুড়ি থেকে এক পর্যন্ত উল্টোদিক থেকে গণনা করতে বলা।
(গ) স্মৃতি থেকে দুটি বিষয়ের তুলনা করতে বলা।

(ঘ) বার ও তারিখ বলা।

(ঙ) পাঁচটি সংখ্যার পুনরুক্তি করা।

**নয় বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :**

(ক) মুদ্রার খুচরা হিসাব করা।

(খ) শব্দের অর্থ বলা।

(গ) প্রচলিত মুদ্রার সব কয়টিকে চিনতে পারা।

(ঘ) পর পর মাসের নাম বলা।

(ঙ) সহজ প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝে উত্তর দেওয়া।

**দশ বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :**

(ক) ওজনের ক্রম অনুসারে পাঁচটি কাঠের টুকরা সাজানো।

(খ) দুটি ছবি স্মৃতি থেকে অঙ্কন করা।

(গ) কোন অবাস্তব বর্ণনার অবাস্তবতা দেখানো।

(ঘ) কোন কঠিন প্রশ্নের অর্থ অবধারণ করতে পারা।

(ঙ) তিনটি প্রদত্ত পদের প্রয়োগ করে বাক্য রচনা করা।

**এগার বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :**

(ক) কতকগুলি উক্তির অসম্ভাব্যতা দেখিয়ে দেওয়া।

(খ) তিনটি পরিচিত শব্দ দিয়ে একটি বাক্য গঠন করতে বলা।

(গ) তিন মিনিটে ষাটটি শব্দের নাম করা।

(ঘ) তিনটি অমূর্ত শব্দের ভাবার্থ বলতে বলা।

(ঙ) উল্টোপালটা সাজানো কয়েকটি পদের সাহায্যে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরী করা।

**পনের বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :**

(ক) সাত অঙ্কের একটি সংখ্যা শুনে পুনর্বার বলতে বলা।

(খ) একটি শব্দের তিনটি সমোচ্চারিত শব্দ এক মিনিটে খুঁজে বার করতে বলা।

(গ) ছাব্বিশটি সিলেবেলের একটি বাক্য শুনে পুনর্বার বলতে বলা।

(ঘ) ছবির ব্যাখ্যা করতে বলা।

(ঙ) প্রদত্ত ঘটনার ব্যাখ্যা করতে বলা।

**পরিণত বয়স্কদের উপযোগী প্রশ্ন ঃ**

(ক) বিশেষ আকার অনুযায়ী কাগজ কাটা।
(খ) একটি ত্রিভুজকে কল্পনায় সাজান।
(গ) কতকগুলি বিমূর্ত পদের পার্থক্য বলতে পারা।
(ঘ) রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট এবং রাজার কাজের মধ্যে তিনটি পার্থক্যের উল্লেখ করা।
(ঙ) একটি পঠিত অংশের সংক্ষিপ্তসার বলতে পারা।

## ৭। স্ট্যানফোর্ড-বিনে বুদ্ধি অভীক্ষা ঃ

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টারম্যান (*Terman*)-বিনের প্রশ্নতালিকা সংশোধিত করে একটি নতুন তালিকা রচনা করেন। এটিই স্ট্যানফোর্ড-বিনে পরীক্ষা বা স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ (Terman's Stanford Revision Test) নামে খ্যাত। এই প্রশ্নতালিকার কয়েকটি প্রশ্নের উদাহরণ নীচে দেওয়া হল ঃ

**(১) তিন বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :**

(ক) দেহের বিভিন্ন অংশ দেখাতে বলা।
(খ) পরিচিত বস্তুর নাম বলতে বলা।
(গ) ছবির বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনা দিতে বলা।
(ঘ) ছয় থেকে সাতটি পদ শুনে পুনরায় বলতে বলা।
(ঙ) ছেলে না মেয়ে বলতে বলা।

**(২) পাঁচ বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :**

(ক) ওজনের তুলনা করতে বলা।
(খ) রঙের নাম বলতে বলা।
(গ) কোন্‌টি বেশী সুন্দর তার তুলনা করতে বলা।
(ঘ) ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংজ্ঞা দিতে বলা।
(ঙ) দুটি ত্রিভুজকে একত্র করে একটি আয়তক্ষেত্র রচনা করতে বলা।
(চ) তিনটি কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে বলা—টেবিলের উপর চাবি রাখা, দরজা বন্ধ করা এবং একটি বই নিয়ে আসা।

**(৩) আট বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :**

(ক) বল এবং মাঠের পরীক্ষা (Ball and Field Test)।

(খ) ২০ থেকে ১ পর্যন্ত উলটো দিক দিয়ে গণনা করা।

(গ) বিশেষ পরিস্থিতি অবধারণ করে তার সঙ্গে জড়িত কোন সমস্যার সমাধান করতে বলা। যেমন, তুমি কি করবে যদি তোমার কোন খেলার সাথী অনিচ্ছাসত্ত্বে তোমায় আঘাত করে?

(ঘ) সাদৃশ্য বস্তুর বিবরণ দিতে বলা।

(ঙ) ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য না রেখে সংজ্ঞা দিতে বলা।

(চ) কুড়িটি শব্দ বলতে বলা।

**ভাষাভিত্তিক ব্যক্তিগত বুদ্ধি-অভীক্ষা (Verbal Individual Test) :** বুদ্ধি-অভীক্ষা ভাষাভিত্তিক হতে পারে বা ভাষাবর্জিত হতে পারে। যেসব বুদ্ধি-পরীক্ষায় ভাষার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য বা সমস্যা সমাধানের জন্য ভাষার ব্যবহার করতে হয় সেগুলি ভাষামূলক বুদ্ধি-অভীক্ষা। আবার এই অভীক্ষা ব্যক্তিগত (Individual) বা দলগত (Group) হতে পারে। বিনে-সিমোঁর অভীক্ষা হল শিশুদের জন্য ভাষামূলক ব্যক্তিগত অভীক্ষা। আবার পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্যও এই জাতীয় পরীক্ষার প্রবর্তন করেন নিউ ইয়র্কের বেলেভ্যু সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালের ডঃ ডেভিড ওয়েক্স্লের (*Dr. David Wechsler*)। তাঁর নামানুসারে একে ওয়েক্স্লের বেলেভ্যু-অভীক্ষা (Wechsler-Bellevue Test) বলা হয়।

**ভাষাভিত্তিক দলগত অভীক্ষা (Verbal Group Test) :** একই সঙ্গে যাতে একটি বড় দলকে পরীক্ষা করা যায় তার জন্য এই অভীক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করার সময় তাদের বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য এই জাতীয় দুটি অভীক্ষার প্রবর্তন করা হয়; একটির নাম 'আর্মি আলফা অভীক্ষা' (Army Alpha Test) এবং আর একটির নাম 'আর্মি বিটা অভীক্ষা' (Army Beta Test)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারসাধন করে একটি নতুন অভীক্ষা তৈরী করা হয়, এটির নাম 'সৈন্যবিভাগীয় সাধারণ মান-নির্ধারক অভীক্ষা' (Army General Classification Test)। এই অভীক্ষায় ভাষাগত, সংখ্যাগত এবং অবস্থানমূলক জ্ঞান সম্পর্কে ক্ষমতার পরীক্ষা করা হয়।

**৮। ভাষাবর্জিত অভীক্ষা বা কৃতি অভীক্ষা (Non-verbal Test or Performance Test) :**

বিনে-সিমোঁ অভীক্ষা মূলতঃ ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা, কিন্তু শিশুর পক্ষে সব সময় তার মনের ভাবকে ভাষায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। সেহেতু শিশুর বুদ্ধির যথার্থ পরিমাপ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সে কারণে যেসব শিশু নিরক্ষর, মূকবধির অর্থাৎ যারা ভাষার ব্যবহারে অসুবিধা বোধ করে বা যেসব বিদেশী অপরের ভাষা জানে না তাদের জন্যই বিশেষ করে এই ভাষাবর্জিত বা কৃতি অভীক্ষাগুলি তৈরী করা হয়। এই ভাষাবর্জিত অভীক্ষাগুলি দুপ্রকারের হতে পারে—(১) **ভাষাবর্জিত ব্যক্তিগত অভীক্ষা** (Non-verbal Individual Test) এবং (২) **ভাষাবর্জিত দলগত অভীক্ষা** (Non-verbal Group Test)।

(ক) **ভাষাবর্জিত ব্যক্তিগত অভীক্ষা** (Non-verbal Individual Test) :

(i) **ফর্ম বোর্ড অভীক্ষা** (Form Board Test) : ডিয়ারবর্ন (*Dearborn*) এই অভীক্ষার প্রবর্তন করেন। পরীক্ষণ-পাত্রের সামনে একটি কাঠের বোর্ড রাখা হয়, যেটিতে নানা আকারের খোপ কাটা আছে। পরীক্ষণ-পাত্রকে ঐ আকারের এবং মাপের কতকগুলি কাঠের টুকরো দেওয়া হয়। পরীক্ষণ-পাত্রকে কাঠের টুকরোগুলি দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ঐ খোপগুলি ভরতি করে দিয়ে বোর্ডটিকে সাজিয়ে দিতে হবে, সাজাবার পর দেখতে হবে যেন কোন খোপ খালি না থাকে বা কোন টুকরো পড়ে না থাকে।

(ii) **ছবি সম্পুরণ অভীক্ষা** (Picture Completion Test) : এই অভীক্ষার প্রবর্তন করেন মনোবিদ্ গুডএনাফ (*Goodenough*)। এই অভীক্ষা চার থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের উপযোগী। পরীক্ষণ-পাত্রকে পেন্সিল দিয়ে একটি মানুষের মূর্তি আঁকতে বলা হয়। ছবিটা কতখানি সুন্দর হয়েছে তা দেখে নয়, ছবির মধ্যে কতখানি সামঞ্জস্য আছে বা ছবিটা কতখানি সম্পূর্ণ করতে পেরেছে তাই দেখে নম্বর দেওয়া হয়।

(iii **প্যাস অ্যালং অভীক্ষা** (Pass Along Test) : মনোবিদ্ আলেকজাণ্ডার (*Alexander*) এই অভীক্ষার প্রবর্তন করেন। এই অভীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর বিচারশক্তি, বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক অবস্থা সম্পর্কে

জ্ঞান ইত্যাদি জানা যায়। এই অভীক্ষায় প্রয়োজন চারটি ছোট ছোট চৌকা ও আয়তাকার কাঠের টুকরো এবং একটি ট্রে। ট্রের একদিকের কানাচে নীল ও অন্যদিকের কানাচে লাল রঙ। পরীক্ষণ-পাত্রকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে
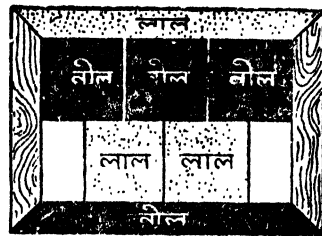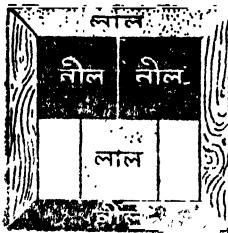
Pass along Test
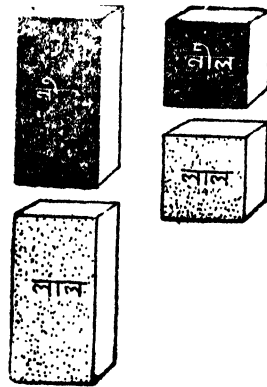
Pass along Tray

Pass along Blocks

লাল টুকরোগুলি ট্রের লাল কানাচের দিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরীক্ষণ-পাত্রের সামনে এক এক করে ছবিগুলি রাখতে হবে যাতে পরীক্ষণ-পাত্র ছবি অনুযায়ী টুকরোগুলো সাজাতে পারে।

**(iv) ধাঁধা-পথ অনুসন্ধান অভীক্ষা** (Maze Exploration Test): পোর্টিয়াস (*S. D Porteus*) বার এবং চোদ্দ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য ধাঁধার পথ বার করার কতকগুলি অভীক্ষা রচনা করেন। এই অভীক্ষাগুলি নানা ধরনের হয়ে থাকে। একটি কাগজের উপর একটি ধাঁধা আঁকা থাকে

পরীক্ষণ-পাত্রকে একটি চিহ্নিত স্থান থেকে শুরু করে বন্ধপথের ভিতর না ঢুকে খোলাপথে বেরিয়ে আসতে বলা হয়। পরীক্ষণ-পাত্রকে একটি পেন্সিল দিয়ে সংক্ষিপ্ততম পথটি বার করতে বলা হয়। পরীক্ষণ-পাত্র কত নির্ভুলভাবে এবং কত অল্প সময়ে পথটি বার করতে পারে তার উপর ভিত্তি করে নম্বর দেওয়া হয়।

পূর্বোক্ত অভীক্ষাগুলি ছাড়াও আছে বিভিন্ন অংশ একত্র করে অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা (Picture completion test), সংখ্যা শ্রেণীর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা ইত্যাদি।

**(খ) ভাষাবর্জিত দলগত বুদ্ধি-অভীক্ষা (Non-verbal Group Test):** সৈন্যদের জন্য যে আর্মি বিটা অভীক্ষা (Army Beta Test) বা আর্মি আলফা অভীক্ষা (Army Alpha Test) প্রবর্তন করা হয়েছে, সেই অভীক্ষা এই জাতীয় অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এগুলিতে পরীক্ষণ-পাত্রের পক্ষে কোন ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। ধাঁধার পথ খুঁজে বার করা, অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা, জ্যামিতিক চিত্র গঠন করা প্রভৃতি সমস্যার দ্বারা আর্মি বিটার (Army Beta) অভীক্ষাটি রচিত।

## ৯। বুদ্ধি অভীক্ষা এবং অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা (Intelligence Test and Achievement or Scholastic Test):

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরীক্ষণ-পাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে যেসব পরীক্ষা নেওয়া হয় সেগুলিকে বলা হয় অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা (Achievement Test)। এই সব পরীক্ষা থেকে পরীক্ষণ-পাত্র কোন একটি বিষয় সম্পর্কে কতখানি জ্ঞান অর্জন করেছে তা জানা যায়। অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষণ পাত্র জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কতখানি জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করেছে তার পরিমাপ করা যায়। অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষায় যেসব প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করা হয় সেগুলি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়ের উপরই করা হয়ে থাকে এবং এই সব প্রশ্নের সাহায্যে পাঠ্য বিষয়ের কতখানি জ্ঞান পরিক্ষণ-পাত্র অর্জন করেছে তা জানা যায়।

**বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা**

নানা কারণে অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা বুদ্ধি-পরীক্ষার উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে না। অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষাগুলির ব্যাপকতা খুবই সীমিত। বিদ্যালয়ে যেসব বিষয় শেখান হয় কেবলমাত্র সে বিষয়ের অর্জিত জ্ঞানই এই

পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়। বিদ্যালয়ের বাইরে যে বৃহত্তম পরিবেশ আছে সে সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা সাধারণতঃ এই সব অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষায় করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যেসব ছেলে খুব পড়ুয়া তারা এই সব পরীক্ষার সুবিধা বিশেষ ভাবে গ্রহণ করতে পারে। তৃতীয়তঃ, যেসব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বালক-বালিকা তাদের বুদ্ধির উপযোগী পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায় না, এই সব অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মানসিক শক্তির যথার্থ বিচার হবে না।

অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা বুদ্ধি-পরীক্ষার উদ্দেশ্য-সাধন করতে পারে না

বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষণ-পাত্রের সহজাত মানসিক শক্তির এবং পরিবেশ সম্পর্কে তার সাধারণ জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়। অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় একটা নতুন পরিস্থিতিকে সে কতখানি অনুধাবন করতে পারে তা জানা যায়।

বুদ্ধি-অভীক্ষার উদ্দেশ্য

সুতরাং বুদ্ধি-অভীক্ষায় এমন কোন প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করা চলবে না যার উত্তর দেবার জন্য পরীক্ষণ-পাত্রকে অর্জিত বিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। যেমন, শাজাহানের পিতার নাম কি বা একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ একত্রে কয়টি সমকোণের সমান প্রভৃতি প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষণ-পাত্রের অর্জিত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাবে, কিন্তু তার বুদ্ধির পরিমাপ করা চলবে না। বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রশ্নগুলি এমন হবে, যাতে পরীক্ষণ-পাত্র অর্জিত জ্ঞানের সহায়তা ছাড়াই তার সাধারণ মানসিক শক্তির সাহায্যেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারবে। যেমন, 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন বালক যদি তার কোন খেলার সাথীকে আঘাত করে, 'তাহলে সে কি করবে', এই জাতীয় প্রশ্নের মাধ্যমেই পরীক্ষণ-পাত্রের বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব হবে। কারণ এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য পরীক্ষণ পাত্রের অর্জিত বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রশ্নগুলির স্বরূপ

তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে একেবারে অর্জিত জ্ঞাননিরপেক্ষ করে তৈরী করা কঠিন। কেননা, বেশী বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য যেসব বুদ্ধির অভীক্ষা রচিত হয়, সেগুলিতে সাধারণতঃ কোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে বলা হয় এবং এর জন্য কিছুটা অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সুতরাং অর্জিত জ্ঞানকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি গঠন করা যায় না। আধুনিক বুদ্ধি অভীক্ষাগুলিতে শব্দবিন্যাস, বাক্যার্থ নির্ণয়, আঙ্কিক প্রশ্ন প্রভৃতি শিক্ষার্জিত বা অর্জিত অভিজ্ঞতা-নির্ভর নানা সমস্যার অবতারণা করা হয়। বিনে-সিমোঁ প্রবর্তিত বুদ্ধি-অভীক্ষায়ও অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বহু সমস্যাকে গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান বুদ্ধি-অভীক্ষাতে ভাষাভিত্তিক জ্ঞান বা বিদ্যাবত্তার এত প্রাচুর্য দেখা যায় যে, অনেকে এ অভীক্ষাগুলিকে আর বুদ্ধি-অভীক্ষা বলে অভিহিত করতে চান না, তাঁরা এ অভীক্ষাগুলিকে অর্জিত অভিজ্ঞতা বা বিদ্যাবত্তার দক্ষতার অভীক্ষা (Scholastic Aptitude Test) রূপে অভিহিত করেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন এগুলি বুদ্ধির পরিমাপ না করে শিক্ষামূলক দক্ষতাকেই পরিমাপ করে। এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, বুদ্ধি-অভীক্ষা গঠনে ভাষাধর্মী বা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন অবতারণার প্রবণতা থেকে অভীক্ষাকারকগণ যতদূর সম্ভব মুক্ত থাকবেন। অবশ্য এটাও উল্লেখযোগ্য যে, অভীক্ষাকারকগণ ভাষা বা অর্জিত জ্ঞানের ততটুকুই ব্যবহার করেন যতটুকু একটি নির্দিষ্ট বয়োগোষ্ঠী (age group) ছেলেমেয়েদের মধ্যে থাকতে পারে। এ ব্যাপারে তাঁরা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার উপর নির্ভর করেই প্রশ্ন গঠন করেন।

## ১০। বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির সুবিধা ও অসুবিধা (Uses and limitations of Intelligence Tests) :

বর্তমান যুগে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে প্রায় সব দেশেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির নিম্নোক্ত সুবিধা লক্ষ্য করা যায় :

(ক) শিক্ষা-মনোবিদ্ রস্ (*Ross*) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির মূল্য সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি মানুষের মানসিক প্রকৃতি এবং তার ক্রমোন্নতি সম্পর্কে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করেছে। টারম্যান বলেন, "বুদ্ধি অভীক্ষাগুলির আর একটি প্রয়োজনীয় উপকারিতা হল—যেসব উপাদান মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে সেগুলি আলোচনা করা।"[২]

1. Ross : Groundwork of Educational Psychology ; Page 230.
2. L. M. Terman : The Measurement of Intelligence ; Page 19.

(খ) ছাত্রদের বুদ্ধির পরিমাপ করে সেই বুদ্ধি অনুযায়ী ছেলেদের শ্রেণীভুক্ত করার জন্য বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি খুবই কার্যকরী। বুদ্ধিমান ছাত্র দ্রুত শিক্ষা করে, বুদ্ধিহীন ছাত্রের শিক্ষার গতি মন্থর। ভাল-মন্দ, মাঝারি সব ছেলেমেয়েদের যদি একই শ্রেণীভুক্ত করে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র উভয়ের প্রতি সমান অবিচার করা হয়। একই বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q)-সম্পন্ন ছাত্রদের একই শ্রেণীভুক্ত করে শিক্ষাদান করলে শিক্ষাকার্য ভালভাবে সম্পন্ন করা যায়। ভাল, মন্দ, মাঝারি শিক্ষার্থীদের এই শ্রেণীবিন্যাস বুদ্ধি-অভীক্ষায় প্রয়োগের দ্বারাই সম্ভব হয়।

**একই বুদ্ধ্যঙ্কসম্পন্ন ছাত্রদের একই শ্রেণীভুক্ত করলে ভাল হয়**

(গ) বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির সাহায্যে জানা যাবে ছাত্রের বুদ্ধি সম্পর্কে শিক্ষকের বিচার যথার্থ হয়েছে কিনা। তাছাড়া, এই বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষক নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কেও সচেতন হতে পারবেন। যদি বুদ্ধি-অভীক্ষায় পাওয়া সাফল্যাঙ্কের (score) সঙ্গে ক্লাসের কাজের সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে শিক্ষক মহাশয় উপলব্ধি করতে পারেন, কি কারণে তা ঘটেছে।

**বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির প্রয়োজনীয়তা**

(ঘ) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির সাহায্যে ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ, অনুরাগ এবং বিশেষ সামর্থ সম্পর্কে অনেক বিষয় জানা যায়। ছাত্রের বুদ্ধি ঠিকমত পরিমাপ করতে পারলে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কোন বিষয়টি তার পক্ষে শিক্ষা করা সহজ হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

**বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ, অনুরাগ প্রভৃতি জানা যায়**

(ঙ) ছাত্রের ভবিষ্যৎ-বৃত্তি-নির্বাচনের পক্ষে বুদ্ধি-অভীক্ষা বিশেষভাবে কার্যকর। কোন্ বৃত্তি ছাত্রের পক্ষে উপযোগী সেটি নির্ধারণ না করে খেয়াল-খুশিমত যে কোন একটি বৃত্তি গ্রহণ করলে ছাত্র জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ছাত্রের সাধারণ বুদ্ধির মান, বিশেষ বিশেষ কর্ম করার মানসিক ক্ষমতা, প্রবণতা, আগ্রহ প্রভৃতি বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়। মাতাপিতা যদি সন্তানের বুদ্ধি সম্পর্কে অবহিত হন তাহলে তাঁর সন্তানদের এমন কোন বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করবেন না, যা তাদের বুদ্ধির উপযোগী নয় এবং এর ফলে অযথা অর্থ ব্যয় বা অপচয় বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া, বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির সাহায্যে জানা যাবে যে, ছেলেমেয়েরা তাদের পূর্ণ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করছে কিনা।

**ছাত্রদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচনে বুদ্ধি-অভীক্ষা কার্যকারিতা**

(চ) যারা স্বল্পবুদ্ধি তাদের বুদ্ধির স্বল্পতার কারণ নির্ধারণের জন্য, যাদের বুদ্ধি বিকারগ্রস্থ, তাদের বিকারের লক্ষণ নির্ণয় করার জন্য, যারা সামাজিক বা শিক্ষামূলক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান করে চলতে অপারগ, তাদের মধ্যে এই অসঙ্গতির কারণ কি তা নিরূপণ করার জন্য বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। যেসব শিশুরা লেখাপড়ায় ক্লাসে পিছিয়ে পড়ে তাদের ক্ষেত্রে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে অনেক তথ্য জানা যায়। কখনও দেখা যায় শিশুর বুদ্ধির স্বল্পতাই এর কারণ, শিক্ষক বা মাতাপিতার ত্রুটি নয়। আবার যদি দেখা যায় যে, শিশুর বুদ্ধি এর জন্য দায়ী নয়, তখন অনুমানের ক্ষেত্রকে অন্যদিকে পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

যারা স্বল্পবুদ্ধি, বিকার-গ্রস্ত, তাদের স্বল্পবুদ্ধি এবং বিকারের কারণ নির্ধারণে বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

(ছ) অপরাধপ্রবণ শিশুদের অপরাধমূলক মনোবৃত্তি নির্ধারণ করার ব্যাপারেও এই অভীক্ষাগুলি খুবই কার্যকর।

(জ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন ছাত্র ভর্তি করার জন্য, বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কর্মী নির্বাচনের জন্য, সৈন্যবাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করার জন্য এই সব বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে প্রয়োগ করা হয়। বর্তমানে অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপযোগী বৃত্তি-নির্বাচনে সহায়তা করার জন্য বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে। এই সব বিভাগ বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির প্রয়োগ করে ছাত্রদের উপযুক্ত বৃত্তি-নির্বাচনে সহায়তা করে।[1] কারণ, দেখা গেছে যে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন পরিমাপের বুদ্ধির প্রয়োজন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োগ

**বুদ্ধি অভীক্ষাগুলির অসুবিধা :** যদিও বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির পূর্বোক্ত সুবিধা আছে, তবু এগুলি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়।

(ক) বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির বুদ্ধির যথার্থ পরিমাপ সম্ভব হয় না। শিক্ষা-দীক্ষা লাভের সমান সুযোগ না থাকলে বুদ্ধির পারস্পরিক তুলনা কার্যকর হয় না। কেননা, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পাওয়ার ফলে বহুলোক বুদ্ধি-অভীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করেছে।

বুদ্ধি-অভীক্ষার দ্বারা সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধির যথার্থ পরিমাপ সম্ভব নয়

---

1. "Intelligence tests, then have many uses. They are of proved practical value in the diagnosis of mental deficiancy, in the grading of pupils, in the clinical study of 'problem' children and in vocational guidance and selection."

—Rex and Knight : Intelligence and Intelligence Tests, Page 94

ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি-অভীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির পরিমাপ করতে পারে না

(খ) ভাষাভাষিক বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধির যথার্থ পরিমাপ অনেক সময় হয় না। কেননা, ভাষার ব্যবহারে পরীক্ষার্থী নানারকম অসুবিধা ভোগ করতে পারে।

বুদ্ধি-অভীক্ষায় সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপ সম্ভব নয়

(গ) বুদ্ধি-অভীক্ষার সহায়তায় কোন ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপ সম্ভব নয়। কেননা, যে কোন অভীক্ষা ব্যক্তিত্বের একটি দিকই পরিমাপ করতে পারে।

(ঘ) বুদ্ধি-অভীক্ষার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে অভিযোগটি আনা হয় তাহল এই যে, বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি যে বুদ্ধির পরিমাপ করে, সেই বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতের ঐক্য নেই। যে মানসিক শক্তির পরিমাপের চেষ্টা করা হচ্ছে, তার সম্পর্কে যদি কোন সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকে তাহলে সে শক্তি পরিমাপের কোন অর্থই হয় না। অবশ্য, এই জাতীয় অভিযোগ যদি বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয় তাহলে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির কার্যকারিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আসলে এই অভিযোগ টেঁকে না, কারণ বুদ্ধির কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না হলেও, বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না।

বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতের অনৈক্য বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির অপ্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে না

(ঙ) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির আদর্শীকরণ (Standardization) করা না হলে, পরীক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের বা কর্মজীবনের সফলতা সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। তাছাড়া, কোন কোন কাজে কেবলমাত্র বুদ্ধিই সাফল্য আনতে পারে না।[1] অফিসের কোন একজন টাইপিস্ট অন্যান্য টাইপিস্টদের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান হতে পারে কিন্তু সে একজন ভাল টাইপিস্ট নাও হতে পারে। একজন লোকের ব্যবসায়ে উন্নতি করার পক্ষে যথেষ্ট বুদ্ধি থাকতে পারে, কিন্তু তার নৈতিক ধারণা তার ব্যবসায়ের উন্নতি করার পথে অন্তরায়স্বরূপ হতে পারে। মানুষের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপের প্রয়োজন।

বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির আদর্শীকরণ না হলে পরীক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন বা কর্মজীবন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না

(চ) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হয় যে, কোন ব্যক্তির দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা তার বুদ্ধির অভীক্ষার সাফল্যাঙ্কের উপর

1. "Nor is intelligence always the factor which influences success."
—Rex and Knight: Intelligence and Intelligence Tests, Page 92.

প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এ অভিযোগ যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা, দ্রুত চিন্তনশক্তির জন্য বুদ্ধি-অভীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন বুদ্ধি-অভীক্ষার ত্রুটি নির্দেশ করে না, কারণ, যথাযথ উত্তরের জন্যই কেবলমাত্র নম্বর দেওয়া হয়। তাছাড়া কোন নির্দিষ্ট সময়ে যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির তুলনায় সুনির্দিষ্টভাবে অধিক চিন্তা করতে পারে, তা নিঃসন্দেহে তার উন্নত বুদ্ধির লক্ষণ।

দ্রুত চিন্তা বুদ্ধি-অভীক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে

(ছ) বুদ্ধি-অভীক্ষার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ যে, এগুলির যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়, যেহেতু পরীক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান তার যথার্থ বুদ্ধির পরিমাপের পথে প্রধান অন্তরায়। স্পীয়ারম্যান প্রমুখ কয়েকজন মনোবিদ্ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। বেরী (*Berry*) বুদ্ধি-অভীক্ষার ফল অনুযায়ী শিশুদের তিন দলে ভাগ করে দেখিয়েছেন যে, যারা বুদ্ধির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে, তারাও প্রথম স্তরে যারা রয়েছে তাদের মতন প্রথমে স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেছিল। কোন বৌদ্ধিক কার্য সম্পন্ন করার যে মানসিক সামর্থ্য তার উপর শিক্ষার প্রভাবকে স্বীকার করে নেওয়া হলেও বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি বুদ্ধির পরিমাপ করে না বা অধিক কিছু পরিমাপ করে একথা বলা চলে না। বুদ্ধি হল সহজাত শক্তি, কিন্তু বংশগতি অনুসারে একজন ব্যক্তি বুদ্ধির যে সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করতে পারে, তা করার জন্য তার একটা উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন।[1]

বুদ্ধি-অভীক্ষার যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়

(জ) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হল আবেগ বা মেজাজ (emotional mood) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এর উত্তরে স্পীয়ারম্যান বলেন যে—অস্থিরতা, আত্মসংযমের অভাব প্রভৃতি তাদের মধ্যেই বেশী দেখা যায় যারা বুদ্ধি-অভীক্ষায় ভাল ফল দেখায়। বেশির ভাগ লোক, বিশেষ করে শিশুরা যখন বুদ্ধির অভীক্ষায় নিজেদের নিযুক্ত করে, তখন সেগুলিকে আনন্দজনক বলেই মনে করে এবং আবেগজাত বাধা কদাচিৎ অনুভব করে। বিভিন্ন পরীক্ষণের সাহায্যে জানা গেছে যে, আবেগজাত

আবেগ বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে

1. "Intelligence is a native trait, but it requires an appropriate environment in order to reach the maximum that has been set for it by heredity."

—Rex and Knight : Intelligence and Intelligence Tests, Page 63.

প্রবণতার জন্য বুদ্ধি-অভীক্ষায় কি পরিণতবয়স্ক বা কি শিশু কোন সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ করে না।

বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির কিছু দোষ-ত্রুটি থাকলেও বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বা এগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হোক এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। প্রথমতঃ, বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির আদর্শীকরণের (Standardization) দ্বারা বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির অনেক দোষ-ত্রুটি দূর করা যেতে পারে। তাছাড়া, পরীক্ষক যদি পরীক্ষার্থীর সঙ্গে একটা সহজ বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে নেন, তাহলে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে।

**বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না**

## ১১। পরীক্ষা পদ্ধতির আদর্শীকরণ (Standardization of Tests) :

পরীক্ষার্থীর বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করেছি। প্রশ্ন হল, এই পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি কিভাবে নির্ভরযোগ্য এবং যথার্থ হতে পারে? প্রশ্নগুলি যদি পরীক্ষার্থীর বয়সের উপযোগী না হয় তাহলে পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগে কখনও সুফল আশা করা যাবে না।

পরীক্ষা-পদ্ধতির আদর্শীকরণ নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ; যথা—(i) **নৈর্ব্যক্তিকতা** (Objectivity), (ii) **নির্ভরযোগ্যতা** (Reliability) এবং (iii) **যাথার্থ্য** (Validity)।

(i) **নৈর্ব্যক্তিকতা** (Objectivity)**:** পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ধারণা, চিন্তা, অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলিকে মুক্ত হতে হবে। পরীক্ষক যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষণকার্যে অগ্রসর না হন তাহলে পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার জন্য তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। অনেক সময় কোন পরীক্ষক শান্ত, ধীর-স্থির ছেলের তুলনায় বাচাল ছেলেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করতে পারেন বা ভাল পোশাক পরা ফিটফাট ছেলেকে নোংরা পোশাক পরা ছেলের তুলনায় বেশি বুদ্ধিমান মনে করতে পারেন। একই পরীক্ষণকার্যে বিভিন্ন পরীক্ষক নিযুক্ত করে দেখা গেছে যে পরীক্ষকের খেয়াল, খুশি এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ছাত্রদের পরীক্ষণের বিষয়টির উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

বর্তমানে নতুন ধরনের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা, যেমন—'multiple choice test,' 'true-false test,' 'best answer test,' 'matching test' প্রভৃতির সাহায্যে এই অসুবিধা দূর করার চেষ্টা হচ্ছে।

(ii) **নির্ভরযোগ্যতা** (Reliability): পরীক্ষা-পদ্ধতিকে তখনই নির্ভরযোগ্য মনে করা যাবে যখন দেখা যাবে পরীক্ষা-পদ্ধতি বার বার প্রয়োগে একই ফল পাওয়া যাচ্ছে। যদি একই পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফল পাওয়া যায় তাহলে সেই পরীক্ষা-পদ্ধতির মান কখনও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির নির্ভরযোগ্যতা বিচার করা হয় বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে একই শিশুদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করে—তাদের সাফল্যাঙ্কের পারম্পর্য নির্ধারণ করে। অবশ্য এই সব পরীক্ষাগুলির পুনরাবৃত্তির মাঝে বেশ কিছু[1] সময়ের ব্যবধান থাকবে।

(iii) **যাথার্থ্য** (Validity): কোন পরীক্ষা-পদ্ধতিকে তখনই যথার্থ মনে করা যেতে পারে যখন দেখব যে, সেই পদ্ধতি যা পরিমাপ করার ইচ্ছা করে, তা-ই পরিমাপ করছে, অন্য কিছু নয় (A test is said to be valid when it does measure what it proposes to measure.)।[2] যেমন, বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে যখন বুদ্ধির পরিমাপ করা হবে তখন লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এই অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়, অন্য কিছু পরিমাপ করা না হয়; যেমন, পরীক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি। পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি তখনই যথার্থ হবে যদি পরীক্ষার্থীর আসল বয়সের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্নগুলি রচিত হয়। কোন নতুন বুদ্ধি-পরীক্ষাকে তখনই যথার্থ মনে করা যেতে পারে যখন তার সঙ্গে কোন স্বীকৃত দলগত পরীক্ষা-পদ্ধতি (recognized group-test) বিশেষ করে স্টানফোর্ড-বিনে পদ্ধতি, নির্ভরযোগ্য শিক্ষকের বিচার, বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের পারম্পর্য থাকে।[3]

1. "The reliability of intelligence tests is measured by correlating the score obtained by a number of applications of those vary tests to the same children at different times."

—H. R. Bhatia: Elements of Educational Psychology; Page 336

2. —Ibid. Page 337.

3. "Thus the validity of a new test of intelligence would be determined by correlating it with some recognized group test, or better with the Standford-Binet tests, with the estimates of intelligence given by a reliable teacher or with school marks."

—H. R. Bhatia: Elements of Educational Psychology; Page 338.

## ১২। বুদ্ধির পরিমাপ (Measurement of Intelligence) :

(i) **বুদ্ধ্যঙ্ক কিভাবে নির্ধারণ করা হয় (How to determine I. Q.) :** প্রকৃত বয়স (Chronological Age) এবং মানসিক বয়স (Mental Age)—এ দুটির আনুপাতিক সম্বন্ধ হল বুদ্ধ্যঙ্ক। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টারম্যান যখন বিনের অভীক্ষাটির সংশোধন করে তার একটি সংস্করণ করেন তখন তিনিই সর্বপ্রথম বুদ্ধ্যঙ্কের ব্যবহার করেন।

ছেলে বা মেয়ে যে বয়সের উপযোগী পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে তাই হবে তার মানসিক বয়স (mental age)। একে সংক্ষেপে বলা হয় M. A. এই মানসিক বয়স ছেলে বা মেয়ের মানসিক পরিণতি নির্দেশ করে। মানসিক বয়সকে (mental age), প্রকৃত বয়স ( chronological age ) দিয়ে ভাগ করে ঐ ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে কোন ছেলে বা মেয়ের বুদ্ধির পরিমাণ বা বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligent Quotient বা I.Q.) বলে।

বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times ১০০$$

$$\text{I. Q.} = \frac{\text{M. A. (in months)}}{\text{C. A. ( in months )}} \times 100$$

[ ভগ্নাংশ এড়াবার জন্যই ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করতে হয়। ]

ধরা যাক, একটি ৬ বছরের ছেলে ৬ বৎসরের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হল। এক্ষেত্রে ছেলেটির প্রকৃত বয়স ৬ এবং মানসিক বয়সও ৬, তাহলে তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে $= \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} = \frac{৬}{৬} \times ১০০ = ১০০$

**অর্থাৎ ছেলেটি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে।**

আবার কোন একটি ছেলের প্রকৃত বয়স ৮, কিন্তু সে ৬ বছরের উপযুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হল, অর্থাৎ তার মানসিক বয়স হল ৬। তাহলে

তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে $= \frac{\text{মানসিক বয়স ( M A. )}}{\text{প্রকৃত বয়স ( C.A. )}} = \frac{৬}{৮} \times ১০০ = ৭৫$

(৬/৮ কে ৩/৪ এবং ১০০ কে ২৫ দিয়ে কাটা)

অর্থাৎ, ছেলেটি স্বল্পবুদ্ধি।

আবার একটি বালকের প্রকৃত বয়স ৮ বৎসর এবং মানসিক ১২ বৎসর।

তাহলে তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে= $\frac{\text{মানসিক বয়স ( M. A. )}}{\text{প্রকৃত বয়স ( C. A. )}} = \frac{১২}{৮} \times ১০০ = ১৫০$

অর্থাৎ, ছেলেটি উন্নত বুদ্ধি

(ii) **বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা** (Constancy of I. Q.): মনোবিদ্‌দের মতে বুদ্ধ্যঙ্ক অপরিবর্তনশীল। কেননা, মনের উন্নতি সত্ত্বেও ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক তার জীবনে মোটামুটি একই থেকে যায়, যেটুকু বাড়ে-কমে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। যে বয়সে বুদ্ধ্যঙ্ক প্রযুক্ত হয়, সেই বয়সের সম্পর্কে সেটি অপরিবর্তনীয় থাকে। যদি কারও প্রকৃত বয়স ১০ হয় ও মানসিক বয়স ১২ হয় এবং বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ হয়, তাহলে এই বুদ্ধাঙ্ক এরূপ বয়সের পরিমাপক হয়। স্বাভাবিক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১০০, বুদ্ধ্যঙ্ক কমলে বা বাড়লেও সে বাড়া-কমা ৫ থেকে ১০ অঙ্ক পর্যন্ত, এর বেশী নয়। ১৬ বছরের পরে বুদ্ধি আর তেমন বাড়ে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায় তা বুদ্ধির বিষয়কে কেন্দ্র করে, বুদ্ধির আকার-প্রকার সম্পর্কে নয়। ১৬ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির মান একই থাকে। অবশ্য বুদ্ধি ঠিক কত বছরের পরে আর বাড়ে না সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কোন কোন মনোবিদ্‌ মনে করেন, সেই বয়স হল ১৪। বিনে, টারম্যান এবং মিরিলের মতে সেই বয়স হল ১৫ এবং ওটিস (*Otis*) এবং মনরো (*Manroe*)-র মতে তাহল ১৮। কিন্তু বেশীর ভাগ মনোবিদ্‌ যাঁরা বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে প্রয়োগ করে তার ফলাফল লক্ষ্য করেছেন তাঁদের মতে সেই বয়স হল ১৬। নীচের তালিকাটি থেকে সাফল্যাঙ্কের যে গড় পাওয়া যায় তার থেকেই বোঝা যায় যে, ১৬ বছরের পরে বুদ্ধির আর তেমন উন্নতি হয় না।

| বয়স | সাফল্যাঙ্কের গড় |
|---|---|
| ১১ | ১৩'১ |
| ১২ | ১৪ ৪ |
| ১৩ | ১৫'১ |
| ১৪ | ১৭'৪ |
| ১৫ | ১৮'৫ |
| ১৬ | ১৮'৯ |
| ১৭ | ১৮'৯ |

*'Otis Advanced Test'* থেকে সাফল্যাঙ্কের যে বিবরণ টমসন লিপিবদ্ধ করেছেন তা নিম্নরূপ।

| বয়স | সাফল্যাঙ্কারে গড় | বয়স | সাফল্যাঙ্কের গড় |
|---|---|---|---|
| ১০ | ৫৫ | ১৮ | ১৩০ |
| ১১ | ৬৮ | ১৯ | ১৩০ |
| ১২ | ৭০ | ২০ | ১৩০ |
| ১৩ | ৯০ | ২১ | ১৩০ |
| ১৪ | ১০০ | ২২ | ১৩০ |
| ১৫ | ১১০ | ২৩ | ১৩০ |
| ১৬ | ১২০ | ২৪ | ১৩০ |
| ১৭ | ১২৭ | — | — |

উপরিউক্ত দুটি তালিকা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, আমাদের বুদ্ধি ষোল বছর বয়সের পরে আর বিশেষ বাড়ে না। জীবনের প্রথম দিকে বুদ্ধির বিকাশ যত তাড়াতাড়ি হয় শেষের দিকে সেরূপ আর হয় না। আর বুদ্ধি বাড়লেও বুদ্ধ্যঙ্ক প্রায় একই থেকে যায়। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ১৬ বৎসরের পরে যদি আর বুদ্ধির বিকাশ না হয় তাহলে কোন ব্যক্তি ১৬ বৎসর বয়সে যতখানি বুদ্ধিসম্পন্ন ৪০ বৎসরেও কি ঠিক ততখানি বুদ্ধিসম্পন্ন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ৪০ বৎসর বয়সে তার বুদ্ধির ক্ষেত্র বা পরিসর ১৬ বৎসরের তুলনায় বেশি, কিন্তু বুদ্ধির গভীরতা একই থেকে যায়। ৪০ বৎসর বয়সে তিনি বেশি বিষয় সম্পর্কে সচেতন।

(iii) **বুদ্ধ্যঙ্কের পরিমাণ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ (Classification according to the degree of I. Q.):** যেসব মানুষ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি নয় তাদের I. Q. বা বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ ধরে নেওয়া হয়। যার I. Q. ১০০-এর বেশি তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান আর যার কম তাকে কম বুদ্ধিমান বলে ধরা হয়। কতকগুলি বিভিন্ন ধরনের মানুষের বুদ্ধ্যঙ্ক নিয়ে দেখা গেছে যে, শতকরা ৬০ জনের বুদ্ধি মাঝারি প্রকৃতির অর্থাৎ তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১০০ পর্যন্ত। এর নীচের দিকে শতকরা ২০ জন ক্ষীণবুদ্ধি বা Feeble-minded এবং উপরে শতকরা ২০ জন উন্নতবুদ্ধি বা Gifted. এরকমভাবে ক্রমশঃ নীচের দিকে যেতে যেতে নির্বোধ বা হাবা পর্যন্ত আর উপরের দিকে প্রতিভাবান পর্যন্ত যাওয়া যায়।

ক্ষীণবুদ্ধিদের আবার তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ; যথা—

**(ক) জড়ধী (Idiot) :** বুদ্ধির সোপানের সর্বনিম্নে রয়েছে এরা। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২০ থেকে ২৫ এবং মানসিক বয়স তিন থেকে পাঁচ বছরের বেশী নয়। এদের বাকশক্তি বা বোধশক্তি দুই-ই নেই বললেই চলে। নিজেদের রক্ষা করার শক্তি বা ভাল-মন্দ বিচারশক্তি কিছুই এদের নেই। জীবনে সাধারণ বিপদ এড়িয়ে চলতে এরা পারে না। এরা না পারে নিজেরা খেতে, না পারে পরতে ; খুব চেষ্টা করে সহজ কতকগুলি কাজ এদের শেখাতে পারা যায়।

**(খ) মন্দধী বা বোধহীন (Imbecile) :** এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২৬ থেকে ৫০ এবং এদের মানসিক বয়স পাঁচ থেকে আট বছরের বেশী নয়। এদের প্রকাশ-শক্তি খুব অল্প। তাছাড়া, কোন কাজ নিজের থেকে এরা করতে পারে না। তবে খুব চেষ্টা করে অভ্যাস করিয়ে দিলে এরা কোন কাজ গতানুগতিক-ভাবে করতে পারে। জড়ধীর সঙ্গে এদের পার্থক্য যে, এরা মোটামুটি জীবনের সাধারণ বিপদ এড়িতে চলতে পারে।

**(গ) ক্ষীণধী বা স্বল্পবুদ্ধি (Moron) :** ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্নদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক আছে যারা কোনরকমে দৈনন্দিন জীবন চালিয়ে নেবার মতো বুদ্ধিসম্পন্ন ; এদের স্বল্পবুদ্ধি বা Moron বলে। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০ থেকে ৭০ এবং এদের মানসিক বয়স আট থেকে এগারো বছরের অধিক হয় না, এরা মোটামুটি রকমের কাজ শিখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। তাছাড়া, এরা অল্পস্বল্প লেখাপড়া চেষ্টা করে শিখতে পারে। কোন নতুন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি-বিধান করা বা কোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে এরা পারে না।

**ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষা (Education of the feeble-minded) :** বুদ্ধি পরিমাপের ফলে যাদের ক্ষীণবুদ্ধি বলে গণ্য করা হয়, তারা স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ের মতো শিক্ষা গ্রহণে অপারগ। গতানুগতিক শিক্ষায় এসব ক্ষীণবুদ্ধিরা ছিল অবহেলিত। আধুনিক ব্যক্তিমুখী শিক্ষা ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। এদের গ্রহণ ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুসারে বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে করা হয়েছে। আমাদের দেশেও বেসরকারী উদ্যোগে এসব অবহেলিত মানবসন্তানদের জন্য কিছু কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়েরা ভাষা বা বিষয়জ্ঞানে বিশেষ কোন পারদর্শিতা লাভ করতে পারে না। বিশেষ শিক্ষার দ্বারা এদের ইন্দ্রিয়শক্তির উৎকর্ষ সাধন ও

পরনির্ভর না হয়ে যাতে নিজের কাজ নিজে করতে পারে এজন্য কতকগুলি আচরণে অভ্যস্ত করা হয়। সাধারণতঃ ক্ষীণবুদ্ধিদের জন্য বিশেষ বিত্থালয়ের (Special school) ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে বলেন, বিশেষ বিত্থালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে এদের সঙ্গে স্বাভাবিক শিশুদের সহজ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। এজন্য সাধারণ বিত্থালয়ে ক্ষীণবুদ্ধিদের জন্য বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করাই উচিত।

সে যা হোক, ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অনিবার্য না হলেও অপরাধ-প্রবণতার নিকট সম্পর্কে বর্তমান। ক্ষীণবুদ্ধিরা সাধারণতঃ পরনির্ভর, এরা প্রায়ই দুষ্কৃতি পরায়ণ সমাজবিরোধীদের প্রভাবে পড়ে অসামাজিক হয়ে ওঠে। ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষাব্যবস্থায়, এদের সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত করার চেষ্টার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(vi) **উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক:** উন্নতবুদ্ধিসম্পন্নদের মধ্যে প্রথম পর্যায়কে আমরা উজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্ন (Bright) বলি। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১১০ থেকে ১২০ এবং মানসিক বয়স ১৬ থেকে ২০। এর পরে রয়েছে বিশেষ উজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্ন (very bright)। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ থেকে ১৪০ এবং মানসিক বয়স ২০ থেকে ২২। এর উপর প্রতিভাবান (Genius) আছে যার সংখ্যা কম। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০ থেকে ১৬০ এবং মানসিক বয়স ২২ থেকে ২৪। সর্বোপরি অতিমানব বা Superman যার সংখ্যা খুবই বিরল। প্রতিভাবান এবং অসাধারণ প্রতিভাবান (Extraordinary genius) ব্যক্তিদের বুদ্ধির ক্রিয়ায় মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয়। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৬০-এর উর্ধ্বে এবং মানসিক বয়স ২৪ এর উপর।

**উন্নতবুদ্ধিদের শিক্ষা** (Education of the gifted children):

ক্ষীণবুদ্ধিরা যেমন স্বাভাবিক শিশুর চাইতে কমবুদ্ধিসম্পন্ন, তেমনি উন্নত-বুদ্ধিরা স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের চাইতে অধিক বুদ্ধির অধিকারী। এদের মানসিক চাহিদা ও শক্তি, মননশীলতা, উপলব্ধির ক্ষমতা অপরিসীম। এদের উপযুক্ত শিক্ষা সাধারণ বিদ্যালয়ে সম্ভব নয়। উন্নত মানের শিক্ষা-প্রদানের জন্য এদের জন্যও বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। ইলংণ্ডের অনুকরণে আমাদের দেশেও উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়ের জন্য পাব্লিক বিদ্যালয় বর্তমান।

উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়ের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় প্রবর্তন না করে সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করার অনেকেই পক্ষপাতী। তার কারণ,

উন্নতবুদ্ধিরা সমাজের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসামাজিক হয়ে ওঠে এবং অসঙ্গত শ্রেষ্ঠত্ববোধ ওদের মনে সৃষ্টি হয়। নিজেকে স্বাভাবিক মানুষের চাইতে উন্নত ভেবে তারা একটি সামাজিক দূরত্ব (social distance) সৃষ্টি করে।

(v) **প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধ্যঙ্ক** (The I.Q. of Adults) : যেহেতু বুদ্ধি-অভীক্ষকদের মতে ১৬ বছরের পর ব্যক্তির মানসিক বয়স (mental age) আর বাড়ে না, অথচ তার প্রকৃত বয়স (chronological age) বাড়তে থাকে, সেহেতু সাধারণ নিয়মানুযায়ী যদি প্রাপ্তবয়স্কের বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করা হয় তাহলে তার বুদ্ধ্যঙ্ক ক্রমশঃ কমতে থাকবে। অর্থাৎ ৪০ বৎসর বয়সে একজন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক তার ২০ বৎসর বয়সের বুদ্ধ্যঙ্কের অর্ধেক হবে। এইভাবে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করতে গেলে ক্রমশঃ দেখা যাবে যে, ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক মন্দধী বা বোধ-হীনের (Imbecile) বুদ্ধ্যঙ্কের পর্যায়ভুক্ত হবে। এই কারণে প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করার সময়ে তাদের প্রকৃত বয়সের কোন পরিবর্তন না করে সকল ক্ষেত্রেই তাকে ১৬ বৎসর ধরে নিয়ে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ, একজন প্রাপ্তবয়স্কের, যার বয়স ১৬ বৎসর বা তার উর্ধ্বে তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে—

$$\frac{\text{M.A.}}{১৬} \times ১০০ =$$

বুদ্ধি-অভীক্ষকদের মতে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মানসিক বয়স, ১৬, অস্বভাবীদের ৩ থেকে ১৬ এবং প্রতিভাবানদের ২০ থেকে ৩২ পর্যন্ত হতে পারে।

তবে এই ভাবে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করার পদ্ধতি অনেকে সমর্থন করেন না। কারণ যদিও সাধারণতঃ ধারণা করা হয় যে, মানসিক শক্তি মধ্যবয়স পর্যন্ত বাড়তে থাকে এবং বৃদ্ধ বয়সেই কমতে থাকে। বুদ্ধি-অভীক্ষার সাফল্যাঙ্ক (Intelligence Test Score) থেকে জানা যায় যে, মানসিক শক্তি ২০ বা ২৫ বছর বয়স থেকেই কমতে থাকে এবং এই কমা ক্রমিক ভাবে এবং একই গতিতে (gradual but steady) চলতে থাকে। ১৩, ২৩, ৪৫ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে পরীক্ষকরা যেসব পরীক্ষণকার্য চালিয়েছেন তার দ্বারাই এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়েছে। সুতরাং, যেহেতু প্রাপ্তবয়স্কের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সাফল্যাঙ্ক কমতে থাকে, সেহেতু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধ্যঙ্ক ক্রমশঃ কমতে থাকবে এরূপ অনুমান

করা হয়। ২০ বা ৪০ বৎসর বয়সে তার সাফল্যাঙ্ক যা হয়েছিল ৬০ বৎসরে তা হবে না। এই কারণে ব্যক্তিকে তার সমবয়সী অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনা করে তার বুদ্ধ্যাঙ্ক নির্ধারণ করা হয়। এই বুদ্ধ্যাঙ্ক নির্ধারণ করার পদ্ধিতিটুকু এবার বুঝে নেওয়া যাক: ধরা যাক, ৬০ বৎসর বয়সী একদল লোকের উপর বুদ্ধি-অভীক্ষা প্রয়োগ করে তাদের সাফল্যাঙ্কের গড় নির্ধারণ করা হল। এই গড়কে ১০০ বুদ্ধ্যাঙ্কের সমান বলে ধরে নিতে হবে এবং তারপর সেই সাফল্যাঙ্কের গড়ের সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের সাফল্যাঙ্কের মানের ব্যবধান কি পরিমাণ তা নির্ধারণ করতে হবে। একেই বলা হয় Standrad Deviation Score বা সংক্ষেপে S.D. score।[1] যেহেতু সাফল্যাঙ্কের গড়কে ১০০ বুদ্ধ্যাঙ্কের সমান ধরে নেওয়া হয়েছে, সেহেতু ব্যক্তি বিশেষের বুদ্ধ্যাঙ্কের ব্যবধানটুকু অনুমান করে নেওয়া যাবে। এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী; কেননা, কোন মনোবিদ্‌ই একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে প্রমাণ করতে চান না, যদিও তার সমবয়সী লোকের বুদ্ধির গড়ের অনুপাতে তার বুদ্ধি কোন অংশে কম নয়।

S.D. Score

তবে অনেক মনোবিদ্‌ মনে করেন যে, বুদ্ধি-অভীক্ষায় প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের ভিত্তিতে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের বুদ্ধ্যাঙ্কের যথাযথ পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কেননা, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি যে বুদ্ধি-অভীক্ষায় তেমন ভাল ফল দেখাতে পারে না তার কারণ কেবলমাত্র দৈহিক দুর্বলতা ও ইন্দ্রিয়গত ত্রুটি-বিচ্যুতি নয়, যুবকদের তুলনায় বৃত্তিগত এবং শিক্ষাগত তারতম্যও এর জন্য দায়ী। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কোন এক বিশেষ বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকার জন্য সে সম্পর্কেই দক্ষতা অর্জন করেন। বয়সের জন্য কাজকর্ম চটপট করার অভ্যাস তাদের থাকে না এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য এই সব পরীক্ষার প্রতি তাঁরা কম আগ্রহ প্রকাশ করেন বা তেমন সহযোগিতা দেখাতে চান না।

## ১৩। বুদ্ধির বণ্টন (Distribution of Intelligence):

বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির আসল তাৎপর্য হল, কোন এক ব্যক্তির বুদ্ধির সঙ্গে অপর ব্যক্তির বুদ্ধির তুলনা করা বা কোন ব্যক্তির বুদ্ধিকে তার সমবয়সী

1. "The individual's S.D. score is his distance above or below the average, measured in terms of the S.D as a unit......The SD score shows exactly where the individual stands in the group as a whole."

—Woodworth : Psychology ; Page 61.

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা। ছয় বছরের একটি ছেলে কতখানি বুদ্ধিমান তা আমরা নির্ধারণ করি অন্য একটি ছয় বছরের ছেলের বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করে। অনুরূপভাবে একজন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি কতখানি বুদ্ধিমান তা আমরা পরিমাপ করি সাধারণ পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধির সঙ্গে তার বুদ্ধির তুলনা করে। আমরা কোন বিশেষ ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের সঙ্গে সাধারণের বুদ্ধ্যঙ্কের তুলনা করে বুঝতে পারি সে কতখানি বুদ্ধিমান।

**বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির তাৎপর্য হল কোন ব্যক্তির বুদ্ধির সঙ্গে সমবয়সী ব্যক্তির বুদ্ধির তুলনা করা**

সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধি বণ্টন কি ভাবে হয়েছে তা আমাদের জানা উচিত। শিশুদের উপর বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তার উপরই আমাদের বিশেষ করে নির্ভর করতে হবে; কেননা, পরিণত বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের ক্ষেত্রে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে যথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমেরিকায় ২ থেকে ১৮ বছরের প্রায় ২৯০০ জন ছেলেমেয়ের উপর পরীক্ষণকার্য চালিয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার থেকে জানা যায় যে, অধিকাংশ ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১০৯ পর্যন্ত। ১৪০ এবং তার উর্ধ্বে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তারা হল প্রতিভাবান শ্রেণীভুক্ত এবং ৭০-এর নীচে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তারা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন (Feeble minded)।

নিচের ছকটি লক্ষ্য করলে জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধি বণ্টনের শতকরা হার কত জানা যাবে:

| বুদ্ধ্যঙ্ক | জনসাধারণের শতকরা হার |
|---|---|
| ১৪০ ও তার উর্ধ্বে | ১ |
| ১৩০ — ১৩৯ | ২ |
| ১২০ — ১২৯ | ৮ |
| ১১০ — ১১৯ | ১৬ |
| ১০০ — ১০৯ | ২৩ |
| ৯০ — ৯৯ | ২৩ |
| ৮০ — ৮৯ | ১৬ |
| ৭০ — ৭৯ | ৮ |
| ৬০ — ৬৯ | ২ |
| ৬০-এর নিচে | ১ |

উপরের তালিকা থেকে জানা যায় যে, শতকরা ৪৬ জনের (২৩+২৩)' বুদ্ধি মাঝারি এবং তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১০৯-এর

মধ্যে, এটিই হল বুদ্ধির গড়পড়তা পরিসর (average range of intelligence)।

কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের প্রকৃত তাৎপর্য তখনই বোঝা যাবে যদি জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্কের বণ্টন জানা যায়। যেমন, যদি আমরা জানি যে কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-এর উর্ধ্বে, তাহলে আমরা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারব যে লোকটি স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কিছু উপরে। অনুরূপভাবে যদি জানা যায় কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০, তাহলে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন, আবার যদি জানি যে কারও বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-এর কম, তাহলে বুঝব যে, সে ব্যক্তি স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নীচে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কতটা উপরে বা কতটা নিচে, তা কি ভাবে বুঝব? যদি কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ১৩০ হয় তাহলে কি মনে করব লোকটি প্রখর বুদ্ধিশালী আবার কারও বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ হয় তাহলে সে কি একেবারে নির্বোধ? কেবলমাত্র বুদ্ধ্যঙ্ক জানা থাকলে এর উত্তর দেওয়া যাবে না। আমাদের বুদ্ধির গড়পড়তা বিস্তার এবং জনসাধারণের মধ্যে কি ভাবে বুদ্ধি বণ্টিত হয়েছে তা জানতে হবে। যদি বলা হয় কারও বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০, তাহলে বুঝতে হবে যে জনসাধারণের শতকরা (১+২=৩) ৩ ভাগ লোক তার থেকেও কম বুদ্ধিসম্পন্ন। আবার যদি বলা হয় কারও বুদ্ধ্যঙ্ক ১৩০, তাহলে বুঝতে হবে জনসাধারণের শতকরা ৩ জন (১+২) তার থেকে বেশী বুদ্ধিমান।

কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের প্রকৃত তাৎপর্য জানা যায় যদি জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্কের তাৎপর্য জানা যায়

## ১৪। বুদ্ধি এবং আচরণ (Intelligence and Conduct):

মানুষের বুদ্ধির এবং তার আচরণের মধ্যে যে একটা গভীর সম্বন্ধ আছে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা তার অনেক প্রমাণ পেয়ে থাকি। বস্তুতঃ, মানুষের বুদ্ধি তার আচরণের মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশ করে। বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে মানুষের আচরণের মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতিভাশালী ব্যক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের আচরণ তাদের শাণিত বুদ্ধির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। যাদের আচরণ সঙ্গতিপূর্ণ, সৃষ্টিধর্মী, গঠনমূলক তাদের বুদ্ধি যে উন্নত স্তরের এ আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অপরপক্ষে, যারা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন, যেমন—জড়ধী (Idiots), অল্পধী বা বোধহীন (Imbeciles) এবং ক্ষীণধী বা অল্পবুদ্ধি (Moron)—তাদের

মানুষের বুদ্ধি তার আচরণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়

বুদ্ধির আচরণ অনুসারে মানুষের আচরণের তারতম্য

স্বাভাবিক বুদ্ধির মান নিম্নস্তরের এবং সেহেতু তাদের আচরণের মধ্যে নানারকম অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, যারা জড়ধী তারা জীবনের স্বাভাবিক বিপদ থেকেও নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। জীবনের বহু বিচিত্র সমস্যার সমাধানে বুদ্ধিই মানুষকে সহায়তা করে। এ কারণে কোন ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাণ আমাদের জানা থাকলে আমরা তার আচরণ সম্পর্কে মোটামুটি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। যেসব ব্যক্তির বুদ্ধির মান স্বাভাবিক স্তরের নিম্নে তারা জটিল সমস্যা সমাধানে অপারগ হয়, পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে পারে না, নতুন নতুন বিষয় শিক্ষা করতে পারে না বা কোন উদ্দেশ্য-সাধন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়গুলি অবলম্বন করতে পারে না।

**অপরাধতত্ত্বের ক্ষেত্রে বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োগ**

সাম্প্রতিককালে অপরাধতত্ত্বের ক্ষেত্রে বুদ্ধি অভীক্ষাগুলিকে প্রয়োগ করে বুদ্ধির সঙ্গে আচরণের সম্পর্ক নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির স্বল্পতাই ব্যক্তির অপরাধমূলক আচরণের অন্যতম কারণ। বিশেষ করে যারা স্বল্পবুদ্ধি (Moron), তাদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতার সম্ভাবনার কথা মনোবিদ্‌রা বলে থাকেন। তবে বুদ্ধির স্বল্পতাই অপরাধের একমাত্র কারণ বলা যেতে পারে না। কতকগুলি বিশেষ ধরনের অপরাধ সম্পন্ন করার জন্য যে উন্নত ধরনের বুদ্ধির প্রয়োজন হয় তা অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

**সহজাত বুদ্ধির সঙ্গে কাজের সঙ্গতি আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে**

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুর বুদ্ধি অনুযায়ী যদি তাকে কাজ করতে দেওয়া না হয়, তাহলে তার আচরণের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। যদি খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুকে কোন সহজ কাজ করতে দেওয়া হয় তাহলে কাজটি অল্প সময়ে সম্পন্ন করার পর, অবসর সময় সে অসামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োগ করে। আবার অপরপক্ষে, কোন স্বল্প-বুদ্ধিবিশিষ্ট শিশুকে যদি খুব কঠিন কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে সে সেটি করতে পারে না এবং সকলের কাছ থেকে উপেক্ষা ও ভর্ৎসনা লাভ করার জন্য তার মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা দেখা দেয়। কাজেই সহজাত বুদ্ধির সঙ্গে কাজের সঙ্গতি কি শিশু, কি পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি সকলের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

তবে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের আচরণ কেবলমাত্র তার বুদ্ধির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, আবেগ, দৈহিক শক্তি, শিক্ষা মানুষের আচরণকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে।

অপরদিকে মানুষের আচরণের উপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও কম নয়। সমাজের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার, নৈতিক আদর্শ সব কিছুই মানুষের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং কেবলমাত্র বুদ্ধি-প্রণোদিত হয়েই মানুষ আচরণ করে, এ কথা বলা যেতে পারে না। অবশ্য ব্যক্তির চরিত্রের গঠন ও বিকাশের মূলে বুদ্ধির অবদানকে সুস্পষ্টভাবেই স্বীকার করে নিতে হয়। আচরণের মাধ্যমেই ব্যক্তি-চরিত্রের প্রকাশ। যে ব্যক্তি বুদ্ধির সাহায্যে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের তাৎপর্য উপলব্ধি করে নিজের আচরণের সঙ্গে তার সঙ্গতিসাধনে সচেষ্ট হয় এবং বুদ্ধির সাহায্যে তার বিভিন্ন শক্তিকে সুসংহত করতে পারে; তার চরিত্র যে সুগঠিত হয় সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং বুদ্ধির সঙ্গে মানুষের আচরণের গভীর সম্পর্ককে কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না।

মানুষের আচরণ কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না

## ১৩। বুদ্ধি এবং অপরাধপ্রবণতা (Intelligence and Delinquency) :

'ডেলিংকোয়েন্সী' শব্দটির বাংলা অর্থ 'দুষ্ক্রিয়তা', 'অপরাধ,' বা 'অপকর্ম'। কিন্তু আসলে 'ডেলিংকোয়েন্সী' শব্দটির দ্বারা আমরা বুঝি শিশু অপরাধ-প্রবণতা। সিরিল বার্টের (*Cyril Burt*) মতে যখন কোন শিশুর মধ্যে অসামাজিক প্রবণতা দেখা দেয় এবং এমনভাবে দেখা দেয় যে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় তখন তাকে অপরাধী বলা যেতে পারে। সামাজিক অপরাধও বিচিত্র ধরনের। নরহত্যা, প্রতারণা, চৌর্যবৃত্তি, যৌন অপরাধ, মিথ্যা বলা, কলহ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, আত্মহত্যার প্রচেষ্টা সবই সামাজিক অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। যেসব অসামাজিক কাজের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের শাস্তি বা দণ্ড দেওয়া হয়, সেসব কর্ম করার জন্য শিশু বা কিশোরদেরও অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। তবে তাদের ক্ষেত্রে বয়সের একটা বিশেষ প্রশ্ন এসে পড়ে; যে জন্য বয়সের তারতম্য অনুযায়ী শাস্তির মাত্রা ও প্রকারের তারতম্য ঘটে থাকে।

সিরিল বার্ট-এর অভিমত

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি প্রচলিত হবার পর পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির এবং কিশোরদের অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে বুদ্ধির কতখানি সম্বন্ধ আছে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা প্রথম অবস্থায় দেখা

গেল যে বেশির ভাগ অপরাধীই ক্ষীণবুদ্ধি, কিন্তু বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে পূর্ব ধারণা পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দিল। বস্তুতঃ দেখা গেল যে, অপরাধীদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনেরই ক্ষীণবুদ্ধি, বেশীর ভাগ স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বেশ কয়েকজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। তবে বেশীর ভাগেরই বুধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৯০ এর মধ্যে। অবশ্য কিশোর অপরাধীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ক্ষীণবুদ্ধি এবং পরিণতবয়স্ক অপরাধীর বুদ্ধির মান কিশোর অপরাধীদের বুদ্ধির মানের তুলনায় অধিক। ইংল্যাণ্ডে স্যার সিরিল বার্ট কিশোর-অপরাধপ্রবণতা সম্পর্কে যে ব্যাপক গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন তার দ্বারাও পূর্বোক্ত তথ্য অনেকাংশে সমর্থিত। বার্টের মতে অপরাধের যতরকম মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে তার মধ্যে একটি হল ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতা (defective mind)। যদি কোন বালকের বয়স দশ হয় এবং মানসিক বয়স সাত হয় তাহলে তাকে ত্রুটিপুর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন বালক বলা যেতে পারে। তবে এ জাতীয় ব্যক্তিরা একেবারে জড়ধী (Idiot) এবং বোধহীনের (Imbecile) অন্তর্ভুক্ত নয়। বার্টের মতে কিন্তু অধিকাংশ অপরাধী ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন। বার্ট বলেন, "ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন বালকের মধ্যে সেই প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টির অভাব আছে যার দ্বারা সে নিজেই প্রত্যক্ষ করতে পারে বা নিজের মনে দৃঢ়ভাবে ধারণা করতে পারে যে, যা তাকে প্রলোভিত করে তা অসাধু এবং অসাধুতা খারাপ।"[1] অন্য কথায়, বুদ্ধিহীন হয়ে যারা জন্মায় তারা অপরাধমূলক আচরণ করে। কারণ অপরাধ হল বোকার মতো নিজের উদ্দেশ্য লাভ করা। রেক্স এণ্ড নাইট (*Rex and Knight*) এই প্রসঙ্গে বলেন, "অপরাধ এবং বুদ্ধির স্বল্পতার মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তা এমন বিস্ময়জনক কিছু নয়; কেননা, যেখানে বুদ্ধির অভাব সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ চরিত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।[2]

অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ

ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতা

1 "The defective child is without the necessary insight to perceive for himself, or to hold effectively in his mind, that tempts him is dishonest and that dishonesty is wrong."

—Burt : The Young Delinquent : Page 301

2. "The connexion between crime and low degree of intelligence is not surprising, because where intelligence is lacking, it is impossible to establish a self-controlled and well organised character."

—Rex and Knight : Intelligence and Intelligence Tests ; Page 89.

বার্টের মতে অপরাধীদের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন দু-একজন দেখা গেলেও কেবলমাত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধিই অপরাধের কারণ নয়। বিশেষ পরিবেশে তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাকে অপরাধমূলক কার্য-সম্পাদনে সহায়তা করে মাত্র। তাঁর মতে অপরাধ প্রবণতার মূলে একাধিক কারণ বর্তমান। অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ, মাতাপিতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব, শিশুর প্রতি মাতাপিতার বিরূপ মনোভাব, কুসঙ্গ, অত্যধিক উত্তেজনা ও আবেগ-প্রবণতা, দারিদ্র্য, শারীরিক ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রভৃতি কারণ অপরাধের মূলে বর্তমান। অপরদিকে নিকৃষ্ট বংশগতিও ব্যক্তির স্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে অপরাধপ্রবণ করে তুলতে পারে।

বার্ট, রেক্স এবং নাইট-এর অভিমত

উডওয়ার্থের[1] মতেও কিশোর-অপরাধ-প্রবণতা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের অপরাধ-প্রবণতার মূলে কোন একটি বিশেষ কারণ, যেমন—ক্ষীণবুদ্ধি, আবেগজাত অস্থিরতা, দারিদ্র্য বা চারপাশের নিকৃষ্ট পরিবেশ রয়েছে বলা যেতে পারে না। কোন বিশেষ সময়ে এটা বা ওটা, কোন একটি বিশেষ বিষয়ের প্রভাব অধিকমাত্রায় দেখা যায়। কোন যুবতী নারী গৃহে লাঞ্ছিত বা উপেক্ষিত হওয়ার জন্য যৌন অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হয়। কোন বালক দুঃসাহসিক কার্য করার জন্য এত বেশী ঝুঁকে পড়ে যে, পাড়ার কুসঙ্গে মিশে অসামাজিক কাজে নিজেকে লিপ্ত করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র বুদ্ধির অভাবকেই অপরাধের কারণ বলে নির্দেশ করা যায় না। অপরাধের একাধিক কারণের মধ্যে ক্ষীণবুদ্ধি হওয়া অন্যতম কারণ। যারা ক্ষীণবুদ্ধি তাদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতার সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু বুদ্ধির অভাবের সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার কোন অনিবার্য সম্বন্ধ নেই।

উডওয়ার্থ-এর অভিমত

## ১৬। বুদ্ধি ও বৃত্তি (Intelligence and Occupation):

বুদ্ধি এবং বৃত্তির মধ্যে যে একটা পারস্পরিক সংযোগ আছে তা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। যে-কোন ব্যক্তিই যে-কোন বৃত্তিতে সফলতা অর্জন করতে পারে না। যেসব ব্যক্তির বুদ্ধি অত্যন্ত অল্প তাদের পক্ষে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থেকে নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করা খুবই কঠিন। কোন ক্ষীণবুদ্ধির পক্ষে শাসন-সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। জড়ধী কোন বৃত্তিরই উপযুক্ত নয়। ক্ষীণবুদ্ধি যারা, তারা গতানুগতিক পেশায় নিযুক্ত হয়ে কোন কাজ যান্ত্রিকভাবে করতে

বুদ্ধি ও বৃত্তির পারস্পরিক সংযোগ

1. Woodworth: Psychology; Page 131.

পারে। যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক, তারা স্বাভাবিক বৃত্তিতে, যাতে বিশেষ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই, তার পক্ষে উপযুক্ত। আর যারা প্রতিভাবান তারা সেই সব পেশায় উপযুক্ত যাতে সৃজনীশক্তি বা কল্পনার মৌলিকতা দেখানর প্রয়োজন।

বুদ্ধি ও বৃত্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ

সাম্প্রতিককালে বুদ্ধি এবং বৃত্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করার জন্য মনোবিদ্‌গণ সচেষ্ট হয়েছেন এবং বিভিন্ন বুদ্ধি অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে তাঁরা বুদ্ধি এবং বৃত্তির মধ্যে যে প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েছেন। দেখা গেছে যে, কোন বৃত্তিতে সফলতা অর্জন করতে হলে, একেবারে খুব কম করেও কিছু পরিমাণ বুদ্ধিগত সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, কোন বৃত্তিতে সাফল্য অর্জন করার জন্য সেই বৃত্তির প্রয়োজন অনুযায়ী বুদ্ধির একটা সর্বনিম্নমান স্বীকার করে নিতে হবে। কোন ব্যক্তির বুদ্ধির মান যদি সেই বৃত্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় যে সর্বনিম্ন মান, তারও নীচে থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি সেই বৃত্তির উপযোগী নয়, এমন কথা বলা যেতে পারে।

মনোবিদ্ উডওয়ার্থ-এর মতে সাধারণ কেরানীর কাজে মোটামুটি কাজ চালিয়ে যাবার জন্য এমন লোকের প্রয়োজন যার মানসিক বয়স অন্ততঃপক্ষে কম করে দশ বৎসর। অবশ্য উচ্চস্তরের কেরানীর কাজে এই মানসিক বয়সের নিম্নতম হার আরও বেশি। অনেক সময় কোন কোন মাতাপিতা তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করেন, যদিও ছেলেটির বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-র বেশি নয়। ছেলেটি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও মাতাপিতার প্রত্যাশা সবটুকু পূর্ণ করতে পারে না। অবশ্য ব্যক্তি যদি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের বৃত্তি নির্বাচন করে, তাহলে তাঁর বৃত্তির সঙ্গে তার বুদ্ধিগত সামর্থ্যের একটা সঙ্গতি থাকে এবং নিজ বৃত্তিতে সফলতা অর্জনের পথে কোন অন্তরায় দেখা দেয় না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন

কোন বিশেষ বৃত্তিতে সাফল্যলাভের জন্য বুদ্ধি ছাড়া আরও অনেক গুণের প্রয়োজন

বিশেষ বৃত্তিতে সাফল্যলাভের জন্য শুধু বুদ্ধিই যে প্রয়োজন আছে তা নয়, বুদ্ধি ছাড়াও অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণগুলির প্রয়োজন। রেক্‌স এবং নাইট (*Rex and Knight*) বলেন, "যেকোন বৃত্তির জন্য কি পরিমাণ বুদ্ধির দরকার তা নির্ভর করে

কেবলমাত্র সেই বৃত্তি বা বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপর নয়, কোন বিশেষ সময়ে সেই বৃত্তিতে কতখানি প্রতিযোগিতা আছে তার উপর।"[1]

বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিতে যেসব ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন তাঁদের গড়পড়তা বুদ্ধির হার বা বুদ্ধ্যঙ্ক কত সে সম্পর্কে মনোবিদ্‌রা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, যারা বুদ্ধিজীবী, যেমন—হিসাব-রক্ষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, লেখক তাদের গড়পড়তা বুদ্ধ্যঙ্ক বেশী এবং কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি অদক্ষ কারিগরদের বুদ্ধ্যঙ্ক সবচেয়ে কম। মনোবিদ্ উডওয়ার্থের মতে, "গড়পড়তা হিসেবে দেখা গেছে, বুদ্ধির পরীক্ষায় স্বাধীন ব্যবসায়ীদের সাফল্যাঙ্ক সবচেয়ে বেশি। হিসেব-রক্ষক ও কেরানীদেরও সাফল্যাঙ্ক বেশ উপরের দিকে, দক্ষ কারিগরদেরও মোটামুটি উপরের দিকে, তবে অদক্ষ কারিগরদের স্থান একেবারে নিচের দিকে।"[2] রেক্স এবং নাইটও (*Rex and Knight*) পূর্বোক্ত অভিমত সমর্থন করেন।[3]

বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তির গড়পড়তা বুদ্ধির হার

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন মনোবিদ্ উডওয়ার্থ। বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির গড় কত? এ সম্পর্কে যেসব গবেষণা করা হয়েছে এবং তার ফলে যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার থেকে জানা যায়, ব্যবসায়ী এবং শাসনবিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দের ছেলেমেয়েরা বুদ্ধির পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে এবং অশিক্ষিত দিনমজুর শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা বুদ্ধির পরীক্ষায় সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করে।

টারম্যান এবং মেরিল (*Terman and Merrill*) আমেরিকার লোকদের উপরে এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যে ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন তা পরপৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল।[4]

1. Rex and Knight : Intelligence and Intelligence Tests ; Page 79.
2. "On the average, to be sure, professional men score the highest in intelligent test, book-keepers, and clerks rather high, mechanics fairly high, unskilled labourers the lowest."—Woodworth : Psychology ; Page 129.
3. .........in respect of average intelligence, the professions were at the top and unskilled manual occupations at the bottom."
—Rex and Knight : Intelligence and Intelligence Tests. Page 79.
4. —Garret : Great Experiments in Psychology ; Page 256,

পিতার বৃত্তি অনুসারে সন্তানের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় ঃ

| পিতার বৃত্তি | সন্তানের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় |
|---|---|
| ১। স্বাধীন ব্যবসায়ী বা পেশাদার (professicnal) | ১১১·৬২ |
| ২। আধা-পেশাদার এবং পরিচালনা সম্পর্কীয় (Semi-Professional and managerial) | ১১১·৯ |
| ৩। কেরানীবৃত্তি, দক্ষ-ব্যবসাদার, খুচরা ব্যবসাদার (Clerical, skilled trades, retail business) | ১০৭·৫ |
| ৪। অর্ধ-দক্ষ, সামান্য কেরাণী, সামান্য ব্যবসায়ী (Semi-skilled, minor clerical and business) | ১০৫·০ |
| ৫। যৎসামান্য দক্ষ এবং অদক্ষ (Slightly skil'ed and un-skilled) | ৯৭·২ |
| ৬। গ্রাম্য-স্বত্বাধিকারী (Rural owners) | ৯৫·১ |

অবশ্য পূর্বোক্ত তালিকাতে বুদ্ধ্যঙ্কের গড়ের কথাই বলা হয়েছে। এর যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না, তা নয়। শাসনবিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দের কোন সন্তান অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে, আবার কোন দিনমজুরের সন্তানও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সন্তানের বুদ্ধি নির্ধারণ করার ব্যাপারে পিতার বৃত্তি কোন একটি মুখ্য উপাদান নয়। তবে একান্তই কেন পিতার বৃত্তিকে একটি উপাদানরূপে গণ্য করা হয়? এর উত্তরে কেউ কেউ পরিবেশগত প্রভাব এবং বংশগত প্রভাব উভয়েরই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা খুবই মুশকিল। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে বংশগত এবং পরিবেশের প্রভাব সংমিশ্রিত হয়ে থাকে, সেহেতু কোন্ সন্তানের বুদ্ধি কতটা বংশগত, কতটা পরিবেশগত প্রভাবের ফল তা বলা মুশকিল।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধি এবং বৃত্তির মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে। যে ব্যক্তি যে বৃত্তিতে নিযুক্ত যদি সেই বৃত্তির উপযোগী বুদ্ধি তার মধ্যে থাকে, তাহলে সেই বৃত্তিতে সে সফলতা লাভ করতে পারে। সুতরাং কোন্ ব্যক্তি কোন্ বৃত্তির জন্য উপযুক্ত বা সেই বৃত্তির প্রয়োজনীয় নিম্নতম বুদ্ধির পরিমাণ তার আছে কিনা তা নির্ধারণ করা গেলে বৃত্তির জন্য উপযুক্ত লোক নির্বাচনে সুবিধা হয়। কোন্ বৃত্তিটি কার পক্ষে উপযোগী তা নির্ধারণ করার জন্য সাধারণ বুদ্ধি-পরীক্ষা

**বুদ্ধি ও বৃত্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে**

(General Intelligence Test), বিশেষ বুদ্ধি-পরীক্ষা (Special Ability Test) এবং অন্যান্য পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির বুদ্ধির মান, বিশেষ ক্ষমতা, প্রবণতা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগৃহীত হলে, ব্যক্তিকে তার উপযোগী বৃত্তিতে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়। তার ফলে যেমন উচ্চস্তরের কাজের জন্য উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকেই নির্বাচন করা সম্ভব হবে তেমনি অপরদিকে অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে তার অনুপযোগী বৃত্তিতে নির্বাচিত না করে, শ্রম, সময়, অর্থের অযথা অপচয় নিবারণ করা সম্ভব হবে।

## প্রশ্নাবলী

1. What are Intelligence Tests ? What are their uses ? Describe any standardised Intelligence Tests and indicate how it measure intelligence.

Ans. ( পৃ: ৩৭২-৭৪, ৩৮৩ ৮৪ —পৃ: ৩৮৮-৮৯ )

2. Explain in detail the nature of intelligence and indicate the uses of intelligence tests. [ C. U. 1963

Ans. ( পৃ: ৩৬৯-৭১—পৃ: ৩৮৩-৮৪ )

3. Describe any Intelligence Test and show how it measures intelligence. How are intelligence tests useful to a teacher ?

Ans. ( পৃ: ৩৭২-৭৪ —পৃ: ৩৯০-৯১, এবং ৩৮৩-৮৫ )

4. Describe any test of intelligence that you are familiar with and indicate the uses of intelligence tests in school. [ C. U. 1966

Ans. ( পৃ: ৩৭২-৭৪ পৃ: ৩৮৩-৮৫ )

5. Analyse the concept of Intelligence. How can you measure intelligence ? Discuss the practical uses of such measurement.

Ans ( পৃ: ৩৬৯-৭১—পৃ: ৩৯০-৯১ )

6. What are intelligence tests ? Show your acquaintance with any one of them. [ C. U. 1968

Ans. ( পৃ: ৩৭২-৭৪ )

7. What are intelligence tests ? How do they differ from scholastic tests ?

Ans. ( পৃ: ৩৭২-৭৪—পৃ: ৩৮১-৮৩ )

8. Elucidate clearly the meaning of I. Q. and M. A. Classify the different intelligence tests and point out their usefulness. [ C. U. 1969

Ans. ( পৃ: ৩৯০-৯১—পৃ: ৩৬৯-৭১. )

9. What is intelligence test? Why are some psychologists in favour of using the name 'Scholastic Aptitude Tests' instead of Intelligence Test?

Ans. ( পৃ· ৩৭২-৭৪—পৃ: ৩৮১-৮৩ )

10. What is intelligence? How can it be measured? [ C. U. 1970

Ans. (পৃ: ৩৬৯-৭১—পৃ: ৩১০-৯১ )

11. Is I.Q. Constant? Give reasons for your answer?

Ans. ( পৃ: ৩৯০—৩৯১ )

12. Define inte'ligence and discuss the importance of intelligence tests in child-guidance and class teaching. [ C. U. 1064

Ans. ( পৃ: ৩৬৯-৭১—পৃ: ৩৮৩-৮৫)

13. What is I.Q.? How the J,Q. of an adult is determin:d?

Ans. ( পৃ: ৩৯০.৯১—পৃ: ৩৯৫-৯৬ )

14. What is the Feeble mindedness? What are its d'fferent grades? Give illustra'ions.

Ans. ( পৃ: ৩৯২—৩৯৫ )

15, What should a Teacher do for the education of the feeble mind and gifted children?

Ans. ( পৃ: ৩৯৩—পৃ: ৩৯৫ )

16. Write short notes on :—

Mental age and in'elligence quotiont. Intelligent quotient.

[ C, U, 1967, 70

# একাদশ অধ্যায়

# ব্যক্তিগত বৈষম্য

# Individual Difference

## ১। ভূমিকা (Introduction) :

মানুষের মধ্যে যেমন নানা দিক দিয়ে মিল আছে তেমনি তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রভেদও দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি বিষয়ে একটি মানুষের সঙ্গে অন্য আর একজন মানুষের অবিকল মিল কখনও দেখা যায় না। প্রতিটি মানুষের এমন কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে অন্য মানুষ থেকে প্রভেদ করে।

মানুষের মধ্যে যেমন মিল, তেমন প্রভেদও আছে

এই প্রভেদ আমরা খুব পরিষ্কার করে দেখতে পাই যখন কোন একটি শ্রেণীর সমান বয়সের ছাত্রদের চেহারা, দৈর্ঘ্য, ওজন, স্বভাব ইত্যাদি বিচার করে দেখি। বিচার করলে দেখা যাবে কেউ খুব সুপুরুষ, কেউ কুৎসিত, কেউ বা খুব লম্বা, কেউ বা বেঁটে, কেউ শক্তিমান, কেউ বা দুর্বল। আরও নানা দিক দিয়ে প্রচুর অমিল খুঁজে পাওয়া যায়—কেউ লেখাপড়ায় খুব ভাল, কেউ খারাপ, কেউ রাগী, কেউ শান্ত, কেউ বাচাল প্রকৃতির, কেউ বা গম্ভীর প্রকৃতির।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত প্রভেদের বিশেষ তাৎপর্য আছে। বর্তমানে শিশুদের শিক্ষা দেবার সময় সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে ব্যক্তিগত সামর্থ্যের ভিত্তিতে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কাজেই আমাদের সামনে দুটি সমস্যা—সামর্থ্যের পরিমাপ কিভাবে সম্ভব এবং ব্যক্তিগত সামর্থ্যের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠন কি ভাবে সম্ভব। বর্তমানে আমরা দ্বিতীয় সমস্যা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করব।[1]

দুটি সমস্যা

## ২। ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকারভেদ (Different Types of Individual Difference) :

ব্যক্তিগত বৈষম্যের বিষয়টির দিকে যদিও বিশেষ করে আধুনিক কালেই মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে, তবু বিষয়টি খুবই প্রাচীন

1, প্রথম সমস্যাটি পরবর্তী স্তরে আলোচনা করব।

প্রাচীন চিন্তাবিদ্‌রা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের কথা যে স্বীকার করেছেন তার প্রমাণ আমরা পাই প্লেটো অ্যারিস্টটল, রুশো প্রভৃতির রচনায়। প্লেটো মানুষকে তাদের মৌলিক বিভিন্নতা অনুযায়ী কয়েকটি দলে ভাগ করেছেন। গ্যাল্টন বংশগতির ভিত্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের বিষয়টি নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। বৈজ্ঞানিক ক্যাটেল স্মৃতিশক্তি, ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতা প্রভৃতির ভিত্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। আলফ্রেড জিন বুদ্ধির ভিত্তিতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের তালিকা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের বিষয়টি প্রাচীন

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নিম্নোক্তরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে :

**(ক) দৈহিক গঠন** (Physical traits) : এই বৈষম্য নানারকম হতে পারে ; যেমন—উচ্চতা বা ওজনের প্রভেদ, গায়ের রং বা মুখের গঠনের প্রভেদ, চেহারা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন জাতির দেহের গঠন বিভিন্ন প্রকার হয়। যেমন—ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়দের দৈহিক গঠনের পার্থক্য।

দৈহিক গঠন

আধুনিক যুগের মনোবিজ্ঞানীরা দৈহিক প্রভেদের বিশেষ মূল্য দেন না। তবে একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সুস্থ সবল হলে মানুষের মন সতেজ ও কর্মপ্রবণ থাকে। অ্যাডলার (*Adler*) পরীক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছেন যে শারীরিক কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি, যেমন—বিকলাঙ্গ হওয়া কিংবা অন্য কোনও শরীরগত অপূর্ণতা থাকলে সে মানুষের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ (sense of inferiority) জন্মে থাকে। এর ফলে চারিত্রিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। কিংবা কোন কোন সময় আবার চারিত্রিক উন্নতিও ঘটতে পারে। দেহের একটি দিকের ত্রুটি পূরণ করার জন্য ব্যক্তি অপর কোন গুণের উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট হয়।

**(খ) মানসিক গঠন** (Mental traits) : বুদ্ধি, বিশেষ সামর্থ্য বা ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, ইন্দ্রিয়বোধের তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে এই প্রভেদ দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধিবিষয়ে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে নানা প্রকারের অভিজ্ঞতার সাহায্যে বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। বুদ্ধির এই পরিমাপকে বুদ্ধ্যঙ্ক বা *Intelligent Quotient* বলে। সংক্ষেপে এটিকে *I. Q.* বলা হয়।

মানসিক গঠন

যেসব মানুষ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের $I. Q$ বা বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১০৯-এর মধ্যে ধরে নেওয়া হয়। যার $I. Q.$ তার থেকে বেশী তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান, আর যার কম তাকে কম বুদ্ধিমান বলে ধরে নেওয়া হয়। কতকগুলি বিভিন্ন ধরনের মানুষের বুদ্ধ্যঙ্ক নিয়ে দেখা গেছে যে শতকরা ৬০ জনের বুদ্ধি মাঝারি ধরনের অর্থাৎ তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১০৯ পর্যন্ত। শতকরা ২০ জন ক্ষীণবুদ্ধি বা Feeble minded যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০-এর থেকে কম এবং শতকরা ২০ জন উন্নত বুদ্ধিযুক্ত বা gifted এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ থেকে ১২০-এর মধ্যে। জড় বা নির্বোধের (Idiot) বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০-এরও নীচে। আবার প্রতিভাবানদের (genus) বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ থেকে ১৩০-এর মধ্যে।

বিশেষ মানসিক শক্তি বা সামর্থ্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, কোন বিশেষ ছেলে বা মেয়ে সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধির পরীক্ষায় অত্যন্ত সাধারণ ফল বা খুব খারাপ ফল করলেও কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে, যেমন—চিত্রাঙ্কনে বা সংগীতে।

ছাত্রদের বুদ্ধ্যঙ্কের ভিত্তিতে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় ক্লাসে পড়াতে গিয়ে শিক্ষকেরা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের কথা চিন্তা করে পড়াতে থাকেন। তাঁরা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন ও উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের অবহেলা করেন। এ দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

**(গ) মানস-প্রকৃতিগত প্রভেদ (Temperamental Difference) :** ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মানস-প্রকৃতিগত বা মেজাজগত প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—কেউ একটুতেই রেগে ওঠে, এরা হল খিটখিটে মেজাজের। আবার কেউ অনেক খোঁচালেও রাগে না, এরা হল শান্ত প্রকৃতির। কেউবা অল্প দুঃখেই অভিভূত হয়ে পড়ে, আবার কেউ বা সংযত থাকে।

মানস-প্রাকৃতিগত প্রভেদ

**(ঘ) নৈতিক চরিত্রগত প্রভেদ (Moral Difference) :** মানুষের মধ্যে নৈতিক চরিত্রগত পার্থক্য অত্যন্ত প্রবল, যেমন—কতকগুলি চারিত্রিক গুণ অর্থাৎ স্থৈর্য, ক্ষমাশীলতা, ঔদার্য, নিষ্ঠুরতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে উপস্থিত থাকে না।

নৈতিক চরিত্রগত প্রভেদ

**(ঙ) স্বভাব অনুযায়ী বা ব্যক্তিত্বের টাইপ অনুযায়ী প্রভেদ :** মনোবিজ্ঞানী য়ুঙ (*Jung*) মানুষকে ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপ (type) অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করেছেন—(১) অন্তর্মুখী (Introvert), (২) বহির্মুখী (Extrovert) এবং (৩) উভয়মুখী (Ambivert)। ক্রেৎসমার, সেলডন, স্প্রানগার, গ্যালেন, আইসেঙ্ক, জীংস্ক প্রমুখ মনোবিজ্ঞানিগণ মানুষকে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন টাইপ অনুযায়ী ভাগ করেছেন।

ব্যক্তিত্বের টাইপ অনুযায়ী প্রভেদ

**(চ) জাতিগত প্রভেদ** (Racial and Natural Difference) **:** জাতিতে জাতিতে পার্থক্য দেখা যায়। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণ দৃষ্ট হয় যা এক জাতি থেকে অন্য জাতিকে প্রভেদ করে। তবে এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বুদ্ধিগত বা অন্যান্য গুণগত পার্থক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

জাতিগত প্রভেদ

**(ছ) বংশগত প্রভেদ** (Hereditary Difference) **:** প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী গ্যাল্টন (*Galton*) এ সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর মতে বংশের প্রভাবের উপরই মানুষের চারিত্রিক গঠন নির্ভর করে, পরিবেশের কোন মূল্য নেই। কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়, বংশগত প্রভাব ও পরিবেশগত প্রভাব দুই-ই প্রয়োজন।

বংশগত প্রভেদ

**(জ) পরিবেশগত প্রভেদ** (Environmental Difference) **:** মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে দেখা যায়, অনেক সময় খুব মহৎ ব্যক্তির সন্তান দুর্নীতিপরায়ণ, আবার খুব চরিত্রহীন লোকেরও মহৎ চরিত্রের সন্তান হয়। অনেকের মতে মানুষের গুণগত পার্থক্যের কারণ হল পরিবেশ। কিন্তু পরিবেশকেই মানুষের গুণগত প্রভেদের একমাত্র কারণ বলে মনে করা যায় না, বংশগতিরও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তবে অনুকূল পরিবেশে মানুষের সুপ্ত গুণগুলি বিকশিত হয় এবং প্রতিকূল পরিবেশ সুপ্ত গুণের বিকাশের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

পরিবেশগত প্রভেদ

**(ঝ) কৃষ্টিগত প্রভেদ** (Cultural Difference): সামাজিক পরিবেশের প্রভেদের জন্য কৃষ্টিগত প্রভেদ দেখা দেয়। তাই প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্ত্যের ব্যক্তির মধ্যে কৃষ্টিগত প্রভেদ দেখা যায়। আবার এক ভারতেই নানান দেশের কৃষ্টিগত অর্থাৎ ভাবধারা, আচরণ ইত্যাদির মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্টিগত প্রভেদ

**(ঞ) নারী ও পুরুষে প্রভেদ** (Difference due to sex): নারী ও পুরুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তার কারণ তাদের দৈহিক গঠনের বৈষম্য, ভিন্ন স্বভাব ও চালচলনের প্রভেদ। বুদ্ধি ও কর্মকুশলতায় নারী পুরুষের থেকে হীন, এ সিদ্ধান্ত এখন আর সমর্থিত হয় না। বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্মকুশলতায় নারীরা এখন পুরুষদের সমান দক্ষতা দেখাচ্ছে। কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করার ব্যাপারে পুরুষদের দক্ষতা মেয়েদের তুলনায় বেশি প্রকাশ পায়, কিন্তু ভাষাগত সামর্থ্যে মেয়েদের দক্ষতা বেশি। সাধারণ হিসেবে পুরুষরা বেশী দক্ষ, কিন্তু মেয়েদের স্মৃতিশক্তি পুরুষদের তুলনায় প্রখরতর। সাধারণ বুদ্ধির দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায় না।

নারী ও পুরুষে প্রভেদ

**(ট) সমাজগত প্রভেদ** (Social Difference): যে মানুষ শৈশব থেকে এক বিশেষ সমাজের আবহাওয়ায় বর্ধিত হয় সে সেই সমাজের আচার-ব্যবহার-পদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষা করে। ফলে, তার সঙ্গে অন্য সমাজের মানুষের এই কারণে প্রভেদ সৃষ্টি হয়। খুব ছোট শিশুদের মধ্যে এই সামাজিক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। কোন কোন শিশু এতই ভীরু ও লাজুক প্রকৃতির যে যখনই অন্য কোন পরিবারের ব্যক্তি তাদের পরিবারে আসে, তখনই তারা পালিয়ে বেড়ায়, আবার কোন কোন শিশু অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গেও বিনা সংকোচে বেশ বন্ধুত্ব করে নেয়।

সমাজগত প্রভেদ

**(ঠ) আবেগগত প্রভেদ** (Emotional Difference): মানুষের মধ্যে কারও স্নেহমমতা বোধ বেশী, কারও কম, কারও খুব তাড়াতাড়ি উত্তেজনা অনুভূত হয়। আবার কাউকে সহজে উত্তেজিত করা চলে না। কারও আবেগ এতই লঘু যে অল্পেতেই আবেগ উপস্থিত হয়, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। আবার কারও আবেগ দেরীতে এলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

আবেগগত প্রভেদ

**(ড) মনোভাবের প্রভেদ** (Difference in attitude): অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি মনোভাবের দিক থেকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ বা মনে করে সমাজের নিয়ম ভাল, কেউ বা মনে করে মন্দ। শিশুদের শিক্ষার প্রতি মনোভাব শিশুদের বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, গৃহ পরিবেশের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর। মাতাপিতার মধ্যে শিক্ষার প্রতি যদি সুস্থ মনোভাব থাকে তাহলে শিশুর মধ্যেও অনুরূপ মনোভাব দেখা দেবে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি খুব একটা সুস্থ মনোভাব নেই, সেহেতু তাদের শিশুদেরও শিক্ষায় তেমন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না।

মনোভাবের প্রভেদ

**(ঢ) বিদ্যার্জনের সামর্থ্যগত প্রভেদ** (Difference in achievement): বিদ্যার্জনের সামর্থ্যের ব্যাপারে শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভেদ দেখা যায়। পড়া এবং অঙ্ক কষার ব্যাপারে এই পার্থক্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আবার একই বুদ্ধ্যঙ্ক (*I Q.*) সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিদ্যার্জন সামর্থ্যের ব্যাপারে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যদি শিশুর যোগ্যতা তার বুদ্ধ্যাঙ্ক অনুযায়ী না হয় তাহলে শিক্ষকের তার কারণ নির্ধারণ করা উচিত। হয়ত দেখা যাবে শিশুর আগ্রহের অভাবের জন্যই এরূপ ঘটেছে। আবার অনেক শিশু তাদের বুদ্ধির তুলনায় অধিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে। সুতরাং শিক্ষকের উচিত হবে শিক্ষার্থীর চাহিদার দিকে নজর রেখে শিক্ষা দেওয়া।

বিদ্যার্জনের সামর্থ্যগত প্রভেদ

**(ণ) শিক্ষাগত প্রভেদ** (Educational Difference): ব্যক্তি তার জীবনযাত্রার প্রতিটি বৈচিত্র্যময় ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই বিচিত্র পরিবেশের প্রভাব দেখা দেয় ব্যক্তি-জীবনে। আর তা থেকে মানুষের কর্মরীতি, আচরণ ইত্যাদির মধ্যেও প্রভেদ দেখা যায়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের আচরণের ও অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। কেউ বিদ্যালয়ের শেষ সোপানে পৌঁছতে পারে, কেউ বা পারে না। বিভিন্ন ব্যক্তি শিক্ষার বিভিন্ন পথ বেছে নেয়, যেমন—কেউ চিকিৎসাবিদ্যা শেখে, কেউ আইন বিদ্যা শেখে, কেউ বা শিল্প, কেউ বা সাহিত্য আবার কেউ বা কারিগরীবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করে। এই প্রভেদ থেকেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ দেখা দেয়।

শিক্ষাগত প্রভেদ

বর্তমানে সব সভ্য সমাজে শিক্ষাব্যবস্থা এমন সুন্দরভাবে গঠন করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক নাগরিক তার ইচ্ছামত, ক্ষমতা অনুযায়ী ও নিজের রুচি অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়টি নির্বাচন করতে পারবে ও ভবিষ্যৎ জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তুলতে পারবে।

## ৩। ব্যক্তিগত বৈষম্যের স্বরূপ (Nature of individual differences) :

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ থাকার জন্যই আমরা শিশুদের সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনের বিষয়টিতে অপরের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বর্তমান যুগে আমরা এই অভিমতই পোষণ করি যে, আগ্রহ এবং সামর্থ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যক্তির নিজ বৃত্তি নির্বাচন করা উচিত এবং যেহেতু বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সামর্থ্য, প্রবণতা, অনুরাগ প্রভৃতির ব্যাপারে প্রভেদ বর্তমান সেহেতু বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে যথাযথ নির্দেশ দেবার প্রয়োজনও আছে।

**শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে তত্ত্বাবধান**

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের ব্যাপারে দুটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এই দুটি বিষয় হল, স্বাভাবিকতা এবং পরিবর্তনশীলতা। যখন এক দল ছেলের মধ্যে কোন একটি সংলক্ষণ বা সামর্থ্যের পরিমাপ করা হয়, তখন একদিকে যেমন সে ব্যাপারে দলের অন্তর্ভুক্ত ছেলেদের মধ্যে পরিবর্তনশীলতা দেখা যায়, তেমনি স্বাভাবিকতাও দেখা যায়। ধরা যাক কর্মকুশলতা। দেখা গেল, দলের ছেলেদের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ছেলের কর্মকুশলতার মান প্রায় এক, আর ২০ ভাগের মধ্যে কর্মকুশলতা স্বাভাবিক হারে কম বা বেশী।

**স্বাভাবিকতা ও পরিবর্তনশীলতা**

ব্যক্তির শিক্ষণের উন্নতি ও বিকাশের উপরও এই ব্যক্তিগত বৈষম্য নির্ভর করে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন শিক্ষণের সামর্থ্যের দিক থেকে প্রভেদ থাকে, তেমনি শিক্ষণের উন্নতির ব্যাপারেও প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

**শিক্ষায় উন্নতির ব্যাপারে প্রভেদ**

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল কোন একটি ব্যাপারে পার্থক্য অন্য ব্যাপারেও পার্থক্যের সৃষ্টি করে। যেমন, কোন ছাত্রের বুদ্ধ্যঙ্ক যদি অপরের তুলনায় কম হয় তাহলে তার বিদ্যা অর্জনের কুশলতাও অপরের তুলনায় কম

**এক বিষয়ে প্রভেদ অন্য বিষয়ে প্রভেদের সৃষ্টি করে**

হবে। ফলে শুধু বুদ্ধির ব্যাপারে নয়, শিক্ষা গ্রহণ-ক্ষমতার ব্যাপারেও অপরের সঙ্গে তার পার্থক্য দেখা যাবে।

বংশগত ও পরিবেশগত কারণেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন ধরনের বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই জগতে জন্মগ্রহণ করে, যা তার ব্যক্তিগত সামর্থ্য নির্ধারিত করে; ফলে, বংশগত কারণের জন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ দেখা দেয়। আবার বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে, তার ফলে জীবদ্দশায় যেসব বৈশিষ্ট্য সে অর্জন করে সেগুলি অপর শিশুদের থেকে পৃথক হয়।

**বংশগত ও পরিবেশগত কারণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ**

## ৪। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের তাৎপর্য (Educational significance of Individual difference) :

শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, যাকে অবহেলা করলে শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। যদিও শিশুদের দলবদ্ধ করে, এক একটা শ্রেণীতে ভাগ করে শিক্ষা দেওয়ার সাধারণ রীতি প্রায় সর্বত্রই অবলম্বন করা হয়, তবু শিক্ষা দেবার সময় আমাদের লক্ষ্য থাকে প্রতিটি শিশুকে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেওয়া, তার সুপ্ত গুণের বিকাশ সাধন করা, তার সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের সংগঠনের চেষ্টা করা। দলভুক্ত বা শ্রেণীবদ্ধ করে শিক্ষা দিলেও কোন দল বা শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শ্রেণীভুক্ত প্রতিটি শিশুকেই শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। কাজেই শিক্ষা দেবার সময় বুদ্ধি, যোগ্যতা, রুচি, প্রবণতা, সামর্থ্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে শিশুতে শিশুতে যে পার্থক্য তার কথা বিস্মৃত হয়ে শিক্ষাদান করলে, সে শিক্ষাদান কখনই সার্থক হতে পারে না। যে শিশুর দক্ষতা ভাষায়, গণিতে নয়, তাকে যদি গণিতে পারদর্শী এমন কয়েকটি ছেলের সঙ্গে দলভুক্ত করে গণিত শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তার অক্ষমতার জন্য তাকে বিদ্রূপ করা হয় তাহলে সে শিশুর মধ্যে হীনমন্যতাবোধ জাগবে এবং তার মানসিক বিকাশ কখনও সম্পূর্ণ হবে না। কাজেই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার সময় শিশুতে শিশুতে ব্যক্তিগত প্রভেদের কথা স্মরণ রেখে তাদের শিক্ষা দিতে হবে। একথা ঠিক যে প্রতিটি ছাত্রকে পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু তা বলে ছাত্রদের বুদ্ধি, সামর্থ্য, রুচি, প্রবণতা এবং চাহিদার কথা চিন্তা না

**দলভুক্ত করে শিক্ষা দিলেও আমরা ব্যক্তি-শিশুকেই শিক্ষা দিই**

**এক দলভুক্ত করে শিক্ষা দেওয়া সব ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নয়**

করে সবাইকে এক দলভুক্ত করে শিক্ষা দেওয়াও কোন যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি নয়। এই উভয় সমস্যার মধ্যে সঙ্গতি বিধান করে শিক্ষাব্যবস্থাকে কিভাবে সংগঠিত করা যায়, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীরা তারই কথা চিন্তা করেছেন। এ কাজ খুব সোজা নয়। এ ব্যবস্থা ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ; এর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

(১) শিক্ষার্থীর যোগ্যতা (ability) পরিমাপের জন্য নির্ভরযোগ্য অভীক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত ধারণা করতে না পারলে তার সার্থক শিক্ষণের জন্য কি সুযোগ দেওয়া যেতে পারে তা নির্ধারণ করা যাবে না।

(২) যোগ্যতা নিরূপিত হবার পর তার যোগ্যতানুসারে তাকে সুযোগ দিতে হবে যাতে সে শিক্ষায় সফলতা অর্জন করতে পারে।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

(৩) শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও আগ্রহ অনুযায়ী তার পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে, চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধনে সক্ষম হয় যদি তাকে তার আগ্রহ ও শক্তি অনুযায়ী তার সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করার সুযোগ দেওয়া হয়। যে বিষয়ে তার আগ্রহ সে বিষয় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তাকে দিতে হবে।

(৪) যে পরিবেশে শিক্ষার্থী তার জন্মগত ক্ষমতাকে বিকশিত করতে সমর্থ হবে, সেই পরিবেশে শিক্ষার সুযোগ শিক্ষার্থীকে দিতে হবে।

(৫) ব্যক্তিগত তারতম্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে আগ্রহ ভরে শিক্ষা দেবে এমন উপযুক্ত শিক্ষককে শিক্ষাকার্যে নিয়োগ করতে হবে।

(৬) যথাযথ প্ররোচকের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সঞ্চারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কথা বিবেচনা করে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। যেসব শিক্ষার্থী নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সবচেয়ে অধিক ফল দেখাতে পারবে তাদের পুরস্কৃত করতে হবে। এই ব্যবস্থায় যারা যোগ্যতম কেবল যে তারাই পুরস্কার লাভের সুযোগ পাবে তা নয়, প্রতিটি শিক্ষার্থী যথাসাধ্য ও আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করার জন্য পুরস্কার লাভ করার সুযোগ পাবে।

(৮) একই বিষয়ে আগ্রহ থাকলেও শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। দশটি উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেদের সঙ্গে

যদি একটি ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেকে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে খুবই স্বাভাবিক যে, শেষোক্ত ছেলেটি অনেক পিছিয়ে পড়বে এবং অন্য ছাত্রদের সঙ্গে সমান তালে তাকে চালনার চেষ্টা করে বিশেষ সুফল লাভ করা যাবে না। আবার দশটি ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রের সঙ্গে যদি একটি প্রতিভাবান ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে প্রতিভাবান ছাত্রটির বুদ্ধির সম্যক বিকাশ কখনই ঘটবে না ; তার শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় ঘটবে।

(৯) অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাধারণ ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষা না দিয়ে পৃথকভাবে শিক্ষা দিতে হবে, তাহলেই তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

(১০) বুদ্ধি ছাড়াও মানসিক, প্রকৃতিগত ও আবেগগত প্রভেদের কথা স্মরণ রেখে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের অনুভূতি, আবেগ প্রভৃতি শিক্ষাদানের সংগে বিবেচনা করা চাই।

(১১) বুদ্ধিগত যোগ্যতা ছাড়াও কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষতাকেও শিক্ষা-ব্যবস্থায় মর্যাদা দিতে হবে। সব ছাত্রেরই যে ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল এবং অঙ্কে আগ্রহ থাকবে এমন কোন কথা নেই। কারও বা হাতের কাজে, কারও বা চিত্রাঙ্কনে, কারও বা সঙ্গীতে অনুরাগ থাকতে পারে। শিক্ষার্থীকে তার যথাযথ অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে।

(১২) বিদ্যালয়ে দলগত শিক্ষা ব্যবস্থায়, দল গঠনের সময় এক-প্রকৃতিক (homogeneous) দল গঠন করাই যুক্তিযুক্ত হবে। এই ব্যবস্থায় উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন, মধ্যমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই এক-প্রকৃতিক শ্রেণী গঠনের বিরোধিতা করেছেন ভিন্ন-প্রকৃতিক (heterogeneous) শ্রেণী গঠনের সমর্থকবৃন্দরা। তাদের বক্তব্য যে, যদি উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের থেকে পৃথক করে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে শেষোক্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের অনুকরণ করে প্রেরণালাভের সুযোগ পাবে না, ফলে তাদের শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত হবে। তাছাড়া, এই ব্যবস্থায় একটি বিশেষ শ্রেণীকক্ষে উৎকর্ষগত মর্যাদা দেওয়া হয়। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রেরণালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

তবু শারীরিক, সামাজিক ও আবেগগত পার্থক্যের কথা বিবেচনা করে এক-প্রকৃতিক শ্রেণী গঠন যুক্তিযুক্ত। প্রতিটি শ্রেণীকে বোঝাতে হবে যে, কোন বিশেষ শ্রেণীকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া এই শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য নয়।

(১৩) অস্বাভাবিক ধরনের শিশু, পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর ছেলে অর্থাৎ যাদের সাফল্যাঙ্ক ৭০ থেকে ৮৫-র মধ্যে এবং অন্ধ, খঞ্জ, বোবা প্রভৃতি শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন শিশু এবং প্রতিভাবান শিশুদের স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৪) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের কথা বিবেচনা করে প্রয়োজনমত শিক্ষা-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া ছেলেদের পড়াবার জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, প্রতিভাবান ছেলেদের পড়াবার জন্য অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা সমীচীন নয়। পিছিয়ে পড়া ছেলেদের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারিত করতে পারে এমন পদ্ধতি অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত।

### ৫। বৃত্তি নির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতি (Principle of Individual Difference and Vocational Guidance) :

বৃত্তি-নির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতির যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। বৃত্তি বলতে আমরা বুঝি কোন বিশেষ কাজ বা বিশেষ ধরনের জীবিকা যা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে ব্যক্তি জীবন ধারণ করতে পারে। ব্যক্তির এমন একটি বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত যা তার পক্ষে উপযুক্ত অর্থাৎ যা সে আপন দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা দ্বারা যথাযথ ভাবে সমাধা করতে পারে এবং কর্মসম্পাদন দ্বারা কাজের তৃপ্তি (job satisfaction) লাভ করতে পারে।

বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন বৃত্তির জন্য বিভিন্ন বুদ্ধ্যঙ্কের কর্মী প্রয়োজন। ব্যক্তির বুদ্ধিগত সামর্থ্য তাই বৃত্তি-নির্বাচনে অপরিহার্য। তাছাড়া যে জীবিকাই আমরা গ্রহণ করি না কেন তাতে আমাদের আগ্রহ বা অনুরাগ আছে কিনা তাও বিচার্য। জীবিকায় অনুরাগ না থাকলে কিছুদিন পরই কাজে বিরক্তি, অবসাদ ও ক্রমবর্ধমান অসন্তুষ্টি দেখা দেবে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য আমরা লক্ষ্য করি, সে অনুসারে আমাদের বৃত্তি নির্বাচন করা উচিত। তা না হলে জীবিকার সঙ্গে আমাদের জীবনের সঙ্গতিবিধান হবে না। যে কাজে প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের প্রয়োজন সে কাজে ক্ষীণ বা স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি উপযুক্ত নয়, যে কাজে প্রচুর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সে কাজে চপলমতি ব্যক্তিকে গ্রহণ করা উচিত নয়।

ব্যক্তির প্রক্ষোভগত ও সামাজিক বৈষম্য বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে প্রভাব বিস্তার করে। বুদ্ধিগত, মানসিক শক্তিগত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রক্ষোভগত ও সামাজিক বৈষম্যের ফলে ব্যক্তি বৃত্তিমূলক সঙ্গতি লাভ করতে পারে না। এ জন্য আধুনিক শিক্ষায় প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক পরিচালনার (vocational guidance) গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে।

## প্রশ্নাবলী

1. Discuss the importance of individual difference in the educational and vocational guidance of the child.

Ans. ( পৃ: ৪১৫ – ৪১৯ )

2. What is meant by individual difference? In what respects does man differ from man.

Ans. ( পৃ: ৪০৮—৪১৩ )

3. What is the educational significance of individual difference.

Ans. ( পৃ: ৪১৫—৪১৮ )

4. Explain the problem of individual differences in the light of individual's abilities. [B. A. 1962

Ans. ( পৃ: ৪০৮—৪১৪ )

5. Write a short essay on Individual differences and their education implications. [B. A. 1964

Ans. ( পৃ. ৪০৮—৪১৯ )

6. In what respects do children in a classroom differ from one another? Examine whether ideal training and care make all children alike. [B.T. 1969

Ans. ( পৃ: ৪১৪—৪১৮ )

7. What do you mean by Backwardness, dullness and retardation? Explain this in the light of individual difference. [B. A. 1963

Ans. ( পৃ: ৩৯২—৩৯৪ )

# পঞ্চদশ অধ্যায়

# ব্যক্তির পরিমাপ

## (Assesment of Individuals)

### ১। ব্যক্তির পরিমাপ বলতে কি বুঝি? (What is Assesment of Individuals)

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই ব্যক্তিকে পরিমাপ করার বা ব্যক্তিগত বৈষম্য যাচাই করার কোন-না-কোন পন্থা অনুসৃত হয়ে আসছে। অতীতে ব্যক্তির চেহারা, চালচলন, কর্মশক্তি প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিকে পরিমাপ করা হত। বলা বাহুল্য, এ ধরনের পরিমাপক প্রণালী অনেক সময়ই যুক্তিসিদ্ধ ছিল না। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যক্তির পরিমাপ করার কোন কৌশল প্রাচীন কালে আমাদের জানা ছিল না। ইদানীং কালে বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীতে নানা ধরনের পরিমাপ প্রণালী এবং তার সহায়ক যন্ত্রপাতি (instrument) আবিষ্কৃত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'পরিমাপ' বলতে আমরা কি বুঝি? সাধারণতঃ 'পরিমাপ' বলতে আমরা বুঝি কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা, অন্য বস্তুর তুলনায় ঐ বস্তুটি বৃহৎ না ক্ষুদ্র ইত্যাদি বিবেচনা করা। ঐ সাধারণ কথাটি যে কোন বস্তু বা বিষয়কে পরিমাপ করার ব্যাপারেও প্রযোজ্য। এক বস্তা চাল বা কোন ছাত্রের কৃতিত্বকে পরিমাপ করতে হলে আমরা এভাবে পরিমাণই নির্ধারণ করি। চালের ওজন কিলোতে (Killo) আর ছাত্রের কৃতিত্ব নম্বরে (marks) প্রকাশ করি।

থর্নডাইক বলেন: যাহা অস্তিত্বশীল, তার কোন একটা পরিমাণ আছে এবং পরিমাণযুক্ত অস্তিত্বকে পরিমাপ করা যায়।[1] অর্থাৎ যে বস্তুর পরিমাণ রয়েছে সে বস্তুকেই আমরা পরিমাপ করতে পারি। মানসিক ক্ষমতা, বুদ্ধি সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়কেও আমরা এজন্য পরিমাপ করতে পারি। অবশ্য যেভাবে সহজে আমরা এক বস্তা চাল বা ডাল ওজন করতে পারি, ব্যক্তির গুণাবলীকে তত সহজে পরিমাপ করা যায় না। ব্যক্তির পরিমাপে প্রয়োজন খুব সূক্ষ্ম কলাকৌশল, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, পরিমাপকারী ব্যক্তির দক্ষতা এবং যে গুণকে পরিমাপ করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে তার সঠিক জ্ঞান।

1. "Any thing that exists at all exists in some quality, and anything that exists in quantity is capable of being measured."—Thorndike.

আমরা ব্যক্তির কি পরিমাপ করি ? ব্যক্তির পরিমাপ বলতে মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তির দৈহিক ওজত আমরা বুঝি না ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ ব্যাখ্যা করার জন্য সময় বিশেষে ব্যক্তির ওজন পরিমাপের হয়ত প্রয়োজন আছে, কিন্তু ব্যক্তির দৈহিক ওজনের সঙ্গে মানসিক গুণাবলীর কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। আমরা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, মানসিক গুণাবলী, তাহার গ্রহণক্ষমতা, সামর্থ্য, বুদ্ধি ইত্যাদি পরিমাপ করি।

ব্যক্তির পরিমাপকে আমরা নিম্নোক্তভাবে ভাগ করতে পারি, যথা—(১) কৃতিত্বের পরীক্ষা (Achievement test), (২) প্রবণতা পরীক্ষা (Aptitude test), (৩) আগ্রহের বর্ণনামূলক তালিকা (Interest inventory), (৪) চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা (Character and Personality test), এবং (৫) বুদ্ধি-পরীক্ষা (Intelligence test)।

**(১) কৃতিত্বের পরীক্ষা (Achievement test)**: এ পরীক্ষায় পরীক্ষণ পাত্রের কোন কাজের সাফল্যের তুলনামূলক বিচার করা হয়। সাধারণতঃ দুই ধরনের কৃতিত্বমূকক পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রথমটিকে বলা হয় সাধারণ কৃতিত্বের পরীক্ষা (General achievement test)। এ পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষণ পাত্রের কাজের সমগ্র ক্ষেত্রকে বিচার করা হয় এবং কৃতিত্বসূচক নম্বর প্রদান করা হয়। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ত্রুটি-নির্ণায়ক পরীক্ষা (Diagnostic test)। এ পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষণ পাত্রের এক বা একাধিক কাজের পরীক্ষা করে পরীক্ষণ পাত্রের ত্রুটি বা দুর্বলতা স্থির করা হয়। শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এ ধরনের পরীক্ষা খুবই প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ বা শিক্ষকের শিক্ষাদান সার্থক হচ্ছে কিনা তা এই পরীক্ষার সাহায্যেই নির্ধারণ করা যায়।

কৃতিত্বের পরীক্ষাকে আমরা নিম্নোক্তরূপ গ্রহণ করতে পারি :

(ক) মৌখিক পরীক্ষা (Oral test): শিক্ষার্থী বা পরীক্ষণ পাত্রকে অনেক সময় মৌখিক ভাবে জবাব দিতে হয়। লঘু সমস্যা সমাধানের জন্য পরীক্ষণ পাত্রের কৃতিত্ব যাচাই করতে অনেক সময় মৌখিক জবাবই যথেষ্ট।

(খ) রচনামূলক পরীক্ষা (Essay type test): রচনামূলক পরীক্ষা নিয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি : পৃঃ ৪২৫

(গ) বিষয়াত্মক অভীক্ষা (Objective test): এ সম্বন্ধেও পরবর্তী স্তরে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

1. "An achievement test is an instrument designed to measure relative accomplishment in an area of work."

(ঘ) কৃতি পরীক্ষা (Performance test) : এ ধরনের পরীক্ষায় পরীক্ষণ পাত্রকে কোন প্রশ্নের জবাব কাগজে লিখতে হয় না, কিন্তু পরীক্ষকের নির্দেশমত বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতি পরিচালনা করতে হয়।

(২) **প্রবণতা পরীক্ষা** (Aptitude test) : অনেক সময় দেখা যায় যে পরীক্ষণ পাত্রের বুদ্ধি পরীক্ষার দ্বারা অন্যান্য কোন কর্মসম্পাদন বা বিশেষ কোন বিষয়ে ( অর্থাৎ সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি ) পরীক্ষণ পাত্রের ঝোঁক বা সামর্থ্য পরীক্ষা করা যায় না। কোন যন্ত্রের কাজে (mechanical work) দক্ষতা বা সঙ্গীতে দক্ষতা যাচাই করার জন্য এ ধরনের পরীক্ষা গৃহীত হয়। সৈন্যবিভাগের লোক নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যাপারে এ পরীক্ষা খুব সহায়ক।

(৩) **আগ্রহের বর্ণনামূলক তালিকা** (Interest inventory) : এ ধরনের পরীক্ষা দ্বারা কোন বিষয়ে পরীক্ষণ পাত্রের আগ্রহকে সেই বিষয়ে যারা সফলতা অর্জন করেছে তাদের আগ্রহের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আগ্রহের এ ধরনের তুলনা থেকে বোঝা যায় পরীক্ষণ পাত্র ভবিষ্যৎ জীবনে কোন্ ধরনের জীবিকার উপযোগী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আগ্রহ পরীক্ষা, আসলে পরীক্ষা নয়, উহা তুলনামূলক বিচার পাত্র। এতে আগ্রহের কোন পরিমাণ নির্ধারিত হয় না। অর্থাৎ কোন পরীক্ষণ মাত্র যদি কোন বিশেষ বিষয়ে প্রচুর আগ্রহ প্রকাশ করে এবং এতে তার দক্ষতা থাকে, আর ঐ একই বিষয়ে যদি কোন বৈজ্ঞানিক ও সমানভাবে আগ্রহ ও দক্ষতা প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে আমরা বলতে পারি ভবিষ্যৎ জীবনে আমাদের পরীক্ষণ পাত্র বৈজ্ঞানিক হবে।

(৪) **চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা** (Character and Personality test) : এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

(৫) **বুদ্ধি-পরীক্ষা** (Intelligence test) : এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

## ২। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা (Different Types of Examination) :

শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত গুণ বা ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত উন্নতির পরিমাপক হিসেবে নানা ধরনের পরীক্ষা নানা ভাবে গ্রহণ করা হয়। লিখিত পরীক্ষাকে আমরা রচনামূলক (essay) বা বিষয়াত্মক (objective) এই দু'ভাগে ভাগ করেছি। বিষয়াত্মক পরীক্ষাগুলির মধ্যে আবার নানা শ্রেণীর পরীক্ষা-পদ্ধতি আছে। এগুলির প্রচলন খুব বেশি দিন ধরে হয় নি এবং এখনও এদের প্রয়োগ ও গঠন

সম্বন্ধে নতুন নতুন গবেষণার ফল বেরুচ্ছে। এজন্য এগুলোকে নতুন ধরনের অভীক্ষা (New-Type test) বলা হয়। এগুলির বহুল প্রচলিত একটি পরীক্ষা হল আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test)। আবার যদি পরীক্ষার্থী মুখে মুখে প্রশ্নের জবাব দেয় তবে তাকে মৌখিক পরীক্ষা (Oral Test) বলে। পরীক্ষাকে অনেক সময় যোগ্যতা বৃদ্ধির পরীক্ষা (Qualifying Test) এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (Competetive Test)—এ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যোগ্যতা বৃদ্ধির পরীক্ষা বলতে বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যান্য কোন সংস্থার দ্বারা গৃহীত পরীক্ষা বোঝায়। এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থী যে শিক্ষা গ্রহণ করছে তার পরিমাপ করা হয়। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বলতে শিক্ষার্থীর বৃত্তিগত (vocational) যোগ্যতার পরিমাপ বোঝায়। যারা শিক্ষার্থীকে কোন কাজ বা বৃত্তি (vocation) বা পেশাতে নিয়োগ করবেন তারাই তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে এ পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এই গেল পরীক্ষার প্রকারভেদ সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয়।

এছাড়া পরীক্ষাগ্রহণকারী ভেদে পরীক্ষাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—অন্তর্বৃত (internal) এবং বহির্বৃত (external) পরীক্ষা। প্রতি বিদ্যালয়েই অন্তর্বৃত পরীক্ষার প্রচলন আছে। সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের অগ্রগতি হচ্ছে কিনা বা শিক্ষকের শিক্ষাদান এগিয়ে চলেছে কিনা, এ সব নির্ণয় করার জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা তাদের মনোনীত শিক্ষকগণ এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন। বহির্বৃত পরীক্ষা বিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুত প্রশ্নপত্রের দ্বারা শিক্ষার্থীর যোগ্যতা নির্ণয়ের ব্যবস্থা। এই বহির্বৃত পরীক্ষাই সাধারণী পরীক্ষা (Public Examination) বলে অভিহিত হয়েছে। অন্তর্বৃত পরীক্ষার বিশেষ কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। সাধারণী বা বহির্বৃত পরীক্ষাকেই রাষ্ট্র বা সমাজ স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর যোগ্যতার নিদর্শনস্বরূপ অভিজ্ঞানপত্র (certificate) বা পদবী (degree) দেওয়া হয়। এগুলোর একটি সামাজিক মানও (social standard) রয়েছে।

## পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য (Purpose of Examination) :

(১) পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ শিক্ষার্থীর শিক্ষণের অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের শিক্ষাদানই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থী

কতটুকু শিখল, যে বিশেষ পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে তাকে শিক্ষাপ্রদান করা হচ্ছে, সে তা যথাযথ গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা তার পরিমাপ করাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য।

(২) শিক্ষার্থীর কোথায় কোন্ ত্রুটি হয়েছে বা সে কেন পিছে পড়ে আছে তা পরীক্ষার মাধ্যমেই ধরা পড়ে। শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হয়েছে কিনা বা তার ত্রুটির কারণ কি—এসব নির্ধারণ করার একমাত্র উপায় পরীক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষার্থী যদি পরীক্ষাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার ব্যর্থতার কারণ নির্ধারণ (diagnosis) করা যায়। কিভাবে শিক্ষার্থী তার ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে পারে এজন্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ই সচেষ্ট হতে পারেন।

(৩) শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষা গ্রহণ পরিচালনা করা, তার ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনে সহায়তা করাও (Prognosis) পরীক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনে কি ধরনের দায়িত্ব নিতে পারবে, কোন্ বৃত্তি গ্রহণ তার পক্ষে উপযুক্ত হবে ইত্যাদিও পরীক্ষার মাধ্যমে স্থির করা যায়।

(৪) পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যে শুধু শিক্ষার্থীর শিক্ষণের পরিমাপ করা যায় তা নয়, অনেক সময় শিক্ষকের শিক্ষাদানের দক্ষতারও বিচার করা হয়। যদিও শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণে অক্ষমতার সঙ্গে শিক্ষকের অযোগ্যতার কোন কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, তবুও শিক্ষকের শিক্ষাদানের সার্থকতার, পরিচয় বহন করে পরীক্ষার্থীর সাফল্য।

(৫) পরীক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি করে, ইহা অনেক সময় একটি কৃত্রিম উদ্বোধকের (artificial incentive) কাজ করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীকে সমাপ্ত করতে হবে, এ ধরনের একটি তাড়না (need) শিক্ষার্থী অনুভব করে। শিক্ষার্থীর বিক্ষিপ্ত মনের উপর পরীক্ষার ব্যবস্থা এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social control) রূপে কাজ করে।

(৬) পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের পরিমাপই শুধু হয় না, পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীর অন্যান্য গুণের পরিমাপও হয়। যে শিক্ষার্থী পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়েছে বা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে সে যে শুধু পাঠ্যসূচীর বিষয়গুলোই অধ্যয়ন করেছে তা নয়, পাঠ্যসূচীর বাইরেও অন্যান্য বিষয়ের সে অনুশীলন করেছে এবং তার পেছনে শিক্ষার্থীর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ রয়েছে। অর্থাৎ পরীক্ষার মাধ্যমে কেবল শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ হয় না, এর সঙ্গে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত অন্যান্য মানসিক গুণাবলীরও একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

## ৩। প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার সুবিধা এবং অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of the Conventional Essay-Type Examination) :

রচনামূলক (essay-type) পরীক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? রচনামূলক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে যে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়, তার মধ্যে একাধিক প্রশ্ন থাকে। শিক্ষার্থী যথাসম্ভব নিজ ভাষায় এই প্রশ্ন বা প্রশ্ন সমষ্টির জবাব দেয়। সিম্স (*Sims*) তাঁর *The Essay Examination is a Projective Technique* বইতে রচনামূলক পরীক্ষা সম্বন্ধে বলেন: রচনামূলক পরীক্ষার যে সমস্যাধর্মী পরিস্থিতি থাকে, অধিকতর স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থী তার উত্তর লিখতে পারে। এতে শিক্ষার্থীর মানসিক অভিজ্ঞতার গঠন, গতিশীলতা এবং ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। এই আলোচনা থেকে রচনামূলক পরীক্ষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে: (ক) পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নের জবাব লিখতে তার নিজস্ব মতামতের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।[1] (খ) সম্পূর্ণ এবং যথাযথ হিসেবে এসব প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব নেই, এমনকি বিশেষজ্ঞরাও ঠিক করে দিতে পারে না।[2] (গ) বিভিন্ন গুণ ও কৃতিত্বের তারতম্যের দ্বারা এ প্রশ্নের জবাব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।[3]

**রচনামূলক পরীক্ষার সুবিধা** (Advantages of Essay-Type Examination): (১) প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার প্রধান সুবিধা হল, শিক্ষার্থীর অধীত পাঠ্যসূচীর বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ করা যায়। (২) এই পরীক্ষার মধ্যে শিক্ষার্থীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও মতের স্বাধীনতা থাকে। শিক্ষার্থীর জীবনে স্বাধীন মত প্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (৩) শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, রচনাশৈলী, ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ইত্যাদি প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই যাচাই করা যায়। (৪) এই পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থীর যুক্তি বা অনুমান ক্রিয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকে, জ্ঞান অর্জনের শ্রেষ্ঠ মানসিক প্রক্রিয়া হল যুক্তি। সুতরাং এদিক থেকে, রচনামূলক পরীক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে। (৫) রচনা-

1. The examinee is permitted freedom of response in answering the question.

2. There is no single answer to the question which can be regarded as correct and complete, even by experts.

3. Answers of the question are characterised by different degrees of quality or merit.

মূলক পরীক্ষাকে অনেকে সমালোচনা করে বলেন যে উহা ব্যক্তির আচরণের প্রলক্ষণকে (individual traits) পরিমাপ করতে পারে না। কিন্তু এখানে আমাদের, প্রশ্ন হচ্ছে, রচনামূলক পরীক্ষা কি পরিমাপ করতে চায়? পরীক্ষার্থীর সাবলীলভাবে গদ্যে (prose) একটি প্রশ্নের জবাব লিখবার কতটুকু ক্ষমতা (ability) আছে, তা এই পরীক্ষা মাপ করে। সুতরাং ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত আচরণ পরীক্ষা করা এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

রচনামূলক পরীক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধে বলা হয় যে, ভাবসংগঠন ও নির্বাচনে, প্রকল্প গঠন ও সমর্থনে, তর্কসম্মতভাবে যুক্তি প্রসারে, গঠনধর্মী ভাষা প্রকাশে যে উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়া নিয়োজিত তা পরিমাপ করাই রচনামূলক পরীক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং এই পরীক্ষার দ্বারাই শিক্ষার কতকগুলি ব্যাপক ফলাফল যাচাই করা যেতে পারে, যা অন্য কোন কাগজ-কলমে বা লিখিত পরীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না।

**রচনামূলক পরীক্ষার অসুবিধা** (Disadvantages of Essay-Type Examination): (১) প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রধান ত্রুটি হল এতে কোন নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) নেই। একই পরীক্ষক এই ধরনের প্রশ্নের খাতায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নম্বর (marks) দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন পরীক্ষক সম্বন্ধে তো কথাই নেই। কারণ বিভিন্ন পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর সাফল্য পরিমাপের বিভিন্ন মান (standard) প্রয়োগ করেন। পরীক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক অবস্থার উপরও তার পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে। সুতরাং এ ধরনের পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার্থীর শিক্ষণের পরিমাপ করা যায় না। তাছাড়া, পরীক্ষকের মেজাজ বা মানসিক অবস্থার উপরও পরীক্ষার্থীর সাফল্য নির্ভর করে। একই প্রশ্নপত্র ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে যে পরীক্ষক দেখছেন, উহা সুস্থ বা প্রফুল্ল মনে দেখলে এ দুপ্রকার খাতার নম্বরদানের পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। আসল কথা, পরীক্ষার ফলাফল বিচার অনেকটা ব্যক্তিসাপেক্ষ (subjective) ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

(২) প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষায় প্রয়োগশীলতার (administrability) অভাব রয়েছে। প্রথমতঃ, প্রশ্নপত্রের মধ্যে পরীক্ষক কতটুকু জবাব চান বা একটা প্রশ্নের জবাব লিখতে পরীক্ষার্থী কোন্ কোন্ দিক বিবেচনা করবে এ ধরনের কোন ইঙ্গিত প্রশ্নপত্রে থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তরে

বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নম্বর দেবার (scoring) কোন ব্যবস্থা নেই। উহা অনেকটাই ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার।

(৩) রচনাধর্মী পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে যথেষ্ট সময় লাগে। পরীক্ষার্থীরা প্রায়ই অভিযোগ করে যে, যে ধরনের প্রশ্নের জবাব চাওয়া হয় তা তিন-চার ঘণ্টায় যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় না। তারপর প্রশ্নের উত্তরপত্র পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশ ইত্যাদিতে প্রচুর অর্থ এবং সময়ের অপব্যবহার হয়। এ পরীক্ষাব্যবস্থায় তাই পরিমিততার (economy) অভাব রয়েছে।

(৪) এই রচনাধর্মী পরীক্ষাতে কোন মান (norm) নেই। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর একটি বিষয়ের ফলাফলের সঙ্গে অন্য বিষয়ের ফলাফলকে যথাযথ ব্যাখ্যা করার এবং তুলনা করার (interpretation and comparability) কোন সুযোগ নেই। নম্বরদান (scoring) এত ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার যে তার কোন বিজ্ঞানসম্মত মান নেই।

(৫) এ ধরনের পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থী অধ্যয়নের চাইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই বড় করে দেখে। তাই তারা শিক্ষকের শিক্ষাদান বা ভাবসংগ্রহের চাইতে পরীক্ষাতে কি ধরনের প্রশ্ন আসবে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে আর বাজারের নোটবই (Sure Success, Made Easy, One Minute's preparation) পড়ে। শিক্ষার্থীর কাছে বিদ্যালয় পরীক্ষায় পাস করানর একটি কল বা কারখানা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য এর পেছনে কারণও রয়েছে। রচনাধর্মী পরীক্ষাতে সমগ্র পাঠ্য বইয়ের উপর প্রশ্ন থাকে না, সুতরাং পরীক্ষার্থীরাও পাঠ্যবই পড়বার আগেই কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এ নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

রচনামূলক পরীক্ষার এসব অসুবিধার জন্য এ পরীক্ষার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন দেখা দেয়। সে আন্দোলনের ফলস্বরূপ আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার (New-Type test) প্রচলন হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রচনামূলক পরীক্ষাকে কি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া চলে? এ পরীক্ষার ভবিষ্যৎ কি?

## ৪। রচনামূলক পরীক্ষার ভবিষ্যৎ (Future of Essay-Type Examination):

প্রথমতঃ, অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে বিদ্যালয়গুলি থেকে রচনামূলক পরীক্ষাকে নির্বাসিত করা উচিত। কিন্তু পরে দেখা গেল আধুনিক

বিষয়াত্মক অভীক্ষার মধ্যেও এমন কতকগুলি ত্রুটি রয়েছে যার ফলে উহা রচনামূলক পরীক্ষাকে স্থানচ্যুত করতে পারে না। রচনামূলক পরীক্ষায় যে সুবিধা বর্তমান, শিক্ষার্থীর স্বাধীন মত প্রকাশ, অনুমান করার সুযোগ, ভাব প্রকাশের অধিকার ইত্যাদি কোন কিছুই অন্য কোন পরীক্ষাতে সম্ভব নয়। আর শিক্ষার মূলসূত্র শিক্ষার্থীর স্বাধীন মত গঠন এবং ভাব সৃষ্টিতেই নিহিত। সুতরাং এ পরীক্ষাকে পরিত্যাগ করা চলে না।

এজন্য ১৯৪৮—৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এই রচনামূলক পরীক্ষার সংস্কার করতে চেয়েছেন।[1] প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন তৈরির সময় যদি সমগ্র পাঠ্য বইয়ের উপর প্রশ্ন করেন, প্রশ্নের কোন্ কোন অংশের উপর কিভাবে কত নম্বর দেবেন ইত্যাদি স্থির করেন, তবে পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তরকে যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে। আর শিক্ষার্থীও পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার জন্য সহজ বই না পড়ে পাঠ্যবই পড়বার প্রবণতা দেখাবে।

তাছাড়া, প্রশ্নপত্র তৈরির সময় প্রশ্নগুলি যাতে নির্ভরশীল হয় তাও বিবেচনা করতে হবে। কারণ, সময় সময় এমন প্রশ্ন করা হয় যার সঠিক উত্তর পরীক্ষার্থী ঠিক করতে পারে না। এজন্য বিশেষ কোন সমস্যা প্রশ্নের মধ্যে উপস্থাপিত করলে পরীক্ষার্থী ঠিক বুঝতে পারে, কোন্ সমাধান তার কাছে থেকে চাওয়া হচ্ছে।

পরীক্ষার নম্বরদান (scoring) যাতে পুরোপুরি ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায় তার জন্য একই প্রশ্নোত্তর একাধিক পরীক্ষক পরীক্ষা করতে পারেন।

আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার সঙ্গে রচনাধর্মী পরীক্ষার যথাসম্ভব একটি সমন্বয় বা একটিকে আর একটির সহায়করূপে বিবেচনা করলে রচনামূলক পরীক্ষার উন্নতি সম্ভব।

রচনাধর্মী পরীক্ষা থেকে ব্যক্তিসাপেক্ষতা (subjectivity) দূর করার জন্য এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষা-জীবনের একটি সামগ্রিক রূপ বিবেচনা করার জন্য আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ধারাবাহিক পরিমাপ পত্র (Cumulative Record Card) প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর শুধু বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষার অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করা হয় না, তার

1. If examinations are necessary, a thorough reform of these are still more necessary. (The Report of the University Education Commission, 1948-49.)

ব্যক্তিগত ইতিহাস ( পারিবারিক, সামাজিক ), ব্যক্তিগত গুণাবলী ( আগ্রহ, কর্মক্ষমতা. উৎসাহ, সামাজিক কর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির বিবরণ ), ব্যক্তিসত্বা ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশ, সহপাঠ্য-সূচীর কার্যাবলীতে তার অংশ গ্রহণ, তার স্বাস্থ্যের বিবরণ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সকল বিষয় উল্লিখিত হয়।

যদিও এই ধারাবাহিক পরিমাপপত্রে শিক্ষকের ব্যক্তিগত মত ও আকর্ষণের ছাপ পড়ার আশঙ্কা আছে, তবুও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় গ্রহণ করলে এতে শিক্ষার্থীর একটি সামগ্রিক জীবনের পরিচয় আমরা পেতে পারি।

## ৫। আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষা (New-Type Objective Test) ঃ

আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষাকে সাধারণতঃ দু শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short answer item) এবং অন্যটিকে বলা হয় বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর (Multiple-choice item)। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরে পরীক্ষার্থী একটি শব্দ, সংখ্যা বা প্রতীক চিহ্ন বসিয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়। বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তরে প্রশ্নের অনেকগুলি সম্ভাব্য উত্তর বা উত্তরটির এলোমেলোভাবে বিভিন্ন স্তরে সাজান থাকে, পরীক্ষার্থীকে যথাযথ প্রশ্নটি নির্বাচন করে নিতে হয়। অনেক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরকে স্মৃতিমূলক (recalling) এবং বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তরকে স্বীকৃতিমূলক (recognition) বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা সঙ্গত নয়। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরে স্মৃতিই একমাত্র সহায়ক নয়, অনেক সময় নতুন বিষয়ও থাকে। বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তরে অনেক সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর থাকে যার সঙ্গে পরীক্ষার্থীর কোন পরিচয়ই নেই। আমরা নিম্নে এ দুই ধরনের বিষয়াত্মক অভীক্ষার কয়েকটি বহুল প্রচলিত উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

## ৬। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short Answer Item) :

**(ক সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা (Completion or Recall Type) ঃ** এখানে একটি বাক্য থাকে এবং এ বাক্যের মধ্যে বিশেষ শব্দ বা শব্দসমষ্টি উহ্য থাকে, পরীক্ষার্থীকে তা পূরণ করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ—

১। গীতাঞ্জলির রচয়িতা হলেন—।

২। চুম্বকের ধর্ম—।

**(খ) হ্যাঁ অথবা না** (Yes or No Type) :

১। জলের চেয়ে বরফ হালকা। হ্যাঁ/না

২। সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। হ্যাঁ/না

৩। সম্রাট আকবর ধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। হ্যাঁ/না

'হ্যাঁ' অথবা 'না' এ ধরনের অভীক্ষা 'সত্য-মিথ্যা' বিচারের (True or False Type) নামান্তর। এ ধরনের প্রশ্নের গঠননীতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন শুধু সত্য কিনা বা মিথ্যা কিনা জিজ্ঞাসা করা হবে। অথবা শুধু যে প্রশ্ন সত্য বা যে প্রশ্ন মিথ্যা তা-ই জিজ্ঞাসা করা হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সত্য বা মিথ্যা প্রশ্নের প্রতি প্রশ্নকর্তার পক্ষপাতিত্ব না থাকাই ভাল। প্রশ্নের সংখ্যা যত বেশী হবে ততই এ ধরনের অভীক্ষার নির্ভরশীলতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। সত্য বা মিথ্যা প্রশ্নের মধ্যে অনুপাত না থাকাই ভাল। এ ধরনের অভীক্ষাতে সাধারণতঃ অনুমান করার কোন সুযোগ থাকে না। কিন্তু কোন কোন স্থলে অনুমান করার সুযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক বা অর্জিত জ্ঞানের উপর পরীক্ষা গৃহীত হলে অনুমানের কোন সুযোগ দেওয়া হয় না।

**(গ) উপমান অভীক্ষা** (Analogy Type) : এখানে দুই বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য লেখা থাকে, শিক্ষার্থীকে তৃতীয় বস্তুর সঙ্গে চতুর্থ বস্তুর সাদৃশ্য খুঁজে নিতে হয়।

১। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ শিক্ষকের সঙ্গে — সে সম্বন্ধ।

২। জলের সঙ্গে মাছের যে সম্বন্ধ কেঁচোর সঙ্গে — সে সম্বন্ধ।

৩। দুঃখের সঙ্গে সুখের যে সম্পর্ক আলোর সঙ্গে — সে সম্পর্ক।

### ৭। বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর (Mulitiple Choice Test) :

**(ক) নির্বাচনী পরীক্ষা** (Choice Test) : এখানে প্রশ্নের জবাবের অনেকগুলি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকে বা এলোমোলাভাবে প্রশ্নের জবাব লেখা থাকে, পরীক্ষার্থীকে সেটা খুঁজে নিতে হয় অথবা ঠিকভাবে সাজিয়ে নিতে হয়।

১। ভারতে নোবেল পুরস্কার পান গান্ধীজী/রবীন্দ্রনাথ/দাদাভাই নৌরজী।

২। ভারত অর্থনীতিতে অনগ্রসর দেশ তার কারণ—ভারতের মানুষ অলস/ভারতের সরকার ইহা চান না/শিল্প ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির এবং দক্ষ কারিগরের অভাব।

**(খ) মিলনকরণ পরীক্ষা (Matching Test):** এখানে প্রশ্নের ডান দিকে উত্তর দেওয়া থাকে, সেখানে যে উত্তরটি খাটে সেখানে সেটি সাজিয়ে লিখতে হয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (১) | রবীন্দ্রনাথ প্রথম লাভ করেন | (১) | প্রধানমন্ত্রী |
| (২) | পশ্চিমবঙ্গ ঘনবসতি | (২) | নোবেল পুরস্কার |
| (৩) | জওহরলাল ভারতের প্রথম | (৩) | অঞ্চল |

## ৮। আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test) :

পরীক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে তার যাথার্থ্য এবং নৈর্ব্যক্তিকতার উপর। কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষার (এমন কি নতুন অভীক্ষারও) ত্রুটি হল এদের ফলাফলকে অন্যান্য ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। অর্থাৎ একটি পরীক্ষার্থী অঙ্কে ৩৫ নম্বর পেয়েছে, তার এই ফলকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? যদি ধরা যায় অঙ্কে মোট নম্বর ছিল ১০০ এবং উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর ৩০, তবে ছেলেটি মোটামুটিভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু অঙ্কে কাঁচা। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, এ ব্যাখ্যা মোটেই যথাযথ নয়। ছাত্রের কৃতিত্ব বা দুর্বলতাকে বিচার করতে গেলে আমাদের আরও কয়েকটি প্রশ্ন করতে হয়। যেমন, এই শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা কত? তারা কে কত নম্বর পেয়েছে? তাদের গড় (average) নম্বর কত? সে তুলনায় ছাত্রটি যদি ৩৫ পায় তবে এ নম্বর গড় নম্বরের ঊর্ধ্বে, না নিম্নে ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের সমাধান না করে ছাত্রের ফলকে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং নম্বর দান কখনও বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না।

অতএব একটি সাধারণ মান (Standard or Norm) নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই মানের সঙ্গে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরকে তুলনা করে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। এ ধরনের মানকে জনসাধারণের মান (Population Norm) বলা হয়ে থাকে। বারবার প্রয়োগের দ্বারা একটি অভীক্ষার প্রতিনিধিমূলক গড় মান স্থির করা হয় এবং জনসাধারণ একে আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test) হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এ ধরনের পরীক্ষার সহায়করূপে নম্বর দানের জন্য নানা ধরনের পরিমাপক (Scale) আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গড় নম্বর এবং আদর্শায়িত মান এক জিনিস নয়। গড় নম্বর হল শিক্ষার্থী গড়ে যে নম্বর পেয়েছে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিয়ে সকলের মোট নম্বরকে ভাগ করে যা লাভ করা যায়।

কিন্তু আদর্শ মান হল শিক্ষার্থীর যা ন্যায্যপ্রাপ্য। মনে করা যাক, যে শিক্ষার্থী অঙ্কে ৩৫ পেয়েছে, সেই শ্রেণীতে ২০ জন ছাত্র এবং গড়ে প্রত্যেকে ২৫ পেয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সে ছেলে অঙ্কে ৩৫ পেলেও অঙ্কে দুর্বল নয় বরং অন্যতম ভাল ছাত্র। প্রতিটি পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আদর্শায়িত মান ঠিক করা হয়। মনে করা যাক সেই আদর্শ মানটি ৪০। যদি পরীক্ষার্থী ৩৫ বা ৫০ নম্বর পায়, তখন ঐ আদর্শ মানের সঙ্গে তুলনা করে তার ফলাফল ব্যাখ্যা করা যাবে। তাছাড়া, পরিমাপক (Scale) ব্যবহার করার ফলে নম্বর দান নির্ভরশীল এবং ব্যক্তিসাপেক্ষকতা থেকে মুক্ত। আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষাগুলিকে এভাবে আদর্শায়িত মানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

## ৯। আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষার সুবিধা এবং অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Objective-Type Test) :

**আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষার সুবিধা (Advantages of Objective Type Test) :** এই নতুন পরীক্ষাপদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল, উহা নৈর্ব্যক্তিক বা বস্তুনিষ্ঠ (objective), পরীক্ষক বা পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিসাপেক্ষতা (subjectivity) থেকে উহা মুক্ত। এজন্য উহা নির্ভরশীল। প্রশ্নের জবাব স্থির করা থাকে; সুতরাং নম্বরদান এতে যথাযথভাবে করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এতে সময় এবং পরিশ্রম কম লাগে। তৃতীয়তঃ, সমগ্র পাঠ্য বইয়ের উপর ব্যাপকভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে বলে শিক্ষার্থী কয়েকটি প্রশ্নের জবাব মুখস্থ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয় না। চতুর্থতঃ, অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়াও যে কেহ প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা করতে পারেন।

**আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষার অসুবিধা (Disadvantages of ObjectiveType Test) :** এ পরীক্ষায় নিছক তথ্যগত জ্ঞানের (subject knowledge) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভাব, ভাষা বা রচনা কৌশলের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এ ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা ব্যয়বহুল এবং বিশেষজ্ঞ (expert) ছাড়া প্রশ্নপত্র তৈরি করা যায় না। তৃতীয়তঃ, এই পরীক্ষায় প্রয়োগশীলতার অভাব রয়েছে। কারণ, এ ধরনের পরীক্ষা চালাতে প্রচুর কৌশলের প্রয়োজন। সাধারণ বিদ্যালয়ে এ ধরনের কৌশলী পরীক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। চতুর্থতঃ, এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন মতামত ও ভাব প্রকাশের সুযোগ নেই। এ জন্য

অনেকে বলেন, শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ এ পরীক্ষার দ্বারা সম্ভব নয়। স্যাণ্ডিফর্ড (*Sandiford*) বলেন : পরীক্ষকের পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে কোথায় জ্ঞানের পরিসমাপ্তি আর কোথায় অনুমান শুরু হয়। বিষয়াত্মক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর পক্ষে বুদ্ধি-চর্চার বিশেষ কোন সুযোগ নেই। পরীক্ষার্থী অনেক সময় না বুঝেই প্রশ্নোত্তরে একটি দাগ বসিয়ে দেয়, কোন কোন সময় উহা ঠিক হয়ে যায়, কোন ক্ষেত্রে বা ঠিক হয় না। পঞ্চমতঃ, যে কোন বিষয়াত্মক পরীক্ষায় ফলাফলের ব্যাখ্যা এবং তুলনা সম্ভব নয়। একমাত্র আদর্শায়িত অভীক্ষায় (Standardised Test) ফলাফলকে ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য ফলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

তারপর এ ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষার্থীর মৌলিকতা (originality) পরিমাপ করা যায় না।

## ১০। বিষয়াত্মক পরীক্ষার বিষয়বস্তু গঠনের সাধারণ নিয়ম (General Maxims for Item Writing on Objective Test) :

বিষয়াত্মক পরীক্ষার ত্রুটিগুলি অনেক সময় বিষয়বস্তু গঠনের ত্রুটি থেকে উদ্ভূত হয়। বিষয়বস্তু নির্বাচন ও গঠনে যথেষ্ট রচনাশৈলীর প্রয়োজন। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বিষয়াত্মক পরীক্ষা-পরিচালনা যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন।[1] বিষয়বস্তু গঠনে (construction) কোন মৌলিক নীতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে আজও পরীক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ, বিষয়াত্মক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরীর কোন বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম নেই।[2]

তবুও অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতা এবং অবধারণ থেকে উদ্ভূত কতকগুলি সাধারণ নিয়ম এক্ষণে আলোচনা করব। এ নিয়মগুলি বিষয়াত্মক পরীক্ষার সব রকম প্রশ্ন প্রস্তুতির জন্য মোটামুটি সমানভাবে প্রযোজ্য। এ ছাড়াও প্রতিটি অভীক্ষার বিশেষ বিশেষ নিয়ম বর্তমান।

1. তুলনীয় : "Writing good test items is an art. It is a little like writing a good sonnet and a little like baking a good cake. The operation is not quite so free and fanciful as writing the sonnet. it is not quite so standardised as baking the cake.

Thorndike and Hagen : Measurement and Evaluation in Psychology and Education ; Page 50

2. তুলনীয় : "The point we wish to make is that we do not have a science of test construction."—Ibid, Page 50

(১) **পরীক্ষার বিষয়বস্তু পঠনে যেন খুব কম অসুবিধা হয়** (Keep the Reading Difficulty of Test Items low) : প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করার সময় আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে পরীক্ষার্থী যেন পরিষ্কারভাবে প্রশ্ন পড়তে পারে, অর্থাৎ, শব্দবাহুল্য না থাকাই শ্রেয়। প্রশ্নপত্র তৈরীর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরিমাপ করা। সুতরাং প্রশ্নপত্রপাঠে পরীক্ষার্থীর যাতে বিশেষ কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর দেওয়া কর্তব্য। অবশ্য যদি প্রশ্নপত্র দ্বারা পরীক্ষার পঠন বা লিখন ক্ষমতা বিচার করা হয় সেস্থলে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

(২) **পাঠ্যপুস্তক থেকে কোন বক্তব্যকে আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত না করা** (Do not lift a Statement Verbatim from the text-book) : পাঠ্যপুস্তক থেকে পংক্তি উদ্ধৃত করে প্রশ্নপত্র তৈরী না করাই শ্রেয়। কারণ, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার প্রবণতার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষার একটি প্রধান ত্রুটি হল, উহা শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার প্রবণতাকেই উৎসাহিত করে। সুতরাং বিষয়াত্মক পরীক্ষাতে যেন এ ধরনের ত্রুটি না থাকে।

(৩) **যদি প্রশ্নের কোন বিষয় কোন ব্যক্তিবিশেষের অভিমতের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে সে ব্যক্তি বিশেষের ( বা প্রামাণিক নজির ) নাম উল্লেখ করা** (If an Item is based on Opinion or Authority, Indicate whose Opinion or what Authority) : সাধারণতঃ, বিতর্কমূলক বিষয় প্রশ্নপত্রে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবুও কোন কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির চিন্তার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সেসব ক্ষেত্রে মতামতকে উদ্ধৃত করলে কার মতামত বা কোন্ প্রাথমিক নজির থেকে গৃহীত হয়েছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(৪) **প্রশ্নগুচ্ছ পরিকল্পনার সময় যাতে একটি প্রশ্ন অন্য প্রশ্নের জবাব প্রদানে কোন সঙ্কেত প্রদান না করে এ সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা** (In planning a set of Items for a test, care must be taken that one Item does not provide Cues to the answer of another Item or Items) :

বিষয়াত্মক পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত করা হয় সে সকল প্রশ্নের জবাব দেবার সময় পরীক্ষার্থী যেন একটি প্রশ্ন থেকে অন্য প্রশ্ন বা প্রশ্নগুলির

জবাবের কোন সংকেত বের করতে না পারে। এ সকল প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে আলাদা থাকবে।

(৫) **প্রশ্নপত্রে পরস্পর নির্ভরশীল প্রশ্ন যেন না থাকে** (Avoid the Use of Interlocking or Interdependent Items) : প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করার সময় যাতে একটি প্রশ্নের জবাব অন্য প্রশ্নের জবাবের একটি শর্ত (condition) না হয়ে পড়ে তা বিবেচনা করা উচিত। অর্থাৎ, প্রশ্নগুলি যেন স্বনির্ভর ও নিরপেক্ষ হয়। এই নিয়ম পূর্বোক্ত চতুর্থ নিয়মেরই একটি দিক মাত্র।

(৬) **একটি প্রশ্নপত্রে সঠিক জবাব যেন এলোমেলো ধরনের হয়** (In a set of Items, let the occurrence of correct responses follow essentially a random pattern) : প্রশ্নের জবাব বিশেষ কোন ধরনের অর্থাৎ হয় সত্য হবে, না হয় মিথ্যা হবে অর্থাৎ বিশেষ স্থলে সর্বত্রই একইভাবে চিহ্ন বসাতে হবে, এরূপ যেন না হয়। পরীক্ষার্থীর উত্তরদান একই ভাবে বা একই ধরনের করতে হবে, এমনটি যেন না হয়।

(৭) **প্রশ্নপত্রে কৌশল বা চাতুরীপূর্ণ প্রশ্ন না থাকা** (Avoid trick and catch question) : বিশেষ কোন প্রশ্নে কোন কৌশল বা চাতুর্যে শিক্ষার্থী কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে, তা পরিমাপ করার জন্য কৌশল বা চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে। তবে সাধারণক্ষেত্রে যেন কৌশল বা চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্ন না থাকে। এতে অভীক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

(৮) **প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্নবাক্যে ও অর্থে যেন কোন দ্ব্যর্থকতা না থাকে** (Try to avoid ambiguity of statement of meaning) : বিষয়াত্মক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে প্রশ্নবাক্য যেন সুবিন্যস্ত, সরল ও সহজবোধ্য হয়। অর্থের মধ্যে যেন কোন জটিলতা না থাকে। অর্থাৎ, প্রশ্নপত্র অনুধাবন ও বিচার করতে পরীক্ষার্থী যেন অযথা ভারাক্রান্ত না হয়।

(৯) **অতি সাধারণ বিষয় উল্লেখ করা থেকে সাবধান হওয়া** (Beware of Items dealing with Trivia) : অতি সাধারণ মামুলি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন না করাই উচিত। কোন অর্থপূর্ণ বা আবশ্যকীয় বিষয় প্রশ্নপত্রে স্থান পাওয়া উচিত। প্রশ্ন করার আগে পরীক্ষক যে প্রশ্নটি করছেন তা জানা বা না জানার মধ্যে কোন জ্ঞানগত পার্থক্য আছে কিনা বিবেচনা

করে দেখবেন। অর্থাৎ, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীর সঠিক জ্ঞান যাচাই করার জন্য পরীক্ষক বিষয়ের অংশগুলি বেছে নেবেন।

**১১। বিষয়াত্মক পরীক্ষা ও রচনাধর্মী পরীক্ষা (Objective type and Essay-type Examinations):** আমরা রচনাধর্মী পরীক্ষার সমালোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, বহু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও রচনাধর্মী পরীক্ষা অপরিহার্য। রচনাধর্মী পরীক্ষার মারাত্মক দুর্বলতা হল এর ব্যক্তি-সাপেক্ষতা। আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষা এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকার ফলে রচনাধর্মী পরীক্ষার উপরে বিষয়াত্মক পরীক্ষার প্রভাব আজ স্বীকৃত। নানাভাবে বিষয়াত্মক পরীক্ষা রচনাধর্মী পরীক্ষার উন্নতিসাধন করেছে। প্রথমতঃ, প্রশ্নপত্র রচনায় ও নম্বরদানে যাতে ব্যক্তিগত প্রভাব বেশী না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। দ্বিতীয়তঃ, কিছু সংখ্যক প্রশ্ন বিষয়াত্মক করার চেষ্টা হয়। তৃতীয়তঃ, প্রশ্নোত্তরের জন্য নমুনা ও সঙ্কেত প্রদান করে বিচার করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থতঃ, শিক্ষার্থীর অর্জিত নম্বরের সাধারণ মান নির্ণয় করা হয়।

এসব পরিবর্তন বিষয়াত্মক পরীক্ষার প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে।

## Questions

1. What is individual assessment? What do you measure?

Ans. (পৃঃ ৪২০-২২)

2. Distinguish between Intelligence test and Achievement test. What are the uses and limitations of Intelligence test?

Ans. (পৃঃ ৪২৫—পৃঃ ৪২৭)

3. Discuss the merits and demerits of essay-type examination.

Ans. (পৃঃ ৩২৩—পৃ ৩২৮)

4. What are the new-type tests? What improvements they have made upon the essay-type examination?

Ans. (পৃঃ ৪২৯—পৃঃ ৪৩৩)

5. Give a general ideas of objective tests. Indicate their uses and limitations. [B. A. 1965

Ans. (পৃঃ ৪২৯—পৃঃ ৪৩৩)

6. What do you understand by objective tests? Show your acquaintance with their merits and limitations. [B. A. 1967

Ans. (পৃঃ ৪২৯—পৃঃ ৪৩৩)

7. Write notes on:

Objective test. [B. A. 1964, 1970

Performance test [B. A. 1969

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

# সহজাত প্রবৃত্তি

## (Instincts)

### ১। সহজাত প্রবৃত্তির স্বরূপ (Nature of Instinct):

প্রবৃত্তি থেকেই ক্রিয়ার উৎপত্তি। এই প্রবৃত্তি দুরকমের হতে পারে, অর্জিত (acquired) এবং সহজাত (inherited)। ধূমপান, মাদকদ্রব্য পান, চা-পান—এগুলি হল অর্জিত প্রবৃত্তি। এগুলি জন্মগত নয় বা বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়। এসব প্রবৃত্তি নিজের চেষ্টায় অর্জিত। কিন্তু পাখীর বাসা তৈরী করার প্রবৃত্তি, শিশুর স্তন্য পানের প্রবৃত্তি—এগুলি হল সহজাত প্রবৃত্তি।[1] প্রাণী এগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। শিক্ষার দ্বারা এগুলিকে আয়ত্ত করতে হয় না। এগুলি বংশগত বা সহজাতভাবে একই শ্রেণীর প্রত্যেক প্রাণীতে একই ভাবে বর্তমান থাকে।

প্রবৃত্তি দুপ্রকার—অর্জিত ও সহজাত

1. 'সহজাত প্রবৃত্তি' শব্দটিকে অনেকে লৌকিক অর্থে ব্যবহার করেন এবং যে কোন প্রকার কর্ম করার শক্তি বা প্রবণতাকে সহজাত প্রবৃত্তি নামে আখ্যা দিয়ে থাকেন। আবার অনেকে একে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করে যে কোন প্রকার জন্মগত' প্রবৃত্তিকেই সহজাত প্রবৃত্তি বলে গণ্য করেন। যেমন, সঙ্গীত প্রবৃত্তি, চিত্রাঙ্কণ প্রবৃত্তি। কিন্তু মনোবিদ্যার 'সহজাত প্রবৃত্তি' শব্দটিকে একটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। যে কোন প্রকার কর্মপ্রবণতাই সহজাত প্রবৃত্তি নয়, অথবা, কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সঙ্গীত প্রবৃত্তি জন্মগত হলেও এগুলিকে সহজাত প্রবৃত্তি নামে আখ্যাত করা যুক্তিযুক্ত নয়। সহজাত প্রবৃত্তি একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত সকলের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে, শুধু ব্যক্তিবিশেষ বা প্রাণীবিশেষের মধ্যে থাকে না। যেমন সঙ্গীত প্রবৃত্তি বা চিত্রাঙ্কন প্রবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে দেখা গেলেও, যেহেতু এই প্রবৃত্তি সমগ্র জাতির সম্পত্তি নয়, এদের সহজাত প্রবৃত্তি বলা যায় না। সাম্প্রতিক কালে কয়েকজন মনোবিদ্ কোন কোন ক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তি এবং 'আবেগের' সহ অবস্থান লক্ষ্য করে উভয়কে অভিন্ন বলে মনে করেন। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিকে আবেগের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। জেম্‌স (James) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'আবেগ হল অনুভূতিপ্রবণতা, আর সহজাত প্রবৃত্তি হল কর্মপ্রবণতা।' ("An emotion is a tandency to feel, and an instinct is a tendency to act."—James.)

আমরা এখন সহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারি। যে সকল জন্মগত প্রবৃত্তির বশে একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জীব কোন রকম শিক্ষা বা পূর্বসঙ্কল্পের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এবং কাজের ফলাফল সম্পর্কে কোন ধারণা না করে বংশপরম্পরায় প্রায় একই রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে আত্মরক্ষা বা স্বজাতিরক্ষার জন্য একাধিক কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করে, সেই জন্মগত প্রবৃত্তিকে বলা হয় **সহজাত প্রবৃত্তি**। পাখীর বাসা বাঁধার প্রবৃত্তি, ডিমে তা দেওয়ার প্রবৃত্তি, শিশুর স্তন্যপানের প্রবৃত্তি প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তির উদাহরণ। সহজাত প্রবৃত্তিবশে যে কাজ করা হয় তাকেই বলা হয় **সাহজিক ক্রিয়া (Instinctive Action)**।

সহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞা

সাহজিক ক্রিয়া

**সহজাত প্রবৃত্তির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ**, সহজাত প্রবৃত্তি হল জন্মগত বা বংশগত প্রবৃত্তি। প্রাণী জন্মগত বা বংশপরম্পরায় এই সব প্রবৃত্তির অধিকারী হয়। এগুলিকে শিক্ষার দ্বারা আয়ত্ত করতে হয় না।

**দ্বিতীয়তঃ**, সহজাত প্রবৃত্তি জন্মগত হলেও সব সহজাত প্রবৃত্তিই জন্মের সময় থেকেই আত্মপ্রকাশ করে না। যেমন, পাখীর বাসা বাঁধার প্রবৃত্তি বা ডিমে তা দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্ম সময় থেকেই নিজেকে ব্যক্ত করে না। উপযুক্ত সময়ে এই প্রবৃত্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর স্তন্যপানের প্রবৃত্তি জন্ম সময় থেকেই নিজেকে ব্যক্ত করে, কিন্তু মানুষের যৌন প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে অনেক পরে।

সহজাত প্রবৃত্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

**তৃতীয়তঃ**, সহজাত প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া সমগ্র দেহযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র দেহযন্ত্রটি নিযুক্ত থাকে।

**চতুর্থতঃ**, একটা সমগ্র পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে সহজ প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে।

**পঞ্চমতঃ**, সহজাত প্রবৃত্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়; একটি জাতির সম্পত্তি। সহজাত প্রবৃত্তি একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায়। যেমন—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনপ্রবৃত্তি, বাৎসল্য, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি যে কোন জাতির প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান।

**ষষ্ঠতঃ**, সহজাত প্রবৃত্তি জন্মগত, যেহেতু বংশপরম্পরায় এই প্রবৃত্তি একই ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সে কারণে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার মধ্যে একটা যান্ত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়।

**সপ্তমত:**, সহজাত প্রবৃত্তি বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। অবশ্য এটি বিতর্কমূলক বিষয়। অনেক মনোবিদ্ মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি যে কেবলমাত্র পরবর্তী কালেই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তা নয়, সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রকাশের মধ্যেও বুদ্ধির পরিচালনা থাকে। মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তি বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কিনা, সে প্রশ্ন আপাততঃ উত্থাপন না করে বলা যেতে পারে যে, মানুষের ক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষা, রুচি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে অভ্যাসের সহায়তায় কোন কোন সহজাত প্রবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে অবদমিত ও বর্জিত হয়। তবে এ সম্পর্কেও মতভেদ দেখা যায়।

**অষ্টমতঃ**, সহজাত প্রবৃত্তি প্রাণীর কোন-না-কোন উদ্দেশ্যসাধন করে, যদিও প্রাণীর মধ্যে এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ব থেকে কোন সুস্পষ্ট চেতনা থাকে না। সহজাত প্রবৃত্তি প্রাণীর জৈবিক প্রয়োজন মেটায় এবং আত্মরক্ষা ও স্বজাতি রক্ষায় সহায়তা করে। কাজেই সহজাত প্রবৃত্তি চেতনাযুক্ত, জ্ঞাতসারে উদ্দেশ্যমূলক নয়, জৈবভাবে উদ্দেশ্যমূলক।

**নবমতঃ**, সহজাত প্রবৃত্তি মূলতঃ কর্মপ্রবণতা, অর্থাৎ, কর্মের মাধ্যমে এ প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে।[1] এই কারণে আবেগের সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। আবেগ হল জটিল অনুভূতি, সহজাত প্রবৃত্তি হল কর্মপ্রবণতা। আবেগ অন্তর্মুখী ; সহজাত প্রবৃত্তি বহির্মুখী। অবশ্য মনোবিদ্ ম্যাকডুগালের (*McDougall*) মতে সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে প্রত্যক্ষণ, আবেগ ও কর্মপ্রবণতা, এই তিনটি উপাদানই বিদ্যমান।

**দশমতঃ**, প্রাণীর শারীরিক ও স্নায়বিক সংগঠনের সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির বিশেষ সংযোগ আছে। প্রাণীর এই বিশেষ দেহসংগঠনের জন্যই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি এমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

**একাদশতঃ**, অনেক ক্ষেত্রেই সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগ যুক্ত থাকে, তবে আবেগ ও সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক নিয়ত বা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কিনা সে বিষয়ে মনোবিদদের মধ্যে মতবিভেদ দেখা যায়।

2. Though we speak of instinctive action or behaviour. an instinct is more a tendency or disposition to act, to behave."

—H. B. Bhatia : Elements of Educational Psychology, Page 83.

## ২। সহজাত প্রবৃত্তির উৎপত্তি সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of the origin of Instinct) :

সহজাত প্রবৃত্তির উৎপত্তি (Origin) সম্পর্কে দুটি মতবাদ প্রচলিত ছিল ; যথা—(ক) **লুপ্তবুদ্ধি মতবাদ** (The Theory of Lapsed Intelligence) এবং (খ) **প্রতিবর্ত-ক্রিয়া মতবাদ** (The Reflex Theory)।

(ক) **লুপ্তবুদ্ধি মতবাদ** (The Theory of Lapsed Intelligence) : এই মতবাদ অনুযায়ী সহজাত প্রবৃত্তি হল লুপ্তবুদ্ধি (Lapsed Intelligence) এই মতবাদ অনুসারে যেসব কার্যকে বর্তমানে সাহজিক ক্রিয়া বলে গণ্য করা হয়, সেগুলি আমাদের পূর্বপুরুষেরা বুদ্ধির সাহায্যেই সম্পন্ন করতেন, অর্থাৎ অতীতে এগুলি ছিল বৌদ্ধিক কার্য (Intelligent Action)। কিন্তু একই কাজ বার বার করার ফলে এগুলি ক্রমশঃ যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হতে লাগল এবং অভ্যাসে পরিণত হল। তারপর এইসব অভ্যাস পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে সহজাত প্রবৃত্তির আকার গ্রহণ করল। জীববিদ্ কোপ্ (*Cope*) এবং ভুণ্ড্ (*Wundt*) এই মতবাদের সমর্থক।

**সহজাত প্রবৃত্তি হল লুপ্তবুদ্ধি**

**সমালোচনা :**

লুপ্তবুদ্ধি মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ, এই মতবাদে অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা অমানুষিক বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এ নিছক অনুমান বা কল্পনা। দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধিক ক্রিয়া হল ঐচ্ছিক ক্রিয়া এবং সহজাত প্রবৃত্তি হল অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় রূপান্তর বিবর্তনের ধারাকে পশ্চাৎমুখী করে তোলে। তৃতীয়তঃ, জার্মান জীববিদ্ ভাইজমান (*Weismann*) এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দের মতে অর্জিত অভ্যাস বা অভিজ্ঞতালব্ধ গুণ বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয় না। তাঁর মতে একমাত্র জনন-কোষের স্বতঃস্ফূর্ত আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই (Internal Germinal Variation) বংশানুক্রমে সংক্রামিত হতে পারে।

(খ) **প্রতিবর্ত-ক্রিয়া মতবাদ** (The Reflex Theory) : এই মতবাদ অনুসারে সহজাত প্রবৃত্তি প্রথম থেকেই জন্মগত নয়, জীবন সংগ্রামের উপ-যোজনের প্রচেষ্টা থেকে উৎপন্ন। স্পেন্সার (*Spencer*), ভাইজমান (*Weismann*) প্রমুখ ব্যক্তিদের মতে সাহজিক ক্রিয়া হল প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল বা প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার অনুক্রম (a series of reflex acts)। আকস্মিকভাবে একটি

প্রতিবর্ত-ক্রিয়া আর একটি প্রতিবর্ত-ক্রিয়া সৃষ্টি করল ও দ্বিতীয়টি তৃতীয় একটি প্রতিবর্ত-ক্রিয়া সৃষ্টি করল এবং এইভাবে প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার একটি অনুক্রম সৃষ্টি হল এবং আকস্মিকভাবে এই প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার অনুক্রমটি বার বার সাধিত হয়ে ক্রমশঃ একটি অভ্যাসে পরিণত হল। শেষ পর্যন্ত এটি জীবের এমন একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হল যে, এটি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংক্রামিত হল এবং সহজাত প্রবৃত্তির আকারে আত্মপ্রকাশ করল।

**সাহজিক ক্রিয়া প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল**

**সমালোচনা:**

প্রতিবর্ত-ক্রিয়া মতবাদের প্রধান ত্রুটি এই যে, এই মতবাদে আকস্মিকতার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে। এই মতবাদ অনুসারে প্রতিবর্ত-ক্রিয়াগুলি আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছে এবং পরস্পরের সঙ্গে আকস্মিকভাবেই যুক্ত হয়েছে, অথচ তার শেষ ফল জীবনের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু এ কি ভাবে সম্ভব হতে পারে?

**আকস্মিকতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ**

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ সহজাত প্রবৃত্তির মূলে যে মানসিক উপাদান আছে তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। যেমন, যে পাখী সহজাত প্রবৃত্তিবশে বাসা তৈরী করছে তার মনোযোগ বা আগ্রহ কেন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অসংখ্য বস্তুর মধ্যে খড়কুটোর দিকেই ধাবিত হবে, অর্থাৎ সহজাত প্রবৃত্তি-সম্পাদনের পেছনে জীবের যে আগ্রহ থাকে সেই আগ্রহের কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এই মতবাদ দিতে পারে না।

**এই মতবাদ সহজাত প্রবৃত্তির মূলে যে মানসিক উপাদান আছে তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না**

## ৩। সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে যন্ত্রবাদীদের অভিমত (Mechanical View of Instinct):

হারবার্ট স্পেন্সার (*Herbert Spencer*), লোয়েব (*Loeb*), উইলিয়ম জেমস (*William James*), থর্নডাইক (*Thorndike*), এবং ওয়াটসন (*Watson*) প্রমুখ আচরণবাদীরা এই মতবাদের সমর্থক। এঁদের মতে প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তি হল অন্ধ এবং যান্ত্রিক প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল (Chain Reflex)। ওয়াটসন নিজেই বলেছেন যে, 'an instinct is a series of chain reflexes'. একটি উদ্দীপক একটি প্রতিবর্ত-ক্রিয়া শুরু করে এবং সেই প্রতিবর্ত-ক্রিয়াটি আর একটি প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল রচিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়াটি একটি সফল পরিণতি লাভ করে।

**সহজাত প্রবৃত্তি অন্ধ এবং যান্ত্রিক প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল**

সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়ার মধ্যে বুদ্ধির কোন স্থান নেই। প্রত্যেকটি ক্রিয়া অন্ধ এবং যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হলেও একটি পরিণতি লাভ করে। ক্রিয়ার শেষে যদিও একটা উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব নির্দেশ করা যায়, তবু উদ্দেশ্যটি সামনে থেকে প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খলকে নিয়ন্ত্রিত করে না। আসলে উদ্দীপকের জন্যই সহজাত প্রবৃত্তি ক্রিয়া করে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক: সিংহের পশু শিকার একটি সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু এই সহজাত প্রবৃত্তিটি একটি জটিল প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল, যেটি অন্ধ ও যান্ত্রিকভাবেই সম্পন্ন হয়। সিংহের প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে একটি নতুন উদ্দীপকের সৃষ্টি হয় এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ একটি নতুন অঙ্গ সঞ্চালন শুরু হয়। সিংহের ক্ষুধার অনুভূতি, দূর থেকে শিকারের গন্ধ পাওয়া, শিকার সন্ধান করা, শিকারের সন্ধান পেলে শিকারকে চুপি চুপি অনুসরণ করা, শিকারের নিকটবর্তী হয়ে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়া—এ সবই প্রতিবর্ত-ক্রিয়া। একটির পর একটি ক্রিয়া অন্ধ যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করা হয় বা শেষ পর্যন্ত সিংহের শিকারকে আয়ত্ত করা—এই সফল পরিণতি লাভ করে।

**সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধির পরিচালনা নেই**

আচরণবাদী ওয়াটসনও (*Watson*) সহজাত প্রবৃত্তির মানসিক দিকটি (psychical aspect) উপেক্ষা করে, তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া (stimulus-response) সূত্রের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে অঙ্গ সঞ্চালন সম্পর্কীয় জটিলতা (motor complexity) সহজাত প্রবৃত্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ওয়াটসন বলেছেন, "এ হল উপযুক্ত উদ্দীপনার ফলে সমষ্টিগত সুস্পষ্ট সহজাত প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশ।"[1]

**ওয়াটসনের ব্যাখ্যা**

থর্নডাইক (*Thorndike*) ও প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মানসিক উপাদান স্বীকার করে নিতে চান না। আচরণবাদীদের মত তিনিও মনে করেন, প্রাণীর আচরণ একটি বিশেষ পরিবেশে প্রাণীর প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।[2] এই প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা

**থর্নডাইকের ব্যাখ্যা**

1. "......a combination of explicit congenital responses unfolding serially under appropriate stimulation."—Watson.

2. এই ক্রিয়ার মধ্যে তিনটি উপাদন আছে। যথা—(১) প্রথমতঃ, পরিবেশ—ব্যক্তির দেহের অভ্যন্তরে এবং দেহের বাইরের পরিবেশ যা ব্যক্তির মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। (২) দ্বিতীয়তঃ, প্রতিক্রিয়া—এই প্রতিক্রিয়া হল উদ্দীপনাহেতু প্রাণীর দেহে কতকগুলি পরিবর্তন। (৩) তৃতীয়তঃ, একটি যোগসূত্র যা পরিবেশ ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগকে সম্ভব করে তোলে।

করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, দেহের সংগঠনের মধ্যে নিউরনের বিন্যাস ও ব্যবস্থার (order of arrangement) উপরই পরিবেশ ও প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধটি নির্ভর করে। সুতরাং প্রাণীর জন্মগত আচরণ প্রতিবর্ত-ক্রিয়া ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়।[1] সুতরাং কি উদ্দেশ্যসাধন করছে, তার সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নয়, বরং কোন্ উদ্দীপক এই সহজাত প্রবৃত্তিকে কার্যকর করে তুলছে তারই সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করা যুক্তিসঙ্গত।

**সমালোচনা :**

সহজাত প্রবৃত্তির যান্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। পূর্বোক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি আনা যেতে পারে :

(১) প্রথমতঃ, এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যামাত্রই যান্ত্রিক ব্যাখ্যা এবং সে কারণে প্রাণীর আচরণকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করলেই প্রাণীর আচরণের যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। যে ব্যাখ্যা-পদ্ধতি পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে উপযোগী, সে ব্যাখ্যা মন এবং প্রাণের ক্ষেত্রেও যে উপযোগী হবে এমন কোন কথা নেই।

মন ও প্রাণের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ব্যাখ্যার অসারতা

তাছাড়া প্রাণীর আচরণ উদ্দেশ্যমূলক। প্রাণী তার আচরণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধন করে। সাহজিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেতনা খুব সুস্পষ্ট নয় সত্য, তবু সাহজিক ক্রিয়ার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ, সহজাত প্রবৃত্তিকে প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল বলা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। কফকা (*Koffka*)-র মতে প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন আংশিক ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত, যেটি প্রাণিদেহের নিউরনের সংস্থানের দ্বারাই বাহ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা আছে এবং এই ক্রিয়ার একটা অবিচ্ছিন্ন গতি লক্ষ্য করা যায়। এই ক্রিয়াকে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার সমষ্টি বলে মনে হয় না, বরং একটি সমগ্র ক্রিয়া বলেই অনুভব করা যায়, যার একটা শুরু আছে এবং

কফকার অভিমত

1. "One sees, therefore, that from this point of view there can be no form of inherited behaviour that is essentially different from the reflexes."
—Koffka : The Growth of Mind, Page 99.

একটা শেষ আছে। সুতরাং সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সমতুল্য, প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার সমতুল্য নয়। উভয় ক্ষেত্রেই সম্মুখ দিকে অগ্রসর হবার জন্য একটা গতি লক্ষ্য করা যায় এবং এই সম্মুখগতিই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য।

(৩) তৃতীয়তঃ, প্রতিবর্ত-ক্রিয়া ও সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও, উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে।

**প্রতিবর্ত ও সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বর্তমান**

মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল (*McDougall*) মনে করেন যে, প্রাণীর উদ্দেশ্যমূলক আচরণের যেসব বৈশিষ্ট্য; যেমন, স্বতঃস্ফূর্ততা (spontaneity), বিভিন্ন প্রচেষ্টাসহ অধ্যবসায়ের লক্ষণ, কোন লক্ষ্যের কথা চিন্তা করে কাজ করা এবং বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যমে সেই লক্ষ্যকে লাভ করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ার বৈচিত্র্য প্রতিবর্ত-ক্রিয়ায় দেখা যায় না। উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ায় ভবিষ্যতের প্রত্যাশা আছে, যা প্রতিবর্ত-ক্রিয়ায় নেই: উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু প্রতিবর্ত-ক্রিয়া পুনরাবৃত্তির দ্বারা পরিবর্তিত হয় না।

(৪) চতুর্থতঃ, যন্ত্রবাদীরা সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার কোন অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়। সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে ক্রিয়া স্বীকার করে না নিলে এ কিভাবে সম্ভব?

সুতরাং, সিদ্ধান্তে এ কথা বলা যেতে পারে, সহজাত প্রবৃত্তি প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল (chain reflex) নয় এবং প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণীর আচরণের

**সহজাত প্রবৃত্তি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়**

যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। প্রাণীর আচরণ উদ্দেশ্যমূলক এবং সে কারণে প্রাণীর আচরণের কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হতে পারে না। প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যার মানসিক উপাদানকে অস্বীকার করা চলে না।

## ৪। সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে জীববিজ্ঞানীদের অভিমত (Biological View of Instinct):

সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জেম্‌স (*James*), স্পেন্সার (*Spencer*) প্রমুখ ব্যক্তিরা নিছক জীববিজ্ঞানের দিক থেকে সহজাত প্রবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। যেসব মানসিক কারণে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে, সেগুলি এঁদের ব্যাখ্যায় স্থান পায় নি। এঁদের বক্তব্য, সহজাত

প্রবৃত্তি জীবদেহের যান্ত্রিক ক্রিয়া এবং সাহজিক ক্রিয়া প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল। সহজাত প্রবৃত্তি জৈব উপযোজনে (biological adaptation) সহায়তা করে মাত্র। জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর উপযোজন (adaptation) জীবনের মূলধর্ম। জীবকে তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে বেঁচে থাকতে হয়। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করে বেঁচে থাকবার জন্য যেসব মৌলিক ক্রিয়া প্রাণী সম্পন্ন করে, সেইগুলিই সহজাত প্রবৃত্তি। এই জাতীয় ক্রিয়া জৈবিক প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এগুলি শিক্ষালব্ধ নয়। প্রাণী জন্মগতসূত্রে এগুলির অধিকারী হয়।

যেসব মৌলিক ক্রিয়া প্রাণীকে পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনে সহায়তা করে সেগুলিই সহজাত প্রবৃত্তি

প্রত্যেকটি প্রাণী সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশের উপযোগী একটি দেহের গড়ন নিয়েই জন্মগ্রহণ করে এবং তার সেই দেহের গড়নই তাকে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক কর্ম করায়। মাকড়সার দেহের জন্মগত গড়নই এমন যে, জাল বোনার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ তার দেহেই রয়েছে। জাল বোনার প্রয়োজনীয় অঙ্গ এবং জাল বোনার যে প্রবণতা—এই জটিল ব্যবস্থা মাকড়সার অস্তিত্বের জন্যই প্রয়োজন। এই সব কর্ম প্রাণীর আত্মরক্ষায় এবং স্বজাতিরক্ষায় সহায়তা করে, যদিও সে সম্পর্কে প্রাণীর মধ্যে কোন পূর্ব-চেতনা নেই। যদি প্রশ্ন করা যায় যে পরিণতি সম্পর্কে প্রাণীর মধ্যে যখন কোন পূর্ব-চেতনা নেই তখন সহজাত প্রবৃত্তি কিভাবে সেই পরিণতির উপযোগী হতে পারে। এর উত্তরে তখন জীববিজ্ঞানীরা জীববিজ্ঞানীদের সাধারণ সূত্রগুলি অর্থাৎ, জীবন সংগ্রাম (Struggle for Existence), প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection), বংশগতি (Heredity), পরিবেশের সঙ্গে উপযোজন (Adjustment with the Environment) প্রভৃতির উল্লেখ করেন।

সহজাত প্রবৃত্তি প্রকাশের উপযুক্ত দৈহিক গড়ন

সহজাত প্রবৃত্তি প্রাণীর অস্তিত্বের জন্য এবং পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের জন্য প্রকৃতির দান। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে চলার জন্য প্রাণীকে কোন চিন্তা করতে হয় না। প্রাণীর দেহের গড়নের মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে যে, পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যদি কোন পরিবর্তন ঘটে এবং প্রাণীর সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যেও যদি কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহলে প্রাণীর দেহের মধ্যেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হয়। কাজেই সহজাত প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ

প্রাণীর দেহ-গড়নই দেহের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি সংগঠিত করে

যান্ত্রিকভাবে কার্য করে; কোন বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। দেহের মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে যে, পাকস্থলীর হজম ক্রিয়া যেন আপনাআপনি সম্পন্ন হয়; চোখ এমনভাবে গঠিত যে, তার মাধ্যমে দেখা ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। প্রাণীর দেহের গঠনও এমন যে, সাহজিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব-অভিজ্ঞতার সহায়তা ছাড়াই সম্পন্ন হয়।

**সমালোচনা:**

জীববিজ্ঞানীদের অভিমতের মধ্যে অনেকটা সত্য আছে। কিন্তু প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এ অভিমত খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। এ মতবাদ যথার্থই নির্দেশ করে যে, সহজাত প্রবৃত্তিগুলি প্রাণীকে তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে যার জন্য প্রাণী তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। কিন্তু এ মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগ আনা যেতে পারে।

সহজাত প্রবৃত্তি প্রাণীকে তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে

প্রথমতঃ, এই মতবাদের যাঁরা সমর্থক তাঁরা সাহজিক ক্রিয়া এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মধ্যে কোন প্রভেদ করেন না। কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া এবং প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও, উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে।

সাহজিক ক্রিয়া ও প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ অনুসারে প্রাণীর মধ্যে লক্ষ্য সম্পর্কে কোন পূর্ব-চেতনা নেই। প্রতিবর্ত-ক্রিয়াগুলি একটির পর একটি সম্পন্ন হয় এবং এগুলিই যান্ত্রিকভাবে প্রাণীকে তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে সহায়তা করে। কিন্তু আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তিপ্রসূত কার্য্যের মধ্যে লক্ষ্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলেও একটা ক্ষীণ ও অস্পষ্ট চেতনা থাকে। নতুবা কোন প্রাণী সাহজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান ও উপায়গুলি নির্বাচন করে নিত না। বাসা বাঁধার সময় পাখী যেসব উপাদান বাসা বাঁধার উপযোগী সেগুলিকেই নির্বাচন করে, লক্ষ্যহীনভাবে অন্ধের মতো যে কোন উপাদানই গ্রহণ করে না। সুতরাং, পাখীর মধ্যে যে কিছুটা দূরদর্শিতা আছে তা স্বীকার করতে হয়। এই মতবাদ প্রাণীর আচরণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন মানসিক উপাদান (psychical factor) স্বীকার

সাহজিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানসিকতাকে অস্বীকার করা চলে না

করে নেয় না। কিন্তু প্রাণীর আগ্রহ, মনোযোগ, লক্ষ্য সম্পর্কে অস্পষ্ট চেতনা প্রভৃতিকে বর্জন করে প্রাণীর আচরণকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সাহজিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানসিকতাকে অস্বীকার করা চলে না।

## ৫। সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে মনস্তত্ত্বমূলক মতবাদ (Psychological Theory of Instinct) :

এই মতবাদ জীববিজ্ঞানীদের সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কীয় মতবাদের বিরোধী মতবাদ। স্টাউট, ম্যাক্‌ডুগাল, উডওয়ার্থ, লয়েড মর্গান এবং মায়ার্স প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ এই মতবাদের সমর্থক। এঁদের মতানুসারে প্রাণীর আচরণের পেছনে যে মানসিক উপাদান আছে তাকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচন, বংশগতি পরিবেশের সঙ্গে উপযোজন এবং দৈহিক ও স্নায়বিক সংগঠনের দ্বারা প্রাণীর উদ্দেশ্যমূলক আচরণকে যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

প্রাণীর আচরণের মূলে যে মানসিক উপাদান আছে তাকে পরিহার করা চলে না

এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ স্বীকার করেন না যে, সহজাত প্রবৃত্তি প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল (chain reflex) মাত্র, কারণ প্রতিবর্ত-ক্রিয়া ও সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভেদ বর্তমান। প্রতিবর্ত-ক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়, কিন্তু সাহজিক ক্রিয়াগুলি যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার মধ্যে কোন বুদ্ধি লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে যে আগ্রহ, মনোযোগ, একাগ্রতা, কর্মবৈচিত্র্য এবং অভিজ্ঞতার সহায়তায় শিক্ষণের বিষয় লক্ষ্য করা যায় তা স্পষ্টই সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধিগত চেতনার (intellectual consciousness) উপস্থিত নির্দেশ করে।

সহজাত প্রবৃত্তি প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল নয়

সাহজিক ক্রিয়া ও প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার পার্থক্য

মনোবিদ্‌ স্টাউটের মতে সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রকাশের মধ্যেই প্রাণীর অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।[1] অভিজ্ঞতা মনোযোগের ফল এবং মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম

1. "..... even in the first performance of an instinctive act the influence of previous experience is by no means altogether excluded."
Stout : Manual of Psychology ; Page 392.

প্রকাশের মধ্যে মনোযোগের বাহ্য বৈশিষ্ট্যগুলি বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। বিশেষ বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের উপযোজন (adaptation), প্রাণীর সর্তকতা, প্রত্যাশা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রস্তুতি—সকল কিছুই প্রাণীর এই মনোযোগের বিষয়টি নির্দেশ করে। প্রাণীদের জটিল ক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র নয়। বিড়ালের শিকার অনুসন্ধান করা, শিকারের দেখা পেয়ে চুপি চুপি তাকে অনুসরণ করা এবং শেষ পর্যন্ত নিজ আয়ত্তের মধ্যে এনে তাকে নিহত করা এই সব কাজ একই জটিল কাজের ধারাবাহিক বিভিন্ন স্তর। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাণীর মধ্যে যে মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়, সেই মনোযোগই একটি ঐক্যের সূত্র হিসেবে বিভিন্ন ক্রিয়াগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে চালিত করে।

সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে মনযোগ রূপ মানসিক ক্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়

জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রাণীর সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে লক্ষ্য সম্পর্কে কোন পূর্ব-চেতনা নেই, সাহজিক ক্রিয়া অন্ধ যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শেষ লক্ষ্য (ultimate end) সম্পর্কে প্রাণীর কোন সুস্পষ্ট চেতনা না থাকলেও বর্তমান লক্ষ্য (proximate end) সম্পর্কে প্রাণী সচেতন। পাখী তার বাসা নির্মাণ করার জন্য যে কোন উপাদানই সংগ্রহ না করে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে। নির্বাচন ও বর্জন (selection and rejection) বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া; সেহেতু প্রাণীর মধ্যে যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট চেতনা আছে তা অস্বীকার করা চলে না। তাছাড়া, প্রাণী প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন-পদ্ধতির (trial and error method) মাধ্যমে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সহজাত ক্রিয়ার মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে।

সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যেও প্রাণীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্পষ্ট চেতনা লক্ষ্য করা যায়

লয়েড মর্গানও (*Lloyd Morgan*) মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা অধ্যবসায় (persistency with varied effort) লক্ষ্য করা যায়। কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাণী যদি উদ্দেশ্যসাধনে বিফল হয় তাহলে নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাণী উদ্দেশ্যসাধন করার জন্য সচেষ্ট হয়।

লয়েড মর্গানের অভিমত

মনোবিদ্ ম্যাকডুগালের (*McDougall*) মতে বুদ্ধি, অনুভূতি এবং কর্মপ্রবণতা—এই তিনটি মানসিক উপাদান সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বিদ্যমান।

ম্যাকডুগালের অভিমত

প্রাণী যে পূর্ব-অভিজ্ঞতার সাহায্যে সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে, প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে এ সম্পর্কে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করে না নিলে প্রাণীর পক্ষে অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয়। লয়েড মর্গান, মায়ার্স, স্টাউট প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাহজিক ক্রিয়া বারবার সম্পাদিত হওয়ার ফলেই যে সাহজিক ক্রিয়া পরবর্তীকালে বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়, তা নয়, সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রকাশের মধ্যেই বুদ্ধির পরিচালনা আছে। সুতরাং প্রাণী তার লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সচেতন না হলেও, প্রাণীর মধ্যে কিছু পরিমাণে ভবিষ্যৎদৃষ্টি বা দূরদর্শিতা প্রথম থেকেই দেখা যায়।

সাহজিক ক্রিয়া অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়, সেহেতু সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধির পরিচালন আছে

সুতরাং মানসিক উপাদান পরিহার করে কেবলমাত্র যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাহজিক ক্রিয়াকে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সমতুল্য মনে করে, প্রাণীর লক্ষ্যাভিমুখী আচরণের ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা কখনও সন্তোষজনক হতে পারে না।

## ৮। ম্যাকডুগালের সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ (McDougall's Theory of Human Instincts):

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আছে কিনা, এটি একটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন। এই সম্পর্কে মনোবিদ্ ম্যাকডুগালের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। ম্যাকডুগালের মতে মানুষের মধ্যে এমন কতকগুলি সহজাত প্রবণতা আছে, যেগুলি মানুষের, কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত সব রকম চিন্তা এবং কার্যের প্রয়োজনীয় উৎস। ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সহজাত প্রবৃত্তিই মানুষের কাজকে পরিচালিত করে।[1] সহজাত প্রবৃত্তিমূলক উত্তেজনাই সমস্ত কাজের লক্ষ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে (the instinctive impulses determine the ends of all activities...)। সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে ম্যাকডুগালের মতবাদ যন্ত্রবাদীদের মতবাদের (Mechanistic view of instinct) সম্পূর্ণ বিরোধী। ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে মানসিক উপাদান বর্তমান ; সাহজিক ক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। তাঁর মতে যে সকল অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ, তাদের সহায়তায় সহজাত প্রবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করা

1. "......that directly or indirectly the instincts are the prime movers of all human activity."

McDougall: An Introduction to Social Psychology. Page 38.

যুক্তিযুক্ত নয়। সহজাত প্রবৃত্তির গতি হল একটি লক্ষ্যাভিমুখী, একটি বিশেষ ধরনের অবস্থার পরিবর্তন—যেটি জীবদেহের উত্তেজনা ও অস্থিরতা দূর করতে পারে। সেই লক্ষ্যের সাহায্যেই সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

ম্যাকডুগালের সহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞা

ম্যাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এ হল "উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বা সহজাত দৈহিক-মানসিক প্রবণতা যা তার অধিকারীকে কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করতে (তার প্রতি মনোযোগী হতে) প্রবৃত্ত করে ও এরূপ একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর কোন বিশেষ প্রকৃতির আবেগজনিত উত্তেজনা অনুভব করতে এবং একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য প্রেরণা দেয়।"[1]

সহজাত প্রবৃত্তির তিনটি স্তর

পূর্বোক্ত সংজ্ঞা থেকে জানা যায় যে, সহজাত প্রবৃত্তিজাত কার্যধারার কয়েকটি স্তর আছে। যথা—(ক) ব্যক্তি একটি উদ্দীপক প্রত্যক্ষ করে বা তার প্রতি মনোযোগী হয়। যেমন, শিকারী বনের মাঝে কোন বাঘকে তার সামনে দেখতে পেল। (খ) ব্যক্তি একটা আবেগের উত্তেজনা অনুভব করল। যেমন, শিকারী বাঘটিকে দেখল এবং তার মনে ভয় জাগল। (গ) ব্যক্তি একটা বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করতে উদ্যত হয়। যেমন, শিকারীর মনে পলায়ন প্রবৃত্তি জেগে উঠল এবং তারপর হয়ত সে সত্য সত্যই দৌড়তে আরম্ভ করল। এক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তিটিই হল পলায়ন প্রবৃত্তি (instinct of escape) এবং এই প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল আবেগ হল ভয়।

ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তি হল জটিল মানসিক প্রবণতা। এর তিনটি দিক আছে—(১) জ্ঞানমূলক (২) অনুভূতিমূলক ও (৩) ক্রিয়ামূলক অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ, আবেগ ও কর্মপ্রবণতা সহজাত প্রবৃত্তির তিনটি উপাদান।

ম্যাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তির অনুভূতিমূলক উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে আবেগ সহজাত প্রবৃত্তির অপরিহার্য উপাদান এবং একটি করে মৌলিক আবেগ প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির অনুগামী।

ম্যাকডুগাল মোট চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং তাদের প্রত্যেকের অনুগামী করে এক-একটি মৌলিক আবেগের উল্লেখ করেছেন। এই চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে:

1. "We may therefore define 'an instinct' as an innate disposition which determines; the organism to perceive (to pay attention) any object of a certain class and to experience in its presence a certain emotional excitement and an impulse to action which find expression in a specific mode of behaviour in relation to that object,"

MaDougall: An Introduction 'o Soc'al Psychology; Page 110.

| সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) | মৌলিক আবেগ (Primary Emotion) |
|---|---|
| (১) পলায়ন প্রবৃত্তি (Instinct of Escape) | ভয় (Fear) |
| (২) সংগ্রাম প্রবৃত্তি (Instinct of Combat) | ক্রোধ (Anger) |
| (৩) বিতৃষ্ণা প্রবৃত্তি (Instinct of Repulsion) | বিরক্তি (Disgust) |
| (৪) বাৎসল্য প্রবৃত্তি (Parental Instinct) | স্নেহ (Tender feelings) |
| (৫) অনুনয় প্রবৃত্তি (Instinct of Appeal) | দুঃখ (Distress) |
| (৬) যৌন প্রবৃত্তি (Sex Instinct) | কাম (Lust or love) |
| (৭) কৌতূহল প্রবৃত্তি (Instinct of Curiosity) | বিস্ময় (Wonder) |
| (৮) খাদ্যান্বেষণ প্রবৃত্তি (Instinct of Food-Seeking) | ক্ষুধা (Hunger) |
| (৯) যূথ প্রবৃত্তি (Gregarious Instinct) | নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ববোধ (Feeling of Loneliness) |
| (১০) আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি (Instinct of Self-assertion) | আত্মগরিমাবোধ (Feeling of Superiority) |
| (১১) বশ্যতা প্রবৃত্তি (Instinct of Submission) | হীনমন্যতা (Feeling of Inferiority) |
| (১২) সংগ্রহ প্রবৃত্তি (Instinct of Acquisition) | অধিকারবোধ (Feeling of Ownership) |
| (১৩) সংগঠন প্রবৃত্তি (Instinct of Construction) | সৃষ্টির আনন্দ (Feeling of Creativeness) |
| (১৪) হাস্য প্রবৃত্তি (Instinct of Laughter) | কৌতুক বা আনন্দবোধ (Feeling of Amusement) |

এই চৌদ্দটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়াও ম্যাকডুগাল কয়েকটি অপ্রধান প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। যেমন—হাসি, কাশি, মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি।

মোট সতেরোটি সহজাত প্রবৃত্তি

পরবর্তীকালে পূর্বোক্ত চৌদ্দটি সহজাত প্রবণতার সঙ্গে ম্যাকডুগাল আরও তিনটি সহজাত প্রবণতাকে যুক্ত করে এই তালিকায় মোট সতেরটি সহজাত প্রবৃত্তির স্থান নির্দেশ করেছেন। এই নতুন তিনটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি মৌলিক আবেগ পরপৃষ্ঠায় দেখান হল ঃ

| | |
|---|---|
| বিশ্রাম প্রবৃত্তি (Instinct of Rest) | ক্লান্তিবোধ (Fatigue) |
| আরাম প্রবণতা (Instinct of Ease) | দুঃখ বিমুখতা (Aversion to Pain) |
| আবিষ্কার প্রবৃত্তি (Instinct of Exploration) | ভ্রমণস্পৃহা (Desire for Travels) |

ম্যাকডুগালের মতে মনুষ্যেতর প্রাণী এবং মনুষ্য উভয়েই এই সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে জ্ঞানমূলক উপাদান থাকার জন্য এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার দ্বারা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। যখন একাধিক সহজাত প্রবৃত্তি যুগপৎ ক্রিয়া করে, তখন আমরা একটি মিশ্র আবেগগত উত্তেজনা অনুভব করি এবং এই মিশ্র আবেগের মধ্যে মৌলিক আবেগের গুণগুলির কিছুটা অনুভব করতে পারি।[1]

**সমালোচনা :**

**'সহজাত প্রবৃত্তিকে' ব্যাপক অর্থে ব্যবহার**

(১) ম্যাক্‌ডুগাল 'সহজাত প্রবৃত্তি' শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি হাঁচি, কাসি, চুলকান প্রভৃতি প্রক্রিয়াকেও সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কিন্তু অনেক মনোবিদ্ এই ধরনের ক্রিয়াকে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী নন।

**মানুষের জটিল আচরণের ব্যাখ্যায় সহজাত প্রবৃত্তি উপযোগী নয়**

(২) ম্যাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে মানুষের জটিল ও বিচিত্র আচরণকে অত্যন্ত সরলভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মানুষের আচরণ এত জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, এত সহজ ও সরল সূত্রের সাহায্যে সেই কারণের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

তাছাড়া, ম্যাকডুগাল মানুষের সব বিচার-বুদ্ধিজনিত আচরণের (rational conduct) মূলে সহজ প্রবৃত্তির তাড়নাকে স্বীকার করে নিয়ে 'সহজাত প্রবৃত্তি' শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মনোবিদ্যায় 'সহজাত প্রবৃত্তি' শব্দটিকে একটি নির্দিষ্ট ও সীমিত অর্থে ব্যবহার করা হয়।

1. "While two or more instincts are simultaneously at work in us, we experience a confused emotional excitement in which we can detect some thing of the qualities of the corresponding primary emotion."

—McDougall : Outlines of Psychology ; Page 128.

(৩) মনোবিদ্ ড্রেভারের (*Drever*) মতে প্রতিটি আবেগের সঙ্গেই যে সহজাত প্রবৃত্তি যুক্ত থাকবে এমন কোন কথা নেই। আবেগ ছাড়াও সাহজিক ক্রিয়ার গতি অব্যাহত থাকতে পারে, তবে কোন কারণে সাহজিক ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হলে আবেগের আবির্ভাব ঘটে।

**প্রতিটি আবেগের সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কযুক্ত নয়**

মনোবিদ্ জেমসের (*James*) মতে প্রত্যেক আবেগের অনুগামী হিসেবে কোন সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব আছে, একথা বলা যেতে পারে না। সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যান করার জন্য আমাদের মধ্যে যে প্রশান্তির ভাব জাগে, তার সঙ্গে কোন সহজাত প্রবৃত্তি জড়িত আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, একই আবেগের ক্ষেত্রে একাধিক সহজাত প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ভয়ের আবেগ দেখা দিলে আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি এবং পলায়ন প্রবৃত্তি উভয়ই সক্রিয় হতে পারে। আবার বিভিন্ন আবেগের ক্ষেত্রে একই সহজাত প্রবৃত্তি ক্রিয়া করতে পারে। যেমন, পাখীর আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি ভয় ও ক্রোধ এই উভয় প্রকার আবেগের ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে পারে।

(৪) ম্যাকডুগালের তালিকাটি অভিনব হলেও বিজ্ঞানসম্মত নয়। সবক্ষেত্রেই সংগ্রাম প্রবৃত্তি থেকে ক্রোধের উদ্ভব হয় বা বাৎসল্য প্রবৃত্তি থেকেই স্নেহের উদ্ভব হয়, তা বলা যায় না।

**ম্যাকডুগালের তালিকা বিজ্ঞানসম্মত নয়**

(৫) ম্যাকডুগালের মতে সব সহজাত প্রবৃত্তিই অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। কিন্তু কোন কোন মনোবিদের মতে যৌন প্রবৃত্তি, বাৎসল্য প্রবৃত্তি, সংগ্রাম প্রবৃত্তি, সংগ্রহ প্রবৃত্তি প্রভৃতি কেবলমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয়, সামাজিক পরিবেশ থেকেও প্রাপ্ত।

**সব সহজাত প্রবৃত্তিই অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ নয়**

(৬) যেসব প্রবণতাগুলিকে ম্যাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তি বলে আখ্যাত করেছেন, সেগুলি বিভিন্ন ধরনের। সে কারণে সবগুলিকে একই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। যেমন, আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি, খাদ্যান্বেষণ প্রবৃত্তি এবং যৌন প্রবৃত্তির সঙ্গে একই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা চলে না, যেহেতু শেষোক্ত সহজ প্রবৃত্তিগুলি মানুষের দেহ-সংগঠনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।[1]

**সব সহজাত প্রবৃত্তিকে একই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা চলে না**

1. "Another more justified criticism was that the tendencies McDougall called instinctive are of widely different types. Such tendencies as self-assertion, for example (which is far from specific whether in the situations that arouse it, or in the type of activity to which it gives rise) cannot readily be put in the same category as impulses like sex and hunger which involve specialised phychological mechanisms."

Rex and Knight : An Introduction to Psychology, Page 185.

(৭) সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে মানুষের আচরণকে ব্যাখ্যা করার যে প্রচেষ্টা তা বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ সহজাত প্রবৃত্তি মানুষের আচরণের কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করে না, শুধুমাত্র বর্ণনা করে। পাখী ডিমে তা দেয় কেন, এর উত্তরে যদি বলা হয় ডিমে তা দেবার সহজাত প্রবৃত্তির জন্য ; বা মানুষ ভীতিজনক বস্তু দেখে পালায় কেন, কারণ মানুষের পলায়ন প্রবৃত্তি আছে—তাহলে একই কথার পুনরাবৃত্তি' করা হয়। সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে কার্যের ব্যাখ্যা করা হলেও কার্যের কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করা হয় না।

**সহজাত প্রবৃত্তি মানুষের আচরণের বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করে না**

ম্যাকডুগালের তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি সহজাত প্রবৃত্তি এবং সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানেন নি। সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের মধ্যে যে সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। আবেগের ধর্ম হল অনুভূতি এবং সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করা।

(৮) অনেক মনোবিদ্ মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি মতবাদ তত্ত্বের দিক থেকে যথার্থ বা অযথার্থ যাই হোক না কেন, ব্যবহারিক দিক থেকে মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এ মতবাদ খুব কাজে আসে না। মানুষ তার শৈশব অতিক্রম করার পর, নেহাৎ সহজ প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কাজ করে না, তার কাজ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। 'সহজাত প্রবৃত্তি' কথাটিকে অনেকে বংশগত অপরিবর্তনীয় কতকগুলি মৌলিক প্রবৃত্তি অর্থে গ্রহণ করেন এবং এই অর্থে তাঁরা মনে করেন যে, মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহজনক। অনেক আধুনিক মনোবিদ্ এই কারণে সহজাত প্রবৃত্তি শব্দটি ব্যবহার না করে, 'প্রেষণা' (Motive), নোদনা (Drive), প্রয়োজন (Need) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করেন।

**মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তি ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিশেষ উপযোগী নয়**

## ৭। সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি (Instinct and Intelligence) :

সহজাত প্রবৃত্তি হল জন্মগত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রবৃত্তি যেগুলি প্রাণীকে কতকগুলি জৈবিক অভাব এবং প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করে। সহজাত প্রবৃত্তি শিক্ষালব্ধ নয়। সহজাত প্রবৃত্তিবশে যে ক্রিয়া সম্পাদন

করা হয় তা প্রাণীর উদ্দেশ্যসাধন করে, যদিও প্রাণী তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ব থেকে সচেতন নয়। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে উপায়গুলি অবলম্বন করা হয় সেগুলি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় না। সহজাত প্রবৃত্তি যদিও জন্মগত তবু সব সহজাত প্রবৃত্তিই জন্মের সময় থেকে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে না।

**সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির পার্থক্য**

বুদ্ধি হল একটা মানসিক শক্তি যার সহায়তায় ব্যক্তি নতুন নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বুদ্ধির মধ্যে থাকে বিচার ও বিবেচনা-শক্তি। বুদ্ধি হল সহজাত এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির ক্রমবিকাশ ঘটে। বুদ্ধি প্রণোদিত কার্যেরও লক্ষ্য থাকে কোন উদ্দেশ্যসাধন করা। কিন্তু বুদ্ধি-প্রণোদিত কার্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ব-চেতনা থাকে এবং উদ্দেশ্যসাধনের উপায়গুলি পূর্ব থেকে স্থির করে নির্বাচন করা হয়।

**মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল (*McDougall*) সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়া এবং বিচার বুদ্ধিজনিত ক্রিয়ার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ নির্দেশ করেছেন:** সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়া হল উদ্দেশ্যমূলক, কিন্তু অনুরূপ পরিবেশের কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্রাণী এ ধরনের ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বিচারবুদ্ধিজনিত ক্রিয়ার লক্ষণ হল—প্রাণী পরিবেশের পূর্ব-অভিজ্ঞতার সাহায্যে লাভবান হতে পারে এবং এর সাহায্যে বর্তমান কার্যকে পরিচালিত করতে পারে। সহজাত প্রবৃত্তি হল উদ্দেশ্যমূলক কাজ করার জন্মগত ক্ষমতা, কিন্তু বুদ্ধি হল পূর্ব-অভিজ্ঞতার আলোকে জন্মগত ক্ষমতার মধ্যে উন্নতিসাধন করার ক্ষমতা।[1]

**ম্যাকডুগালের অভিমত**

অনেকে মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে একটা বৈপরীত্যের ভাব আছে। তাঁদের মতে ইতর প্রাণীর ক্রিয়া সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়; কিন্তু মানুষ পরিচালিত হয় বুদ্ধির দ্বারা, সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা নয়। জেম্স্ (*James*), স্পেন্সার (*Spencer*) প্রমুখ মনোবিদ্‌রা মনে করেন যে, সহজিক

**সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি পরস্পর বিপরীত**

1. "We may properly call "instintive" those actions of animals which seem to be purposive (i.e. exhibit the mark of behaviour) and which are performed by any animal independently of previous experience of similar situations."

"Intelligent action on the other hand, is generally defined as one which seems to show that the creature has profited by prior experience of similar situations that it somehow brings to bear its previous experience in the guidance of the present action' Instinct is native or inborn capacity for purposive action. Intelligence is the capacity to improve upon native tendency in the light of past experience.'—McDougall; Outlines of Psychology. Page 70

ক্রিয়া বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় না, যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। সাহজিক ক্রিয়া হল প্রতিবর্ত ক্রিয়া-শৃঙ্খল (chain reflex)।

সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে কিছুটা বৈপরীত্যের ভাব আছে তা অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু তবু উভয়ের মধ্যে খুব সুস্পষ্ট ভেদ রেখা টানা যায় না। বিচারবুদ্ধিজনিত কাজের মধ্যে যে দূরদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়, সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়ার মধ্যেও তা লক্ষ্য করা যায়। মানুষ যেমন ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে, পিপীলিকা এবং মৌমাছিও তেমনি ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে। বিচারবুদ্ধিজনিত কাজের মধ্যে যে একাগ্রতা, নিষ্ঠা, মনোযোগ ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন কার্যাবলীর ক্ষেত্রে এক নিবিড় যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়, মনুষ্যেতর প্রাণীর সহজাত ক্রিয়ার মধ্যেও এই গুণগুলি লক্ষ্য করা যায়। বিচারবুদ্ধিজনিত কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট চেতনা। সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে অন্তিম লক্ষ্য (ultimate end) সম্পর্কে চেতনা না থাকলেও, বর্তমান লক্ষ্য (proximate end) সম্পর্কে কিছুটা চেতনা থাকে। কেন বাসা তৈরী করছে, সে সম্পর্কে পাখীর চেতনা না থাকলেও, সে যে বাসা তৈরী করছে, এ সম্পর্কে চেতনা তার মধ্যে নিশ্চয়ই আছে।

**সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে সাদৃশ্য**

থর্নডাইক (*Thorndike*) প্রমুখ একদল মনোবিদ্ মনে করেন যে, শিক্ষার ব্যাপারে মানুষ এবং ইতর প্রাণী উভয়েই 'প্রচেষ্টা এবং ভুল সংশোধন পদ্ধতি'-র (Trial and Error Method) মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে এবং শিক্ষার ব্যাপারে সহজাত প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের প্রভাবই লক্ষ্য করা যায়। আবার স্টাউট (*Stout*), লয়েড মর্গান (*Lloyd Morgan*), মায়ার্স (*Myers*) প্রভৃতি মনোবিদ্‌দের মতে সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধি নিহিত থাকে এবং সে কারণেই ইতর প্রাণীর পক্ষেও বুদ্ধির সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে পরিবর্তিত করা সম্ভব হয়। যে কোন খাদ্যই খুঁটিয়ে খাবার জন্মগত প্রবৃত্তি মুরগীর বাচ্চার মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতার সহায়তায় সে অল্পদিনেই বুঝতে পারে কোন্‌টি অখাদ্য আর কোন্‌টি সুখাদ্য। শিকারী প্রাণী পূর্ব-অভিজ্ঞতার সাহায্যে তার শিকার করার পদ্ধতিকে নানাভাবে পরিবর্তিত করে। যে ইঁদুর একবার খাঁচা থেকে পালাবার সুযোগ পেয়েছে সেই ইঁদুর তার খাদ্য গ্রহণের সহজাত প্রবৃত্তিকে রোধ করে আর খাঁচার খাবারের দিকে পা বাড়ায় না।

**থর্নডাইকের অভিমত**

**সহজাত প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরিবর্তিত হয়**

**বুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তির পারস্পরিক সহযোগিতা**

মনুষ্যেতর প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে বুদ্ধি-ও সহজাত প্রবৃত্তির পারস্পরিক সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়, যার জন্য ম্যাকডুগাল (*McDougall*) বলেন, "সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি কার্যসম্পাদন এবং পরিচালনার দুটি ভিন্ন নীতি নয়.... কোন বাহ্যলক্ষণের সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণ এবং বৌদ্ধিক আচরণের মধ্যে তারতম্য করা যায় না।"[1]

উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নাই প্রবল। সময় সময় মনুষ্যেতর প্রাণীর আচরণের মধ্যে এমন অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় যে, তার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে বানরী তার মৃত সন্তানের মৃতদেহটি বহন করে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ায়। গরুর বাছুর মারা যাবার পর সেই মৃত বাছুরের চামড়া ও খড় দিয়ে তৈরী নকল বাছুরকেই নিজের সন্তান বলে মনে করে গরু তার দেহ লেহন করে। মানুষের মধ্যেও সহজাত প্রবৃত্তি আছে; কিন্তু মানুষ তার বুদ্ধির দ্বারা তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। জৈব প্রয়োজনের তাড়না অনুভব করা মাত্রই মানুষ ইতর প্রাণীর মতো সেগুলিকে চরিতার্থ করার জন্য উদ্যত হয় না। মানুষের বুদ্ধি তার উদ্দেশ্যের মূল্য নিরূপণে সহায়তা করে; তাই মানুষের বুদ্ধি তার সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে পরিমার্জিত ও সংস্কৃত করে; কখনও বা তার নির্বুদ্ধিতার জন্য তাকে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে দেখা যায়।

মনুষ্যেতর প্রাণীর আচরণের ক্ষেত্রে অসংগতি

## ৮। সহজাত প্রবৃত্তি কি বুদ্ধিবিযুক্ত? (Are Instincts blind?)

সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধির পরিচালনা আছে কি নেই?—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। জেম্‌স (*James*), স্পেন্সার (*Spencer*) প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি হল বুদ্ধিবিযুক্ত। সাহজিক ক্রিয়া অন্ধ প্রবৃত্তিবশে চালিত হয়। সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে সচেতন বুদ্ধি বিবেচনার কোন স্থান নেই। এই সব মনোবিদ্‌দের মতে সহজাত প্রবৃত্তিজনিত ক্রিয়া হল প্রতিবর্ত ক্রিয়া-শৃঙ্খল (chain reflex) এবং সাহজিক ক্রিয়া নিতান্তই যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। যে পাখীটি বাসা তৈরি করছে,

জেমস্‌, স্পেন্সার প্রভৃতির মতে সহজাত প্রবৃত্তি বুদ্ধিহীন

1. "......Instinct and Intelligence are not two diverse principles of action or of guidance of action"......"instinctive behaviour is indistinguishable from intelligent behaviour by any outward mark."—McDougall. Ibid.

সে পাখীটি যে তার অনাগত শাবকদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছে, সে সম্পর্কে তার কোন সচেতনতা নেই। এমন কি সে যে একটা বাসা তৈরী করছে সে সম্পর্কেও সে সম্পূর্ণ সজাগ নয়।

কিন্তু ম্যাকডুগাল (*McDougall*), স্টাউট (*Stout*) প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ সাহজিক ক্রিয়ার এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে সহজাত প্রবৃত্তি বুদ্ধিবিযুক্ত নয় এবং সাহজিক ক্রিয়া অন্ধ প্রবৃত্তি বশে পরিচালিত হয়ে নিছক যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। যে পাখীটা খড়কুটো দিয়ে তার বাসা তৈরী করছে সে যে তার অনাগত শাবকদের আশ্রয়ের জন্যই বাসা তৈরী করছে এই চরম বা দূরবর্তী লক্ষ্য (ultimate or remote end) সম্পর্কে সে সচেতন না হতে পারে; কিন্তু অদূরবর্তী বা বর্তমান লক্ষ্য (proximate end) এবং সেই লক্ষ্যসাধনের জন্য যে উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সে যে একেবারেই সচেতন নয় এমন কথা বলা চলে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অন্ধ নয়, তার মধ্যে কিছুটা দূরদর্শিতা আছে। যে পাখী ঠোঁটে করে খড়কুটো সংগ্রহ করছে, সে তার বাসা তৈরী করার জন্য যে কোন উপাদানই সংগ্রহ করে না, কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে এবং অপ্রয়োজনীয় উপাদান বর্জন করে। পাখীর এই উপাদান সংগ্রহের মধ্যে যে নির্বাচন ও বর্জনের (selection and rejection) বিষয়টি রয়েছে তা বুদ্ধিনির্ভর।

**ম্যাকডুগাল, স্টাউট প্রভৃতির মতে সহজাত ক্রিয়ার মধ্যে বুদ্ধির পরিচালনা আছে**

সহজাত প্রবৃত্তি যদি বুদ্ধিবিযুক্ত হয় তাহলে সাহজিক ক্রিয়াকে বুদ্ধিবিযুক্ত যান্ত্রিক ক্রিয়া বলে গণ্য করতে হয়। কিন্তু মানুষের মতো মনুষ্যেতর প্রাণীর আচরণও উদ্দেশ্যমূলক এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট চেতনা প্রাণীর মধ্যে থাকে। তাছাড়া, সহজাত প্রবৃত্তি যদি বুদ্ধিবিযুক্ত হয় তাহলে অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রাণী তার সাহজিক ক্রিয়াকে কিভাবে পরিবর্তিত করতে পারে? অথচ, বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, প্রাণী তার উদ্দেশ্যসাধন করার 'জন্য প্রচেষ্টা এবং ভুল-সংশোধন পদ্ধতি'-র (trial and error method) মাধ্যমে অগ্রসর হয় এবং প্রয়োজনমত কাজের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে। লয়েড মর্গানও (*Lloyd Morgan*) স্বীকার করেন যে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণীর মধ্যে নানাভাবে সচেষ্ট অধ্যবসায় (persistency with varied effort) লক্ষ্য করা যায়।

**সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধি না থাকলে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ বুদ্ধির দ্বারা কিভাবে পরিবর্তিত হয়?**

অবশ্য এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সহজাত প্রবৃত্তি প্রথম প্রকাশের মধ্যে বুদ্ধির কোন পরিচালনা থাকে না এবং সাহজিক ক্রিয়া বার বার সম্পাদিত হওয়ার জন্যই, সহজাত প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়।

কিন্তু এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষা গ্রহণ বুদ্ধির লক্ষণ। প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে প্রথম থেকেই বুদ্ধি নিহিত আছে এ কথা স্বীকার করে না নিলে প্রাণীর অভিজ্ঞতার সাহায্যে সাহজিক ক্রিয়াকে পরিবর্তিত করার বিষয়টিকে স্বীকার করা সম্ভব হয় না। তা না হলে মনোবিদ্ স্টাউটের (*Stout*) ভাষায় আমাদের বলতে হয়, "পূর্ব-বুদ্ধির পরিণাম হিসেবেই প্রথম বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটছে" **(intelligence first arises as a consequence of previous intelligence)**। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত স্ব-বিরোধী, সেহেতু ভ্রান্ত।

**অভিজ্ঞতার দ্বারা সাহজিক ক্রিয়ার পরিবর্তন সাহজিক ক্রিয়ার বুদ্ধির উপস্থিতি নির্দেশ করে**

সুতরাং, আমাদের সিদ্ধান্ত হল, প্রাণীর সাহজিক ক্রিয়া যখন প্রথমবার সম্পন্ন হয়, তখনও তার মধ্যে বুদ্ধির পরিচালনা থাকে। তবে এ বুদ্ধি মানুষের সুপরিণত বুদ্ধির সমতুল্য নয়। সাহজিক ক্রিয়ার প্রথম প্রকাশের মধ্যেও প্রাণীর লক্ষ্য সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট চেতনা আছে যদিও প্রাণীর লক্ষ্য সম্পর্কে এই সচেতনতা, বাইরের লোকের কাছে, খুব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না।[1]

**সাহজিক ক্রিয়ার প্রথম প্রকাশের মধ্যেই বুদ্ধির পরিচালনা থাকে**

## ৯। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আছে কি? (Has man instinct?)

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আছে কি নেই, এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মনোবিদ্দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ডারউইনের বিবর্তন সম্বন্ধীয় মতবাদ **(Darwin's Theory of Evolution)** প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে একদল মনোবিদ্ মনে করতেন যে, মনুষ্যেতর প্রাণীই সহজাত প্রবৃত্তির অধীন। ক্ষুধা, বাসা নির্মাণ, যৌন-কামনা প্রভৃতি প্রবৃত্তির প্রকাশ মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। মনুষ্যেতর প্রাণীর সব ক্রিয়াই অন্ধ প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু

**ডারউইনের পূর্ববর্তী লেখকদের অভিমত**

1. "In the first performance of an instinctive action, there will not be purely blind restlessness, but a rudimentary connection or active tendency directed towards an end which is an end for the animal itself and does not merely appear as if it were so to the external observer."
Stout: Manual of Psychology; Page 345.

মানুষ আত্মসচেতন বুদ্ধিমান জীব। মানুষের জীবন মূলতঃ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়, সহজ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় না। কিন্তু ডারউইন পরবর্তী যুগের মনোবিদ্‌গণ মনে করেন যে, মানুষের মধ্যেও অনেক প্রকারের সহজাত প্রবৃত্তি আছে, তবে মানুষ যেহেতু বুদ্ধিমান সে কারণে সে তার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং প্রয়োজন হলে অবদমিত ও বর্জন করতে সক্ষম হয়।

**ডারউইন-পরবর্তী লেখকদের অভিমত**

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের প্রথম বুঝে নেওয়া দরকার যে, 'সহজাত প্রবৃত্তি' শব্দটিকে কি অর্থে আমরা ব্যবহার করব। যদি সহজাত প্রবৃত্তি বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি 'সহজাত অঙ্গসঞ্চালন প্রবণতা' (inborn motor aptitude), তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রবৃত্তির সংখ্যা খুবই অল্প। স্তন্যপান করা, কোন কিছু নিয়ে মুখে পুরে দেওয়া, মুখের মধ্যে কিছু দিলে তা কামড়ান, হামাগুড়ি দেওয়া, হাসা, কাঁদা প্রভৃতি আবেগের প্রকাশ—এই কয়েকটি মাত্র সহজাত প্রবৃত্তি আমরা মানুষের মধ্যে দেখি। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে গেলে মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে মানুষের তুলনায় সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা অনেক বেশী এবং তার প্রকাশও অনেকটা সুস্পষ্ট। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি বলতে যদি আমরা 'সহজাত মানসিক প্রবণতা' (innate mental aptitude) বুঝি তাহলে মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা মনুষ্যেতর প্রাণীর তুলনায় কোন অংশে কম নয়। ম্যাকডুগাল (*McDougall*) যে চোদ্দটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন, সেগুলি ছাড়াও আমরা আরও অনেক সহজাত প্রবৃত্তির কথাও বলতে পারি। এই অর্থে সহজাত প্রবৃত্তি বলতে জন্মগত অনুরাগ, আগ্রহ এবং বিশেষ কয়েক ধরনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষালাভ করার ক্ষমতাকেও বোঝাবে। এই অর্থে নিউটনের (*Newton*) অঙ্কের প্রতি, মোজার্টের (*Mozart*) যন্ত্রসঙ্গীতের প্রতি এবং ডারউইনের (*Darwin*) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি যে সহজাত অনুরাগ বা আগ্রহ, তাকেও সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

**সহজাত প্রবৃত্তিকে কি অর্থে গ্রহণ করা হবে**

কিন্তু মনোবিদ্যায় আমরা 'সহজাত প্রবৃত্তি'কে এতখানি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে প্রস্তুত নই। সহজাত প্রবৃত্তি বলতে আমরা বুঝব সেই সব প্রবৃত্তি যেগুলি শিক্ষালব্ধ নয় ও যেগুলি একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং যেগুলি প্রাণীর কতকগুলি জৈব প্রয়োজন মেটায় ও যা

অপেক্ষাকৃত জটিল ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। কোন রকম মত-বিরোধের মধ্যে না গিয়ে বলা যেতে পারে যে, পূর্বোক্ত অর্থে মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই সব সহজাত প্রবৃত্তি হল কতকগুলি মৌলিক ও অপরিবর্তনীয় প্রবৃত্তি, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই সব সহজাত প্রবৃত্তি তার অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও রুচির প্রভাবে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়। মনুষ্যেতর জীব ক্ষুধা বা যৌন কামনার তাড়না অনুভব করা মাত্রই তার তাড়নাকে পরিতৃপ্ত করতে চায়। মানুষও এই সব প্রবৃত্তির তাড়না অনুভব করে, তবে সভ্য মানুষ রুচিসম্মত ও সমাজ-অনুমোদিত পথে অগ্রসর হয়ে সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়। মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি থাকলেও, সে মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত না হয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধি বা যুক্তির দ্বারাই চালিত হয়। পশুর প্রবৃত্তির প্রকাশ উন্মুক্ত ও অসংযত। মানুষের মধ্যে যদিও সেই একই সহজাত প্রবৃত্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তবু তার প্রকাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রুচিসম্মত, সুসংযত ও সমাজসম্মত। মানুষের বুদ্ধিই তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে পরিবর্তিত করে।

মানুষের কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি আছে তবে এগুলি অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়

### ১০। সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগ (instinct and Emotion) :

যেসব জন্মগত প্রবৃত্তির বশে একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জীব কোনরূপ শিক্ষা বা পূর্ব-সঙ্কল্পের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এবং কাজের ফলাফল সম্পর্কে কোন পূর্ব-ধারণা না করে, বংশপরম্পরায় প্রায় একই রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে আত্মরক্ষা বা স্বজাতির মঙ্গলের জন্য একাধিক কাজ ধারাবাহিক ভাবে করে, সেই সব জন্মগত প্রবৃত্তিকে সহজাত প্রবৃত্তি বলা হয় এবং ক্রিয়াগুলিকে বলা যায় সাহজিক ক্রিয়া। পাখীর বাসা বাঁধার প্রবণতা, ডিমে তা দেওয়ার প্রয়াস, প্রাণীর আত্মরক্ষার প্রেরণা, শিশুর স্তন্যপান, মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তির উদাহরণ। অপরদিকে আবেগ হল এক ধরনের জটিল অনুভূতি ; কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণা একে জাগরিত করে এবং দেহের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য বিশেষ ধরনের কতকগুলি দৈহিক প্রকাশ ঘটে যার জন্য আমরা নানা রকম কাজে প্রবৃত্ত হই। ক্রোধ, ভয়, হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি হল আবেগের উদাহরণ।

সহজাত প্রবৃত্তির ও আবেগের মধ্যে পার্থক্য

সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা এবং যদি কোন সম্পর্ক থাকেও, তাহলে সেই সম্পর্কের প্রকৃতি কি, এ বিষয়কে কেন্দ্র করে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে।

সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

কোন কোন মনোবিদ্ মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। বস্তুতঃ, দৈনন্দিন জীবনে উভয়ের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে কোন একটি কাজ সহজাত প্রবৃত্তিগত, না আবেগগত, কোন্‌টির বহিঃপ্রকাশ, বলা কঠিন হয়ে পড়ে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক; একটি কুকুর যখন আক্রমণকারী কোন ব্যক্তিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে, তখন কুকুরের এই চিৎকারকে ক্রোধ বা ভয় আবেগের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করতে পারি বা 'আত্মরক্ষা' এই সহজাত প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ বলে ধারণা করতে পারি। কোন ব্যাখ্যাই অযৌক্তিক নয়। আবার যে বস্তু আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে জাগরিত করে তা আমাদের মধ্যে আবেগেরও সঞ্চার করে। পায়ের কাছে একটা সাপ দেখলে আমরা আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে দূরে সরে যাই এবং ভয়ে আমাদের বুক দুরু দুরু করতে থাকে। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষারূপ সহজাত প্রবৃত্তি এবং 'ভয়' রূপ আবেগ, উভয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করে মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল সিদ্ধান্ত করলেন যে, উভয়ের মধ্যে একটি নিয়ত সম্বন্ধ (invariable relation) বর্তমান। ম্যাকডুগালের মতে, আবেগ সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত অংশ (integral part)। যেখানে সহজাত প্রবৃত্তি আছে, সেখানে আবেগ আছে; যেখানে পলায়ন প্রবৃত্তি আছে, সেখানে ভয় আছে; যেখানে সংগ্রাম প্রবৃত্তি আছ, সেখানে ক্রোধ আছে, যেখানে বাৎসল্য প্রবৃত্তি আছে, সেখানে স্নেহ আছে; আবার যেখানে যৌন প্রবৃত্তি আছে, সেখানে কাম আছে। ম্যাকডুগাল চৌদ্দটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তির এবং প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি করে আবেগের উপস্থিতির কথা বলেছেন।

ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের মধ্যে নিয়ত সম্পর্ক বর্তমান

ড্রেভারের মতে উভয়ের মধ্যে কোন নিয়ত সম্পর্ক নেই

অনেক মনোবিদ্ কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির ও আবেগের মধ্যে এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে স্বীকার করে নিতে ইচ্ছুক নন। মনোবিদ্ ড্রেভার (*Drever*) মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক আছে বটে, তবে উভয়ের মধ্যে কোন

অনিবার্য বা নিয়ত সম্পর্ক নেই। তাঁর মতে আবেগের অনুপস্থিতিতেও সাহজিক ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হতে পারে ; তবে সাহজিক ক্রিয়া কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হলে আবেগ দেখা দেয়।

মনোবিদ্ স্টাউটের অভিমত ড্রেভারের অভিমতেরই অনুরূপ। তাঁর মতে আবেগ সহজাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। আবেগ হল পরগাছা (**Emotion is parasitical in character**); অপরের উপরই আবেগের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

হেড, মায়ার্স প্রভৃতির অভিমত

হেড (*Head*), মায়ার্স (*Myers*) প্রভৃতি মনোবিদ্গণও মনে করেন যে, জীবনের ক্রমবিকাশের পথে সহজাত প্রবৃত্তির আবির্ভাব আবেগের পূর্বে ঘটেছে এবং আবেগ ও সহজাত প্রবৃত্তির একত্র উপস্থিতি বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেলেও, উভয়ের মধ্যে কোন অবিচ্ছেদ্য বা নিয়ত সম্পর্ক বর্তমান নেই।

আবেগ ও সহজাত প্রবৃত্তির পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হল, কোন কোন ক্ষেত্রে আবেগ সহজাত প্রবৃত্তির সহগামী হলেও, উভয়ের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ আছে একথা বলা চলে না।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক আবেগের সঙ্গেই কোন-না-কোন সহজাত প্রবৃত্তি জড়িত আছে, এমন কথা বলা চলে না। সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যান করার জন্য আমাদের মনে যে উচ্চস্তরের নৈর্ব্যক্তিক ভাবের উদয় হয়, তার সঙ্গে কোন সহজাত প্রবৃত্তির সংযোগ লক্ষ্য করা যায় না। আধ্যাত্মিক চিন্তায় যখন আমাদের মনে এক প্রশান্তির ভাব জাগে, তখন দেহে কোন রকম ক্রিয়াশীলতা থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে আবেগ ও সহজাত প্রবৃত্তি পরস্পর জড়িয়ে থাকলেও, উভয় অভিন্ন একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও আছে। জেম্‌স (*James*) বলেন, "আবেগ হচ্ছে অনুভূতি-প্রবণতা, আর সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে কর্ম-প্রবণতা" (**An emotion is a tendency to feel and an instinct is a tendency to act**)। আবার সাহজিক ক্রিয়া হল বহির্মুখী; আবেগের বহিঃপ্রকাশ থাকলেও, আবেগ অন্তর্মুখী।[1]

1. এ ছাড়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে জেম্‌স বলেছেন "আবেগ সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়ার তুলনায় দূরপ্রসারী নয়, কারণ আবেগের প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ ব্যক্তির দেহকে কেন্দ্র করেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিজনিত ক্রিয়া আরও অগ্রসর হয়ে অস্তিত্বশীল বস্তুর সঙ্গে কার্যকর সম্পর্কযুক্ত হয়"। ('Emotions fall short of instincts in that the emotional reaction usually terminates in the subject's own body whilst the instinctive reaction is apt to go farther and enter into practical relations with the existing objects ")

—James : Principles of Psychology, Vol. II, Page 442.

ব্যবহারবাদী ওয়াটসনের অভিমতও জেমসের অভিমতের অনুরূপ। ওয়াটসনের মতে[1] উদ্দীপকজনিত উপযোজন (adjustment) যখন আভ্যন্তরীণ এবং ব্যক্তির দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তখন পাই আবেগ; যেমন, লজ্জার ভাব। আর যখন উদ্দীপক সমস্ত দেহকেই বস্তুর সঙ্গে উপযোজনের জন্য পরিচালিত করে, তখনই পাই সহজাত প্রবৃত্তিকে; যেমন, আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া। তাছাড়া, তাঁর মতে আবেগের ক্ষেত্রে দৈহিক শক্তি সমস্ত দেহের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে তা উপযোজনের জন্য দেহের কয়েকটি অঙ্গে ঘনীভূত হয়। এই বিষয়টিকেই জেমস্ প্রকাশ করেছেন সংক্ষিপ্তভাবে—আবেগের ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি হল প্রচ্ছন্ন ব্যাপক ক্রিয়া, আর সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি হল সুপরিব্যক্ত, সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ।[2]

## ১১। অভ্যাস ও প্রবৃত্তি (Habit and Instinct) :

সহজাত প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের সম্পর্ক আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি বলে, এখানে এ প্রসঙ্গে আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

## ১২। প্রবৃত্তি ও শিক্ষা (Instinct and Education) :

শিক্ষা ও প্রবৃত্তির মধ্যে কি সম্পর্ক তা নির্ণয় করাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ। আমরা এ সম্পর্ককে দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করার প্রস্তাব করছি।

**শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব** (Effect of Instinct on Education) : প্রাচীন শিক্ষাদর্শে শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব ছিল অস্বীকৃত। অবশ্য এ অস্বীকৃতির মূলে অবৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক ধারণা কাজ করেছিল। প্রবৃত্তিকে নিম্নতর প্রাণীর অপরিহার্য ধর্ম বলে প্রাচীন কালে বিবেচনা করা হত। মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির প্রভাব স্বীকার করা অতি নিন্দনীয় ব্যাপার। প্রবৃত্তি-নিরোধই

1. When the adjustments called out by the stimulus are internal and confined to the subject's body we hate emotion e. g., blushing ; when the stimulus leads to adjustment of the organism as a whole to objects. we have instinct e. g., defence, responses, grasping etc."

—Watson ; Psychology from the Standpoint of a Behaviorist, Page 227,

2. "..... this means that while in emotion the organic energy scatters itself over the whole body, in instinct it is concentrated in certain limbs for the purpose of adaptation......In emotion the action is implicit mass action, whereas in instinct it is explicit, definitized and localised action."

—James ; Principles of Psychology Vol. II. Page 262.

ছিল শিক্ষার সার্থকতা। প্রবৃত্তিকে পরিহার করে যুক্তিধর্মী হওয়াই শিক্ষায় কাম্য। প্রবৃত্তিকে স্বীকার করার অর্থ নিম্নস্তরের আচরণকে মেনে নেওয়া।

অন্যদিকে প্রাচীনপন্থী প্রবৃত্তিবাদীরা বলেন, মানুষের জীবনে প্রবৃত্তির প্রভাব অপরিসীম। শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে প্রবৃত্তিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি যে ভাবে প্রবৃত্তিনিয়ন্ত্রিত সেভাবে তার পরিণত জীবনের বিচিত্র ও জটিল আচরণাবলীও প্রবৃত্তিপ্রসূত। শৈশবের কৌতূহলপ্রবৃত্তিই পরিণত জীবনের শিক্ষা ও গবেষণার মূলে কাজ করে। শৈশবের আসঙ্গলিপ্সাতাই তার ভবিষ্যৎ জীবনের নানা সংগঠন-সৃষ্টি ও সমাজ-চেতনার কেন্দ্রশক্তিরূপে পরিণত হয়।

আধুনিক যুগে ম্যাকডুগাল মোটামুটি প্রবৃত্তিবাদীদের বক্তব্য সমর্থন করেছেন। তিনি প্রবৃত্তির যে সংব্যাখ্যান দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, প্রবৃত্তি একা কোন আচরণ সংগঠিত করতে পারে না, প্রতিটি প্রবৃত্তির মূলে বর্তমান এক একটি প্রক্ষোভ। ব্যক্তির বিকাশে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ যৌথভাবে কাজ করে। শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রবৃত্তি ও তার সহযোগী প্রক্ষোভ সমানভাবে কাজ করছে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভগুলি নানা রসে (sentiment) পরিণত হয় এবং তখনই ব্যক্তিসত্তার গঠন শুরু হতে থাকে।

অবশ্য প্রবৃত্তি ও তার সহগামী প্রক্ষোভ ব্যক্তিত্বের মূলভিত্তি কিনা, বা কেবলমাত্র প্রবৃত্তিই ব্যক্তিত্বের সংগঠনী শক্তি, এ নিয়ে মতপার্থক্য বর্তমান। কিন্তু প্রবৃত্তিবাদীরা এ ব্যাপারে একমত যে, ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির অপরিমিত প্রভাব এবং প্রবৃত্তিই মানুষের আচরণের প্রেষণা-শক্তি।

প্রাচীন শিক্ষাদর্শে প্রবৃত্তি-পরিহার মতবাদ যেমন বিজ্ঞানসম্মত নয়, তেমনি প্রবৃত্তিবাদীদের সংব্যাখ্যানও যুক্তিযুক্ত নয়। প্রবৃত্তি মানুষের জীবনে সহজাত ও সক্রিয়, মানুষের উন্নততর আচরণের মূলে প্রবৃত্তি বর্তমান—একথা আমরা জানি। অন্যদিকে মানবাচরণে প্রবৃত্তির যে সর্বাত্মক ভূমিকার কথা বলা হয়েছে, তাও সমর্থনযোগ্য নয়।

'শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব'—এ প্রশ্নটি 'ব্যক্তিসত্তাগঠনে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব'—এ সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত। ব্যক্তিত্ববিকাশে বংশগতি একমাত্র নির্ণায়ক নয়। বংশগতি ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। বংশগতি ও পরিবেশের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান, এ প্রশ্ন এখানে

অবান্তর। প্রবৃত্তি বংশগতির একটি উপাদান। সুতরাং, শিক্ষাকে যদি ব্যক্তিত্ব, বিকাশের উপায় হিসেবে বর্ণনা করি তবে প্রবৃত্তির যথেষ্ট ভূমিকা শিক্ষায় বর্তমান একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়া পরিবেশের প্রভাবও রয়েছে প্রবৃত্তির উপর। পরিবেশ ও সহজাত প্রবৃত্তি যৌথভাবে শিশুর জীবনে নানা চাহিদা (needs) সৃষ্টি করে চলে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে এই চাহিদাই ব্যক্তিত্ব সংগঠনে সবচেয়ে বেশী কাজ করে। সহজাত চাহিদা (যেমন—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন কামনা) সীমিত ও সার্বিক, কিন্তু পরিবেশগত চাহিদা (সামাজিক বা ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক চাহিদা) অফুরন্ত, সদা পরিবর্তনশীল, জটিল ও বহুমুখী। জীবনবিকাশের প্রাথমিক স্তরে শিশুর জীবনে প্রবৃত্তিজাত চাহিদারই আধিপত্য, কিন্তু বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সন্নিকর্ষে নিত্য নতুন চাহিদা শিশু অর্জন করে। শিশুর ব্যক্তিসত্তার পরিণতি নির্ভর করে এসব পরিবেশগত বা অর্জিত (acquired) চাহিদার অতৃপ্তি বা তৃপ্তির উপর।

কিন্তু আমাদের এ আলোচনার এই অর্থ নয় যে শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিক্ষা একান্তভাবে প্রবৃত্তিনির্ভর নয়, কিন্তু প্রবৃত্তি-কেন্দ্রিক না হলে শিক্ষা অবাস্তব এবং জীবনবিরোধী হয়ে পড়বে। শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষক শিক্ষা প্রদান ও প্রবর্তনে প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে অগ্রসর হবেন। প্রবৃত্তিকে কিভাবে স্বীকার করে নিয়ে বিচক্ষণ শিক্ষক শিক্ষাকে সার্থক, সক্রিয় ও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন, এ নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি :

প্রথমতঃ, শিক্ষককে শিশুর জীবনবিকাশে প্রবৃত্তির প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষাকে প্রবৃত্তিমুখী করা চাই। তা না হলে শিক্ষা কৃত্রিম ও যান্ত্রিক হয়ে পড়বে। স্বভাববাদী (naturalist) শিক্ষাকে যখন স্বাভাবিক করে তুলতে চান তখন প্রবৃত্তির উপরই গুরুত্ব দেন বেশী। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক রুশো প্রবৃত্তির উপর এমন গুরুত্ব দিতে চান যে তিনি কোন সামাজিক চাহিদা বা পরিবেশের প্রভাব স্বীকার করতে রাজী নন। রুশোর বক্তব্যে অত্যুক্তি থাকলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রবৃত্তিমুখী না হলে শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ ও জীবনধর্মী হতে পারে না। সুতরাং প্রবৃত্তির গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যসূচী রূপায়ণ ও শিক্ষা-প্রদান করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রবৃত্তি কিভাবে শিক্ষাসহায়ক হয়, শিক্ষকের দৃষ্টি সেদিকে থাকবে। সার্থক শিক্ষাদানে আগ্রহ, মনোযোগ ইত্যাদি অপরিহার্য। শিক্ষক যদি শিশুর কৌতূহল প্রবৃত্তিকে সুপরিচালিত করতে পারেন তবে শিশুর নানা

বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ এবং মনোযোগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্ধিত হবে। শিক্ষায় আমরা যে সামাজিক আদর্শ ও সমাজচেতনকে লক্ষ্য রূপে স্থির করি, যৌথপ্রবৃত্তিকে সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষায় মর্যাদা দিলে সেসব উদ্দেশ্যসাধন বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে।

তৃতীয়তঃ, মানব-প্রবৃত্তিকে বিচিত্র ও বহুবিধ কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত করে শিক্ষক শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম করে দিতে পারেন। যেমন—ঘৃণা প্রবৃত্তিকে অসঙ্গত, রুচিবিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতি ধাবিত করে শিক্ষক শিশুর জীবনে রুচি ও সংস্কৃতিমূলক আচরণ বৃদ্ধি করতে পারেন। সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব এবং অন্যান্য শিক্ষাবিষয়ক বস্তু সংগ্রহের কাজে লাগান যেতে পারে। অবশ্য প্রবৃত্তির এ রূপান্তরে পরিবেশ পরম সহায়ক।

**প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব** (Influence of Instinct on Education) **:** শিক্ষা প্রবৃত্তির উপর নানা প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, একথা অতি সুপ্রাচীনকাল থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। কিন্তু শিক্ষায় প্রবৃত্তিকে কতটুকু নিয়ন্ত্রিত করা উচিত এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা যায়। প্রবৃত্তির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ শিক্ষায় অভিপ্রেত। এ প্রসঙ্গে সাধারণতঃ, তিনটি পন্থা লক্ষ্য করা যায়।

**(ক) অবদমন** (Repression) **:** প্রাচীন শিক্ষাদর্শে প্রবৃত্তিনিরোধ সমর্থিত হয়েছিল। প্রবৃত্তি মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়, সুতরাং প্রবৃত্তিকে দমন করা চাই। মানসিক শৃঙ্খলা (mental discipline) মতবাদ যারা বিশ্বাস করেন, তাঁরা বলেন, যখন কোন প্রবৃত্তির প্রকাশ অবাঞ্ছিত বলে মনে হবে, তখন সে প্রবৃত্তিকে দমন করা কর্তব্য।

কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞান দেখিয়েছে প্রবৃত্তিনিরোধ মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। অবদমিত প্রবৃত্তি নানা মানসিক জটিলতার সৃষ্টি করে এবং শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

**(খ) বিরেচন** (Catharsis) **:** অবদমনের বিপরীত মতবাদ হল বিরেচন। প্রবৃত্তিকে যথাযথভাবে প্রকাশের সুযোগ দিতে হয়। ফ্রয়েড বলেন, প্রবৃত্তিকে দমন করার ফলে ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সেই বিশেষ প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ দ্বারা তার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা যায়।

কিন্তু এ মতবাদও নানা কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রবৃত্তির অনিয়ন্ত্রিত ও অসংযত প্রকাশ ব্যক্তির জীবনে ও সমাজ-জীবনে অনেক অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া

সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, যুযুৎসা প্রবৃত্তি, বা যৌন প্রবৃত্তিকে যদি অবাধ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয় তবে সমাজ-জীবনে নানা বিশৃঙ্খলা এবং অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যার পরিণামে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। পৃথিবীতে বসবাস মোটেই আকর্ষণযোগ্য হবে না।

**(গ) উন্নীতকরণ (Sublimation):** উন্নীতকরণ মতবাদ পূর্বোক্ত দুই বিরোধী মতবাদের মধ্যবর্তী পন্থা। এ মতবাদ অবদমনকেও যেমন সমর্থন করে না, তেমন প্রবৃত্তির অবাধ বহিঃপ্রকাশকেও সমর্থন করে না। উন্নীতকরণ মতবাদ বিশ্বাস করে প্রবৃত্তি দমন করার অর্থ প্রবৃত্তির জৈবিক দিককে অস্বীকার করা, আর প্রবৃত্তির অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশের অর্থ মানবজীবনের বুদ্ধিগত দিককে অস্বীকার করা। উন্নীতকরণ পন্থায় প্রবৃত্তিগুলির অবাঞ্ছিত প্রকাশকে রোধ করে সমাজ ও ব্যক্তির মঙ্গলাদর্শে প্রবৃত্তির অভিপ্রেত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন বোঝায়।

'উন্নীতকরণ' শব্দটি সর্বপ্রথম ফ্রয়েডপন্থীরা (Freudians) ব্যবহার করেন। যৌন প্রবৃত্তির তাড়নাকে উন্নততর সামাজিক ধারায় প্রধাবিত করা প্রসঙ্গে প্রবৃত্তির উন্নীতকরণ করা উচিত বলে তাঁরা মনে করেন।[1] অবশ্য অধুনা 'উন্নীতকরণ' শব্দটি সকল প্রকার প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, কেবলমাত্র যৌন প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে এটা সীমিত নয়। ম্যাকডুগাল 'উন্নীতকরণ' শব্দের সংব্যাখ্যানে বলেছেন এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যাদ্বারা সহজাতপ্রবৃত্তিমূলক শক্তিগুলিকে আমরা বিভিন্ন রসে (sentiment) রূপান্তরিত করে সমাজ-সংস্কৃতিমূলক উন্নততর কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করেতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ, শিশুর যৌন প্রবৃত্তিকে নানা সৃজনশীল কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রকাশ করাতে পারি, শিশুর যুযুৎসা প্রবৃত্তিকে খেলাধূলা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর আচরণের রূপ দিতে পারি। শিক্ষায় আমরা আচরণের যে পরিবর্তন কামনা করি, সে পরিবর্তন অনেকটাই প্রবৃত্তির উন্নীতকরণ। মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি প্রভৃতি প্রবৃত্তির উন্নত প্রকাশ। এজন্য সকল প্রকার শিক্ষাকে সহজাত ধর্ম ও প্রক্ষোভের শিক্ষা বলে আখ্যাত করা হয় (All education consist in the educntion of instincts and emotion.)।

1. '...the unconscious process of deflecting the energy of the sexual impulse to new objects or aims of a non-seuxal and socially useful. nature''

W.M. Ryburr—'Introduction to Educational Psychology'—Page 25.

### ১৩। প্রবৃত্তি কি শিক্ষাযোগ্য? (Is Instinct Educable ?) :

প্রবৃত্তি সহজাত (innate), শিক্ষা-অর্জিত (acquired) নয়; সুতরাং, সহজাত যে প্রবৃত্তি সে কি শিক্ষাযোগ্য অর্থাৎ, প্রবৃত্তির প্রকাশে আমরা কি বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন আনতে পারি? মানব প্রবৃত্তি সহজাত, কিন্তু নমনীয় (p'astic), সম্পূর্ণ অন্ধ নয়। শিক্ষায় আমরা প্রবৃত্তি-বিনাশ কামনা করি না, কিন্তু প্রবৃত্তির অসংযত, অনিয়ন্ত্রিত এবং অবাধ প্রকাশও সমর্থন করি না। প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাবপ্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে তিনটি পন্থার কথা আলোচনা করেছি। আমরা দেখাতে চেয়েছি, প্রবৃত্তির বিলুপ্তি উচিত নয়। মনোবিজ্ঞানী জেম্‌স মনে করেন, প্রবৃত্তির বিকাশপথ রুদ্ধ করলে প্রবৃত্তির অবলুপ্তি ঘটান যায়। এ সম্পর্কে কোন বিতর্ক উত্থাপন না করেও বলা চলে, প্রবৃত্তি-নিরোধ জৈবিক দিক থেকে অসঙ্গত ও জীবনবিকাশের পরিপন্থী। সুতরাং আমরা প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে উন্নীত-করণ পন্থাই সমর্থন করি। প্রবৃত্তি শিক্ষার যোগ্য বলেই আমরা বিশ্বাস করি। প্রবৃত্তি সহজাত, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ নিম্নপ্রাণীর ক্ষেত্রে যেভাবে বৈচিত্র্যহীন এবং একরূপ (uniform), মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়। মানবপ্রবৃত্তি শিক্ষার দ্বারা নানা বিকাশপথ খুঁজে বিচিত্রধারায় প্রভাবিত হয়ে মানবপ্রকৃতিতে নানা পরিবর্তন, প্রবণতা ও রসের লীলা-খেলা সৃষ্টি করে। তাই প্রবৃত্তি সহজাত হলেও তার সার্থক পরিণতির জন্য শিক্ষানির্ভর, এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

1. What are instincts ? To what extent is human behaviour instnic-tive ? How is the knowledge of human instincts helpful to an educator. ? [ B. T. 1964

Ans. ( পৃঃ ৪৩৭-৩৯—পৃঃ ৪৬৪-৬৯ )

2. Discuss the place of instincts and emotions in the education of a child.

Ans. (পৃঃ ৪৬৪-৬৭—পৃঃ ৪৬১-৬৪ ) [ B, T. 1965

3. How is the knowledge of instincts so essential for an educator ? 'The whole task of education is to sublimate the instincts.' Discuss. [B. T. 1956

Ans. ( পৃঃ ৪৬৪—৪৬৭ )

4. Define instinct and its importance in education.

[ B. A. 1955. 63. & B. T. 1960

Ans. ( পৃঃ ৪৩৭-৩৯—পৃঃ ৪৬৪-৬৭)

5. Explain the nature of instinct and discuss whether instinct is emotional. [B. A. 1957

Ans. ( পৃ: ৪৩৭ ৩৯—পৃ: ৪৬১-৬৪ )

6. How do you reconcile innateness of instinct with their educability [B. A. 1967

Ans. ( পৃ: ৪৬৪—৪৬৯ )

7. What is an instinct? How would you reconcile the innateners of instincts with educabliity of human beings? [B. A. 1963

Ans. ( পৃ: ৪৩৭-৩৯—পৃ: ৪৬৪-৬৯ )

8. What according to McDougall, is the nature of instincts? Discuss the relation between instinct and emotion. [B. A. 1964

Ans. ( পৃ: ৪৪৯-৫৪—পৃ: ৪৬১-৬৪ )

9. Write a short essay on the concept of instinct, [B. A. 1966

Ans. ( পৃ: ৪৩৭-৩৯,—পৃ: ৪৬১-৬৪ ৪৬৪-৬৯ )

10. How would you distinguish between human instincts and needs? What is the importance of instincts in education? [B. U. 1962

Ans. ( পৃ: ৪৬ —৪৬৭ )

# চতুর্দশ অধ্যায়

# আবেগ বা প্রক্ষোভ

# (Emotion)

## ১। আবেগের স্বরূপ (Nature of Emotion) :

বিভিন্ন মনোবিদ্ আবেগের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। কোন কোন মনোবিদের মতে, **আবেগ হল দৈহিক পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত এক-জাতীয় সংবেদন**। কোন কোন মনোবিদের মতে **আবেগ হল অতীত সুখ-দুঃখের পুনরাবির্ভাব**। আবার কোন কোন মনোবিদের মতে **আবেগ হল কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী আচরণ করার প্রবণতা এবং আবেগ এক প্রকার ইচ্ছামূলক চেতনা**।

আবেগের সংজ্ঞা

আবেগের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যেতে পারে—**আবেগ** বা **প্রক্ষোভ হল এমন এক ধরনের জটিল অনুভূতি যার মূলে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান ; কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণা একে জাগরিত করে এবং দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য এমন কতকগুলি বিশেষ ধরনের দৈহিক প্রকাশ ঘটে যার জন্য আমরা নানারকম কাজে প্রবৃত্ত হই। ভয়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি আবেগের উদাহরণ।**

আবেগের পূর্বোক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নলিখিত দিকগুলি আমাদের লক্ষ্য করা যায় :

(১) আবেগ হল একটি জটিল অনুভূতি, অর্থাৎ সুখ দুঃখ বা এ জাতীয় কোনরূপ অনুভূতির অভিজ্ঞতা।

(২) আবেগ জাগরিত হলে দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়।

(৩) দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলে কতকগুলি বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। যেমন, ক্রুদ্ধ হলে চীৎকার করা, দাঁত কড়মড় করা, মুষ্টি বদ্ধ করা, ভ্রূকুটি করা ইত্যাদি।

(৪) আবেগ আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করে ; যেমন, ভয় পেলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে পালাবার চেষ্টা করি বা আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

মনোবিদ্ জেম্‌স (*James*)-এর মতে বস্তুর প্রত্যক্ষণ যে দৈহিক সংবেদন সৃষ্টি করে, তাই হল আবেগ। মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল (*McDougall*)-এর মতে আমাদের সব রকম আচরণ ও চিন্তার মূলে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান। প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে একটি করে আবেগ। এই আবেগ যখন প্রাণীর মনে জাগে, তখন ঐ সহজাত প্রবৃত্তিটি কার্যকর হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পলায়নবৃত্তি হল একটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে মৌলিক আবেগ সেটি হল ভয়। প্রাণীর মনে যখন ভয় জাগে তখন ঐ সহজাত প্রবৃত্তিটি অর্থাৎ পলায়নপ্রবৃত্তিটি কার্যকর হয়।

জেম্‌স-এর মত

ম্যাকডুগাল এর মত

মনোবিদ্ মেলন (*Mellone*) আবেগের দুটি উপাদানের কথা বলেছেন :

(i) **মানসিক দিক :** (ক) কোন একটা অবস্থা বা পরিস্থিতি (**situation**) প্রত্যক্ষ করা, স্মরণ করা, কল্পনা করা বা চিন্তা করা। এই পরিস্থিতি ব্যক্তির জাগতিক, মানসিক, সামাজিক বা উচ্চতর কোন উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত। (খ) একটা অনুভূতির দিক যা সুখকর বা দুঃখজনক। (গ) কর্ম করার প্রবৃত্তি এবং (ঘ) দৈহিক সংবেদন ও পেশীগত সংবেদন।

মেলন-এর মত
আবেগের বিভিন্ন
উপাদান

(ii) **দৈহিক দিক :** (ক) দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন এবং (খ) পেশী সঞ্চালন।

পূর্বোক্ত উপাদানগুলি মিলিত হয়ে আবেগ সৃষ্টি করে।

প্রথমতঃ, কোন একটি অবস্থা বা পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করলে, কল্পনা করলে, স্মরণ করলে বা চিন্তা করলে আবেগ জাগরিত হয়। যেমন, ছাড়া বাঘ দেখলে মনে ভয় জাগে ; অতীত দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করলে মনে ভয় জাগে।

দ্বিতীয়তঃ, আবেগের একটা অনুভূতির দিকে আছে যা হয় সুখজনক বা দুঃখজনক। যেমন, ভীতি যে অনুভূতি সৃষ্টি করে তা সুখকর নয়।

তৃতীয়তঃ, আবেগ ইচ্ছার উপর ক্রিয়া করে এবং আমাদের মধ্যে কর্মপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। সে কারণে বাঘ দেখে যখন মনে ভয়ের আবেগ জাগে তখন আমরা পালাবার জন্য সঙ্কল্প করি।

চতুর্থতঃ, আবেগ দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, সেই উদ্দীপনা যখন সংবেদনবাহী

স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছয়, তখন কতকগুলি দৈহিক সংবেদনের সৃষ্টি হয়। এই দৈহিক সংবেদন আবেগের প্রয়োজনীয় অংশস্বরূপ।

পঞ্চমতঃ, আবেগ পেশীগুলির মধ্যে গতি সঞ্চার করে। এই সঞ্চালনের ফলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, সেই উদ্দীপনা যখন সংবেদনবাহী-স্নায়ু মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায় তখন পেশীগত সংবেদন (motor sensation) সৃষ্টি হয়। এভাবে আবেগজনিত পেশীসঞ্চালন ঘটে থাকে।

সুতরাং আবেগের মধ্যে জ্ঞানগত, অনুভূতিমূলক এবং ইচ্ছাগত তিনটি দিকই বর্তমান। প্রত্যক্ষণ, কল্পনা বা স্মরণ হল জ্ঞানগত দিক, সুখ-দুঃখের অনুভূতি হল অনুভূতিমূলক দিক এবং কর্মপ্রবৃত্তি হল ইচ্ছামূলক দিক।

## ১। আবেগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Emotion):

মনোবিদ্ স্টাউট (*Stout*) আবেগের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

**(ক) আবেগের ব্যাপক পরিধি (Wide Range):** প্রত্যক্ষণ থেকে আরম্ভ করে ধারণা পর্যন্ত—মনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই আবেগ দৃষ্টিগোচর হয়। বিড়ালের বাচ্চাটির গায়ে হাত দিলে বিড়ালটি রেগে যায়। একটি শিশুর কাছ থেকে খেলনাটি কেড়ে নিলে সে ক্রুদ্ধ হয়। উভয় ক্ষেত্রে ক্রোধরূপ আবেগটি উদ্দীপিত হচ্ছে প্রত্যক্ষণের দ্বারা। আমরা ক্রুদ্ধ হই যখন অতীতের অপমানের কথা স্মরণ করি। এক্ষেত্রে স্মরণক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে। আমরা যখন কল্পনা করি যে, আমাদের শত্রু সুযোগ পেলেই আমাদের আঘাত করবে তখনই মনে ক্রোধের উদ্রেক হয়। এক্ষেত্রে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে কল্পনার মাধ্যমে। আবার যখন অন্য ব্যক্তি আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝতে চায় না, তখনও আমরা ক্রুদ্ধ হই। এক্ষেত্রে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে চিন্তার দ্বারা। সুতরাং মনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই একই আবেগ দৃষ্ট হচ্ছে। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই আবেগের মূলে রয়েছে কোন ধারণা। এই আবেগ মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীব সকলের ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে।

**(খ) একই আবেগ বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা উদ্দীপিত হতে পারে (Varied Nature of the Conditions):** একটি বিশেষ আবেগ, যেমন—ভয়, বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা উদ্দীপিত হতে পারে। আমাদের সামনে যদি একটা পাগলা কুকুর দেখি তাহলে আমরা ভীত হই। ভাল চাকরিটা

অপরের ষড়যন্ত্রে হারাতে পারি এই ভয়ে ভীত হই। আবার কোন প্রিয়জনের আকস্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে—এই ভয়ে ভীত হই। একই ভয় নানা কারণে উদ্দীপিত হচ্ছে। কোন কুকুরের কাছ থেকে তার খাবার কেড়ে নিয়ে আমরা তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারি, বা তার বাচ্চাদের বিরক্ত করে বা তার লেজ ধরে টানাটানি করেও তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারি। এভাবে একই ক্রোধ নানা কারণে জাগছে। মনোবিদ্ স্টাউট-এর মতে, কোন বিশেষ ধরনের অবস্থা বা পরিস্থিতিই বিশেষ ধরনের আবেগ জাগিয়ে তোলে।[1] আবেগটি যে আচরণের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে তা বস্তুবিশেষের তারতম্যের উপর নির্ভর করে না। যেমন—কুকুরকে যেভাবেই ক্রুদ্ধ করে তোলা যাক না কেন, তার বাইরের আচরণ মোটামুটি একই প্রকৃতির। যেমন—দাঁত দেখান, গর্জন করা, কামড়াবার চেষ্টা করা ইত্যাদি।

(গ) **আবেগ জাগার কারণ:** প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষণ, চিন্তা, কল্পনা, স্মরণক্রিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে আবেগ জাগতে পারে ; যেমন—ভাল সংবাদ পেলে মনে আনন্দের আবেগ জাগে। আবার দৈহিক পরিবর্তনের (organic changes) ফলেও আবেগ জাগতে পারে : যেমন—কোন মানুষ মদ্যপান করে আনন্দ লাভ করে।

(ঘ) **কোন আবেগ উদ্দীপিত হলে তা একটা মেজাজ (Mood) সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে আবেগটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়:** যখন আমাদের মনে কোন আবেগ জেগে ওঠে, সেই আবেগের উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পরও আবেগটি স্থায়ী হয়। সেই আবেগ একটা আবেগের মেজাজ (emotional mood) সৃষ্টি করে। যদি কোন কারণে আমরা ক্রুদ্ধ হই, তখন অনেক সময় লক্ষ্য করি যে, আমাদের ক্রোধের উপশম হলেও একটা খিটখিটে ভাব বা বদমেজাজ অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে যার জন্য যেকোন সামান্য উত্তেজনাতেই আমরা আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি।

(ঙ) **আবেগ হল পরাশ্রয়ী (Parasitical):** আবেগ পরাশ্রয়ী, যেহেতু সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই আবেগ উদ্ভূত হয়। ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে

1. **"It is a certain general kind of situation, not a specific class of objects which excites a cartain kind of emotion."**

**—Stout : Manual of Psychology ; Page 368**

থেকে যদি মাংসেটুর করোটি কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে সে ক্রুদ্ধ হয়। এই ক্রোধের কারণ তার ক্ষুধার প্রবৃত্তিকে মেটাবার পথে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। ক্ষুধা হল তার সহজাত প্রবৃত্তি (instinct)। যদি কোন বিড়ালীর নবজাত সন্তানকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবে; কারণ, অপত্য স্নেহের পথে বাধার সঞ্চার হচ্ছে। তার মাতৃত্বই তাকে তার সন্তান রক্ষা করার জন্য প্রবৃত্ত করে। মাতৃত্ব হল সহজাত প্রবৃত্তি। সুতরাং আবেগের পূর্বাবস্থাই হল সহজাত প্রবৃত্তি। সে কারণেই মনোবিদ্ স্টাউট বলেছেন যে, আবেগ হল পরাশ্রয়ী বা সহজাত প্রবৃত্তির পরগাছা। আবেগ প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করেই জন্মে।

**(চ) তীব্র আবেগের ক্ষেত্রে দৈহিক সংবেদন (Organic Sensation)**: যখনই আমাদের মধ্যে কোন আবেগ তীব্র হয়ে ওঠে; যেমন, অতিরিক্ত ভীতি বা ক্রোধ, তখন দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে দৈহিক সংবেদন দেখা দেয়। মনোবিদ্ জেম্‌স-এর মতে এসব দৈহিক সংবেদনই হল আবেগ।

মনোবিদ্ স্টাউট প্রদত্ত পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও আমরা আবেগের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি।

**(ছ) আবেগের আবির্ভাব আকস্মিকভাবে ঘটে থাকে**: যে ব্যক্তি কিছু পূর্বেও বেশ শান্ত ছিল, হঠাৎ সামান্য উত্তেজনায় সে এমন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠল যে তার আবেগের এই তীব্রতা বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

**(জ) আবেগ অনেক সময় আমাদের বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলে**: অনেক সময় খুব বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও ক্রোধবশতঃ অপরের প্রতি এমন দৃঢ় আচরণ করে যে, সাময়িকভাবে সে তার সকল রকম বিচারক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় আবেগবশতঃ মানুষ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয় বা আত্মহত্যা করে থাকে।

যদিও আবেগের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য আছে বলে আমরা মনে করি তবু সব আবেগের ক্ষেত্রেই যে বৈশিষ্ট্যগুলি সমানভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা নয়। তীব্র আবেগের ক্ষেত্রে (যেমন—ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি) এই বৈশিষ্ট্যগুলি যেরূপভাবে প্রকাশিত হয়, মৃদু আবেগের ক্ষেত্রে (স্নেহ, প্রেম, সহানুভূতি প্রভৃতি) এগুলি সেরূপভাবে প্রকাশিত হয় না।

## ৩। আবেগ ও দৈহিক পরিবর্তন : জেম্‌স-ল্যাঙ্গ মতবাদ (Emotion and Organic changes : James-Lange Theory) :

আবেগের দুটি দিক আছে—একটি হল মানসিক বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিক এবং অপরটি হল দৈহিক পরিবর্তনের দিক।

আবেগ আগে, না দৈহিক পরিবর্তন আগে

প্রশ্ন হল, কোন্‌টি আগে? অর্থাৎ, প্রথমে আবেগ জাগে এবং পরে দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয়, না প্রথমে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং তারপর আবেগটি জাগে? যেমন, যখন কোন ব্যক্তি বাঘ দেখে, তখন প্রথমে সে ভয় পায় এবং তারপর দৌড়ে পালায়, না প্রথমে সে দৌড়ায় পরে ভয় পায়?

সাধারণ মত

সাধারণ মতানুযায়ী প্রথমে আমাদের মধ্যে আবেগ উদ্দীপিত হয় এবং তারপর কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। যেমন, কোন একটি লোক একটি পাগলা কুকুর দেখে 'ভয়' পেল—অর্থাৎ তার মধ্যে 'ভয়' এই আবেগটি জাগল, যার ফলে শেষ পর্যন্ত সে দৌড়ে পালাল। সুতরাং লৌকিক মতানুযায়ী প্রথমে আবেগ, তারপর দৈহিক পরিবর্তন। আবেগ দৈহিক প্রকাশের পূর্বগামী।

আবেগ দৈহিক প্রকাশের পূর্বগামী

জেমস্‌-এর মত

কিন্তু আমেরিকান মনোবিদ্‌ উইলিয়াম জেম্‌স (*William James*) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং ড্যানিস শরীরতত্ত্ববিদ্‌ কার্ল ল্যাঙ্গ (*Carl Lange*) ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মতবাদের ঠিক বিপরীত একটি মতবাদ উপস্থিত করেন। তাঁদের মতে আবেগ হল দৈহিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ। দেহগত পরিবর্তন যে দৈহিক সংবেদন (organic sensations) সৃষ্টি করে, সেই দৈহিক সংবেদন হল আবেগ।

জেম্‌স ও ল্যাঙ্গ-এর মতে দৈহিক সংবেদনই আবেগ

**জেম্‌স-এর মতে দৈহিক পরিবর্তন আবেগের অনুগামী নয়, পূর্বগামী।** তাঁর মতে, আমরা যখন কোন একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে। সংবেদনবাহী স্নায়ু এই পরিবর্তনের সংবাদ মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায় ও তার ফলে দৈহিক সংবেদন সৃষ্টি হয় এবং আবেগ হল এই দৈহিক সংবেদনের অনুভূতি। কোন একটি লোক যখন তার সামনে একটি বুনো ভালুক দেখতে পেল, তখন বুনো ভালুকটি দেখা মাত্রই

তার মস্তিষ্কে উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। সেই স্নায়বিক উদ্দীপনা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু-মণ্ডলীর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে নানা প্রকার শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই প্রতিক্রিয়াগুলি ঘটার ফলে স্নায়বিক উদ্দীপনা স্নায়ুপথ বেয়ে আবার মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছল, তার ফলে 'ভয়'—এই আবেগের সৃষ্টি হল। সুতরাং **জেম্‌স-এর মতে প্রথমে দৈহিক পরিবর্তন, তারপর আবেগ। প্রথমে আবেগ তারপর দৈহিক পরিবর্তন নয়।**

**প্রথমে দৈহিক পরিবর্তন এবং পরে আবেগ**

**জেম্‌স্-এর মত এবং সাধারণ মত :** জেম্‌স-এর মতানুযায়ী আবেগ অনুভব করার প্রক্রিয়াটি হল :

**পরিস্থিতি→দেহগত পরিবর্তন→দৈহিক সংবেদন** বা **আবেগ**

সাধারণ মতানুযায়ী এই প্রক্রিয়াটি পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। যথা—

**পরিস্থিতি→আবেগ→দেহগত পরিবর্তন→দৈহিক সংবেদন**

জেম্‌স তাঁর মতবাদের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন।

**জেম্‌স-এর যুক্তি :** (ক) জেম্‌স-এর মতে প্রত্যক্ষণ এবং দৈহিক সংবেদনের মাঝামাঝি আবেগ বলে কিছুই নেই। অন্ধকারে যদি আমরা কোন একটি অজানা মূর্তিকে বন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার স্বাভাবিক গতি বাধা প্রাপ্ত হয়। কোন রকম ভয়ের ধারণা করার পূর্বেই দেহগত পরিবর্তনগুলি ঘটে যায়। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণ এবং দেহগত পরিবর্তনের মাঝামাঝি কোন আবেগ মনে উদ্দীপিত হয়েছে বলে আমরা অনুভব করি না। বস্তুটি প্রত্যক্ষণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই দেহগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। সুতরাং যাকে আবেগ বলছি তা দেহগত পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়।[1]

**আবেগ দেহগত পরিবর্তন ছাড়া কিছুই নয়**

1. জেম্‌স্ বলেন, "আমার মতবাদটি হল, উত্তেজনামূলক বস্তু প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গেই দৈহিক পরিবর্তন তার অনুগামী হয় এবং সেই পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের যে অনুভূতি তা-ই হল আবেগ। সাধারণ বুদ্ধি বলে, আমাদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে, আমরা দুঃখিত হই এবং ক্রন্দন করি। একটি ভালুকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, আমরা ভীত হই এবং দৌড়াই। আমাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বারা আমরা অপমানিত হই, আমরা ক্রুদ্ধ হই এবং আঘাত করি।" অধিক যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা হল, "আমরা কাঁদি বলেই দুঃখ অনুভব করি, আমরা আঘাত করি বলেই ক্রুদ্ধ হই, আমরা কাঁপি বলেই ভীত হই এবং দুঃখিত হই, ক্রুদ্ধ হই বা ভীত হই বলে কাঁদি, আঘাত করি বা কাঁপি।"—W. James: Text Book of Psychology, Page 375-76.

(খ) যদি আমরা কোন একটি আবেগ সম্পর্কে মনে মনে চিন্তা করি এবং এই আবেগের যে দৈহিক প্রকাশ সেগুলিকে যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে আবেগের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না ; যা অবশিষ্ট থাকবে তাহল, 'উত্তেজনাবিহীন নিরপেক্ষ বুদ্ধিগত প্রত্যক্ষণ' (a cold and neutral state of intellectual perception)। দৈহিক প্রকাশ ছাড়া আমরা কোন আবেগের কথা ভাবতে পারি না। কোন লোক ক্রুদ্ধ হয়েছে অথচ ক্রোধের কোনরূপ বাহ্যিক প্রকাশ, যেমন—ভ্রুকুটি করা, দাঁত কড়মড় করা, নাসিকা স্ফীত করা বা ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেওয়া, কোনটিই প্রকাশ করছে না—এ আমর ভাবতেই পারি না। জেম্‌স বলেন, "কায়াহীন মনুষ্য-আবেগ অলীক বস্তু ছাড়া কিছুই নয়" (A disembodied human emotion is a sheer non-entity)।

দৈহিক প্রকাশ ভিন্ন আবেগ হল উত্তেজনা-হীন বুদ্ধিগত প্রত্যক্ষণ

(গ) আবেগের দেহগত বহিঃপ্রকাশকে যদি রুদ্ধ করা যায়, তাহলে আবেগটিও তিরোহিত হয়। ক্রোধের সময় ক্রোধকে রোধ করার উপায় হল ক্রোধের বহিঃপ্রকাশকে প্রকাশ হওয়ার সুযোগ না দেওয়া।

(ঘ) মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের (pathological cases) লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাহ্য জগতের কোন উদ্দীপক ছাড়াই তাদের মনে আবেগের সৃষ্টি হয়েছে। উন্মাদ বা মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত রুগীদের (hysterical patient) ক্ষেত্রে দেখ যায় যে, কখনও তারা হাসছে, কখনও কাঁদছে বা কখনও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। বাহ্যিক কারণ ছাড়াই বিভিন্ন ধরনের আবেগ—যেমন রাগ, আনন্দ, দুঃখ তাদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এ কিভাবে সম্ভব? এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র দৈহিক অবস্থা বা পরিবর্তনের ফলেই আবেগ জন্মাতে পারে।

বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উদ্দীপক ছাড়াই আবেগ সৃষ্ট হয়

(ঙ) কৃত্রিমভাবে যদি আবেগের দেহগত বহিঃপ্রকাশকে ঘটান যায়, তাহলে মনের মধ্যে আবেগের সঞ্চার হয়। অনেক সময় দেখা যায় অভিনয় করার সময় ক্রোধ, দুঃখ, বিরক্তি, ভয় প্রভৃতি আবেগের বহিঃপ্রকাশকে বাইরে ঘটাবার প্রচেষ্টায় অভিনেতাদের মনে সেই সব আবেগ জেগে ওঠে।

কৃত্রিমভাবে দেহগত প্রকাশ সৃষ্টি করলে আবেগ সৃষ্ট হয়

(চ) মাদক দ্রব্য এবং উত্তেজক বস্তু গ্রহণ করার পর দেখা গেছে, অনেক লোক বেশ প্রফুল্ল বোধ করছে বা কেউ কেউ খুব সাহসী হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে দেহগত অবস্থাই যে আবেগগুলিকে জাগিয়ে তুলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মাদক দ্রব্য দেহগত অবস্থার পরিবর্তন এনে আবেগ সৃষ্টি করে

(ছ) দৈহিক প্রকাশের মাত্রাকে যতই বাড়ান যায় আবেগও সে অনুপাতে বাড়তে থাকে। ভয়ের সময় মানুষ যত অধিক কাঁপতে থাকে, ভয়ের মাত্রা সে অনুপাতে বাড়তে থাকে। রাগের সময় যত বেশী হৈ-চৈ করা যায়, রাগও সেই পরিমাণে আরও বেড়ে যায়।

দৈহিক প্রকাশ বাড়লে আবেগ বাড়ে

পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে জেমস্ (*James*) বলতে চান যে, কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করার ফলে যে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং এ সকল দৈহিক পরিবর্তন যে দৈহিক সংবেদন (organic sensation) সৃষ্টি করে তা-ই হল আবেগ। **আবেগ দৈহিক সংবেদন ছাড়া আর অতিরিক্ত কিছুই নয়।**

ড্যানিশ মনোবিদ্ কার্ল ল্যাঙ্গ (*Carl Lange*) পূর্বোক্ত মতবাদটিকে স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর মতবাদে বাহ্য-নিয়ামক প্রতিক্রিয়া (vaso-motor reactions) এবং আন্তরযন্ত্রীয় প্রতিক্রিয়ার (visceral reactions) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ল্যাঙ্গ-এর মতে আবেগের মধ্যে দুটি উপাদান আছে—একটি হল কারণ (cause) এবং অপরটি হল কার্য (effect)। কারণ হল কোন প্রত্যক্ষণ বা ধারণা ও কার্য হল বাহ্য-নিয়ামক প্রতিক্রিয়া (Vaso-motor reactions) বা দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত-প্রবাহগত পরিবর্তন এবং তার ফলে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন। উভয়ের অন্তবর্তী হিসেবে কোন অনুভূতির স্থান নেই। ল্যাঙ্গও মনে করেন যে, আবেগ হল অনুভূতিবর্জিত দৈহিক সংবেদনের সমষ্টি। তিনি বলেন, "আমাদের মানসিক জীবনের সমগ্র আবেগময় দিকটি, আমাদের আনন্দ এবং বেদনা, সুখ এবং দুঃখ—এ সব কিছুর জন্যই আমাদের বাহ্য-নিয়ামক প্রণালীর (Vaso-motor system) কথা চিন্তা করতে হবে।

কার্ল ল্যাঙ্গ-এর মতবাদ

যেহেতু ল্যাঙ্গ স্বাধীনভাবে জেম্স-এর পূর্বোক্ত মতটিকেই সমর্থন করেছেন সেহেতু মতবাদটিকে জেম্স-ল্যাঙ্গ মতবাদ (James-Lange Theory) নামে অভিহিত করা হয়।

**জেম্‌স-ল্যাঙ্গ মতবাদের সমালোচনা (Criticism of the James-Lange Theory) :** জেম্‌স-ল্যাঙ্গ-এর মতবাদের মধ্যে যে বেশ কিছুটা অভিনবত্ব আছে তাতে সন্দেহ নেই। এই অভিনবত্বের জন্যই একদিন এই মতবাদ মনোবিদ্‌দের জগতে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং বহু মনোবিদ্‌কে এ বিষয়ে গবেষণাকার্যে প্রণোদিত করেছিল। এই সব গবেষণাও প্রমাণ করেছে যে দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের একমাত্র কারণ নয়। কোন রকম মানসিক অনুভূতি ছাড়া আবেগ সম্ভব নয়। সমালোচকরা এই মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন :

সমালোচনা

দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের একমাত্র কারণ নয়

(ক) জেম্‌স-এর মতে দৈহিক প্রকাশ ছাড়া আবেগ সম্ভব নয়। কিন্তু সে কারণে এ কথা বলা যায় না যে, দৈহিক প্রকাশ এবং আবেগ অভিন্ন। দৈহিক প্রকাশ এবং আবেগের সহ-অবস্থান এ কথাই প্রমাণ করে যে, একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করা চলে না। কিন্তু উভয়কে অভিন্ন মনে করার কোনরূপ যুক্তি নেই। মনোবিদ্‌ স্টাউট (*Stout*) এই মতবাদের সমালোচনায় বলেন যে, "একটা পাথর জলের মধ্যে পড়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি না করে পারে না। তাই বলে ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিই পাথর নয়। ....আগুন ছাড়া ধুঁয়ো হয় না। কিন্তু ধুঁয়ো এক জিনিস এবং আগুন আর এক জিনিস।"[1]

দৈহিক প্রকাশ ও আবেগ অভিন্ন নয়

(খ) যেসব দৈহিক সংবেদন আবেগ সৃষ্টি করে এবং যেগুলি আবেগ সৃষ্টি করে না—এই উভয় প্রকার দৈহিক সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মনোবিদ্‌ স্টাউট বলেন, 'সুনিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, দৈহিক সংবেদনই আবেগ নয়, ক্ষুধা বা পেট ব্যথা আবেগ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা নয়।[2] জেম্‌স দৈহিক সংবেদন বলতে কি বোঝেন তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নি।

জেমস্‌ দৈহিক সংবেদনের অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেননি

(গ) বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনে কোন রকম বাইরের জগতের উদ্দীপক ছাড়াই আবেগের সঞ্চার হয়। জেম্‌স-এর অভিমতের বিরুদ্ধে একথা বলা

1. Stout : Manual of Psychology (Fifth Edition), Page 366
2. Ibid ; Page 367

যেতে পারে যে, এ সব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাকে আমরা আবেগ বলি সেগুলি হল আবেগের মেজাজ (emotional mood) এসব ক্ষেত্রে দৈহিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে কোন আবেগের সৃষ্টি করে না, আবেগের একটা মেজাজ সৃষ্টি করে এবং কোন প্রত্যক্ষণ বা ধারণা সঙ্গে সঙ্গে এই আবেগের মেজাজটিকে আবেগে রূপান্তরিত করে। উন্মাদ ব্যক্তির সব সময়ই একটা বিশেষ ধরনের মেজাজ থাকে এবং কোন উদ্দীপক, যখন সামান্য কারণেও তার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে তখনই তার আবেগ প্রকাশিত হয়।

বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যা দেখা যায় তা আবেগ নয়, আবেগের মেজাজ

অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যে, মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য আবেগ সৃষ্টি করে না, আবেগের মেজাজ সৃষ্টি করে। দৈহিক পরিবর্তনও আবেগের মেজাজ সৃষ্টি করে, আবেগ সৃষ্টি করে না।

(ঘ) জেম্‌স-এর মতে যদি কৃত্রিমভাবে আবেগের দৈহিক প্রকাশগুলিকে ঘটান যায় তাহলে আবেগের উদ্ভব হয়, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়। অভিনেতারা কৃত্রিমভাবে যে আবেগের সৃষ্টি করে তা স্থায়ী হয় না। অনেক অভিনেতাকে রঙ্গমঞ্চে করুণভাবে ক্রন্দন করার পরই যবনিকার অন্তরালে গিয়ে হাসতে দেখা গেছে; অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই আবেগটি দূরীভূত হয়েছে।

(ঙ) জেম্‌স আবেগ এবং দৈহিক সংবেদনকে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু মনোবিদ্‌ ওয়ার্ড (*Ward*)-এর মতে আবেগ হল অনুভূতিমূলক অবস্থা (affective state) এবং দৈহিক সংবেদন হল জ্ঞান-সম্পর্কীয় অবস্থা (cognitive state)। আবেগের প্রতি মনোযোগী হলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু দৈহিক সংবেদনের প্রতি মনোযোগী হলে সেগুলি অদৃশ্য হয়ে যায় না। যে লোক খুব সামান্য রাগ করেছে, সেই রাগের প্রতি যেই সে মনোযোগী হতে যায় তখনই রাগ পালায়। কিন্তু ক্ষুধার প্রতি মনোযোগী হলে ক্ষুধা অদৃশ্য হয়ে যায় না।

আবেগ হল অনুভূতি সম্পর্কীয়, দৈহিক সংবেদন হল জ্ঞান সম্পর্কীয়

(চ) আবেগ এবং তার দৈহিক প্রকাশ যদি অভিন্ন হয় তাহলে একই রকম দৈহিক প্রকাশ একই আবেগকে নির্দেশ করত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিভিন্ন আবেগের ক্ষেত্রে একই রকম দৈহিক প্রকাশ ঘটে থাকে। আমরা ভীত

হলেও আঘাত করি আবার ক্রুদ্ধ হলেও আঘাত করি। ব্যস্ত হলেও দৌড়াই আবার ভীত হলেও দৌড়াই। তাছাড়া, একই আবেগের বিভিন্ন ধরনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তি একভাবে রাগকে প্রকাশ করে, আবার অসভ্য ও অশিক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ অন্যভাবে দেখা দিতে পারে।

একই আবেগের ক্ষেত্রে একই রকম দৈহিক প্রকাশ ঘটে না।

এ ছাড়াও, যে দৈহিক প্রকাশকে আমরা কোন একটি আবেগের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করি, সেই দৈহিক প্রকাশটি দেখা দিলেও সেই আবেগটি দেখা নাও দিতে পারে। যেমন, আমরা ভীত হলে কাঁপি, আবার শীতেও কাঁপি। যখন শীতে কাঁপি, তখন মনে ভয়ের আবেগ কোথায়? সুতরাং কম্পনই ভয় নয়! মনোবিদ্ টিচেনার (*Titchener*)-র মতেও দৈহিক সংবেদন—দৈহিক সংবেদনই; হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করাকেই ভয়ের আবেগ বলা যেতে পারে না, রক্তগণ্ড হওয়াকেই লজ্জার আবেগ বলা চলে না।[1]

(ছ) আবেগের মধ্যে যে একটা চেতনা বা অনুভূতির দিক আছে, তা কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। মনোবিদ্ টিচেনার বলেন, "আবেগ হল খুব জটিল চেতনা, যেহেতু এর উদ্দীপক কোন বস্তু নয়, কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপক নয় বরং একটা সমগ্র পরিস্থিতি বা সঙ্কট। এ হল পুরোপুরি অনুভূতিমূলক চেতনা, যেহেতু এই পরিস্থিতি এবং আবেগের প্রতিক্রিয়াজনিত দৈহিক সংবেদন সুনিশ্চিতভাবে হয় প্রীতিকর বা না হয় অপ্রীতিকর।"[2] মনোবিদ্ স্টাউট-এর মতেও অনুভূতি আবেগের একটা উপাদান।[3]

1. "A group of organic sensation is after all, a group of organic sensations; palpitation of the heart is not, in itself, the emotion of dread; and blushing is not, in itself, the emotion of shame,"
—Titchener : Text Book of Psychology, Page 482

2. "It is a highly complex consciousness, since its stimulus is not an object, a perceptive stimulus, but some total situation or predicament. It is through and through an affective consciousness, since both the situation itself and the organic sensations of the emotive reaction are definitely pleasant or unpleasant. —Titchener : Text Book of Psychology; Page 482

3. "......and emotions would seem to ivolve a specific affective component." —Stout : Manual of Psychology : Page 367

(জ) জেম্‌স-এর মতে বস্তু প্রত্যক্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি দেহগত প্রতিক্রিয়া ঘটে। এই দেহগত প্রতিক্রিয়াগুলি আসলে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action) এবং এগুলিই আবেগ। কিন্তু দেহগত প্রতিক্রিয়া যদি প্রতিবর্ত ক্রিয়া হয় তাহলে একই বস্তু বা উদ্দীপক একই প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। প্রতিবর্ত ক্রিয়া সব ক্ষেত্রেই এক প্রকার। কিন্তু বস্তু অনুযায়ী যে আমাদের দেহগত প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয়, দৈনন্দিন জীবনে আমরা এর বহু উদাহরণ দেখি। খাঁচার ভালুক দেখলে আমরা ভয় পাই না, কিন্তু ছাড়া ভালুক দেখলেই দৌড়তে শুরু করি। সুতরাং বস্তু দেখে নয়, আসলে পরিস্থিতিই আমাদের মনে আবেগ জাগিয়ে তোলে।

**দেহগত প্রতিক্রিয়া ও পরাবর্তক ক্রিয়া এক নয়**

(ঝ) মনোবিদ্ স্টাউট-এর মত জেমস্, আবেগ যে পরাশ্রয়ী বা সহজাত প্রবৃত্তির উপরই যে আবেগের ভিত্তি, সে কথা ভুলে গেছেন। কোন বিড়ালীয় বাচ্চাগুলিকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে যে ক্রুদ্ধ হয় তার কারণ হল তার অপত্যস্নেহের পথে বাধার সঞ্চার হচ্ছে। মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল-এর মতে আবেগের একটা ইচ্ছামূলক দিক আছে। উডওয়ার্থ এবং ড্রেভারও মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তিগুলির ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হলেই আবেগের সঞ্চার হয়।

**আবেগ পরাশ্রয়ী বা সহজাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল**

(ঞ) শেরিংটন একটি কুকুরীর উপর পরীক্ষণকার্য চালিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, জেম্‌স-ল্যাঙ্গ মতবাদ ভ্রান্ত। তিনি কুকুরীটির সংবেদনবাহী স্নায়ুগুলি কেটে দিয়ে তার সব রকম আন্তরযন্ত্রীয় সংবেদন (visceral sensations) রহিত করে দিলেন, কিন্তু দেখা গেল তার পরেও কুকুরীটি ক্রোধ, আনন্দ, বিরক্তি এবং ভয় প্রকাশ করছে। সুতরাং আবেগ আন্তরযন্ত্রীয় সংবেদননির্ভর নয়।

**শেরিংটন-এর পরীক্ষণ**

(ট) ক্যানন, লুইস ও ব্রিটন বিড়ালের উপর অনুরূপ পরীক্ষণকার্য চালিয়ে জেম্‌স-ল্যাঙ্গ মতবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছেন। তাঁরা কয়েকটি বিড়ালের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু (sympathetic nerves) অস্ত্রোপচারের সহায়তায় অপসারিত করলেন এবং স্নায়ুর উপর নির্ভর যে ক্রোধের অবেগটি তার প্রকাশের সকলপথ রুদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু তবু দেখা গেল যে, বিড়ালগুলি ক্রোধের বাহ্যিক-লক্ষণগুলি, যেমন—গর্জন করা, দাঁত দেখান প্রভৃতি প্রকাশ করছে। সুতরাং

**ক্যানন, লুইস ও ব্রিটন-এর পরীক্ষণ কার্য**

দৈহিক অবস্থা যে ক্রোধরূপ আবেগের কারণ নয়—এর দ্বারা তা প্রমাণিত হল ; আবেগ দৈহিক সংবেদনের সমষ্টি নয়।

জেমস্ পরবর্তীকালে তাঁর মতবাদটিকে পরিবর্তিত করেছিলেন। তিনি তাঁর মূল মতবাদটির মধ্যে দুটি পরিবর্তন এনেছিলেন। প্রথমতঃ, তিনি প্রত্যক্ষণের অনুভূতির দিকটিকে স্বীকার করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন প্রত্যক্ষণ অনুভূতিবর্জিত ও উত্তেজনাহীন নয়। দ্বিতীয়তঃ, যে পরিস্থিতিতে বস্তুটিকে প্রত্যক্ষণ করা হয়, সেই পরিস্থিতিকেও তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

**James-এর মতবাদে পরিবর্তন**

সুতরাং জেমস্-এর মতবাদটির পরিবর্তিত রূপটি হল, আমরা প্রথমে একটি পরিস্থিতি (situation) পর্যবেক্ষণ করি যার একটি অনুভূতিমূলক দিক আছে। এই অনুভূতিযুক্ত প্রত্যক্ষণ দেহগত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এ সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছলেই আবেগের সঞ্চার হয়।

প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষণ এবং দেহগত প্রতিক্রিয়ার অন্তবর্তী অনুভূতিকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ, বস্তুটি যে অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে বর্তমান সেই পরিস্থিতিকে স্বীকৃতি দিয়ে জেমস্ মূল মতবাদটির অভিনবত্বকে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করেছেন এবং পরোক্ষভাবে লৌকিক মতবাদটিকেই যেন স্বীকৃতি দিয়েছেন।

**সমালোচনা**

সুতরাং **আমাদের সিদ্ধান্ত হল আবেগ দেহগত প্রকাশের পূর্বগামী**। জেম্স-এর মতবাদের মূল্য হল এই যে, দেহগত সংবেদন যে আবেগের অপরিহার্য অংশ, সেটি তিনি নির্দেশ করেছেন।

**ম্যাকডুগালের আবেগ ও প্রবৃত্তিতত্ত্ব (McDougall's theory of Instinct and Emotion) :** আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

## ৪। আবেগ ও শিক্ষা (Emotion and Education) :

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সার্থক শিক্ষার উপর আবেগের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। মানুষ যদিও চিন্তাশীল জীব কিন্তু তার জীবনের আচরণ ও কর্ম কেবল চিন্তাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না, তার মনের আবেগ, অনুভূতি তার আচরণ ও কর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মানবজীবনের সকল কর্মই আবেগ-বিধৃত। ম্যাকডুগালের ভাষায়, আবেগই আমাদের সকল কাজের প্রেরণা যোগায়। প্রতিটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রে যে ইচ্ছামূলক ও অনুভূতিমূলক শক্তি বর্তমান

তাকেই আবেগ বলা হয়। সে যেহোক, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আবেগ ও শিক্ষার সম্পর্ককে আলোচনা করলে দেখা যায়, শিক্ষার সাফল্য আবেগের সার্থক প্রয়োগের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

শিক্ষাপ্রদানকালে শিক্ষার্থীর আবেগ সম্বন্ধে শিক্ষকের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষাকে স্বতঃস্ফূর্ত করার কথা বলা হয়ে থাকে। শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত হতে হলে সে-শিক্ষা শিশুর জীবনধর্মী হওয়া উচিত এবং এখানেই আবেগের সঙ্গে শিক্ষার সহজ সম্পর্ক বর্তমান। ভয় বিরক্তি, বিষাদে যদি শিশুর মন ভারাক্রান্ত থাকে, সে যদি সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সহপাঠী এবং শিক্ষকের সঙ্গে যদি তার প্রীতির সম্পর্ক না থাকে বিদ্যালয়ের পরিবেশে সে যদি গৃহের আনন্দ লাভ না করে তবে শিশুর শিক্ষা-গ্রহণ ব্যাহত হবে। অন্যদিকে আনন্দ, বিস্ময়, কৌতূহল, আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করে। এজন্য শিক্ষককে শিক্ষা-প্রদান কালে শিশুর মনে শিক্ষার অনুকূলে আবেগ সঞ্চার করতে হবে। অধিতব্য বিষয়ের প্রতি যাতে সহজে শিশু-মনে অনুরাগ, আনন্দ, কৌতূহল ইত্যাদি সঞ্চারিত হয়, সেদিকে শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষা যাতে আবেগধর্মী হয় সেজন্য আবেগের বিকাশ ও পরিবর্তন অনুসারে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও শিক্ষা প্রদান করা উচিত। শিশু যখন সর্ব ব্যাপারে কৌতূহলী, তখন তার কৌতূহলকে অহেতুক মনে করে তিরস্কার করা উচিত নয়। শিক্ষার্থীকে যদি পাঠে উৎসাহ প্রদান করা হয়, তবে তাকে পাঠে অগ্রসর হতে দেখা যায়। কিন্তু সামান্য অসাফল্যের জন্য যদি শিশুকে ভৎর্সনা করা হয়, তবে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং অনেক ক্ষেত্রে অপপ্রতিযোজনমূলক আচরণ অর্থাৎ বিদ্যালয় পালানো, অন্যের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পরিণামে মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে সে দুর্বল হয়ে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। প্রথমতঃ, রাগ, ভয়, হীনমন্যতাবোধ প্রভৃতি আবেগ সাধারণভাবে শিক্ষায় অনুকূল বা সহায়ক নয় বলে ধরা হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এসব আবেগও শিক্ষার সহায়ক হতে পারে। পাঠে ব্যর্থতার জন্য ক্রোধের সৃষ্টি হলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কঠোর কর্মপ্রবণ ও অধ্যবসায়শীল হয়ে ওঠে। হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি হলে শিক্ষার্থী অনেক সময় আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, প্রতিকূল আবেগও সময় বিশেষে এবং শিক্ষার্থী বিশেষে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব আবেগ স্বাভাবিক পন্থায় মোটেই শিক্ষাসহায়ক

নয়, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রদানে এসব আবেগ থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্ত রাখাই উচিত। দ্বিতীয়তঃ, আবেগ যদি তীব্র হয় অর্থাৎ মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তবে আবেগ শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করবে। কৌতূহল, আনন্দ প্রভৃতি শিক্ষা-সহায়ক আবেগগুলিও যদি খুব তীব্র হয়, তবে নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগ প্রদান এবং স্মরণক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাহত হবে। অপ্রতিকূল আবেগ তীব্র হল তো আর কথাই নেই, শিক্ষণকার্য সেক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং শিক্ষণের ক্ষেত্রে আবেগের যথাযথ বিকাশ ও প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষায় আবেগের তীব্রতাকে সংহত করে উন্নীত করা চাই। আবেগকে উন্নীতকরণের ফলে শিশুর মনে শিক্ষা ও জীবনবিকাশের সহায়ক রস সৃষ্টি হয়। কিন্তু আবেগ অবদমিত হলে মনে নানা বিকৃতি (complexes) সৃষ্টি হবে। আবেগের উপযুক্ত বিকাশে আমাদের তিনটি দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। (১) শিক্ষাসহায়ক আবেগগুলি অর্থাৎ আনন্দ, বিস্ময়, কৌতূহল, ভালবাসা প্রভৃতি যাতে শিশুর মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করে, শিক্ষাপ্রদানকালে শিক্ষক সেদিকে নজর দেবেন। (২) প্রতিকূল আবেগগুলি অর্থাৎ, ভয়, রাগ, বিদ্বেষ প্রভৃতি আবেগগুলি যাতে শিশুর মনে জাগ্রত হয়ে শিক্ষণকার্যকে প্রতিহত না করে সেদিকে শিক্ষক দৃষ্টি দেবেন। (৩) প্রক্ষোভ অনুকূল বা প্রতিকূল হোক তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু যাতে তীব্র না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আবেগ মাত্রাতিরিক্ত ভাবে যাতে প্রকাশিত না হয়, সেদিকেও শিক্ষক সজাগ দৃষ্টি দেবেন। ওয়াটসন (*Watson*) বলেন, আবেগ পরিবেশের দ্বারা সৃষ্ট, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে সাপেক্ষীকরণ (conditioned) করা হয়, এবং শিশুমনে আবেগ সঞ্চারিত করা হতে থাকে। যদি দেখা যায় সাপেক্ষীকরণের দ্বারা অবাঞ্ছিত আবেগের সৃষ্টি হয়েছে তবে তা প্রতিরোধ করে বাঞ্ছিত আবেগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

## ৫। আবেগ নিয়ন্ত্রণ (Guidance in Emotional Development):

আবেগ অনেক ক্ষেত্রেই প্রেষণারূপে কার্য করে এবং আমাদের নানাবিধ কার্যে প্ররোচিত করে। আবেগ সমূহ যদি যথাযথভাবে স্বাভাবিক পথে বিকশিত না হয় তবে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশ, শিক্ষা-গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাহত হয়। পরিণামে শিশু প্রতিযোজন (adaption) ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং নানা সমস্যামূলক

আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং, শৈশব থেকেই শিশুর আবেগসমূহ সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

আবেগ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে শিক্ষককে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। তিনি যেন নিজের অজ্ঞাতসারেও নিজের দোষ-ত্রুটি অন্যের উপর আরোপ করার চেষ্টা না করেন। নিজের দোষ অন্যের উপর চাপালে শিশুরা ভীষণ বিরক্ত হয়ে ওঠে। তারপর শিক্ষক বিভিন্ন মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শিশুর জীবনে বাঞ্ছিত আবেগ প্রকাশের সুযোগ দেবেন। শিশু মনের উপর উচ্চ ভাবাদর্শ বা উপদেশ আরোপের দ্বারা আবেগের উৎকর্ষসাধন করা যায় না। প্রতি শিশুর আবেগকেই ব্যক্তিগতভাবে বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। কোন সাধারণ নিয়ম দিয়ে আবেগকে বিচার করা উচিত নয়।

আবেগের প্রকাশ দৈহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে। দৈহিক পরিবর্তন ও বিকাশ সময়সাপেক্ষ এবং দৈহিক বিকাশ নানা স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক গড়নের বৈশিষ্ট্য তার আবেগকে প্রভাবিত করে। সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী যে শিশু, স্বাভাবিক ভাবে সে উৎফুল্ল ও আত্মপ্রত্যয়ী হবে। কিন্তু যে শিশু ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল সে সদা বিরক্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে আবেগও শিশুর দৈহিক ও সর্বাঙ্গীন মানসিক বিকাশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর গৃহে, বিদ্যালয়ে যদি সুস্থ ও বাঞ্ছিত আবেগগুলি উপস্থিত না থাকে, শিশু যদি ভয়, রাগ, হতাশা, হীনমন্যতা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত আবেগের দ্বারা পীড়িত হয়, তবে যতই সুগঠিত স্বাস্থ্যের অধিকারী সে হোক না কেন, তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ প্রতিহত হবে এবং সে দেহ ও মনের সাম্য (balance) হারিয়ে ফেলবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, বাঞ্ছিত আবেগের সুষ্ঠু পরিচালনব্যাপারে শিক্ষককে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। বিদ্যালয় শিশুর কাছে হবে একাধারে সমাজ ও পরিবার। যদি শিশু তার বিভিন্ন আবেগ প্রকাশের সুযোগ থেকে বিদ্যালয়ে বঞ্চিত হয়, তবে তার শিক্ষাগ্রহণ প্রতিহত হবে।

শিশুর জীবনে আদর্শ আবেগ কি? এ সম্বন্ধে কোন তালিকা প্রদান সম্ভব নয়। তবে সার্থক আবেগের উৎকর্ষসাধনের জন্য শিশুদের এমনভাবে শিক্ষাপ্রদান করতে হবে যাতে তারা আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভরশীল ও সামাজিকতাবোধসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

## ৬। প্রাথমিক ও মিশ্র আবেগ (Primary and Secondary Emotion) :

ম্যাকডুগাল আবেগকে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ; প্রাথমিক (Primary) এবং মিশ্র (Mixed or Secondary)। তিনি মনে করেন, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা সতের এবং প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির সহিত একটি আবেগ সংশ্লিষ্ট আছে। সতেরটি সহজাত প্রবৃত্তির কেন্দ্রগত সতেরটি আবেগ হল প্রাথমিক। এ প্রাথমিক আবেগ হল সহজাত প্রবৃত্তির কেন্দ্র বা সারাংশ (core or essence)। কিন্তু প্রাথমিক আবেগগুলি নিজেদের মিশ্রণে আবার নতুন আবেগ সৃষ্টি করে, এ আবেগ মৌলিক নয় কিন্তু মৌলিক বা প্রাথমিক আবেগের সমবায়ে সৃষ্ট। ম্যাকডুগাল বলেন, কৃতজ্ঞতা, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি হল গৌণ বা মিশ্র আবেগ। কৃতজ্ঞতা—মমতা ও হীনমন্যতার; ঘৃণা—রাগ, বিরক্তি ও ভয়ের; লজ্জা—হীনমন্যতা ও অহংবোধের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হয়।

একথা ঠিক যে আমাদের মনে নানা মিশ্র আবেগ বর্তমান। কিন্তু ম্যাকডুগাল যেভাবে মিশ্র আবেগগুলির বর্ণনা দিয়েছেন বা কতকগুলি প্রাথমিক আবেগের মিশ্রণ বলে ব্যাখ্যা করেন তা অতি সরলীকরণ দোষে ( over simplication) দুষ্ট। মিশ্র আবেগগুলির এ ধরনের ব্যাখ্যা অনেকেই গ্রহণ করেন না। তাছাড়া, ম্যাকডুগাল বর্ণিত প্রাথমিক আবেগগুলি সম্পূর্ণ অমিশ্র কিনা সে ব্যাপারেও মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। উপরন্তু মৌলিক বা প্রাথমিক আবেগের সংখ্যা মাত্র তিনটি বলে অনেকে গ্রহণ করেন। তাদের মতে ভয়, রাগ ও আনন্দ- এই তিনটি মৌলিক বা প্রাথমিক আবেগ। দার্শনিক ডেকার্ট (*Descartes*) মনে করেন যে, বিস্ময়, ভালবাসা, কামনা, ঘৃণা, আনন্দ, দুঃখ এই ছয়টি হল মৌলিক আবেগ। ওয়াটসনের মতে ভয়, রাগ ও ভালবাসা এই তিনটিই প্রধান বা প্রাথমিক আবেগ। অন্যদিকে একদল মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, যেহেতু সকলপ্রকার আবেগের মূলে একই প্রকার উত্তেজনামূলক অবস্থা বর্তমান থাকে, সেকারণ আবেগ মূলতঃ একটি, একাধিক নয়।

## ৭। আবেগের বিকাশ (Development of Emotion) :

মানব শিশু কোন্ কোন্ আবেগ নিয়ে জন্মায় এ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা একমত নন্। সহজাত মৌলিক আবেগের সংখ্যা নির্ণয়েও তাঁদের মধ্যে মতৈক্য

নেই। কিন্তু একথা সবাই স্বীকার করেন যে, নবজাত শিশু কতকগুলি আবেগ নিয়ে জন্মায় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুপ্ত আবেগগুলিকে সে নানা অভিজ্ঞতা ও আচরণের মধ্যে প্রকাশ করে। আবেগের দুটো দিক বর্তমান—একটি মনোগত **(subjective)**, অন্যটি দেহগত **(physical)**, দৈহিকদিকটি আবেগমূলক আচরণের দিক।

ব্যবহারবাদী মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসন (*Watson*) আবেগের কোন মনোগত দিক স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন, আবেগ দৈহিক উত্তেজনাজনিত পরিবর্তন। মানবশিশু কোন সুনির্দিষ্ট আবেগপ্রবণতা নিয়ে জন্মায় না। ওয়াটসন এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষা চালান। একটি বালক সাদা রঙের ইঁদুর দেখলে ভয় পায় না, সে ইঁদুরের সঙ্গে খেলতে চায়। কিন্তু যেই বালকটি ইঁদুরকে ধরতে যাবে, তখন বিরাট এক শব্দ করা হল। ফলে শিশুটি ভয় পেল। তারপর সাদা ইঁদুর দেখলেই সে ভয় পায়। এ ভয় সাপেক্ষীকরণের **(conditioning)** দ্বারা সৃষ্ট হল। অর্থাৎ, ওয়াটসনের মতে মানবজীবনের আবেগের বিকাশ সাপেক্ষীকরণের নামান্তর মাত্র। রাগ, ভয়, ভালবাসা—এ তিনটি মৌলিক আবেগ সাপেক্ষীকরণের ফলে দেখা দেয়। প্রতিটি আবেগ পরিবেশের সঙ্গে প্রতিযোজনের ফলে সৃষ্টি হয়। যে বস্তু উদ্দীপক কোন বিশেষ আবেগ সৃষ্টির পক্ষে নিরপেক্ষ **(neutral)**, তাকেও বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার দ্বারা আবেগ সৃষ্টিকারক করা যায়।

শারমান (*Sherman*), মান (*Mann*) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসনের এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তাঁরা মনে করেন, একমাত্র 'চমকেওঠা' **(startle pattern)** হল প্রাথমিক শিক্ষানিরপেক্ষ আবেগ। যদিও শিশুর বোধ বা চিন্তাশক্তি জাগ্রত নয়, তবুও শিশুর আবেগগুলি একমাত্র দৈহিক প্রতিক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নয়।

আমেরিকার শিশু মনোবিজ্ঞানী ক্যাথরিন ব্রিজেস (*Katharine Bridges*) আবেগের বিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ব্রিজেস লক্ষ্য করেন, নবজাত শিশুর মনে তীব্র উদ্দীপক উত্তেজনা **(excitement)** সৃষ্টি করে। তিনি এ উত্তেজনাকেই মূল আবেগ বলে অভিহিত করেন। এ উত্তেজনা ধীরে ধীরে দুটো পৃথক আবেগে প্রকাশিত হয়—একটি অস্বাচ্ছন্দ্য বা দুঃখ, অন্যটি আনন্দ বা হর্ষ।

আবেগের পরিবর্তন ও বিকাশ সম্বন্ধে ব্রিজেস বলেন, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবেগের তীব্র প্রতিক্রিয়া ক্ষীণ হতে থাকে। বিশেষ বিশেষ উদ্দীপকের দ্বারা সংগঠিত আবেগগুলি সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে। শিশুর চার মাস বয়সে অস্বাচ্ছন্দ্য বা দুঃখাবেগ বিশেষায়িত হয়ে রাগে; পাঁচ মাস বয়সে বিরক্তিতে; সাত মাস বয়সে ভয়ে পরিণতি ও নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। আনন্দ বা স্বাচ্ছন্দ্য রূপ আবেগ ছয় মাস বয়সে বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছ্বাসের (elation) রূপ লাভ করে। এই উচ্ছ্বাস বা আনন্দই প্রথম বড়দের প্রতি ভালবাসার রূপ নেয় এবং শিশুর পনর মাস বয়সের মধ্যেই এই ভালবাসা শিশুর সমবয়সী বা তার চেয়ে ছোট শিশুদের প্রতি প্রসারিত হতে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আবেগজ আচরণ সম্পাদন করার, যে সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে শিশু জন্মায়, তার জন্মের প্রথম দিনগুলিতে এ আচরণগুলি এতই সাধারণধর্মী থাকে যে আবেগের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কিছু ব্যাখ্যা করতে পারি না। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের প্রাথমিক উত্তেজনা নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন রূপ নিতে থাকে। একে আমরা আবেগের বিশেষীভবন (specialisation) বলে আখ্যা দিতে পারি। গুড এনাফ (*Good Enough*) দশ মাস বয়সের শিশুর বিভিন্ন মুখভঙ্গী দেখে বিভিন্ন আবেগের প্রকৃতি বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। শিশুর বয়স যত বৃদ্ধি পেতে থাকে আবেগসঞ্জাত প্রতি-ক্রিয়াগুলি একটি উদ্দীপক থেকে অন্য উদ্দীপকে সংক্রমিত হয় এবং ধীরে ধীরে জটিল আকার ধারণ করে।

এক্ষণে আমরা শৈশবোত্তর স্তরে আবেগের বিকাশ ও বৃদ্ধি আলোচনা করার প্রস্তাব করছি। শৈশবোত্তরে আবেগের পরিবর্ধনে আবেগের সংখ্যাবৃদ্ধি, আবেগের গভীরতা ও স্থায়িত্ব, আবেগের জটিলতা লাভ ও প্রকাশভঙ্গিমার পরিবর্তন ইত্যাদি লক্ষণীয়। একথা উল্লেখযোগ্য যে, আবেগের বিকাশ শিশুর জীবনের অন্যান্য বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শিশুর জীবনের ব্যক্তিত্বের পরিণতির সঙ্গে আবেগগত পরিপক্কতাও (emotional maturity) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শিশু বয়োপ্রাপ্ত হলে তার অনুভূতি বোধ সুস্পষ্ট হয়, অভিজ্ঞতা বহুমুখী হয়, কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বিস্তার ঘটে, সামাজিকতাবোধ জাগ্রত হয়। এর ফলে আবেগগুলি নিয়ন্ত্রিত, সুনির্দিষ্ট, সুসংযত হয়ে ওঠে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে আবেগের বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে। শৈশবে সামান্য ক্রোধের বশেই যেখানে শিশু হাত পা ছুড়ে চেঁচাতে থাকে, জিনিসপত্তর তছনছ করে, বা যার উপর রেগে যায়, তাকে কামড়ায়, মার-ধোর করে, সেই শিশুর বয়স

বাড়তে থাকলে এসব আচরণ কমে যায়। এ পরিবর্তনের মূলে সামাজিক দৃষ্টান্ত, নিন্দা, প্রশংসা, পরিবেশ ও নিজস্ব অতীত অভিজ্ঞতার সক্রিয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমাজের পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের পরিচালনায় শিশু তার শিশুসুলভ আবেগগুলিকে সমাজানুমোদিত প্রকাশ-ভঙ্গিমায় রূপ দিতে থাকে। আবেগের বাহ্যিক প্রকাশকে সাত আট বছরেই ছেলেমেয়েরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলতে পারে, এ সময় থেকেই তারা আবেগকে অবদমিত করতে থাকে। আবেগের এই অবদমন সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য অপরিহার্য। প্রতিটি মানুষ যদি আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত, অনিয়ন্ত্রিত ও যথেচ্ছ প্রকাশের স্বাধীনতা পায়, তবে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক সংগঠন ভেঙ্গে পড়বে। পৃথিবীতে আমাদের বসবাস করা মোটেই সুখকর হবে না। কিন্তু আবেগের এ অবদমন ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল মনে করেন নি। আবেগের বাহ্যিক প্রকাশকে প্রতিহত এবং আবেগকে অবদমিত করলেই আবেগ তিরোহিত হয়ে যায় না। অবদমিত আবেগ নির্জ্ঞান স্তরে উপনীত হয়ে ব্যক্তিচরিত্রে নানা অপসঙ্গতি (maladjustment) সৃষ্টি করে। কিন্তু আবেগকে বাহিরে অভিব্যক্ত করতে পারলে আবেগের অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে ব্যক্তি মুক্ত থাকে। দুঃখে কাঁদলে, রাগে মেজাজ দেখালে মনটা হালকা হয়ে যায়। কিন্তু এগুলি মনে মনে পোষণ করলে ব্যক্তি-চরিত্রে নানা অন্তর্দ্বন্দের সৃষ্টি হয়। গৃহে, বিদ্যালয়ে মানসিক শৃঙ্খলার নামে, শাসন এবং নিন্দার নামে শিশুদের আবেগগুলিকে অবদমিত করা হয়। উহা আত্মপীড়নের নামান্তর। এ অবদমন পরিণামে শিশু-চরিত্রে নানা ক্ষতিকর আচরণের জন্ম দেয়। এজন্য শিক্ষায় আমরা প্রবৃত্তির উন্নীতকরণ কামনা করি, অবদমন নয়।

সুতরাং শিক্ষায় আবেগের বাহ্যিক প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করার সময় শিক্ষককে দেখতে হবে নিয়ন্ত্রণ যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়। শাসন ও ভয় সৃষ্টির দ্বারা শিশুর আবেগকে রুদ্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। তার মনে সমাজচেতনা, সংযত আবেগের কার্যকারিতা বোধ জাগ্রত করলে আবেগ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলভাবে বিকশিত ও বর্ধিত হতে থাকে। শিক্ষক প্রতিটি শিশুর আবেগের প্রকৃত স্বরূপ ও কারণ বিবেচনা করে আবেগকে সুনিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করবেন।

বয়সের অগ্রগমনের ফলে শিশুর অনেক নতুন নতুন আবেগও দেখা দেয়, যেমন, কামাবেগ, উৎকণ্ঠা, লজ্জা ইত্যাদি। শৈশবে এসব আবেগ শিশুর জীবনে লক্ষ্য করা যায় না। বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অহং (ego) বোধ

প্রসারিত হয় এবং বাহ্যপরিবেশের সঙ্গে শিশু তার সম্পর্ক বুঝতে পারে। ফলে, আবেগগুলি বিচিত্র ও জটিল ধারায় প্রকাশিত হতে থাকে এবং পরিপক্কতা (maturity) লাভ করে

## প্রশ্নাবলী

1. Show how emotions are important in education. What emotions would you culture ?

Ans. ( পৃ: ৪৮৪—৪৮৬ )

2. Describe the nature and characteristics of emotional development of children. [ B. T. 1953

Ans. ( পৃ: ৪৮৮—৪৯২ )

3. Examine the characteristics of emotion. Suggest some measures for guiding a child in his emotional difficulty. [B. A. 1967

Ans. ( পৃ: ৪৭৩-৭৫—৪৮৬-৮৭ )

4. What are emotions ? Discuss the emotional development during adolescence and the help the school can render at this stage. [B. T. 1964

Ans. ( পৃ: ৪৮৬—৪৮৭ )

5. Show how emotion associated with curiosity stimulated during childhood and adolescence. [ B. A. 1962

## পঞ্চদশ অধ্যায়

# মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি

# (Mental Hygiene and Maladjustment)

### ১। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কাকে বলে? (What is Mental Hygiene ? ) :

যে বিজ্ঞান বা শাস্ত্র মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে তাকে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলে। দেহের স্বাস্থ্য বলতে আমরা বুঝি, নিরোগ, কর্মক্ষম দেহ ও ত্রুটিহীন ইন্দ্রিয় বা দেহপ্রত্যাঙ্গাদি। সেরূপ মনেরও স্বাস্থ্য বিদ্যমান। শিশুর জীবন-বিকাশে তার সহজাত প্রবৃত্তি, আবেগ, বুদ্ধি, প্রবণতা প্রভৃতি বহু সমস্যা ও চাহিদা নিয়ে উপস্থিত হয়। এ বহুবিধ চাহিদা ও সমস্যার সুষ্ঠু প্রকাশ ও সমন্বয় শিশুর জীবনে না ঘটলে মানসিক দিক থেকে শিশু সমাজ ও পরিবেশের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। সে পরিণামে প্রতিযোজন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং তার মনে নানা মানসিক ত্রুটি ও দ্বন্দ্ব দেখা দেবে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মানসিক দ্বন্দ্ব (conflict) অপপ্রতিযোজন (maladjustment) প্রভৃতি অনভিপ্রেত মানসিক বৈলক্ষণ্যের কারণ নির্ধারণ, ইহাদের প্রতিরোধ এবং মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক (normal) জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার উপায় নির্ণয় প্রভৃতি আলোচনা করে। অতএব দেখা যাচ্ছে, মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ত্রিবিধ কর্ম পরিকল্পনা বর্তমান—(১) রোগ নির্ণয় বা রোগনিদান (diagnosis), (২) রোগের চিকিৎসা (therapy) এবং (৩) রোগের প্রতিষেধ (prevention)। রোগনিদান ও চিকিৎসা মানসিক স্বাস্থ্যের তাত্ত্বিক (theoritical) দিক এবং প্রতিষেদ মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যবহারিক (practical) দিক।

এখন প্রশ্ন হল, মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা কি বুঝি? অধুনা 'মানসিক স্বাস্থ্য', 'সামাজিক স্বাস্থ্য' প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি (concepts) সমাজবিজ্ঞানের দৌলতে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ প্রত্যয়গুলির ন্যায়শাস্ত্রসম্মত কোন সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব নয়, কেননা মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা এমন একটি

মানসিক স্তর বা অবস্থা বুঝি না যা সহজেই লাভ করা যায় বরং মানসিক স্বাস্থ্য একটি আদর্শ যা আমরা জীবনভর লাভ করবার চেষ্টা করি। তাছাড়া, 'মানসিক স্বাস্থ্য' কথাটিকে মনোবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান (Physiology), সমাজবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (domestic science) প্রভৃতি শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করা হয় বলে সর্বসম্মতভাবে এর কোন সংজ্ঞা প্রদান করা যায় না। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, 'মানসিক স্বাস্থ্য' বলতে আমরা ব্যক্তির মানসিক সমতা বা সমন্বয় (harmony) বুঝি অর্থাৎ যার দ্বারা ব্যক্তি নিজে নিজের সঙ্গে এবং সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য এ অর্থে ব্যক্তির প্রতিযোজন-ক্ষমতা (power of adjustment) বোঝায়। যে ব্যক্তির মানসিক কোন দ্বন্দ্ব নেই, আচার-আচরণে বা চিন্তায় কোন অপসঙ্গতি নেই (maladjustment) বা অস্বাভাবিকতা (abnormality), অসামাজিকতা প্রকাশ পায় না, সে ব্যক্তি মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মানসিক স্বাস্থ্য কোন স্থির মনসিক অবস্থা নয়। ব্যক্তির জীবনে মানসিক স্বাস্থ্য একটি আদর্শ বিশেষ, ব্যক্তি তার মনোজগতে সকল মানসিক অবস্থার মধ্যে একটি সুস্থিতি, স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার বুদ্ধি, আবেগ, প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে।

## ২। শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য (Education and Mental Hygiene):

শিক্ষা ও মাননিক স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব-বিকাশ, আর মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষ্য হল শিশুর মানসিক অপসঙ্গতি দূরীভূত করে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথগুলিকে সুগম করে দেওয়া। এদিক থেকে দেখতে গেলে শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্য অভিন্ন।[1] উভয়ই শিশুকে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিযোজনক্ষম করে তুলতে চায় যাতে শিশু তার সকল ক্ষমতা ও সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে পারে। উভয়ই শিশুকে কতকগুলি সুঅভ্যাস ও প্রবণতা গঠনের জন্য পরিচালিত করে যাতে শিশু-জীবনের সমস্যাগুলি অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে পারে। সামাজিক পরিবেশে জীবনের দৈনন্দিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে শিশু যাতে আত্মবিশ্বাসী ও

1. "The aim of modern education and of mental hygiene is essentially the same a well as adjusted child integrated with his environment, making goodl use of his abilities and utilising his potentialities."

Encyclopaedia of Modern Education Page 110.

আত্মনির্ভরশীল হয়ে ব্যক্তিত্বের সার্থক পরিণতি লাভ করে, শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান উভয়ই সে লক্ষ্যে নিজের আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করে।

প্রাচীন গতানুগতিক শিক্ষায় মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অপরিহার্যতা সুস্পষ্ট ভাবে স্বীকৃত হয় নি। সেদিন শিক্ষা অর্থে নিছক পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন বোঝাত। আর শিক্ষার সার্থকতা নির্ণীত হত ব্যক্তির জ্ঞানের পরিমাণের দ্বারা। ভাবসর্বস্ব এ ধরনের মানসিকতাকে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আধুনিক শিক্ষা জীবনধর্মী, শুধু জ্ঞান আহরণই শিক্ষার লক্ষ্য নহে। শিশুর সর্বাঙ্গীন জীবন বিকাশ—তার বুদ্ধিগত, প্রবৃত্তিজাত, আবেগগত সকল চাহিদার সুষ্ঠু প্রকাশ ও পরিতৃপ্তি সার্থক ব্যক্তিত্বগঠনের শর্ত হিসেবে আজ স্বীকৃত। অর্থাৎ শিশুর চাহিদা আজ শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই চাহিদাগুলি যাতে অতৃপ্ত, অবদমিত, অবহেলিত হয়ে শিশুমনে নানা দ্বন্দ্ব ও অপসঙ্গতি সৃষ্টি না করে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সেদিকে লক্ষ্য রাখে।

উদ্দেশ্যগত এ মিল ছাড়াও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মধ্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। সার্থক শিক্ষাপ্রদানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সুস্থ মন একটি অপরিহার্য শর্ত। শিক্ষক যদি মানসিক সুস্থতা থেকে বঞ্চিত হন তবে তিনি তাঁর উপর আরোপিত শিক্ষাকার্য যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারবেন না। শিক্ষার্থীর মনে স্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীর চাহিদাগুলিকে ধৈর্য ও সহানুভূতি সহকারে বিচারবিশ্লেষণ ও সমাধান, অসুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষকের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। সর্বোপরি শিক্ষকর্তার দ্বারা তাঁর মনে কোন তৃপ্তি (job satisfaction) সঞ্চারিত হয় না। অতএব দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাকার্যে সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষককেও তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

অন্যদিকে সার্থকভাবে শিক্ষা-গ্রহণ ও শিক্ষার অগ্রগতির জন্য শিশুর মানসিক সুস্থতা অপরিহার্য। স্বাভাবিক গতিতে গৃহ-পরিজন, শিক্ষক, বিদ্যালয় সহপাঠী প্রভৃতিকে ঘিরে শিশুর আবেগ বর্ধিত হতে থাকে এবং সাধারণত শৈশবে আবেগ সম্বন্ধীয় অপসঙ্গতিই শিশুর জীবনে দেখা দেয়। গৃহে যদি নিরাপত্তার অভাব থাকে, মাতাপিতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার স্নেহপ্রীতি থেকে শিশু বঞ্চিত হয়, বিদ্যালয়ে যদি তিরস্কৃত হয়, সহপাঠীদের দ্বারা যদি অবহেলিত বা উপহাসপ্রদ হয়, তবে শিশুর মনে নানা আবেগমূলক অসুস্থতা দেখা দিতে থাকে। ভয়, ঘৃণা, বিরক্তি প্রভৃতি শিক্ষার প্রতিকূল আবেগ শিশুর মনে নানা অপসঙ্গতির

সৃষ্টি করে এবং শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। শিশুর পাঠগ্রহণে অসাফল্যের মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক সুস্থিতি ও সুস্থতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এজন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সার্থক শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

### ৩। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য (Goals of Mental Hygiene) :

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই আলোচনা করা চলে। ব্যক্তিগতদিক থেকে প্রতিটি ব্যষ্টিকে মানসিক সুস্থিতি প্রদান করা যাতে সে সঙ্গত এবং উদ্দেশপূর্ণ কার্যে প্রণোদিত হয়ে নিজস্ব মেধা ও শক্তির সার্থক প্রয়োগ করতে পারে; যাতে প্রতিটি শিশু আত্মসম্মান, আত্ম-নির্ভরশীলতা লাভ করে সকলের সঙ্গে তার সহজ সম্পর্ক লাভ করতে পারে। যাতে সে সকলের প্রিয় এবং সকলই যাতে তার নিকট প্রিয় হয় অর্থাৎ সকলের সঙ্গে তার সম্পর্কানুভূতি যাতে সদা বর্ধিত হতে থাকে, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সেদিকে লক্ষ্য রাখে। ব্যক্তিগত জীবনে মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষ্যকে ব্লস (*Blos*)[1] আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে নির্ধারিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যের অভিপ্রেত লক্ষ্য হবে যাতে শিশু আপন অনুভূতি ও বস্তুর (fact) মধ্যে, চিন্তা এবং বাস্তবে বিচারপূর্ণ কাজ সম্পাদনের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনের ক্ষমতা অর্জন করে। আমাদের অভিজ্ঞতায় নিত্যনিয়ত যে উত্তেজনা (tension) উপস্থিত হয়, সেগুলিকে কিছুটা সহ্য করার ক্ষমতা, আপন আবেগকে চরিতার্থ করার অস্থিরতা প্রতিহত করার ক্ষমতা, সমাজানুমোদিত বৃহত্তর তৃপ্তিমূলক কাজের জন্য ক্ষুদ্র কাজকে বিসর্জন দেবার ক্ষমতা, শিশু যেন মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সহায়তায় লাভ করে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তিকে জীবনে দ্বন্দ্ব, হতাশা, বিপদ প্রভৃতির সম্মুখীন হবার ব্যক্তিত্ব অর্জনে সাহায্য প্রদান করে।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে সমাজ-জীবনে সুখী, সক্রিয় ও প্রতিবেশীর প্রিয়ভাজন করে গড়ে তোলা। এক কথায় ব্যক্তিকে পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনে উপযোগী করে তোলাই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। অবশ্য ব্যষ্টিগত ও সামাজিক উভয়

1. Blos Peter 'Aspects of Mental Health is Teaching and Learning.'

দিকই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ কোন অশরীরী স্তরে পৌঁছাতে পারে না।

এ আলোচনা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে পারি: (১) ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব এবং জীবন-অভিজ্ঞতার সম্পর্ক অনুধাবন করে মানসিক অসুস্থতা নিবারণ করা, (২) ব্যক্তিগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা, (৩) মানসিক রোগ নিবারণের পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রয়োগ করা।

## ৪। অপসঙ্গতির লক্ষণ (Symptoms of Maladjustment):

ব্যক্তি চরিত্রে অপপ্রতিযোজন বা অপসঙ্গতি তার মানসিক দ্বন্দ্ব (conflict) উত্তেজনা (tension) বা হতাশার (frustration) প্রতিক্রিয়া মাত্র। এ প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশকে প্রতিহত করে, ব্যক্তির মানসিক সুস্থিতিজনিত সুখ ও তৃপ্তি হরণ করে, ব্যক্তির আচরণে সাম্য (balance) বিনষ্ট করে। নানা ভাবে এ প্রতিক্রিয়া বা অপসঙ্গতি ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আমরা নিম্নে অপসঙ্গতির প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি আলোচনা করছি:

**(ক) পলায়ন প্রবৃত্তি (Withdrawal or Retreat):** মানসিক দ্বন্দ্ব ও আবেগমূলক অস্থিরতার জন্য কোন কোন ব্যক্তি বাস্তবের সম্মুখীন হতে ভয় পায়। বাস্তবকে এড়িয়ে চলার পলায়নী মনোবৃত্তি তাদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন—শিশু পরিশ্রমের ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে চায়, বয়স্কব্যক্তি পরিশ্রম এড়াবার জন্য শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দেয়। সমাজের কার্যকারিতার সঙ্গে পলায়নী মনোবৃত্তির দেখা দিলেই অপসঙ্গতি উপস্থিত হয়। এরই এক চরম রূপ হল আত্মহত্যা। বাস্তব জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী না হয়ে পালিয়ে বেড়াবার প্রবণতা ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। আর তীব্র অন্তর্মুখীতার জন্যই ব্যক্তি চরিত্রে পলায়ন প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

**(খ) তীব্র অন্তর্মুখীতা (Extreme Introversion):** ব্যক্তি সব সময় নিজের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চায়। সে সব সময় নিজের ব্যর্থতা, হতাশা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ সম্পর্কে চিন্তা করে। নিরাপত্তার অভাব, ভীতি, ব্যর্থতা, হতাশা, বাধাবিঘ্ন ও অন্যান্য অপ্রীতিকর অবস্থা মানসিক

উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যার ফলে ব্যক্তি দুর্বল ও ভীরু (timid) হয়ে পড়ে এবং অন্তর্মুখী হয়

(গ) **দিবাস্বপ্ন** (Day-dreaming): ব্যক্তি যখন মানসিক দ্বন্দ্ব বা বিরোধের সমাধানে ব্যর্থ হয়, যখন সে তার কামনা-বাসনাকে অবদমন করতে বাধ্য হয়। আর যখন তার ইচ্ছাপূরণ বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন এই দিবাস্বপ্ন দেখা দেয়। বাস্তবে যা পূর্ণ হয় নি, অলীক স্বপ্নের মধ্যে তার পূর্ণতাকে সে আস্বাদন করে তৃপ্তি পায়। কল্পনায় সে তার সাফল্যের চিত্র প্রত্যক্ষ করে আনন্দ লাভ করে। এগুলিও পলায়নী মনোবৃত্তিরই অন্যতম রূপ। দিবাস্বপ্ন যে একেবারে স্বপ্ন তা নয়, অনেক মহৎ ব্যক্তিরও দিবাস্বপ্ন দেখার অভ্যাস ছিল। কিন্তু দিবাস্বপ্ন অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি করে তখনই যখন ব্যক্তি বাস্তবের সম্মুখীন হতে ভয় পায় এবং নিজের মনগড়া রাজ্যের অধিবাসী হয়।

(ঘ) **যৌক্তিকরণ** (Rationalization): অবদমনের ফলে দ্বন্দ্বলিপ্ত বাসনাগুলি আমাদের মনের নির্জ্জান স্তরে সমবেত হয় এবং যখন তারা আমাদের চেতন মনে উপস্থিত হয়ে প্রভাব বিস্তার করে তখন আমরা মিথ্যা যুক্তির দ্বারা এ দ্বন্দ্বগুলিকে সমর্থন করার চেষ্টা করি। কোন একটা যুক্তি তার যাথার্থ্য থাক বা না থাক উপস্থিত করে আমরা নিজেদের দুর্বলতা বা দোষকে ঢাকতে চাই। যেমন, বাসের ভাড়া না দিয়ে চুপি চুপি সরে পড়ার সময় অনেক লোক নিজের এরূপ আচরণের সমর্থন খুঁজে বেড়ায় যে তাকে সারাক্ষণ বাসে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। এ গুলি অপসঙ্গতিমূলক আচরণ।

(ঙ) **অনুকম্পন** (Compensation): হীনমন্যতা দেখা দিলে অনুকম্পনরূপ অপসঙ্গতি ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়। শারীরিক ত্রুটিযুক্ত শিশুরা কাজে অতিরিক্ত সক্রিয়তা দেখিয়ে নিজেদের শারীরিক ত্রুটি ঢেকে রাখতে চায়। অনেক সময় কোন কোন শিশু চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাচারণ, নির্যাতন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বা নিজের স্বাধীন মনোভাব প্রকাশ করার জন্য সচেষ্ট হয়।

(চ) **প্রক্ষেপণ** (Projection): এরূপ অপসঙ্গতি প্রকাশিত হয় যখন আমরা নিজেদের কোন অপরাধকে অপরের উপর চাপিয়ে দিই। এগুলিও একপ্রকার প্রক্ষেপন। যেমন, ফেল করা ছাত্র পরীক্ষকের বিরুদ্ধে, অযোগ্য কর্মী উপরওয়ালার পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়।

থোর্‌প (*Thorpe*) পলায়ন প্রবৃত্তি, যৌক্তিকরণ, অনুকম্পন, প্রক্ষেপণ ইত্যাদি অপসঙ্গতিমূলক লক্ষণকে বাস্তবের প্রতি অপপ্রতিযোজনশীল ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীজনিত আচরণ বলে শ্রেণী বিভাগ করেছেন।

**(ছ) বিকল্প আচরণ** (Sublimation): কোন ব্যক্তির ঈপ্সিত আচরণের পথে অন্তরায় দেখা দিলে, বিকল্প আচরণের অবতারণা করে মানসিক উত্তেজনা হ্রাসের চেষ্টা করতে দেখা যায়। যেমন, সন্তানহীনা নারী মাতৃবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করতে চায় কোন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে।

**(জ) অভেদীকরণ** (Identification): হীনমন্যতাবোধ থেকে ব্যক্তিচরিত্রে এ লক্ষণ দেখা যায়। যে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে হীন মনে করে, সে অন্যের সঙ্গে ঐকাত্ম স্থাপন করে নিজের হীনতা দূর করতে চায়। শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের সমতুল্য মনে করে তার ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করে। আসলে অভেদীকরণ ক্ষতিপূরণমূলক (Compensatory) আচরণ। যেমন, উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ভৃত্য নিজেকে তার প্রভুর সমান মনে করে অনেক সময় দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণ করে।

**(ঝ) অবদমন** (Repression): অনেক সময় কামনা-বাসনাগুলি সমাজ অনুমোদিত স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে না, সেগুলি অবদমিত হয়ে মনের নির্জ্ঞান স্তরে আশ্রয় লাভ করে এবং মনের চেতনস্তরের বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে, যেমন আকস্মিক বিস্তৃতি, ভুল, ত্রুটি প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

**(ঞ) পশ্চাদ্মুখিতা** (Regression): অনেক সময় দেখা যায় বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়সেও শিশুসুলভ আচরণ করে। যখন দেখা যায়, কিশোর, যুবক বা বৃদ্ধ শিশুসুলভ আচরণ করে, তখন এ আচরণকে শৈশবাবস্থায় পশ্চাদপসরণ বা প্রত্যাবৃত্তি বলে। এ ধরনের আচরণ প্রকাশিত হলে বুঝতে হবে, ব্যক্তি কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হবার ক্ষমতা হারিয়ে শৈশবের নিরাপত্তার আশ্রয় সন্ধান করছে।

**(ট) নঞর্থক আচরণ** (Negativism): এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণ হল, যা করার প্রয়োজন তার বিপরীত কাজ করা। এ মনোভাব-সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে সব সময়ই একটি বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের প্রবণতা দেখা যায়।

**(ঠ) মিথ্যাভয় (Phobia):** যদি বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি যখন নিজেকে অসহায়, বিপদগ্রস্ত মনে করে এবং বাস্তব পরিস্থিতির তুলনায় নিজেকে হীন বা অকিঞ্চিৎকর ভেবে বাস্তবকে এড়িয়ে চলে তখন তার মনে আতঙ্ক দেখা দেয়। পরিণামে এ আতঙ্ক সর্বক্ষেত্রে একটি স্থায়ী উৎকণ্ঠা বা দুশ্চিন্তার রূপ পরিগ্রহ করে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিহত করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশু বিদ্যালয়ে যেতে ভয় পায়—তার এ ভয়কে বিদ্যালয়াতঙ্ক (School-phobia) বলে।

## ৩। অপসঙ্গতির কারণাবলী (Causes of Maladjustment):

ব্যক্তিচরিত্রে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা দিলে তার প্রতিকার ও চিকিৎসার (therapy) জন্য অপসঙ্গতির সম্ভাব্য কারণ নির্ধারণ (diagnosis) প্রয়োজন। আমরা নিম্নে অপসঙ্গতির প্রধান প্রধান কারণগুলি বর্ণনা করছি:

**(ক) অন্তর্দ্বন্দ্ব (Conflict):** সকল প্রকার অপসঙ্গতির অন্তরালে মানসিক দ্বন্দ্ব বর্তমান। এজন্য অন্তর্দ্বন্দ্বকে কোন বিশেষ কারণ না বলে সাধারণ কারণ বলে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন কামনা-বাসনাকে ঘিরে ব্যক্তিমনে নানা আবেগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের বাসনাগুলি বহুমুখী এবং বিরোধপূর্ণ। পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা বা অতৃপ্ত বাসনার অবস্থিতি থেকে ব্যক্তিমনে মানসিক দ্বন্দ্ব সঞ্জাত হয়।

শৈশব থেকে শুরু করে বাস্তব পরিবেশের সন্নিকর্ষে কামনা-বাসনার একটি প্রবাহ আমাদের জীবনে চলতে থাকে। সব কামনা-বাসনা নিজ সামর্থ্যের অভাবে অথবা সহায়তা ও সহানুভূতির অনুপস্থিতিতে পূরণ করা সম্ভব নয়। আবার সকল বাসনা সমাজ-অনুমোদিত নয় বা জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও প্রথার বিরোধী। অনেক ইচ্ছার মধ্যে স্ববিরোধিতাও বর্তমান। অনেক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য শিশু কাল্পনিক বা বাস্তব বাধার সম্মুখীন হয়।

ব্যক্তি তার মানসিক, শারীরিক, সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করে থাকে। এ প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তিমনে নানা চাহিদা, ইচ্ছা ও আচরণ দেখা দেয়। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই আমাদের চাহিদা ও ইচ্ছার পরিতৃপ্তিসাধন করে না—সকল আচরণ প্রচেষ্টা চালিয়ে নেবার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা মানুষের নেই। অনেক

ক্ষেত্রে দেখা যায়, কামনাকে চরিতার্থ করার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যেও বিরোধিতা বর্তমান। সুতরাং আমাদের মনে দ্বন্দ্ব অবধারিত একটি ঘটনা। শিশু যখনই সামাজিক দিক থেকে সক্রিয় হয়ে উঠে, তখন দ্বন্দ্ব তার মনে বাসা বাঁধে।[1]

কিন্তু যে কোন দ্বন্দ্বই মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না। কামনা-বাসনা চাহিদা পূরণের অতৃপ্তি বা নিজের অসামর্থতাবোধ, বা বহুমুখী ইচ্ছার বিরোধ উপস্থিত হলেই ব্যক্তিমন দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় না। অতৃপ্তি ব্যর্থতা, বাসনার বিরোধ ব্যক্তিকে কতটুকু বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত করল তার তীব্রতা ও ব্যাপকতার উপর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি ও স্বরূপ নির্ভর করে। অতৃপ্ত ইচ্ছা বা অবদমিত বাসনা ব্যক্তি মনে যে আবেগমূলক উত্তেজনা (emotional tension) সৃষ্টি করে তার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গতিসাধন না হলে মানসিক দ্বন্দ্ব জন্ম নিতে থাকে। এই আবেগধর্মী অপ্রীতিকর মনোভাব বা দ্বন্দ্ব দুপ্রকারের হতে পারে—ব্যক্তি তার মানসিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে যদি অবহিত থাকে, তার মনে যে বিক্ষুব্ধ আবেগ ও উত্তেজনা বর্তমান সে সম্বন্ধে ব্যক্তি যদি সজাগ থাকে, তবে তার মানসিক দ্বন্দ্ব সচেতন মনের দ্বন্দ্ব। সচেতন মনের বিরোধী মানসিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে ব্যক্তি যদি অবহিত না থাকে অর্থাৎ অবদমনের ফলে দ্বন্দ্বগুলি যখন চেতন মন থেকে নির্জ্ঞান মনে স্থানান্তরিত হয়, তখন সে দ্বন্দ্বকে নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্ব বলা হয়। সচেতন মনের দ্বন্দ্ব জনিত আচরণ ব্যক্তির মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিও সচেষ্ট হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি মীমাংসা করে নিতে পারে। কিন্তু নির্জ্ঞান স্তরের দ্বন্দ্ব পরোক্ষভাবে ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে এবং এ দ্বন্দ্বের বিচার-বিশ্লেষণ সহজ নয়। কারণ এ ধরনের দ্বন্দ্ব ব্যক্তিমনে নানা বিকার (complexes) সৃষ্টি করে এবং জটিল আচরণের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, শিশুর জীবনে সামাজিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত হয়। দ্বন্দ্ব মাত্রই অস্বাভাবিক নয়। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতি শৈশবে শিশু তার স্বতন্ত্র সত্তা বা ইচ্ছা সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও পরিবেশের সংস্পর্শে শিশুমনে নানা বিরোধ ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়।

1. 'Conflicts arise early in life as soon as the child becomes active socially. ; Sherman—Mental Hygiene and Education."

শিশু তার গৃহ-পরিজন, সঙ্গী-সাথী, পরিচিত ব্যক্তি, বিদ্যালয়ের সহপাঠী, শিক্ষক সকলের সঙ্গে যখন মেলামেশার সুযোগ লাভ করে এবং অন্যের সন্নিকর্ষে (contact) নিজ' স্বাতন্ত্র্য এবং পরিবেশ ও 'অন্যরা' ( other selves) সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তখন স্বাভাবিক ভাবেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আর এ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করার বা সমাধানের উপর তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ নির্ভর করে।

শিশুর বয়সের অগ্রগতি এবং সমস্যার প্রকৃতি ও সংখ্যার উপর দ্বন্দ্ব নির্ভর করে। শৈশবে ও যৌবনাগমের মানসিক দ্বন্দ্ব বয়স এবং সমস্যার প্রকৃতি ও সংখ্যার দিক থেকে ভিন্ন হবে। যৌবনাগমে (adolescence) শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্তরে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসে তার সঙ্গে শৈশবের মিল নেই। শৈশবে গৃহ-পরিজন, খেলাধুলা, পাঠ-প্রস্তুতি, সহপাঠী, শিক্ষক প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে শিশুমনে যে আবেগ সৃষ্টি হয়, তা সরল ও সংক্ষিপ্ত, সুতরাং এ ধরনের আবেগ উত্তেজনা থেকে সঞ্জাত দ্বন্দ্ব মাতাপিতা, শিক্ষক বা বয়স্কদের সহায়তায় অনেক ক্ষেত্রেই তিরোহিত হয়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যৌবনাগমে যে বিচিত্র ভাবসজ্ঘাত ও চাহিদার লীলাখেলা ব্যক্তির জীবনে চলে তার সঙ্গতিসাধন সহজ নয়। অভিভাবক, শিক্ষক, বিদ্যালয় ও সমাজ সর্বতোভাবে সচেষ্ট না হলে কিশোর-কিশোরীর মানসিক দ্বন্দ্ব অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান স্তরে জড় হয়। আর নির্জ্ঞান স্তরের দ্বন্দ্ব ব্যক্তিকে বিক্ষিপ্ত, অসংহত করে তোলে। একমাত্র মনশ্চিকিৎস (Psychiatrist) ছাড়া এ ধরনের দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব নয়। এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তির আচরণকে অপসঙ্গতিপূর্ণ করে অস্বাস্থ্যকর মনোভাব সৃষ্টি করে।

**(খ) নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব** (Sense of Insecurity): নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব নানাভাবে শিশুমনে উপস্থিত হয়ে শিশুকে অপসঙ্গতিশীল করে তোলে। শিশু-বিজ্ঞানীরা বলেন, শিশু প্রতিপালনে শিশুর মনে নিরাপত্তার মনোভাব সৃষ্টি করা উচিত। শিশু যে নিরাপদে রক্ষিত হচ্ছে সে কথা বড় নয়; সে যে নিরাপত্তা সহকারে রক্ষিত হচ্ছে এ ধারণা তার মনে গ্রথিত করা উচিত। কোন কারণে যদি শিশু মনে করে যে, সে অবহেলিত বা অবাঞ্ছিত তবে তার মনে নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব জন্মায়। এর ফলে ব্যক্তি দুর্বল, সদা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। একটি অহেতুক ভয়হেতু সব কিছুকেই আপন অস্তিত্বের পরিপন্থী বলে সে মনে করে। গৃহে, বিদ্যালয়ে, সামাজিক সকল পরিবেশে এ ধরনের মানসিকতা দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি নানা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ করে থাকে। কোন উদ্যম, কোন নতুন প্রচেষ্টা বা কোন কাজে সে অগ্রণী

হতে চায় না। সে সদা সঙ্কুচিত ও উৎকণ্ঠিত। বিদ্রূপ, নিন্দা, লজ্জা, সমালোচনার ভয়ে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। শিক্ষক পড়া জিজ্ঞেস করলে সে উত্তরপ্রদানে ইতস্ততঃ করে, সঙ্গী-সাথী বা সহপাঠীর সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সে নীরব দর্শক। সব সময়ই তার এক উৎকণ্ঠা যে তার পরিবেশের শক্তিগুলি তার নিরাপত্তা বা সকল স্বার্থকে বিপন্ন করে তুলবে।

অতি শৈশবে এ নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি স্বাভাবিক। মাতাপিতা বা পরিজন শিশুকে তাদের স্নেহ, মমতা ও শিশুর চাহিদা আবদার প্রভৃতি পরিতুষ্টির দ্বারা শিশুমনে নিরাপত্তা জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু যেখানে মাতাপিতা বা আত্মীয় পরিজন দ্বারা শিশু অবহেলিত হয়, তার চাহিদা আবদার যতই মূল্যহীন হোক না কেন, অপরিতৃপ্ত থাকে, সেখানে শিশু নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করবেই।

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশ থেকে সঞ্জাত নানা ঘটনা বা অপ্রীতিকর অবস্থা নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে। কঠোর কাজ, অহেতুক ভর্ৎসনা, নিন্দা, শাস্তি শিশুকে দুর্বল ভয়গ্রস্ত করে তোলে, পরিণামে সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ভাবতে থাকে। বিদ্যালয়ে যদি সহানুভূতির অভাব থাকে, শিক্ষক বা সহপাঠীব দ্বারা যদি শিশু অবহেলিত হয়, বিদ্যালয় পরিবেশে যদি শিশু উৎসাহ, আনন্দ লাভ না করে তবে সে নিজেকে অবাঞ্ছিত, অনভিপ্রেত বলে ধারণা করে।

শৈশবে মাতাপিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলে, মাতাপিতার বিচ্ছেদ (divorce) বা মাতাপিতার মধ্যে অসম্প্রীতি ও কলহ, প্রভৃতির ফলে, জাতি (caste) বা ধর্মগত কারণে শিশুকে অবহেলা, বা সমাজ কর্তৃক শিশুকে প্রত্যাখ্যান, দারিদ্র্য, সামাজিক অস্থিরতা (instability), ক্রটিমূলক শিক্ষণ-পদ্ধতি, কুসংসর্গ, মন্দ অভ্যাস ইত্যাদির ফলে শিশুর মনে নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি করতে পারে।

ব্যক্তিমনে নিরাপত্তার অভাব থেকে নানা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা দেয়। তার আচরণে দিবাস্বপ্ন, প্রক্ষেপণ (projection), হীনমন্যতাবোধ, আত্মকেন্দ্রিকতা, ঐকাত্মবোধ ( identification) প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।

নিরপত্তাবোধ জাগ্রত হলে প্রথমতঃ তার সঠিক কারণ নির্ধারণ করা চাই। তারপর গৃহে বা বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে সে কারণ বিদূরীত করা এবং নিরাপত্তাবোধের সহায়ক পরিবেশ প্রদান করা উচিত। যদি নিরাপত্তার

অভাববোধ জটিল আকার ধারণ করে তবে মনঃসমীক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করাই শ্রেয়।

**(গ) আক্রমণাত্মক মনোভাব** (Sense of Hostility)ঃ অপসঙ্গতির আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল আক্রমণাত্মক মনোভাব। এই আক্রমণাত্মক মনোভাব ব্যক্তির চেতন বা নির্জ্ঞান মনে সৃষ্টি হতে পারে। নানা ধরনের মনোবিকার থেকে আক্রমণমূলক মনোভাব উদ্ভূত হয়। মাতা-পিতার পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার, অতিরিক্ত শাসন ও নিয়ন্ত্রণ, অনাদর, অবহেলা প্রভৃতি শিশুকে আক্রমণধর্মী করে তোলে। যেসব ক্ষেত্রে মাতাপিতা নিজেরাই নিরাপত্তাবোধহীনতায় পীড়িত, তাদের পক্ষে শিশুর প্রতি সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ, দরদ ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মাতাপিতা স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা এবং পক্ষপাতপূর্ণ। এরা তাদের সন্তানসন্ততির মনে ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্যের অতি সহায়ক নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করতে পারেন না। সন্তানের প্রতি তাদের আচরণ সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে, কখনও তারা কঠোর, কখনও বিশেষ সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহপ্রবণ। মোটের উপর তাদের আচরণ বৈষম্যমূলক হবার ফলে শিশু হয়ত তাদের আচরণ সহ্য করে নেয় কিন্তু মেনে নেয় না, মনে মনে সে বিদ্রোহী, আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে।

শৈশবে শিশুর আচরণে উদ্দামতা, তার মনে স্পর্শকাতরতা, কিছুটা নিরাপত্তাবোধহীনতা স্বাভাবিক। অনেক মাতাপিতা সংযম ও শৃঙ্খলার নামে শিশুর শৈশবসুলভ আচরণে বাধা সৃষ্টি করেন। তার খেলাধূলা, কাজকর্মকে অহেতুক সমালোচনা ও তিরস্কারের দ্বারা সীমিত রাখবার চেষ্টা করেন। স্নেহ-প্রার্থী, স্পর্শকাতর শিশুদের কাজের বিরূপ সমালোচনা, তাদের আবদার চাহিদার উপেক্ষা ইত্যাদি দ্বারা আমরা শিশুমনে আক্রমণধর্মিতা সৃষ্টি করে থাকি।

সচেতন মনে এই আক্রমণধর্মিতা সৃষ্টি হলে শিশু তার আচরণে যাতে এ মনোভাব প্রকাশ না পায় সে সম্বন্ধে সচেষ্ট হয়। কিন্তু মনোভাব ও আচরণের মধ্যে এর ফলে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং সমবয়সীদের প্রতি ঝগড়া-বাদ-বিসংবাদ, মারামারি, নিষ্ঠুর আচরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বিক্ষুব্ধ আচরণ প্রকাশ পায়। অনেক ক্ষেত্রে অবদমনের ফলে শিশুর এ মানসিক বিদ্রোহ নির্জ্ঞান স্তরে উপস্থিত হয় এবং নানাভাবে তার আচরণকে প্রভাবিত করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তি অহেতুকভাবে অপরকে পীড়ন করা, আসবাব পত্র বিনষ্ট করা, বইপত্র ছিঁড়ে ফেলা, এমনকি অসহায় পশুপ্রাণীর উপর অযথা উৎপীড়ন করার

প্রবণতা প্রদর্শন করে। এ প্রবণতার কারণ সম্পর্কে ব্যক্তি সজাগ নয়। নির্জ্ঞান মনের আক্রমণধর্মিতাই এর মূলে কাজ করে।

**(ঘ) অপরাধবোধ (Sense of Guilt):** অনেক সময় দেখা যায় ব্যক্তি নিজেকে তার আচরণের জন্য অপরাধী মনে করে। এ অপরাধবোধ যদি ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসম্মত হয়, তবে ব্যক্তি অনুশোচনার দ্বারা বা অপরাধ স্বীকৃতির দ্বারা নিজেকে শুধরিয়ে নেয়। কিন্তু এমন এক ধরনের অপরাধবোধ ব্যক্তি মনে মনে পোষণ করে যা তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নিকৃষ্ট ধারণা থেকে সঞ্জাত। হীনমন্যতাবোধ বা আপন ব্যক্তিত্বকে অতি নিম্নস্তরের ভেবে ব্যক্তি নির্দোষ কাজের জন্যও নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলে, এবং মনে অপরাধের অনুভূতি লালনপালন করে। ফলে, আত্মগ্লানি বা অহেতুক আত্মনিন্দার প্রবণতা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়। সে অনেক সময় নিজেকে কষ্ট দেয়, পীড়া দেয়, আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত করে প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ খুঁজে, অনেকে নিজেকে এতই অপরাধী মনে করে যে সে আত্মহত্যা দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ করে।

এ অপরাধানুভূতির কারণ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। সাধারণতঃ অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা বা বয়স্কদের নিন্দা, বিদ্রূপ, তুচ্ছজ্ঞান শিশুদের মনে অপরাধবোধ উদ্রেক করে। অর্থাৎ শিশুর মনে নিজের সম্বন্ধে নিম্নতাবোধ সৃষ্ট হলেই অপরাধবোধ জন্ম নেয়। ক্ষণিক উত্তেজনায় বশীভূত হয়ে যদি ব্যক্তি হঠাৎ কোন গর্হিত কাজ করে বসে, আর যদি আমরা তাকে অনবরত ধিক্কৃত করি তবেও অপরাধবোধ মনে বাসা বাঁধে।

আধুনিক মনঃসমীক্ষকরা বলেন, শিশুর যৌনতাবোধকে ঘিরে অপরাধবোধ ব্যক্তিচরিত্রে দেখা দেয়। অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী হেতু শিশুর যৌন কৌতূহলকে আমরা প্রকাশিত হতে দিই না। যৌন শিক্ষা আমাদের সামাজিক প্রথানুসারে নিষিদ্ধ পাপ স্বরূপ। কিন্তু শিশুর এ কৌতূহল সমাজ-অনুমোদিত ভাবে পরিতৃপ্ত না হয়ে গোপনে প্রকাশিত হতে থাকে। শিশুও ভাবতে থাকে এ কৌতূহল পাপ—যৌন প্রবণতা পাপ—যৌন আচরণ পাপ; এ পাপকে সে গোপনে পোষণ করছে। ফলে তার মনে অপরাধের অনুভূতি বাসা বাঁধে। কিন্তু একথা আমরা ভুলে যাই, যৌন কৌতূহল শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক, নানা কর্ম-ধারায় একে আমরা প্রভাবিত করতে পারি। আমাদের সংস্কার, সামাজিক অনুশাসন যৌনশিক্ষাকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে—আর এর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও অবদমন শিশুমনে পাপানুভূতির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

একদল মনোবিজ্ঞানী বলেন, ধর্মীয় অনুশাসন পাপ ও অপরাধ সম্বন্ধে শিশু-মনে ধারণা সৃষ্টি করে। ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে নীতিবোধের নামে অনর্থক ভয় সৃষ্টি করে কৃত্রিম আচরণ ও পাপ সম্বন্ধে ধারণা জাগিয়ে তোলে। ধর্মীয় আচরণ ভঙ্গ হলে ব্যক্তি নিজে পাপী বলে ধরে নেয় এবং দুশ্চিন্তা ও আত্মগ্লানিতে ভোগে। ফলে ব্যক্তিত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে।

অপরাধবোধসঞ্জাত আচরণ মানসিক ব্যাধির কারণ এবং ব্যক্তির আচরণের সকল সংহতি ও অহংসত্তা বিকাশের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক।

## ৬। অপসঙ্গতির চিকিৎসা (Therapy of Maladjustment) :

আধুনিক মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে অপসঙ্গতির চিকিৎসা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অপপ্রতিযোজন বা অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয়ের সঙ্গে চিকিৎসার প্রশ্নটি জড়িত। মানসিক অসুস্থতা, ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী এবং সামাজিক সংহতির অনিষ্টকারী বহু আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এসব আচরণের কারণ উদ্ঘাটন সহজ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মিথ্যা বলা (lying), বিদ্যালয় থেকে পলায়ন (truancy) প্রভৃতি অপসঙ্গতিমূলক আচরণ কোন্ নির্দিষ্ট কারণে সংগঠিত হয়েছে বলা দুরূহ ব্যাপার। এ দুটো অপসঙ্গতিমূলক আচরণ একই কারণ নিরাপত্তার অভাব থেকে উদ্ভূত হতে পারে। সুতরাং অপসঙ্গতির চিকিৎসার পূর্বে মানসিক কারণ খুঁজে বের করে নিতে হয়। যে কোন চিকিৎসা করা হোক না কেন, প্রথমতঃ রোগ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করতে হয়, তারপর সে তথ্যগুলির সংব্যাখ্যানের প্রয়োজন। চিকিৎসা-বিধানে মনঃসমীক্ষণ ও খেলাভিত্তিক চিকিৎসা এ দুটো পন্থাই অবলম্বন করা হয়। আমরা পরপর এ সোপানগুলি আলোচনা করছি :

**(ক) তথ্য সংগ্রহ (Data Collection) :** অপপ্রতিযোজনের চিকিৎসার প্রথম কাজ হল রোগ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ। অপসঙ্গতি ব্যক্তির আচরণে ধরা পড়ে সত্য কিন্তু অসংলগ্ন, অস্বাস্থ্যকর আচরণের কারণটি মানসিক। এ মানসিক কারণের স্বরূপ নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। এজন্য প্রথমে রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের (Interview) প্রয়োজন। চিকিৎসক রোগীর আস্থাভাজন হবার চেষ্টা করবেন এবং তার অতি আপন জন ও বন্ধুর মতো তার সঙ্গে আচরণ করবেন। ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার দ্বারা চিকিৎসক রোগীর সমস্যা, রোগের প্রকৃতি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করবেন। এই সাক্ষাৎকার অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। রোগীর

মানসিক ব্যাপার সহজেই চিকিৎসকের কাছে ধরা পড়ে না, রোগীও নিঃসঙ্কোচে তার মানসিক ব্যাপার খুলে বলে না। প্রচুর ধৈর্য ও সহানুভূতি সহকারে চিকিৎসক রোগীকে সঙ্গ দেবেন। তারপর নানা কথাবার্তা, গল্প ইত্যাদি দ্বারা তার মানসিক ত্রুটি কোথায়, কি প্রকৃতির, কবে শুরু হয়েছে ইত্যাদি জানবার চেষ্টা করবেন।

মনঃসমীক্ষকরা (Psycho-analyist) সাক্ষাৎকারের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দিতে চান না। তাঁরা বলেন রোগের প্রকৃত কারণটি ব্যক্তির নির্জ্ঞান স্তরে থাকে। ব্যক্তিমনের এ গোপন স্তরটি সচেতন মনে ধরা পড়ে না। সাক্ষাৎকারের দ্বারা ব্যক্তির রোগের যে প্রকৃতি আমরা নির্ধারণ করি আসলে তার সঙ্গে মূল রোগের কোন সম্পর্ক থাকে না। মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড অবাধ অনুষঙ্গ-পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যক্তিমনের নির্জ্ঞান স্তরে সমবেত গোপন কথাটি খুঁজে বার করার উপদেশ দিয়েছেন। ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব নির্জ্ঞান স্তরে উপস্থিত হয়েই নানা মনোবিকার ও অপসঙ্গতি সৃষ্টি করে।

তবে নির্জ্ঞান মন ও মনঃসমীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও আমরা বলতে পারি, শিশুর ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারই সম্ভবতঃ উপযুক্ত পন্থা। অ্যাডলার অবাধ অনুষঙ্গ-পদ্ধতি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, শিশুর মানসিক অপসঙ্গতি ও বিকারের মূলে রয়েছে নিজস্ব ক্ষমতা সম্বন্ধে শিশুর ধারণা ও বাস্তব সামর্থ্যের মধ্যে তার পার্থক্য। তিনি সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষভাবে শিশুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দ্বারা রোগ নির্ণয় করতে বলেছেন।

(খ) **সংব্যাখ্যান (Interpretation):** সাক্ষাৎকারের দ্বারা চিকিৎসক রোগী, রোগ ও সমস্যা সম্বন্ধে যেসব তথ্য সংগ্রহ করলেন, তার যথাযথ বিন্যাস ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপর রোগীর মানসিক বিকারের স্বরূপ ধরা পড়ে এবং তার চিকিৎসা নির্ভর করে। সঠিকভাবে তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ না করলে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কোনটিই সফল হবে না। রোগী নানা কথা ও সংবাদ এলোমেলোভাবে বলে যায়, এর বেশির ভাগই অপ্রয়োজনীয়, আসল রোগের সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। চিকিৎসক তাঁর দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এ তথ্য স্তূপ থেকে প্রয়োজনীয় ও রোগ-সম্পর্কিত কথাগুলি খুঁজে বার করবেন।

মনঃসমীক্ষকরা বলেন, সাক্ষাৎকারলব্ধ তথ্যগুলি থেকে মানসিক রোগ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কারণ, মানসিক বিকার বা রোগের কারণ রোগীর নির্জ্ঞান

মনে সঞ্চিত থাকে। নির্জ্ঞান মনে যে দ্বন্দ্ব বাঁধে তাকে খুঁজে বার করতে না পারলে এ সংব্যাখ্যানের দ্বারা কোন চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। ব্যক্তির চেতন-মনের তথ্য থেকে নির্জ্ঞান মনের সংবাদ সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করতে না পারলে রোগ নির্ণয় করা যায় না। অবশ্য যাঁরা মনঃসমীক্ষণবাদ বা মনের সকল সমস্যার মূলেই নির্জ্ঞান মনের প্রভাব বর্তমান একথা স্বীকার করেন না, তাঁরাও নির্জ্ঞান মন যে সচেতন মনের উপর সময়বিশেষে এবং ব্যক্তিবিশেষে যথেষ্ট প্রভাবশালী, একথা মেনে নেন। তাঁরা সাক্ষাৎকার ও সংব্যাখ্যানের দ্বারা নির্জ্ঞান মনকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেন।

**(গ) মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসা (Psycho-analytical Therapy):** মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসার উদ্ভাবক হলেন ফ্রয়েড। মনঃসমীক্ষণবাদীরা বিশ্বাস করেন, আমাদের মনের একটি বৃহত্তর অংশ অচেতন, মনের একটি ক্ষুদ্র অংশই চেতন। চেতন মনে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত উপস্থিত হলে ব্যক্তি তাকে অবদমিত করে। এ অবদমিত কামনা-বাসনার দ্বন্দ্ব নির্জ্ঞান স্তরে সমবেত হয়ে ব্যক্তির চেতন-আচরণে নানা প্রতিক্রিয়া এবং অপপ্রতিযোজন সৃষ্টি করে। মনের এই গভীর তলদেশ থেকে অবদমিত দ্বন্দ্ব খুঁজে বার করতে না পারলে ব্যক্তির মানসিক রোগ নির্ণয়, প্রতিকার ও চিকিৎসা সম্ভব হতে পারে না।

কিন্তু নির্জ্ঞান স্তরে অবদমিত দ্বন্দ্ব সোজাসুজি বা প্রকাশ্যভাবে জানা যায় না। ফ্রয়েড এজন্য অবাধ অনুষঙ্গ-পদ্ধতি (Free Associaticn Method) উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতি অনুসারে রোগীকে যা মনে আসে তাই বলে যেতে বলা হয়। রোগীর এ বর্ণনা বিশ্লেষণ করে তার অবদমিত ইচ্ছা খুঁজে বার করা হয়। ফ্রয়েডের মতে অপপ্রতিযোজনের একমাত্র চিকিৎসাই হল নির্জ্ঞান মন থেকে অবদমিত দ্বন্দ্বটির উদ্ঘাটন। মনঃসমীক্ষক ব্যক্তিকে তার অজ্ঞাত দ্বন্দ্ব বা অবদমিত ইচ্ছার সঙ্গে পরিচিত করে দেন এবং তার ভবিষ্যৎ আচরণ থেকে অপসঙ্গতি কি ভাবে অপসারণ করা যায়, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত মনোভাব ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের সুপরামর্শ প্রদান করেন।

মনঃসমীক্ষণ দ্বারা ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছা বা অতৃপ্ত বাসনাকে প্রকাশ করে ব্যক্তির মনকে হালকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু অবদমিত ইচ্ছার উদ্ঘাটনেই চিকিৎসা শেষ হয়ে যায় না। রোগীর ভবিষ্যৎ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান চিকিৎসার অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

মনঃসমীক্ষণকে যাঁরা প্রামাণ্য চিকিৎসা হিসেবে গ্রহণ করেন না তাঁরা অবাধ অনুষঙ্গ-পদ্ধতির কার্যকারিতাও অস্বীকার করেন। আমাদের মানসিক সকল বিকার ও দ্বন্দ্বের মূলে অবদমন এবং নির্জ্ঞান মনের প্রভাব বর্তমান, এই সার্বিক নিয়মটি মানতে এঁরা প্রস্তুত নন। ফ্রয়েডের অনুগামী অ্যাডলার তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিতে নির্জ্ঞান মন ও অবদমনের প্রভাব স্বীকার করেন নি। তিনি সাক্ষাৎকার এবং প্রত্যক্ষভাবে আলাপ আলোচনার দ্বারা মানসিক দ্বন্দ্বের উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা এবং বাস্তবের অসামঞ্জস্যই অপপ্রতিযোজন এবং মানসিক রোগের কারণ।

মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও আমরা বলতে পারি অন্তর্দ্বন্দ্ব আবিষ্কার ও তার পুনরাগমন রোধ করার পরামর্শই ব্যক্তিকে মানসিক দিক থেকে সুস্থ করে তোলে না। এজন্য সুপরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। যে শিশু পাঠে ব্যর্থ হয়ে হীনমন্যতায় ভোগে—তার মানসিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ এবং হীনমন্যতা নিবারণের পরামর্শই তাকে সুস্থ করে তুলবে না। শিশুদের পক্ষে তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ বা আচরণে অভিপ্রেত পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষক, অভিভাবক, চিকিৎসক শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত আচরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন। যে শিশু নিজ সামর্থ্যের অভাবে পাঠে ব্যর্থ হয়ে আত্মগ্লানিতে ভোগে, তাকে পঠন-পাঠন ছাড়া তার দক্ষতা অনুসারে অন্য কোন কাজে প্রবৃত্ত করে পারদর্শিতা অর্জন না করাতে পারলে, মানসিক দ্বন্দ্ব যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। [ এখানে নির্জ্ঞান মন এবং মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে আমরা উল্লেখ করেছি। এজন্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এ অধ্যায়ে দুটো পৃথক অনুচ্ছেদে করা হল। ]

**(ঘ) খেলাভিত্তিক চিকিৎসা (Play Therapy):** খেলা শিশুর স্বাভাবিক প্রাণশক্তির বিকাশ, শিশুর সক্রিয়তা, মানসিক স্ফূর্তি, স্বতস্ফূর্তভাবে খেলার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। খেলার মধ্যেই শিশুর আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, রাগ, অভিমান, দুঃখবেদনা, পুঞ্জীভূত উত্তেজনা প্রকাশিত হয়, প্রশমিত হয়। শিশুমনের ভাববিরোধ, দ্বন্দ্ব সবই খেলার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এজন্য খেলার মাধ্যমে শিশুকে চিকিৎসা করার পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে।

ছোট ছোট শিশুর ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা রোগ সম্বন্ধীয় সত্য সংগ্রহ সম্ভব নয়। কারণ, এই অল্প বয়সে শিশুদের নিজের ভাব ব্যক্ত

করার কোন ক্ষমতা নেই, যথাযথ ভাষাজ্ঞান তারা অর্জন করতে পারে না। সুতরাং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের মনের ভাব জানবার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু এই অল্প বয়সেই শিশুদের মধ্যে নানা ধরনের অপপ্রতিযোজন দেখা দেয়। মনঃসমীক্ষকরা ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ জানবার জন্য বিরেচনপদ্ধতি (Catharsis) বা অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি প্রয়োগ করার কথা বলেন। কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। এজন্য মনশ্চিকিৎসকগণ অপসঙ্গতিপূর্ণ শিশুকে নানা খেলার সুযোগ দেন এবং খেলার প্রকৃতি ও ধরন দেখে শিশুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বটির স্বরূপ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেন। শিশু ভাষার দ্বারা বা বয়স্কদের মতো বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে না। খেলাই শিশুর স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের মাধ্যম; খেলার মাধ্যমেই শিশু তার জীবনের সমস্যা, তার রুদ্ধ, অবদমিত আবেগ ও মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ করে।[1]

এ পদ্ধতি অনুসারে যে শিশুর আচরণে অপসঙ্গতি দেখা যায়, তাকে মনশ্চিকিৎসক চিকিৎসাগারের খেলাঘরে নিয়ে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী তার সামনে তুলে ধরেন। শিশু তার ইচ্ছানুসারে খেলতে শুরু করে। শিক্ষক অলক্ষ্যে থেকে শিশুর আচরণ অনুধাবন করেন। বয়স্কদের ভাষায় শিশু নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না—কিন্তু খেলার মাধ্যমে তার মনোভাব নানা প্রতীক (symbol or sign) অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়। একটি সত্য ঘটনার সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক: খেলাঘরে খেলারত একটি শিশুকে লক্ষ্য করে মনশ্চিকিৎসক দেখলেন, শিশুটি একটি মেয়ে পুতুলকে বার বার একটি বাঘের মূর্তির সামনে ঠেলে দিচ্ছে। শিশুটির এ অদ্ভুদ আচরণ অনুসরণ করে চিকিৎসক জানতে পারলেন, শিশুটি তার মা কর্তৃক অবহেলিত। সুতরাং মেয়ে পুতুল তার মার প্রতীক। মার প্রতি সে ভীষণ বিরক্ত—সে প্রতিশোধ নিতে চায়। তাই সে মেয়ে পুতুলটিকে বার বার বাঘের মূর্তির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। খেলা-বিশ্লেষণ (Play Analysis) দ্বারা চিকিৎসক শিশুর রুদ্ধ অবদমিত অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারলেন।

1. "Play Therapy is based upon the fact that play is the child's natural medium of self expression. It is an opportunity which is given to the child to 'play out' his feelings and problems, just as in certain types of adult therapy, an individual 'talks out' his difficulties."

— W. M. Axline: Play Therapy.

উপরে যে খেলাভিত্তিক চিকিৎসার আলোচনা হল সে খেলা অনিয়ন্ত্রিত (uncontrolled) কিন্তু অনেক সময় চিকিৎসকরা খেলাকে নিয়ন্ত্রিত (controlled) করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। নিয়ন্ত্রিত খেলাভিত্তিক চিকিৎসায় চিকিৎসক খেলা পরিচালিত করেন এবং শিশুকে খেলার ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দেশ দান করেন।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে খেলাভিত্তিক চিকিৎসার উপকারিতা ও উপযোগিতা অনেক। প্রথমতঃ, শিশুর খেলা বিশ্লেষণের দ্বারা মনশ্চিকিৎসক শিশুর মানসিক পরিস্থিতি বুঝতে পারেন। শিশুর চাহিদা কি, তার সমস্যা কোথায়, সে কি ধরনের মানসিক বিকারগ্রস্ত তা জানবার সুযোগ এতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, অভিব্যক্ত মানসিক অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয় করে চিকিৎসক শিশুর চিকিৎসার আয়োজন করতে পারেন। তৃতীয়তঃ, শিশুর প্রয়োজন বা চাহিদা অনুসারে খেলার সামগ্রী উপস্থিত করে শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে সহায়তা করতে পারেন। চতুর্থতঃ, শিশুর আচরণে অবাঞ্ছিত লক্ষণ দেখা গেলে তা দূরীকরণের জন্য নিয়ন্ত্রিত খেলার মাধ্যমে চিকিৎসক অভিপ্রেত পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করতে পারেন।

## ৭। নির্জ্ঞান স্তর (The Unconscious) :

মনোবিজ্ঞানীরা চেতনার তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন—(১) চেতন বা সংজ্ঞান (Conscious), (২) অবচেতন বা অন্তর্জ্ঞান (Sub-Conscious) এবং (৩) নির্জ্ঞান (Unconscious)। চেতন স্তর বলতে আমরা বুঝি যে বিষয় সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্টভাবে সচেতন, অর্থাৎ যে বিষয়টি আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকে। সালি (*Sully*), স্টাউট (*Stout*), এঞ্জেল (*Angell*) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের মতে চেতনার কেন্দ্রস্থলের পর থেকে শুরু করে চেতনার প্রান্তদেশ পর্যন্ত ক্ষেত্রই অবচেতন বা অন্তর্জ্ঞান। যে বিষয়টি আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করে না, অথচ যেটি চেতনার ক্ষেত্রবহির্ভূত নয় সেটি অবচেতন স্তরে রয়েছে বলতে হবে। অর্থাৎ, চেতনার কেন্দ্রস্থলকে ঘিরে রয়েছে যে অস্পষ্ট স্বল্প চেতনার প্রান্তদেশ, তাকেই অবচেতন স্তর বলা হয়।

সাম্প্রতিকালে মনোবিজ্ঞানীরা চেতনার আর একটি গভীরতর স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। চেতনার এই স্তর সম্পর্কে আমরা কি সুস্পষ্টভাবে, কি

অস্পষ্টভাবে, কোন ভাবেই চেতন নই। এটা চেতনার বহির্ভূত স্তর; একেই বলা হয় নির্জ্ঞান স্তর (Unconscious)। এই নির্জ্ঞান স্তর চেতনার ক্ষেত্র-বহির্ভূত, কিন্তু মনোরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। নির্জ্ঞান স্তর সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে, এটি এমন একটি চেতনার স্তর যা একদিন চেতনার ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কোন কারণবশতঃ চেতনার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে গেছে, মন থেকে সরে যায় নি। সুযোগ মতো চেতনার অন্তরাল থেকে এ আবার চেতনার কেন্দ্রস্থলে এসে পৌছতে পারে।

মন এবং চেতনার ক্ষেত্র সমব্যাপক নয়। মনের চেতনার ক্ষেত্রকে অতিক্রম করেও এক গভীরতর স্তর আছে যেটি মনের নির্জ্ঞান স্তর। এই নির্জ্ঞান স্তর চেতনার স্তরবহির্ভূত, কিন্তু মনোরাজ্যের বহির্ভূত নয়। প্রশ্ন হল—এই নির্জ্ঞান স্তরের যে অস্তিত্ব আছে তার প্রমাণ কি? কি যুক্তির উপরে ভিত্তি করে এই নির্জ্ঞান স্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, নির্জ্ঞান স্তরে বিশ্বাস স্থাপন না করলে আমাদের অনেক মানসিক ঘটনার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। যাঁরা মনকে চেতনার ক্ষেত্রের সঙ্গে সমব্যাপক মনে করেন তাঁরাই মনের নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। কিন্তু মনোবিদ্‌রা নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। ফ্রয়েডের মতে শৈশবকালে ব্যক্তির অনেক অন্যায় কামনা স্বাভাবিক ও সমাজ-অনুমোদিত পথে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় না। শাস্তি, নিন্দা প্রভৃতির ভয়ে এই সব অন্যায় কামনা অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান মনে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আত্মপ্রকাশের সুযোগ খোঁজে, কিন্তু স্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হতে না পেরে বিকৃতরূপ নিয়ে বা ছদ্মবেশে সেগুলি প্রকাশিত হয়। দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি, স্বপ্ন, মানসিক রোগ প্রভৃতির মাধ্যমে এগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটে। মনঃসমীক্ষণের (Psycho-analysis) ফলে এগুলি জানা যায়। কাজেই ফ্রয়েডের মতে নির্জ্ঞান মন অবদমিত ইচ্ছার আশ্রয় স্থল। অনেক মনোবিদ্ মনে করেন যে, অবদমিত ইচ্ছার ব্যাখ্যা ছাড়াও স্বভাবী মনের মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যার জন্যও নির্জ্ঞান স্তরের সহায়তার প্রয়োজন হয়। আমরা এবার নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যে প্রমাণগুলি উপস্থাপিত করা হয় সেগুলি আলোচনা করব:

মনের নির্জ্ঞান স্তর স্বীকার করে না নিলে অনেক মানসিক ঘটনার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না

**নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি** (Proofs of the Existance of the Unconscious) :

(১) **দৈনন্দিন জীবনের ভুল-ভ্রান্তি :** ফ্রয়েডের মতে দৈনন্দিন জীবনের অনেক ভুল-ভ্রান্তি,—যেমন, নাম ভুলে যাওয়া, কথা বলার ভুল, লেখার ভুল প্রভৃতি নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন ব্যক্তি কতকগুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তির তালিকা তৈরী করতে গিয়ে দেখলেন যে, একটি পরিচিত ব্যক্তির নাম তিনি ভুলে গেছেন। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল যে, লোকটিকে আদৌ তাঁর পছন্দ নয়। আসল কারণ তাঁর নির্জ্ঞান মনে লুকিয়ে আছে।

দৈনন্দিন জীবনের ভুল-ভ্রান্তি

(২) **স্বপ্ন :** নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামনা-বাসনা যখন চেতন বা সংজ্ঞান (conscious) মনে বিকৃতভাবে প্রবেশ করে তখনই ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে। কাজেই স্বপ্ন নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

স্বপ্ন

(৩) **দিবা-স্বপ্ন (Day-dream) :** অনেক সময় ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায়ও স্বপ্ন দেখে। অলীক কল্পনায় বিভোর হয়ে সে হাস্যকর আচরণ করে। নিজেকে বিরাট ধনী ব্যক্তি ভেবে কল্পিত কোন অধীনস্থ ব্যক্তিকে আঘাত করার চেষ্টা করে। এই রকম আচরণের ক্ষেত্রেও বর্তমান থাকে কোন অবদমিত ইচ্ছা যা নির্জ্ঞান মনে আশ্রয় নিয়ে তার সংজ্ঞান মনের আচরণকে প্রভাবিত করে।

দিবা স্বপ্ন

(৪) **সংবেশন ও সংবেশনাত্তর অভিভাবন** (Hypnotism and post-hypnotic suggestion) : সংবেশনে কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত স্বপ্নাবস্থাও মনের নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আমাদের অতীত জীবনের অনেক ঘটনা আমরা অনেক চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারি না। কিন্তু সংবিষ্ট অবস্থায় আমরা সেসব স্মরণ করতে পারি। আবার সংবিষ্টকাল অতীত হয়ে গেলে, জাগ্রত অবস্থায় সে-সব ঘটনা আমরা বিস্মৃত হই। সুতরাং এই সব ঘটনার স্মৃতি মনের নির্জ্ঞান স্তরে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, এইরূপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

সংবেশন ও সংবেশোনোত্তর অভিভাবন

আবার সংবিষ্ট অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে সংবেশনোত্তর কালে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কার্য করার জন্য আদেশ করে দেখা গেছে যে, ব্যক্তি সংবেশনোত্তর কালে কার্যটি সম্পন্ন করেছে। কিন্তু সংবেশকের আদেশের কথা তার মোটেই মনে নেই। এই ঘটনা নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

(৫) **অনেক উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশ যেমন—উদ্গতি, অভিক্রান্তি, বিপরীত গঠন প্রভৃতি** নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন নারী সেবিকাব্রত গ্রহণ করেছে, কিন্তু আসল কারণ মাতৃত্বের কামনা নির্জ্ঞান মনে আত্মগোপন করে আছে। একে বলা হয় উদ্গতি (Sublimation)। আবার কোন নারী হয়ত পশুপাখী পুষে খুব আনন্দ পান, আসল কারণ অবদমিত মাতৃত্বের কামনা। একে বলা হয় অভিক্রান্তি (Displacement)। কোন সৎ ব্যক্তির অন্যায় শাস্তি লাভ করে হঠাৎ এক বিরাট দুষ্কৃতকারীরূপে পরিণত হওয়া বিপরীত গঠনের (Reaction formation) উদাহরণ। এরূপ ক্ষেত্রে নির্জ্ঞান ইচ্ছা তার বিপরীত রূপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়াও, অভিক্ষেপ (Projection) যুক্ত্যাভ্যাস (Rationalisation), ক্ষতিপূরণ (Compensation), অবাধ-কল্পনা (Fantasy), প্রত্যাবৃত্তি (Regression) প্রভৃতি ঘটনাও নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

উদ্গতি অভিক্রান্তি, বিপরীত গঠন

(৬) **মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ** নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। যেমন, ভয়বায়ুগ্রস্ত (Fear mania) রোগী অকারণে ভীতিগ্রস্ত হয়। শৈশবের কোন অবদমিত অন্যায় কামনা নির্জ্ঞান মনে লুকিয়ে থেকে সংজ্ঞান মনের আচরণকে প্রভাবিত করে। শুচি বায়ু (Touch mania), হিষ্টিরিয়া, বিষাদ বায়ু (Melancholy) চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (Dementia præcox) প্রভৃতি মানসিক ব্যধিগুলির মূলেও কোন অবদমিত নির্জ্ঞান কামনা থাকে, যেগুলি নির্জ্ঞান মনে আত্মগোপন করে থাকে।

মানসিক রোগ

(৭) **আকস্মিক স্মৃতি :** অনেক সময় কোন একটি বিষয় আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমরা মনে আনতে পারি না। কিন্তু অন্য আর একটি বিষয় চিন্তা করার সময় সেই বিষয়টি হঠাৎ মনে জেগে ওঠে। নির্জ্ঞান মনের স্তর থেকেই সে বিষয়টি চেতনার কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছয়, এরূপ অনুমানই এ জাতীয় ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে।

আকস্মিক স্মৃতি

(৮) **নিদ্রাকালে মনের ক্রিয়া :** ঘুমুতে যাবার আগে যে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় নি, দেখা গেছে ঘুম ভাঙবার পর বিনা প্রচেষ্টায় তার সমাধান খুঁজে পাওয়া গেছে। মনের চেতনস্তর যখন এই সমস্যার সমাধান যোগায়নি তখন নির্জ্ঞান স্তরই সে সেই সমস্যার সমাধানটি যুগিয়ে দিয়েছে এরূপ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

নিদ্রাকালে মনের ক্রিয়া

**(৯) অগোচর আবেগ :** অনেক সময় কোন লোকের প্রতি আমরা অকারণেই আকর্ষণ বোধ করি বা অকারণেই ঘৃণা বোধ করি বলে মনে হয়। কিন্তু এই আকর্ষণ বা ঘৃণা বিনা কারণেই মনে উৎপন্ন হয়েছে এরকম অনুমান যুক্তিসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ, মনের নির্জ্ঞান স্তরেই আবেগগুলি মনের অগোচরে জন্মলাভ করেছে, দিন দিন বৃদ্ধিলাভ করছে এবং সুযোগমত মনের চেতন স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে, এরূপ অনুমানই যুক্তিসংগত।

**অগোচর আবেগ**

**(১০) কবি ও শিল্পীদের সৃষ্টি প্রেরণা :** যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ও উৎসাহ কবি ও শিল্পীদের সৃষ্টিকার্যে উদ্বুদ্ধ করে, নির্জ্ঞান স্তরকেই সেই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস বলে ধারণা করা হয়। কবি কোলরিজ (*Coleridge*) বলেছিলেন যে, তাঁর বিখ্যাত কবিতা '*Kubla Khan*'-এর বেশীর ভাগ অংশই তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় রচিত, জাগ্রত অবস্থায় তিনি কেবল লিপিবদ্ধ করেছেন।

**কবি ও শিল্পীর সৃষ্টি-প্রেরণা**

## ৮। শিক্ষা ও নির্জ্ঞান মন (Education and the Unconscious) :

শিক্ষায় এই নির্জ্ঞান স্তরটির প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সার্থক শিক্ষার সঙ্গে নির্জ্ঞান মনের যথাযথ ব্যবহারের সম্পর্ক বর্তমান। তিরস্কার, ভর্ৎসনার দ্বারা শিশুকে শিক্ষাপ্রদান করতে গেলে শিশু হয়ত শিক্ষকের প্রাধান্য মেনে নেয়, কিন্তু তার রাগ, অভিমান, বিরক্তি নির্জ্ঞান স্তরে সমবেত হয়ে নানা মানসিক বিকার ও অপসঙ্গতির সৃষ্টি করে। শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী, চাহিদা-কেন্দ্রিক করে তুলতে গেলে শিশুর আবেগকে শিক্ষায় স্থান দিতে হবে। অবহেলিত আবেগ অবদমিত হয়ে শিশু মনের নির্জ্ঞান স্তরে আশ্রয় লাভ করে শিক্ষাগ্রহণের পরিপন্থী মনোভাব সৃষ্টি করে। ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যান অনুসারে নির্জ্ঞান মন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ব্যক্তির আচরণের মূল নিয়ন্ত্রক এই নির্জ্ঞান মন। শিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা স্মৃতিতে রক্ষিত না হলে শিক্ষণের অগ্রগতি অসম্ভব। কিন্তু শিক্ষার পরিপন্থী মনোভাব সৃষ্টি হলে নির্জ্ঞান স্তর সক্রিয় হয়ে বিস্মৃতি ঘটায়। যদি শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণে বিমুখ হয়, তবে তার মনে কোন ভয় সঞ্চার না করে, তাকে বিদ্রূপ বা অবহেলা না করে, তার মানসিক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে হয়। আর এ অনুধাবনের সময় নির্জ্ঞান মনের অবস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়েই মনশ্চিকিৎসক ও শিক্ষককে শিক্ষাপ্রদানের

কথা চিন্তা করতে হয়। এক্ষণে শিক্ষা ও নির্জ্ঞান মনের সম্পর্ক নির্ণয়ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

আমাদের মনে নির্জ্ঞান স্তরের আবিষ্কার বোধকরি মনোবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এর স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আজও অন্তহীন গবেষণা চলছে। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ণয়ে, মানুষের আচরণ সংব্যাখ্যানে, শিক্ষাপ্রদানে সর্বত্র আজ নির্জ্ঞান মনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া স্বীকৃত ব্যাপার।

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানে মন ও চেতনাকে আমরা সমার্থক এবং সমব্যাপক বলে জানতাম। চেতনার বাইরে মনের অস্তিত্ব ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার। আমরা জানতাম আমাদের সকল আচরণ সচেতন মনপ্রসূত। আর চেতনার বাইরে যা বিদূরীত করা যায় তা মনেরও বাইরে বিলীন হয়। আচরণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দ্বারা মনেরও পরিবর্তন করা যায়। আমরা বিশ্বাস করে এসেছি, শিক্ষা বা পরিবেশের প্রভাবে মনকে ইচ্ছামত প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করা যায়। আর এ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই আমরা মানসিক শৃঙ্খলা প্রবর্তন করতে চেয়েছি, শিক্ষার্থীর মনকে কেন্দ্র না করে সামাজিক অভিরুচি অনুযায়ী পাঠ্য-বোঝা শিক্ষার্থীর উপর আরোপ করেছি।

কিন্তু নির্জ্ঞান স্তরের অবস্থিতি জানবার পর মনের পরিধি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা এতদিন মানবাচরণ সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলাম, নির্জ্ঞান মনের আবিষ্কারে সে জ্ঞান অপর্যাপ্ত এবং অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের আচরণে তার সচেতন মনের চাইতে নির্জ্ঞান মনের প্রভাব বেশি। আমরা আরও জেনেছি, সচেতন মনের বাইরে চলে গেলেই আমাদের কামনা, বাসনা ইত্যাদি মনের বাইরে উধাও হয়ে যায় না। আমাদের অতৃপ্ত চাহিদা, আমাদের অপূর্ণ কামনা নির্জ্ঞান স্তরে আশ্রয় লাভ করে এবং নানাভাবে আমাদের সচেতন মনকে প্রভাবিত করে। নিন্দা, শাসন, ভর্ৎসনার ভয়ে যেসব ইচ্ছা আমরা অবদমিত করি, সেগুলি আমাদের নির্জ্ঞান মনে উপস্থিত হয়ে নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। আর, আমাদের আচরণে, চিন্তায় নানা অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে।

মানবমনের এই আস্বাভাবিকতাকে কেন্দ্র করে আধুনিক অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের (Abnormal Psychology) জন্ম হয়েছে। আর এ অস্বাভাবিক আচরণ নির্জ্ঞান মনের উৎপীড়ন মাত্র।

যে ছেলে পাঠ বিস্মৃত হয়, দেখা যাবে হয়ত তার নির্জ্ঞান মনই তার স্মৃতিকে প্রতিহত করছে। শাসনের ভয়ে হয়ত সে পড়াশোনা করছে, কিন্তু তার মানসিক চাহিদা হয়ত অতৃপ্ত। যে মিথ্যা কথা বলছে, তার হয়ত আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা স্বাভাবিক বিকাশ-পথ না পেয়ে অস্বাভাবিক পন্থায় আত্মম্ভরিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। যে ছেলে ক্লাস থেকে পালাচ্ছে, তার আনন্দমূলক আবেগ হয়ত বিদ্যালয়ে অতৃপ্ত, তাই সে তার কোন কৌতূহল বা চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে বিদ্যালয়ের বাইরে যাচ্ছে। কিন্তু এ সবই অপসঙ্গতিশীল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ এবং ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের বিরোধী। কিন্তু এর কারণ তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এগুলি নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্বলিপ্ত প্রভাব।

ব্যক্তির চরিত্রে এ ধরনের অপসঙ্গতি বা স্বাভাবিকতার সঙ্গে পরিচয় আমাদের নতুন নয়। যে জিনিসটি নতুন সেটি হচ্ছে তার প্রতিকার-ব্যবস্থা ও কারণ-নির্ধারণ প্রণালী। আগে আমরা শাসন, ভর্ৎসনা অথবা প্রশংসা দ্বারা বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে অপসঙ্গতি দূর করতে চেয়েছি। আমরা এগুলির কারণ-নির্ধারণে ব্যক্তির সচেতন মনকে দায়ী করেছি। আমরা ব্যক্তির সঙ্গত আচরণকে তার সচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ মনে করে তার প্রতিকার করতে চেয়েছি নানা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা। কিন্তু নির্জ্ঞান মনোবিজ্ঞান (Psychology of the Unconscious) দেখিয়েছে, অপসঙ্গতি ও অস্বাভাবিক আচরণ সচেতন মনের ক্রিয়া নয়, নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্বজনিত আচরণ। সুতরাং তার চিকিৎসা (therapy) মনোবিজ্ঞানসম্মত হওয়া দরকার। বাইরের নিন্দা, প্রশংসা, শাসন, ভয়, নীতি-উপদেশ ইত্যাদি কোন প্ররোচক দ্বারা তার কোন প্রতিকার করা যায় না। যতক্ষণ না নির্জ্ঞান মনের গভীর তলদেশে নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বটি বিদূরীত হচ্ছে, ততক্ষণ ব্যক্তি-চরিত্রের অস্বাভাবিকতা তিরোহিত হবে না। সুতরাং শাসন, দমন না করে আজ আমরা সমস্যাগ্রস্ত শিশুকে চিকিৎসামূলক সুপরিচালনা দ্বারা (Child Guidance Clinic) মানসিক রোগমুক্ত করার চেষ্টা করে থাকি।

নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে জানবার পর শিক্ষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। পাঠ্যসূচী প্রণয়নে আমরা শিশুর চাহিদা, ইচ্ছা, আবেগ ইত্যাদির উপর নির্ভর করি। কারণ, আমরা জানি শিশুর আবেগ, চাহিদা, প্রবৃত্তি প্রভৃতি শিক্ষায় অতৃপ্ত হলে অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান স্তরে সমবেত হয় এবং নানা মনোবিকার (Complexes) ও আচরণ-সমস্যা সৃষ্টি করে।

শিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রে আজ আমরা যে মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতি (psychological method), ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি (individualised method) গ্রহণ করে থাকি, নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব জানবার পর এ শিক্ষাপদ্ধতিগুলোর অনেক পরিবর্তন ও প্রগতি সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ববিকাশ—কিন্তু ব্যক্তিত্ববিকাশ ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। শিশুর নির্জ্ঞান মনের সঞ্চিত কামনা-বাসনার সঙ্গে বাস্তব জগতের সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গতিবিধান ব্যক্তিত্বের প্রগতির লক্ষণ। কিন্তু নির্জ্ঞান স্তরের অবদমিত অতৃপ্ত বাসনাপুঞ্জ যদি ব্যক্তির আচরণে অস্বাভাবিকতা, অপসঙ্গতি বা মনোবিকার সৃষ্টি করে তবে ব্যক্তিত্ববিকাশ প্রতিহত হবে। এজন্য শিক্ষক নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব ও প্রভাব স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষাপ্রদান করেন। ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখবার জন্য আধুনিক শিক্ষক মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের (Mental Hygiene) সাহায্য গ্রহণ করেন।

এক কথায় শিক্ষার সঙ্গে নির্জ্ঞান মন আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

## ৯। মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) :

**(ক) ফ্রয়েডের মত** (Freud's Theory) : 'মনঃসমীক্ষণ' পদটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, 'মনঃসমীক্ষণ' বলতে মানসিক রোগ চিকিৎসার জন্য ফ্রয়েড যে বিশেষ পদ্ধতি (Technical Method) আবিষ্কার করেছেন তাকে বোঝায় : আর দ্বিতীয়তঃ, মনঃসমীক্ষণ বলতে মনের গঠন ও স্বরূপ সম্পর্কে ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক মতবাদকে (theory) বোঝায়।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীরা মনের সচেতন প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ ও তার স্বরূপ নির্ণয় এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণের মধ্যেই মনোবিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামী মনোবিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম মনের নির্জ্ঞান স্তরের কথা বিশ্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে চেতন মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ ও স্বরূপ নির্ধারণের মাধ্যমে মনের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয় না। মনের গভীরে রয়েছে নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব; মানুষের অবদমিত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনাগুলি একে আশ্রয় করে থাকে এবং এই নির্জ্ঞানস্তরের স্বরূপ নির্ধারণ না করলে

মনের যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায় না। বস্তুতঃ, ফ্রয়েডের মতে এই নির্জ্ঞান মনের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যাই মনোবিজ্ঞানের কাজ।

ফ্রয়েডের মতে মন হল গতিশীল (dynamic)। জ্ঞানমূলক ক্রিয়াই মনের প্রধান ক্রিয়া নয়, ইচ্ছামূলক (conative) ক্রিয়াই মনের প্রধান ক্রিয়া। সে কারণে ইচ্ছা, সহজাত প্রবৃত্তি, তাড়না, বিরোধ, অবদমন প্রভৃতির মাধ্যমে মন ক্রিয়া করে এবং ধারণাগুলি সবই গতিমূলক ধারণা।

মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সূচনা কি ভাবে হল, এ সম্বন্ধে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক—ফ্রয়েড তাঁর চিকিৎসক-জীবনের প্রথম ভাগে মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য সম্মোহন (hypnotism) পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে সময়ে প্যারিস শহরে শারকো (*Charcot*) সম্মোহন পদ্ধতির সাহায্যে হিষ্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা করেছিলেন এবং ফ্রয়েড শারকোর কাছ থেকেই এই পদ্ধতি শিক্ষা কবেন। ফ্রয়েডের বন্ধু এবং সহকর্মী ডাক্তার ব্রুয়ার (*Dr. Breur*) একটি রোগিণীর হিষ্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখলেন যে, রোগীকে সম্মোহিত করে যদি তাকে তার মনের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে রোগী খুব অল্প সময়ের মধ্যে রোগমুক্ত হয় এবং এই পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি রোগিণীটির রোগ নিরাময় করলেন। তারপর ফ্রয়েড ও ব্রুয়ার অন্য রোগীর উপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন এবং মনের কথা বলে যাওয়া (taking out) পদ্ধতিকে বিরেচন (catharsis) নামে আখ্যা দিলেন। কিন্তু ব্রুয়ার শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতির প্রয়োগ বিপজ্জনক মনে করে পরিত্যাগ করলেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর জনৈক রোগিণী রোগ নিরাময়ের পূর্বে তাঁর প্রেমে পড়ে গেছেন। ফ্রয়েড কিন্তু এই পদ্ধতি পরিত্যাগ না করে এই নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে আরও অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন। ফ্রয়েড বরং সম্মোহন পদ্ধতি বর্জন করলেন কারণ তিনি লক্ষ্য করলেন, এই পদ্ধতি সকল সময় সুফল প্রদান করে না। তাছাড়া, রোগ নিরাময় সাময়িকভাবে ঘটে থাকে এবং অনেক স্নায়বিক রোগীকে সম্মোহিত করা সম্ভব হয় না। তিনি 'অবাধ অনুষঙ্গ' (Free Association) পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। এই পদ্ধতি অনুসারে রোগীকে যা মনে আসে তাই বলে যেতে বলা হয়—সে বক্তব্য বিষয় যতই অসংলগ্ন, অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়, দুঃখজনক বা অশ্লীল হোক না কেন। কিন্তু ফ্রয়েড লক্ষ্য করে দেখলেন যে এ সত্ত্বেও রোগী যেন সব কথা মনে আনতে পারছে না। চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ মনের আভ্যন্তরীণ বিরোধ

(conflict) এবং বাঁধার (resistance) জন্য রুদ্ধ হচ্ছে। এই কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ফ্রয়েড নির্জ্ঞান মনের সন্ধান পেলেন। ফ্রয়েড আবিষ্কার করলেন যে এই বিরোধ ও বাধার মূলে আছে রোগীর লজ্জা, দুঃখ ও ভয়, ; এবং তার কারণ অবদমিত ইচ্ছা, কামনা, যেগুলি আসলে যৌনমূলক।

এই সঙ্গে ফ্রয়েড আরও একটি পদ্ধতির অনুসরণ করলেন, যেটি হল স্বপ্ন বিশ্লেষণ। রোগী পূর্ব রাত্রে যে স্বপ্নটি দেখেছে, সেই স্বপ্ন সম্পর্কে অবাধে সব কথা তাকে বলতে বলা হত। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নের দ্বারা ব্যক্তির অতৃপ্ত কোন ইচ্ছার পূরণ ঘটে। এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড রোগীর অতীত জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আবিষ্কার করে তার মানসিক রোগ দূর করতে সচেষ্ট হতেন। ফ্রয়েড দেখালেন স্বপ্নের দুটি অংশ আছে—ব্যক্ত অংশ (manifest content) এবং অব্যক্ত অংশ (latent content)। ফ্রয়েড স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, ব্যক্ত অংশে এমন কতকগুলি প্রতীক (symbol) ব্যবহার করা হয় যেগুলি স্বপ্নের অব্যক্ত অংশটুকুর অর্থ-নির্ধারণে সাহায্য করে।

এছাড়া, ফ্রয়েড মনের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন—(১) সংজ্ঞান (Conscious), আসংজ্ঞান (Pre-Conscious) এবং নির্জ্ঞান (Unconscious)। যা মনের সংজ্ঞান স্তরে আছে তা সহজেই আসংজ্ঞান স্তরে চলে যেতে পারে। বস্তুতঃ, স্মৃতির সাহায্যে আমরা যেসব প্রতিরূপগুলিকে আমাদের মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করে তুলি, সেগুলি মনের এই আসংজ্ঞান স্তরেই সঞ্চিত থাকে। নির্জ্ঞান স্তর আমাদের কামনা-বাসনার আশ্রয় স্থল। যে সব কামনা-বাসনা সমাজ অনুমোদিত পথে স্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ হতে পারে না সেগুলিই এই নির্বাণ স্তর আশ্রয় করে থাকে। স্মৃতির সাহায্যে এগুলিকে মনের সংজ্ঞানস্তরে তুলে ধরা যায় না। ফ্রয়েডের মতে আমাদের সব কামনা-বাসনা মূলতঃ কামজ। যেহেতু সকল কামনাকে স্বাভাবিকভাবে সমাজজীবনে পরিতৃপ্ত করা যায় না সেহেতু এগুলি অবদমিত হয় এবং স্বপ্ন, মানসিক বিকার প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

ফ্রয়েড প্রথমে মনকে দুটি অংশে ভাগ করেন, ঈগো (Ego) এবং নির্জ্ঞান (Unconscious)। এই ঈগো হল মনের সংজ্ঞান বা চেতন স্তর। এই সংজ্ঞান স্তর সেই সব ইচ্ছাগুলিকে অবদমিত করে সেগুলি সে গ্রহণ করতে নারাজ, এগুলিকে সে বাধা দিয়ে নির্জ্ঞান স্তরে ঠেলে দেয়। নির্জ্ঞান স্তরের বিষয়গুলি সংজ্ঞান স্তরে আসার জন্য সব সময়ই চেষ্টা করে। কিন্তু ঈগো

সেগুলিকে প্রতিহত করে রাখে। কিন্তু দেখা গেল অনেক রোগীর ক্ষেত্রে বাধা দেবার বিষয়টি রোগীর অজ্ঞাতসারেই ঘটে থাকে। অর্থাৎ সচেতনভাবে যদিও তারা অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি অনুসারে কোন কোন অভিজ্ঞতাকে মনে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে, কিন্তু ঈগো অজ্ঞাতসারে তারা বাধা দিচ্ছে। সে কারণে ফ্রয়েডের সংশোধিত মতবাদে দেখা গেল ঈগো অংশতঃ সংজ্ঞান এবং অংশতঃ নির্জ্ঞান। সচেতন বা সংজ্ঞান হিসেবে ঈগোর সঙ্গে পরিবেশের সংযোগ আছে এবং এটি বাস্তব সূত্র (reality) অনুসরণ করে। নির্জ্ঞান হিসেবে এটি নির্জ্ঞান স্তরের গভীরে মিশে থাকে, যাকে তিনি বলেছেন ঈদ (Id) এবং একটি সুখসূত্র (Pleasure-Principle) অনুসরণ করে। ঈগোর কাজ হল এই জগৎ এবং ঈদএর মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করা। সহজাত প্রবৃত্তি, তাড়না, নোদনা প্রভৃতি নিয়ে ঈদ (Id) গঠিত। কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে ঈদের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। এ নিজে কিছুই জানে না, নিজের থেকে এর কিছুই করার ক্ষমতা নেই। এদিকে ঈগো সচেতনভাবে ঈদএর আদেশ পালন করে, অপরদিকে যেসব ইচ্ছা, কামনা বাসনা সমাজের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় সেগুলিকে অবদমিত করে। ঈগোর কাজ হল ঈদএর কাছ থেকে প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ে বাস্তব সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা। এছাড়া মনের আরও একটি অংশ আছে যাকে বলা হয় সুপার ঈগো (Super Ego । ঈগোর আবার দুটি অংশ—একটি হল কর্মকর্তা এবং আর একটি নৈতিক সমালোচক, এটিই হল সুপার ঈগো।[1] সুপার ঈগোকে বিবেক বা নীতি-বুদ্ধির (Conscious) সঙ্গে এবং ঈগোকে বিজ্ঞতার (Prudence) সঙ্গে তুলনা করা চলে। ঈদ (Id) যাবতীয় কামনা-বাসনার আশ্রয়স্থল। সুপার ঈগো ঈগোর উপর খবরদারী শুরু করে দেয়—এটা কর, এটা কর না, কিন্তু কেন করবে বা করবে না তার কোন কারণ নির্দেশ করে না। সুপার ঈগো তার আদেশের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কারণ, এই আদেশের উৎস রয়েছে মনের নির্জ্ঞান স্তরে। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব যে তিনটি স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত তা হল যৌন আকাঙ্ক্ষা (libido), অবদমন (repression) এবং শৈশবকালীন যৌনতা (infantile sexuality)। শিশুর

1. "So the ego is split into, the doer or executive which remains the ego Proper and the watcher or moral critic in the Super Ego.

—Woodworth

যৌনাকাঙ্ক্ষা সমাজের বিধিনিষেধের জন্য চরিতার্থতা লাভ করার সুযোগ পায় না। সে কারণে এই আকাঙ্ক্ষা অবদমিত হয়ে অবচেতন ইচ্ছার রূপ পরিগ্রহ করে।

মন বা ঈগো সংজ্ঞান স্তরে বাস্তব সূত্র অনুসরণ করে সমাজের নৈতিক আদর্শ মেনে চলে। সমাজের প্রভাবের জন্যই সমাজ অননুমোদিত বাসনার পরিতৃপ্তি সে খুঁজে না। কিন্তু ঈগো নির্জ্ঞান স্তরে সুখসূত্র অনুসরণ করে এবং নির্জ্ঞান স্তরে যেসব কামনা-বাসনা অবদমিত হয়ে থাকে সেগুলি পরিতৃপ্তির সন্ধান করে এবং সুখসূত্র অনুসরণ করে। সেগুলি দিবা স্বপ্ন, অলীক কল্পনা প্রভৃতির মাধ্যমে পরিতৃপ্তি খুঁজে বেড়ায়। সুতরাং বাস্তব সূত্রের সঙ্গে একটা বৈপরীত্য (Polarity) সম্বন্ধ বর্তমান।

ফ্রয়েড মানুষের মধ্যে দুটি আদিম প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন—অহং প্রবৃত্তি **(ego বা ego tendency)** এবং কাম প্রবৃত্তি (*libido*)। আত্মরক্ষামূলককার্য অহং প্রবৃত্তির এবং বংশরক্ষামূলককার্য কাম প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। ফ্রয়েডীয় ভাষায় কাম প্রবৃত্তিকে *libido*[1] বলা হয়। এই *libido* শব্দটিকে ফ্রয়েড ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। লিবিডোর অর্থ কামভাব বা যৌনাকাঙ্ক্ষা। আমাদের সকল রকম ভালবাসা, মাতাপিতার সন্তান বাৎসল্য, সকল রকম মানসিক আকর্ষণ ও সম্পর্ক, এক কথায় সকল সুখানুভূতি লিবিডোর অন্তর্ভুক্ত।

ফ্রয়েডের মতে শিশু হল আত্মকামী **(autosexual)**; সে তার নিজের দেহকে ভালবাসে। এই আত্মকামিতাকে বলা হয় নার্সিসিজম **(Narcissism)**। যখন সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন বালক-শিশু অন্য বালককে ভালবাসে, একে বলা হয় **'hemosexuality.'** তারপর সে যখন পরিণত বয়স্ক যুবকে পরিণত হয় তখন সে অন্য কোন যুবতীকে ভালবাসে, একে বলা হয় **'Heterosexuality.'** সুতরাং লিবিডো বা কাম প্রবৃত্তির বিভিন্ন স্তর আছে।

ফ্রয়েড কার্যপ্রবৃত্তির আরও দু ধরনের প্রকাশের কথা বলেছেন, একে বলা হয় ঈডিপাস কম্প্লেক্স **(œdipus Complex)** এবং ইলেকট্রা কম্প্লেক্স **(Electra Complex)**। প্রথমটি হল পুরুষ শিশুর মাতার প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করা এবং পিতাকে ঈর্ষা করা বা ঘৃণা করা। দ্বিতীয়টি হল স্ত্রী শিশুর পিতার প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করা এবং মাতাকে ঘৃণা করা।

1. **'Our whole civilization is the expansion of libido'. —Freud**

এ রকম আরও দু ধরনের যৌনপ্রকাশ হল মর্ষকাম (Masochism) ও ধর্ষকাম (Sadism)। মর্ষকাম হল আত্মপীড়নের মাধ্যমে যৌন তৃপ্তি লাভ করা। মর্ষকামীরা প্রেমাস্পদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে যৌন সুখ অনুভব করে। ধর্ষকাম হল প্রেমাস্পদকে নিপীড়িত করে যৌন সুখ লাভ করা।

ফ্রয়েড লিবিডো সম্পর্কীয় ধারণাকে ব্যাপক করে তুলেছেন আরও একটি বৈপরীত্যের উল্লেখ করে। এটি হল জীবন বৃত্তি (Eros or life urge) এবং মরণ প্রবৃত্তি (Death-instinct)। এ উভয়ের দ্বন্দ্ব প্রতিটি মানুষের মধ্যে বর্তমান। 'নির্বাণ' লাভের আকাঙ্ক্ষার মূলে এই মরণ প্রবৃত্তিই ক্রিয়া করে।

'মনঃসমীক্ষণ' আলোচনা-প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের অনুগামী অ্যাডলার (*Alferd Adler*) এবং য়ুঙের (*Karl Jung*) বক্তব্যগুলি লক্ষণীয়।

**(ক) অ্যাডলার-এর মতবাদ** (Views of Adler): অ্যাডলারের মতবাদ ব্যষ্টি-মনোবিজ্ঞান (Individual Psychology) নামেখ্যাত। অ্যাডলার মনে করেন, ফ্রয়েড শিশুমনে যৌনাকাঙ্ক্ষার আবির্ভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে শিশুর আচরণের যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। অ্যাডলারের মতে শিশুর মধ্যে শৈশব থেকেই দেখা যায় আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা এবং অপর ব্যক্তি তার উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হলে তার প্রতিরোধ করা। চারপাশের পরিবেশে শিশু যাদের দেখে তাদের তুলনায় নিজেকে দুর্বল ও হীন মনে করে এবং তার ফলে তার মনে যে হীনমন্যতা বোধ জাগে, সেই হীনমন্যতা বোধ থেকে সে মুক্ত হতে চায়। অ্যাডলার বলেন যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে শক্তি বা ক্ষমতালাভের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা, অপরের কাছে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার এবং অপরের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার বাসনা।

বস্তুতঃ, অ্যাডলার যৌন তাড়নার তুলনায় আত্মপ্রতিষ্ঠার তাড়নার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তাঁর মতে পরিবেশের জন্য এই তাড়না বিশেষ-ভাবে ব্যাহত হয়, যার জন্য প্রতিযোগীদের প্রতি ঘৃণা, অসামাজিক কার্যকলাপ এবং মানসিক বিকারের আবির্ভাব ঘটে।

কিন্তু এই ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তিকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে? অ্যাডলার মনে করেন, শিশুর মধ্যে সদয় ও প্রীতিমূলক প্রতিক্রিয়া করার এক সহজাত ক্ষমতা আছে (a native capacity for friendly, loving responses)। মাতা-পিতা, বিদ্যালয়, সমাজ এ ক্ষমতাকে কাজে লাগালে শিশু অপসঙ্গতিশীল হয়ে ওঠে না। শিশুর মধ্যে জীবনের প্রতি

একটি দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবনযাত্রা পদ্ধতি (style of life) সূচিত হতে থাকে, জীবনের বহু সমস্যার সঙ্গে প্রতিযোজন করার সময় সে এ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়।

যৌন তাড়নাকে অস্বীকার না করলেও অ্যাডলার এর উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করেন নি। যখন মনঃসমীক্ষক যৌন বিষয়কে কেন্দ্র করেই সব কিছু ব্যাখ্যা করতে চান তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি মানুষের কার্যকলাপের একটি বিকৃত ছবি তুলে ধরেন। সামাজিক জীবনযাত্রা (Community-living), বৃত্তি (Occupation) এবং যৌনগামী প্রেম (Sexual-love)—জীবনের এই তিনটি সমস্যার মধ্যে প্রথমটির সঙ্গেই শিশুর প্রথম পরিচয় এবং সমাজের সঙ্গে তার উপযোজন নির্ভর করে, কিভাবে অন্য সমস্যাগুলির সমাধানে সে অগ্রসর হবে।

মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সমাজ-জীবনের সঙ্গে যথার্থ উপযোজনের অভাবে ব্যক্তির মনের মধ্যে হীনমন্যতা বোধ জাগে এবং এই হীনমন্যতাবোধ দূর করার জন্য সে আত্মম্ভরিতার সাহায্য নেয়। অবদমিত কামনা, ও ইচ্ছাগুলিকে জানার জন্য স্বপ্নবিশ্লেষণের উপর অ্যাডলার কোন গুরুত্ব দেন নি। তাঁর মতে স্বপ্ন কেবলমাত্র অবদমিত ইচ্ছার পূরণ নয়, রোগীর বর্তমান সমস্যার প্রতি তার আবেগমূলক দৃষ্টিভঙ্গী এই স্বপ্নের মাধ্যমে জানা যায়।

(খ) **য়ুঙের মতবাদ** (Views of Jung): প্রথম দিকে ফ্রয়েডের অনুগামী হলেও য়ুঙ শেষ পর্যন্ত ফ্রয়েড প্রবর্তিত মতবাদ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন।

য়ুঙ লিবিডো বা যৌনশক্তিকে ফ্রয়েডপ্রদত্ত ব্যাখ্যার চাইতেও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি ফ্রয়েডের যৌন আকাঙ্ক্ষা এবং অ্যাডলারের ক্ষমতা লাভের বাসনা—সংক্ষেপে সবরকম প্রেষণাকেই লিবিডোর অন্তর্ভুক্তি করেছেন। য়ুঙ-এর কাছে লিবিডো হল জীবের জীবনশক্তি।

মানসিক রোগীর রোগের কারণ নির্ণয়ের ব্যাপারে য়ুঙ রোগীর শৈশব জীবনের ইতিহাস-সন্ধানের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তাঁর মতে রোগীর রোগের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থাই রোগের কারণ এবং সেই পূর্ববর্তী অবস্থা হল পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু উপযোজনে ব্যক্তির অসামর্থ্য। তবে মানসিক রোগের

চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি ফ্রয়েডের অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি এবং স্বপ্নবিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

ফ্রয়েডের তুলনায় য়ুঙ নির্জ্ঞানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। য়ুঙ-এর মতে নির্জ্ঞানের গভীর এবং গভীরতর স্তর আছে। সবচেয়ে কম গভীর স্তর হল ব্যক্তিগত নির্জ্ঞান (Personal Unconsciousness), যার মধ্যে কেবলমাত্র অবদমিত উপাদানই থাকে না, বিস্মৃত বিষয় বা অবচেতন ভাবে যেসব বিষয় শিক্ষা করা হয়েছে সেগুলিও উপস্থিত থাকে। এরও গভীর স্তরে রয়েছে সমষ্টিগত নির্জ্ঞান (Collective Unconsciousness)। সমষ্টিগত নির্জ্ঞান উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। ব্যক্তিমনকে জানার জন্য ব্যক্তিগত নির্জ্ঞান ও সমষ্টিগত নির্জ্ঞান উভয়কে জানা প্রয়োজন।

য়ুঙ-এর মতে স্বপ্ন কেবল অতীত জীবনের সংবাদ দেয় তা নয়, ভবিষ্যৎ সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতও স্বপ্নের মধ্যে থাকে। য়ুঙ ফ্রয়েডের ঈডিপাস কম্‌প্লেক্সের বাস্তবতা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে মাতাপুত্র, পিতাপুত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক কোন যৌন সম্পর্ক নয়।

ফ্রয়েডের 'মনঃসমীক্ষণ' আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা অ্যাডলার এবং য়ুঙ-এর মতবাদ মোটামুটি আলেচনা করেছি। এঁদের বক্তব্য মনে রেখেই ফ্রয়েডের মতবাদের একটি সমালোচনা আমরা প্রদান করছি :

## ফ্রয়েডীয় মতবাদের সমালোচনা :

ফ্রয়েডীয় মতবাদের মধ্যে যে অভিনবত্ব আছে তা অস্বীকার করা চলে না এবং সে কারণেই ফ্রয়েডীয় মতবাদ চিন্তার জগতে বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ফ্রয়েডীয় মতবাদেরও নানারকম সমালোচনা করা হয়েছে। ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি উপস্থাপিত হয়েছে :

(১) ফ্রয়েড যৌনাকাঙ্ক্ষার বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করেছেন যার জন্য তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে সর্ব যৌনতাবাদের (Pan-sexuality) অভিযোগ আনা হয়েছে। মানুষের জীবনে যৌন প্রেষণার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মানুষের আচরণের মূলে এই একটি মাত্র প্রেষণার অস্তিত্ব আছে এমন কথা বলা চলে না। বস্তুতঃ, মানুষের আচরণ এবং স্বভাব এতই জটিল ও বিচিত্র যে কেবলমাত্র যৌন প্রবৃত্তির সাহায্যে তার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন।

(২) ফ্রয়েড মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের উপর ভিত্তি করেই তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির মানসিক বিকারের উপর ভিত্তি করে

যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

(৩) ফ্রয়েড লিবিডো শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন, যার জন্য বিষয়টি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। মাতার সন্তানবাৎসল্য বা মাতৃত্ববোধ এবং যৌনপ্রবৃত্তি দুটি ভিন্ন প্রকৃতির প্রবৃত্তি, উভয়কে একই লিবিডোর অন্তর্ভুক্ত করা কোন মতেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

(৪) ফ্রয়েডের বাস্তবতাসূত্র (Reality-principle) এবং সুখসূত্র (Pleasure-principle) যৌন আকাঙ্ক্ষার অবদমনের নীতি স্বীকার পূর্বক প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। অবদমন সম্পর্কীয় মতবাদটি অযথার্থ প্রমাণিত হলে এগুলিও অযথার্থ প্রমাণিত হবে। তাছাড়া, 'মনস্তত্ত্বমূলক সুখবাদ' (Psychological hedonism), যেটি ফ্রয়েড তাঁর মতবাদ ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সমর্থন করেছেন, সেটি অযথার্থ প্রমাণিত হয়েছে।

(৫) ফ্রয়েড 'জীবন প্রবৃত্তি' (life instinct) এবং 'মরণ প্রবৃত্তি'র (Death-instinct) মধ্যে যে বৈপরীত্যের ধারণা সৃষ্টি করেছেন তা নিছক অনুমান। তাঁর ঈদ, ঈগো, সুপার ঈগো প্রভৃতি নিছক কল্পনাপ্রসূত প্রত্যয়।

(৬) ফ্রয়েড বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা সহজাত প্রবৃত্তির উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বিচারবুদ্ধির সাহায্যে আমরা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে নানাভাবে পরিবর্তিত এবং প্রয়োজন বোধে পরিশোধিত করতে পারি।

(৭) ফ্রয়েডের মতবাদ আমাদের নৈতিক ধারণার প্রতি সুবিচার করে না। তাঁর মতে যেসব সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে সমাজ বিপজ্জনক মনে করে সেগুলির প্রকাশকে বাধা দেবার জন্যই নৈতিকতার সৃষ্টি। ভাল-মন্দ প্রভৃতি মূল্যবোধ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস বর্তমান ; এ জাতীয় ব্যাখ্যার দ্বারা মোটেই সমর্থন করা যায় না।

## ১০। অপসঙ্গতি নিবারণ (Prevention of Maladjustment) :

অপসঙ্গতি প্রশ্নটি শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপসঙ্গতিশীল শিশু সমাজের পক্ষে এক বিরাট সমস্যাস্বরূপ। সে কারণে খুব উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এদের সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, মাতাপিতা সকলকেই এদের প্রতি সহানুভূতিমূলক আচরণ করতে

হবে, এদের উপর বিরক্ত হয়ে উঠলে বা এদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করলে বা এদের আচরণের জন্য ধিক্কৃত করলে সমস্যার কোন সমাধান হবে না।

প্রথমতঃ, শিশুদের মানসিক চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এবং যাতে অপপ্রতিযোজনশীল শিশুরা চিকিৎসার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, অপ্রতিযোজনশীল শিশুদের মানসিক রোগ দূরীকরণের জন্য মাতা-পিতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ দরকার, যাতে তাঁরা শিশুদের মন থেকে মানসিক বিরোধ, হতাশা এবং ব্যর্থতা দূর করতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, শিশুদের চাহিদা বা প্রয়োজন যাতে স্বাভাবিক হয় এবং অসামাজিক ইচ্ছা, কামনা বা মনোভাব যাতে তাদের মধ্যে না জাগে, শৈশব থেকেই এবিষয়ে মাতাপিতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য আরও প্রয়োজন মন্দ পরিবেশ ও কুসংসর্গ থেকে তাদের দূরে রাখা, যাতে কোন অসামাজিক পরিবেশের মধ্যে তারা মানুষ না হয়।

চতুর্থতঃ, শৈশব থেকে শিশুদের যাতে নিরাপত্তার অভাব দেখা না দেয় মাতাপিতা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্নেহ ও প্রীতি থেকে তারা যাতে বঞ্চিত না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

পঞ্চমতঃ, যতদূর সম্ভব শিশুদের ইচ্ছাগুলিকে সমাজানুমোদিত পথে পূরণ করার চেষ্টা করা দরকার, তাহলেই কামনা-বাসনার অপূরণ জনিত কোন ব্যর্থতা বোধ তাদের মধ্যে দেখা দেবে না। কোন রকম হতাশার ভাব বা পরাজয়ের বেদনা যেন নতুন করে তাদের মধ্যে না জাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

ষষ্ঠতঃ, শৈশব থেকে শিশুদের বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। কোন অলীক কল্পনা রাজ্যে যেন সে নিজেকে নির্বাসিত না করে সেদিকে নজর রাখতে হবে। শিশুর মধ্যে যাতে সংকল্পের দৃঢ়তা জাগে, সদ্ অভ্যাস যাতে তাদের মধ্যে গঠিত হয়, তার জন্য আমাদের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

সর্বশেষে, শিক্ষক-শিক্ষিকার মানসিক সুস্থতা শিশুর মানসিক সুস্থতার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকার চরিত্রে যদি অসামঞ্জস্যতা থাকে, শিশুরা সেগুলি অনুকরণ করার ফলে তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যেও অপসঙ্গতি দেখা দেয়। সুতরাং শিক্ষক-শিক্ষিকা মানসিক দিক থেকে সুস্থ কিনা সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

শিশুদের অপপ্রতিযোজন দূরীকরণের জন্য বিদ্যালয়গুলি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কিভাবে বিদ্যালয়ে সঙ্গতিসাধন করে চলতে হয়, শিশুকে তা শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। তার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনেও সে মানসিক দ্বন্দ্ব বা বিরোধ থেকে মুক্ত হয়ে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে সক্ষম হয়। বিদ্যালয় সেই স্থান যেখানে শিশুর সুপ্ত গুণগুলিকে বিকশিত করা, সদ্ অভ্যাস মধ্যে গঠন করা এবং সামাজিক আচরণের সঙ্গে তার পরিচয়সাধন করা সহজ। বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতা, নিয়মনিষ্ঠা, শাসন, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার অভ্যাস, সদ্ আদর্শ ইত্যাদি শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে এবং তার আচরণের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দূর করে।

## ১১। বিদ্যালয়ে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ (Main causes of indiscipline in educational institution) :

বিদ্যালয়ে শিক্ষার উন্নয়ন বা শিক্ষা-সংস্কার কোনটাই সম্ভব নয় যদি বিদ্যালয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব থাকে। ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বর্তমানে এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চরিত্র-শিক্ষা তথা কোন শিক্ষাই নিয়মানুবর্তিতার অভাবে প্রদান করা সম্ভব নয়। কি কারণে বিদ্যালয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় আমরা এবার তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

বিদ্যালয়ে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার একাধিক কারণ বর্তমান। কেবলমাত্র প্রধান প্রধান কারণগুলি এখানে আলোচনা করা হচ্ছে—

বিদ্যালয় পঠন-পাঠনের কেন্দ্রস্থল, নীরস প্রাণহীন পাঠ্যসূচী অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাঠ্যবিষয় যদি শিক্ষার্থীর কাছে তৃপ্তিকর মনে হয়, তাহলে শিক্ষার্থী পাঠ্যবিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয়, কিন্তু যদি পাঠ্যবিষয় দুরূহ ও বৈচিত্র্যহীন হয় তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে একঘেয়েমি বা বিরক্তিকর মনোভাব জাগে। ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষণের প্রতি বীতরাগ, অস্থিরতা ও চঞ্চলতা দেখা দেয় যার ফলে শিক্ষার্থী উচ্ছৃঙ্খল আচরণে নিজেদের নিয়োজিত করে।

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্যের বিষয়টি যদি শিক্ষক উপেক্ষা করেন তাহলে ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব দেখা দেয়। যদিও শ্রেণীকক্ষে দলগতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তবু শিক্ষা দেবার সময় প্রতিটি ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে

শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষকের উদ্দেশ্য। কাজেই শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বুদ্ধি, যোগ্যতা, রুচি, প্রবণতা, সামর্থ্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়গুলির প্রতি যদি শিক্ষক মনোযোগী না হন তাহলে শিক্ষার্থী অবহেলিত হতে পারে, যার ফলে শিক্ষার্থী উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে।

বিদ্যালয়ের পরিচালনার মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব, শিক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ও ন্যায় বিচারের অভাব, শিক্ষকের কর্তব্যে অবহেলা, শিক্ষকদের মধ্যে নিয়মনিষ্ঠা ও সময়নিষ্ঠার অভাব, শিক্ষকের পক্ষপাতিত্ব ছাত্রকে উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ প্রভৃতি এমনই হওয়া দরকার যাতে ছাত্রের মধ্যে পঠন-পাঠনে মানসিক অবসাদ সৃষ্টি না করে, তাহলে ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব দেখা দিতে পারে।

প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, সঙ্গী, অভিভাবকেদের বিরূপ ও সমাজবিরোধী কার্য-কলাপ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা সহজেই অপরের আচরণ অনুকরণ করে, উপরিউক্ত ব্যক্তিদের নীতি-বিগর্হিত আচরণ, মন্দ অভ্যাস শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ঐ জাতীয় আচরণে প্রবৃত্ত করে।

অপসঙ্গতির জন্যও অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয় এবং সেই সব শিক্ষার্থীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ শিক্ষায়তনের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে।

অনেক সময় রাজনীতির প্রভাবও শিক্ষার্থীকে উচ্ছৃঙ্খল আচরণে প্রবৃত্ত করে। তরুণমতি শিক্ষার্থী রাজনীতিতে এমন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে যে ছাত্র হিসাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বিস্মৃত হয়, মন বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হয় এবং অধ্যয়ন, পঠন-পাঠন হয়ে পড়ে গৌণ, রাজনৈতিক আন্দোলন করা হয়ে পড়ে মুখ্য।

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীর আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন তার মধ্যে নিরাপত্তার অভাব, শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা, শিক্ষার্থীকে অধ্যয়নের প্রতি উদাসীন করে তোলে এবং তাকে উচ্ছৃঙ্খল আচরণে প্রবৃত্ত করে।

যে শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা গহণের উপরে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং শিক্ষার্থীর চরিত্র বিকাশের দিকে লক্ষ্য দেয় না, সেই শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে

ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। বিদ্যালয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র-গঠনের আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে। শৈশব থেকেই ছাত্রদের মধ্যে সদ্‌ অভ্যাস গঠন, রুচি ও মূল্যবোধের সৃষ্টি করা, সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি তার অনুরাগ সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। শিশুর চরিত্রের যথাযথ বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হলেই শিশু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

**নিয়মানুবর্তিতার সহায়ক কতকগুলি বিষয় (Factors Promoting Discipline) :** শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে একটি নাগরিক হিসাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে উপযুক্ত করে তোলা। সুতরাং ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং জনসাধারণের দায়িত্ব। বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শৃঙ্খলার খুবই সহায়ক। শ্রেণী-শিক্ষক (Class Teacher) ছাত্রদের শৃঙ্খলার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন। ছাত্ররা নিজেরা সংগঠন সৃষ্টি করে নিজের আচার-আচরণ শিক্ষা-প্রদানের উপ-যোগী করে তোলার জন্য চেষ্টা করতে পারে। একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন বহিঃনিয়ন্ত্রণ বা শাস্তি সার্থক শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করতে পারে না। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বা আত্মশৃঙ্খলাই সত্যিকার শৃঙ্খলা এবং ছাত্ররা নিজেরা যাতে এ ব্যাপারে অগ্রণী হয় বিদ্যালয়ে সে পরিবেশ প্রধানতঃ শিক্ষক সৃষ্টি করবেন। তাছাড়া সহপাঠ্যসূচীর কার্যাবলী; যথা—এন, সি. সি. স্কাউট, রেড-ক্রস প্রভৃতির উপর বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। পরিশেষে একথাও আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা, সমাজের নেতারা এমনভাবে আচরণ করবেন যে তাঁদের আচার-আচরণ যেন ছাত্র-শৃঙ্খলার পরিপন্থী না হয়।

**শিক্ষকের ভূমিকা (Role of teachers) :** ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানু-বর্তিতা রক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। যদি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় থাকে, তবে সে বিদ্যালয়ে ছাত্ররাও সহজে নিয়মানুবর্তী হয়ে থাকে। ছাত্রদের মনের উপর শিক্ষকের আচার-আচরণ ও কথাবার্তার প্রভাব খুব বেশি। তারা সর্বক্ষণ শিক্ষকের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করে থাকে। সুতরাং শিক্ষকরা একথা মনে রেখে তাঁদের আচরণকে শৃঙ্খলার আদর্শ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করবেন।

**ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা (Religious and Moral Instructions) :** শিক্ষার্থীর চরিত্র সংগঠনে ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষাও যথেষ্ট সহায়তা করে। ছাত্রদের মনে যদি নৈতিক গুণ জাগ্রত করা না হয় তবে শিক্ষার কোন সার্থকতা থাকে না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ (secular) ভারতে অনেকেই ধর্ম বা নৈতিক শিক্ষার বিরোধী। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে আমাদের শিক্ষায় ধর্মের কোন স্থান নেই। বিশেষ কোন ধর্মের শিক্ষা বা বিদ্যালয় কোন বিশেষ ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করবে এটা কাম্য নয়। তবে ধর্মের মূল শিক্ষা, নৈতিক ও পরমজীবন সম্বন্ধে জ্ঞান নিরাপদেই ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা যেতে পারে।

**সহপাঠ্যসূচীর কার্যাবলী (Co-curricular Activities) :** আধুনিক শিক্ষানীতি সহপাঠ্যসূচীতে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সক্রিয় অংশ গ্রহণকে শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যক অংশ বলে মনে করে। ছাত্রদের চরিত্র সৃজনশীল কাজের মধ্যেই গড়ে ওঠে এবং সে সুযোগ সহপাঠ্যসূচীর অন্তর্গত কার্যাবলীই প্রদান করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, সহপাঠ্যসূচীর যথাযথ ব্যবস্থা থাকলে ছাত্রদের তারুণ্য-শক্তি বিপথগামী না হয়ে নানা গঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হবে এবং চারিত্রিক শক্তিও দৃঢ় হবে।

## ১২। আচরণমূলক সমস্যা (Behaviour Problem) :

শিক্ষার্থীর আচরণমূলক সমস্যা অপসঙ্গতির একটি দিকমাত্র। তবে অপসঙ্গতি যে ভাবে ব্যক্তিচরিত্রের একটি স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, আচরণমূলক সমস্যা শিশুর জীবনে সেভাবে স্থায়ী রূপ না নিয়ে ক্ষণস্থায়ী হয়। যখন এ সমস্যা স্থায়ী রূপ নেয়, তখন বুঝতে হবে, এর কারণ অতি ব্যাপক এবং ইহা অপসঙ্গতির নামান্তর। আচরণমূলক সমস্যা বলতে আমরা শিক্ষার্থীর সাধারণ, ক্ষণস্থায়ী অশোভন, শিক্ষাগ্রহণ-প্রতিকূল, অবাধ্য আচরণগুলিই বুঝি।

শিশুর স্বাভাবিক জীবনবিকাশের এবং শিক্ষাগ্রহণের সহায়করূপে আমরা কতকগুলি সুশোভন সামাজিক আচরণের প্রবর্তন উচিত বলে মনে করি। শিক্ষকের বাধ্য হওয়া, সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মান অনুসারে (social and cultural norms) অভিপ্রেত আচরণ করা প্রতিটি শিক্ষার্থীর উচিত। কিন্তু শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি এসব

আচরণের অভাব আমরা লক্ষ্য করি এবং শিক্ষার্থীকে যদি এগুলির বিপরীত আচরণ করতে দেখি অর্থাৎ শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকের অবাধ্য, কলহপ্রিয় এবং অভদ্র আচরণে অভ্যস্থ হয়, তবে সে শিক্ষার্থী সমস্যাগ্রস্ত।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি শিশুর আচরণমূলক সমস্যা অতি সাধারণ (trivial) ক্ষেত্রেও দেখা দিতে পারে, যেমন—হাতের আঙুল চোষা, ভীরুতা, আক্রমণ-ধর্মিতা প্রভৃতি আচরণ। মোট কথা শিক্ষাগ্রহণের প্রতিকূল সকল আচরণই সমস্যামূলক। এ ধরনের আচরণকারী শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে গণ্ডগোল করে, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষার্থীর নানাভাবে বিরক্তি উৎপাদন করে, নিজেও লেখাপড়া বিশেষ পছন্দ করে না। প্রতি বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীতে এ ধরনের কিছু সংখ্যক ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের পরিচিতি ঘটে এবং তাকে এজন্য বিব্রত হতে হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ-ধরনের আচরণমূলক সমস্যার কারণ কি? বলা বাহুল্য যে আচরণমূলক সমস্যা যদি গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দাঁড়ায় তবে তা অপসঙ্গতির (maladjusted) নামান্তর এবং অপসঙ্গতির কারণ গুলিই তা ব্যাখ্যা করতে পারে। এখানে আমরা কয়েকটি সাধারণ কারণ উল্লেখ করছি। প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীর পারিবারিক, সামাজিক পরিবেশের মধ্যে এর কারণ অনুসন্ধান করতে হয়। শিশু যে পরিবারে জন্ম নিয়েছে সে পরিবারের পরিজনের আচার-আচরণ তার উপর প্রতিফলিত হয়। তার সামাজিক আচরণ পরোক্ষভাবে তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সে যে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের প্রভাবও তার উপর কম নয়। সুতরাং এসব যে কোন একটি ক্ষেত্র থেকে শিশু সমস্যামূলক আচরণ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া, অনেকক্ষেত্রে শিশুর প্রক্ষোভজনিত বা দৈহিক কোন ত্রুটির জন্যও শিশু অসংযত এবং অশোভন আচরণে অভ্যস্ত হতে পারে। আচরণমূলক সমস্যার যে কারণই হউক না কেন, এসবের আচরণের উপস্থিতি শ্রেণীকক্ষে সার্থক শিক্ষাদান ব্যাহত করে।

এ সবের আচরণের প্রতিকার কি? সুষ্ঠু এবং অভিপ্রেত আচরণ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকের একান্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশুর পরিবার শিশুকে যদি অভিপ্রেত আচরণে অভ্যস্ত না করায় তবে সমস্যাগ্রস্ত আচরণ নিয়ে শিশু বড় হবে এবং সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। পরিবারের সহায়তার পর

বিদ্যালয়ে সমস্যামূলক আচরণ দূর করার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন ও নানা কর্মানুষ্ঠানের পরিকল্পনা থাকা উচিত। নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আচরণের সুযোগ এদের দিতে হবে এবং যেহেতু শিক্ষার্থীকে তার সামাজিক পরিবেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু বিদ্যালয়কেই আদর্শ সমাজের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য এ কার্যসম্পাদনে শিক্ষককে বিশেষ পারদর্শী হতে হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হয়। তাছাড়া অনেকে বিদ্যালয়ে শিশুপরিচালন-স্বাস্থ্য-কেন্দ্র (Child-guidance Clinics) গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন। এসব কেন্দ্রে সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের আচরণের কারণগুলি অনুসন্ধান করতঃ প্রতিকারের পন্থা উদ্ভাবন করা হয়। এসব কেন্দ্রে সাধারণতঃ মানসিকরোগের চিকিৎসক (Psychiatrist) থাকেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মিগণ সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের আচরণ বিশ্লেষণ করেন। তারপর বিদ্যালয়ে এ ধরনের শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা করেন বা এদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ বিদ্যালয়ে (Special School for Problem Children) এদের প্রেরণ করেন।

## প্রশ্নাবলী

1. Discuss the modern concept of mental hygiene and show its relation to education.

Ans. ( পৃঃ ৪৯৩-৯৬ )

2. What are the causes of maladjustment ? How can a school help cure it ?

Ans. ( পৃঃ ৫০০-৬—পৃঃ ৫০৯-১১ )

3. What are the symptoms of maladjustment ?

Ans. ( পৃঃ ৫০০—পৃঃ ৫০৬ )

4. Describe the therapy of maladjustement.

Ans. ( পৃঃ ৫০৬- পৃঃ ৫১১ )

5. Describe measures to prevent maladjustment.

Ans. ( পৃঃ ৫০৬—পৃঃ ৫১১ )

6. What is the Unconscious ? Discuss its influence upon the educational practices.

Ans. ( পৃঃ ৫১৫—৫১৮ )

7. A valid criterion of mental health isthe degree of satisfaction a person has attained—the better satisfied he is, the better is mental health. Do you agree ? Give reasons. [ B. A. 1962

Ans. ( পৃ: ৩৭২-৭৪—পৃ: ৩৮১-৮৩ )

8. Who are maladjusted children ? Discuss in a general wany some common behaviour problem of school children. [ B. A. 1965

Ans. ( পৃ: ৫০৬—পৃ: ৬১১, )

9. Whom do you consider as problem children. [ B. A. 1969.

Ans. ( পৃ: ৫৩১—৫৩৩ )

10. Explain the main causes of indiscipline in educational institutions. How can discipline be maintained ? [ B. A. 1968

Ans. ( পৃ: ৫২৮—৫৩১ )

সপ্তদশ অধ্যায়

# পরিমাপের ব্যাখ্যা

## (Interpretation of Assessment)

### ১। পরিসংখ্যান বলতে কি বোঝায়? (What is Statistics)?

সংখ্যা বা সংখ্যাত্মক শব্দের (Numerical Terms) সাহায্যে কোন বিষয়ের আলোচনা সাধারণ মানুষের কাছে অতি সহজেই বোধগম্য হয়। যে বিজ্ঞান, সংখ্যাগতভাবে ঘটনা সংগ্রহ করে, তাকে তুলনামূলকভাবে সজ্জিত এবং সুসংবদ্ধ করে, বিশেষ বিশেষ ভাবে তাকে উপস্থাপিত করে ও (presentation) সেগুলির বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে (analysis and interpretation) তাকে রাশিবিজ্ঞান (Statistics) বলে। তুলনামূলকভাবে সজ্জিত কতকগুলি রাশিতথ্য বোঝাবার জন্য 'পরিসংখ্যান' কথাটি ব্যবহার করা হয়। যদিও '*Statistics*' এই ইংরেজী প্রতিশব্দটি রাশিবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়, তবু রাশিবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান সমার্থক শব্দ নয়। পরিসংখ্যানের পরিমাণগত তথ্যের বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা হল রাশিবিজ্ঞানের কাজ।

পরিসংখ্যানের প্রথম কাজ হল সংখ্যাগতভাবে তথ্য সংগ্রহ অর্থাৎ ঘটনা বা তথ্য সংগ্রহ করে তাকে সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা। নানাভাবে এই তথ্য সংগৃহীত হতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বিবরণী, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের প্রকাশিত বিবরণী, বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরিত প্রশ্নাবলীর উত্তরাদি, ব্যক্তিগত গবেষণার ফলাফল বা গবেষণাগারের প্রকাশিত ফলাফল প্রভৃতির মাধ্যমে তথ্য (data) সংগ্রহ করা সম্ভব। এলোমেলোভাবে সংগৃহীত তথ্য যদি সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ হয়ে নির্দিষ্ট আকারে প্রকাশিত না হয় তাহলে সংগৃহীত তথ্য সাধারণের কাছে বোধগম্য হয় না। সে কারণে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত ও ছকবিন্যস্ত করে (classification and tabulation), নির্দিষ্ট আকারে উপস্থাপিত করা হয় ও লেখচিত্রে (graphs) প্রকাশ করা হয়। তারপর সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়।

তথ্য সংগ্রহের কাজটি যাতে বিশুদ্ধ বা নির্ভুলভাবে সম্পাদিত হয়, তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কতকগুলি প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন

করলে এই সংগ্রহণ কার্য নির্ভুল হতে পারে। প্রথমতঃ, যে বিষয়-সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হবে, সেই বিষয়-সংক্রান্ত বিবরণীগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি সংগ্রহ করতে হবে তা প্রথমেই স্থির করে নিতে হবে। যেমন, ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার সময় ছাত্র-সংখ্যা, ছাত্রদের পারিবারিক অবস্থা ও আর্থিক অবস্থা, ছাত্রদের বয়স, ছাত্রদের ব্যবহৃত খাদ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ, ছাত্রদের বাসগৃহের অবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ বিবরণগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি সংগ্রহ করতে হবে তা প্রথমেই স্থির করে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, যে এককে (unit) সংগৃহীত তথ্য প্রকাশ করতে হবে তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। যেমন, দৈর্ঘ্য গণনার সময় মিটার, সেন্টিমিটার প্রভৃতির একটিকে একক নেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ, তথ্য সংগ্রহের জন্য কখনও সমগ্র অংশের কখনও বা সীমিত অংশের নমুনার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। যেমন, আদমসুমারীর জন্য সমগ্র জনসংখ্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কিন্তু কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হলে প্রতি শ্রেণী থেকে নমুনা হিসেবে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার ছাত্র নির্বাচন করে নিয়েও ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে। সর্বশেষে ভ্রান্তিশূন্যতা বা নির্ভুলতার মাত্রার (Degree of Accuracy) প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

## ২। মনোবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান-পদ্ধতি (Statistics in Psychology):

অধুনা পরিসংখ্যান-পদ্ধতি বিশেষভাবে মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারণ, এঁদের মতে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিসংখ্যানের একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে মনোবিজ্ঞানীরা এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির তুলনামূলক বিচার করেন। এই তুলনামূলক বিচারের সময় একপ্রকার পরিমাপের সাহায্য নিতে হয়। যেমন, আমরা প্রাত্যহিক জীবনে অনেক বস্তুর মাপ করি—কোন্ জিনিস বেশি ভারী, কোন্‌টি কম, কোন্ বস্তুর বেশী দৈর্ঘ্য, কোন্‌টির কম ইত্যাদি। আবার কার্যকলাপের মাপও করা যায়—যেমন, খেলাধূলায় কে কার চেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত লাফাতে পারে, কে কতদূর সাঁতরাতে পারে ইত্যাদি। এমনিভাবে মানুষের অন্যান্য গুণাবলীর পরিমাপ আমরা করে থাকি। এই পরিমাপের জন্য আমাদের নানারকম যন্ত্রের প্রয়োজন হয়—যেমন, দৈর্ঘ্য মাপার ফিতা, ওজন নেবার যন্ত্র, উচ্চতা মাপার যন্ত্র ইত্যাদি।

মনোবিজ্ঞানে যে পরিমাপের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার নাম Psychometry. *Metry* অর্থে মাপ বোঝায়। অতএব Psychometry-র অর্থ হল মনোবিজ্ঞানের পরিমাপ যা মানুষের চরিত্র, বুদ্ধি ও অন্যান্য গুণাবলীর পরিমাপ করে।

**৩। পরিসংখ্যানের আলোচনায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ (Some Terms used in Statistics):**

(১) **সারিবিন্যাস** (Ranking): প্রাত্যহিক জীবনে আমরা বিভিন্ন বস্তুর পরিমাপ করে থাকি। পরিমাপ করতে গিয়ে পরিমাপের বস্তুগুলিকে যখন তার বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সারিবদ্ধ করে সাজাই তখন তাকে বলা হয় সারিবিন্যাস। যেমন, কতকগুলি লোককে তাদের ওজন অনুযায়ী সারিবিন্যাস করার অর্থ হল, সেই ওজন যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে, তাকে সর্বপ্রথমে রাখা। তারপর তার থেকে কম পরিমাণ ওজন যার, তাকে রাখা। এইভাবে সব শেষে সেই লোকটিকে রাখা যার ওজন সবচেয়ে কম। এই সারিবিন্যাসের সুবিধা হল এতে ব্যক্তির নিজস্ব স্থান ও অন্যান্যদের তুলনায় তার অবস্থানের ধারণা সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু সারিবিন্যাস থেকে ব্যক্তির প্রকৃত পরিমাপ জানা যায় না—আমরা জানতে পারি না কোন ব্যক্তির প্রকৃত ওজন কত।

(২) **স্কোর** (Score): বিশেষ নম্বরের সাহায্যে আমরা ব্যক্তিরা পরিমাপ প্রকাশ করি, একে *Score* বলা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তির পরীক্ষার ফলাফল 25, 30, 35, 60, 70 প্রভৃতি সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করি। কোন ব্যক্তির উচ্চতা পরিমাপ করতে গিয়ে ব্যক্তির স্কোর গজ, ফুট, ইঞ্চি দিয়ে বা ওজনের পরিমাপ করতে গিয়ে গ্রাম, কিলোগ্রাম প্রভৃতি দিয়ে প্রকাশ করতে পারি।

(৩) **চল** (Variable): যে মান (value) পরিবর্তনশীল, তাকেই চল বলে। চলকেই স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। ব্যক্তির যেসব বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীল তাকেই স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেসব বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনশীল অর্থাৎ সকলের ক্ষেত্রে একরূপ সেগুলিকে স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ করা চলে না।

ধরা যাক তিরিশ জন লোকের একটি দল। এই দলের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে গুণের দিক থেকে নানারকম প্রভেদ দেখা যায়। কোন লোকের বুদ্ধির মান উঁচু, কারও বা নীচু, কেউ বেশি চালাক, কেউ কম চালাক, কাজেই এই সব গুণ হল চল (Variable)। চল দুপ্রকার হতে পারে—পরিমাণগত ও গুণগত। ওজন, উচ্চতা হল পরিমাণগত চল; বুদ্ধি, চাতুর্য হল গুণগত চল। এগুলিকে স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ করা চলে। কিন্তু ব্যক্তির দেহের বিভিন্ন অংশের কোন স্কোরের কথা বলা চলে না, যেহেতু এগুলি অপরিবর্তনশীল এবং সকলের ক্ষেত্রে এক।

(৪) **স্কেল** (Scale): স্কেল হল একটি পরিমাপক। ব্যক্তির স্কোরগুলি যখন সমান ইউনিটের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় এবং সেগুলিকে যখন পাশাপাশি সাজান হয়, তখন তাকে স্কেল বলা হয়। 10, 20, 30, 40 প্রভৃতি হল সমান ইউনিট, যেহেতু এদের দূরত্ব হল 10. অনুরূপভাবে 2, 4, 6, 8, 10 ইত্যাদি সমান ইউনিট, (unit) যেহেতু এগুলিও সমদূরত্বসম্পন্ন সংখ্যা। এদের দূরত্ব হল 2। যে কোন স্কেলে এরূপ সমদূরত্ববিশিষ্ট সংখ্যা পাশাপাশি থাকে।

(৫) **সারি** (Series): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 এই স্কোরগুলি হল একটি সারি। এই সারি দুরকমের হতে পারে—অবিচ্ছিন্ন (Continuous) এবং বিচ্ছিন্ন (Discrete) সারি। পর পর সারি করে সাজান যে বস্তু তার মাঝখানে যদি কোনও ছেদ না থাকে তাকে '*Continuous series*' এবং যে সারি পরপর সাজান অথচ ছেদযুক্ত তাকে '*Discrete series*' বলা হয়, যেমন—1, 5, 9, 11, 13.

Continuous series-এর উদাহরণস্বরূপ দৈর্ঘ্যের পরিমাপ নিতে পারি। যেমন, গজ থেকে ফুট এবং তার থেকে ইঞ্চি ধাপে ধাপে নেমে এসেছে, তার মধ্যে কোন ফাঁক নেই। মনোবিজ্ঞানের পরিসংখ্যানে Continuous series এরই প্রয়োজন। কেননা, মানসিক কার্যকলাপগুলিকে পর পর ধারাবাহিক ভাবে সাজান যায়।

এখন অবিচ্ছিন্ন সারিতে স্কোরের অর্থ কি তা নিরূপণ করে দেখা যাক। এখানে স্কোরকে সম্পর্কশূন্য বিচ্ছিন্ন মান মনে করলে ভুল করা হবে। দুটি সীমার মধ্যে এই স্কোরের অবস্থিতি। অবিচ্ছিন্ন সারির ধারাটিকে আমরা একটা সরলরেখা ভেবে নিই। এতে এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুর দূরত্বকে score ধরে নিই। যেমন, কোন পরীক্ষার স্কোর বলতে আমাদের বুঝে নিতে

হবে এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুর মধ্যে কত ব্যবধান। যদি কোন ব্যক্তির স্কোর 125 হয় তাহলে ধরতে হবে তার score 124·5 থেকে 125·5 পর্যন্ত যে দূরত্ব ঠিক তার মধ্যবিন্দু।

125

124·5 125·5

এখানে 124·6 থেকে 125·4 পর্যন্ত যতগুলি স্কোর আছে সবগুলিকেই 125 score বলে ধরা হয়। তাই 125 score-এর সবচেয়ে নীচের স্কোর হচ্ছে 124·5, যাকে নিম্ন সীমা বা *lower limit* বলা হয়। আর সবচেয়ে উপরের score হচ্ছে 125·5 যাকে উচ্চ-সীমা বা *upper limit* বলা হয়।

**৪। পরিসংখ্যা-বিভাজন (Frepuency Distribution) :**

পরিসংখ্যানের জন্য সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সুবিন্যস্ত এবং তার তাৎপর্য নিরূপণ করার জন্য যেসব পদ্ধতি সহায়ক, পরিসংখ্যা বিভাজন তার মধ্যে অন্যতম।

পরিসংখ্যানের জন্য সংগৃহীত তথ্যগুলি অসজ্জিত বা শ্রেণীবিহীনভাবে (unclassified or ungrouped) অথবা, সজ্জিত বা শ্রেণীবদ্ধভাবে (grouped or arranged) পরিসংখ্যাবিদের কাছে আসতে পারে। প্রথমে আমরা অসজ্জিত বা শ্রেণীবিহীন তথ্য, যাকে কাঁচা তথ্য (raw data) বলা হয়, তাকে কি ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

কোন শ্রেণীর 50 জন ছাত্র ইতিহাসের পরীক্ষায় 100 নম্বরের মধ্যে যে নম্বর পেয়েছে তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল :

**No. 1 Table : Raw Data**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 71 | 41 | 51 | 56 | 62 | 67 | 69 | 61 | 73 |
| 37 | 46 | 58 | 77 | 71 | 48 | 61 | 83 | 70 | 69 |
| 63 | 38 | 48 | 77 | 60 | 62 | 55 | 57 | 78 | 74 |
| 87 | 68 | 66 | 32 | 46 | 62 | 52 | 60 | 63 | 68 |
| 65 | 56 | 74 | 35 | 43 | 81 | 62 | 54 | 63 | 64 |

পূর্বপৃষ্ঠার তালিকাটিতে তথ্যগুলি এলোমেলো বা অবিন্যস্তরূপে লেখা হয়েছে। এই তালিকা দেখে চট্ করে বলা সম্ভব হবে না সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন নম্বর কত। সবচেয়ে বেশী কতজন একই নম্বর পেয়েছে, 60-এর উপর বা 45-এর কম নম্বর কতজন পেয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু এই নম্বরগুলোকে তাদের মানের ঊর্ধ্বক্রমে বা অধঃক্রমে সাজালে তালিকাটি নিম্নোক্তরূপ হবে :

**No. 2. Table : Arrayed Data**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 77 | 71 | 68 | 64 | 62 | 60 | 56 | 48 | 41 |
| 83 | 75 | 71 | 68 | 63 | 62 | 60 | 55 | 48 | 38 |
| 81 | 74 | 70 | 67 | 63 | 62 | 58 | 54 | 46 | 37 |
| 78 | 74 | 69 | 66 | 63 | 61 | 57 | 52 | 46 | 35 |
| 77 | 73 | 69 | 65 | 62 | 61 | 56 | 51 | 43 | 32 |

উপরের ছকের তথ্যগুলো ( নম্বরগুলো ) তাদের মানের ঊর্ধ্বক্রমে এবং নিম্নক্রমে সাজান হয়েছে। এখন চট্ করে দেখেই বলা সম্ভব হবে যে সর্বোচ্চ নম্বর হল 87 এবং সর্বনিম্ন নম্বর হল 32. একই নম্বর পেয়েছে এমন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের সংখ্যা হল চার জন, 60-এর উপরে নম্বর পেয়েছে তিরিশ জন এবং 45-এর কম পেয়েছে ছয়জন এবং তথ্য বা নম্বরগুলির মানের প্রসার (Range) = 87—32 = 55.

পূর্ব পৃষ্ঠার—এক নম্বর ছকের (Table) তুলনায় দুনম্বর ছক যে অধিক মূল্যবান ও কার্যকর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এভাবে সজ্জিত বা ক্রমবিন্যস্ত ছক তৈরী করা সময়সাপেক্ষ, তাছাড়া এর বিস্তৃতিও কম নয়। এই কারণেই পরিসংখ্যা-বিভাজক ছক (Frequency Distribution Table) প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

সংগৃহীত তথ্যগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে, উচ্চতম বিভাগ এবং নিম্নতম বিভাগ সীমার মধ্যবর্তী অংশকে প্রয়োজনমত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে, প্রত্যেক সীমার অন্তর্গত পরিসংখ্যান (frequency) নির্ণয় করে যে ছক তৈরী করা হয় তাকেই পরিসংখ্যা-বিভাজন ছক বলে। পরপৃষ্ঠার ছকটি দেখে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক :

**No. 3. Table : Frequency Distribution**

| (Class-interval) | F (Frequency) |
|---|---|
| 85—89 | 1 |
| 80—84 | 2 |
| 75—79 | 4 |
| 70—74 | 6 |
| 65—69 | 7 |
| 60—64 | 12 |
| 55—59 | 5 |
| 50—54 | 3 |
| 45—49 | 4 |
| 40—44 | 2 |
| 35—39 | 3 |
| 30—34 | 1 |
| Total— | 50 |

উপরের ছকটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এখানে বারটি বিভাগ রয়েছে। প্রথম বিভাগ 85—89, দ্বিতীয় বিভাগ 80—84, শেষ বিভাগ 30—34. প্রতিটি বিভাগের পাশে ঐ বিভাগের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। পরিসংখ্যান অর্থে কোন একটি বিশেষ নম্বর বা score কতবার আবির্ভূত হয়েছে। যেমন, প্রথম বিভাগে 85—89-এর মধ্যে 87 এই একটি সংখ্যা একবার মাত্র আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং, এই বিভাগের পরিসংখ্যান বা frequency হল 1 ; দ্বিতীয় বিভাগে 80—84-এর মধ্যে 83 এবং 81 এই দুটি সংখ্যা প্রত্যেকে একবার করে আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং, এর পরিসংখ্যান বা frequency হল 2 ; অনুরূপভাবে 60—64-এর মধ্যে 60 সংখ্যাটি 2 বার, 61 সংখ্যাটি 2 বার, 62 সংখ্যাটি 4 বার, 63 সংখ্যাটি 3 বার ও 64 সংখ্যাটি 1 বার অর্থাৎ, (2+2+4+3+1)=12 বার আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং, এই বিভাগের frequency হল 12।

প্রশ্ন হল, ছকটিতে class-interval বা বারটি শ্রেণীবিভাগ করা হল কেন? বিভাগ করার নিয়ম কি? এই নিয়ম হল সর্বোচ্চ score বা নম্বর থেকে সর্বনিম্ন score বা নম্বরের প্রসার (range) কত দেখতে হবে। উপরের ছকে সেই range হল 87—32=55। তারপর বিভাগের সংখ্যা ও আয়তন নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণতঃ 3, 5, 10 একক নিয়ে বিভাগের বিস্তার বা আয়তন নিরূপণ করা হয় এবং 5 থেকে 15টি বিভাগে নম্বরগুলিকে সাজান হয়। প্রসারকে বিভাগের আয়তন দিয়ে ভাগ করলে class-

interval বা বিভাগের সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। পূর্বপৃষ্ঠার ছকে প্রসার হল 55 ও interval হল 5. অতএব আমরা 11টি শ্রেণী পাচ্ছি। যখন লেখ বা গ্রাফে প্রকাশ করব তখন এক (1) যোগ দিয়ে বারটি করতে হবে। সে কারণে পূর্বপৃষ্ঠার ছকে বারটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। শ্রেণীবিভাগ নিরূপণ করার সূত্র হল :

$$\text{Total number of class-intervals} = \frac{\text{Range}}{\text{Length of class-interval}} + 1$$

অর্থাৎ,

$$\text{শ্রেণীবিভাগের সংখ্যা} = \frac{\text{প্রসার}}{\text{শ্রেণীবিভাগের আয়তন বা বিস্তার}} + 1$$

তাহলে পূর্বোক্ত ছকে শ্রেণীবিভাগের সংখ্যা হবে $\frac{55}{5}+1=12$টি। পরিসংখ্যা-বিভাজন ছক তৈরী করতে হলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হবে। 2নং ছক থেকেই বিভাজন করা সুবিধাজনক, তবে 1নং অর্থাৎ কাঁচা তথ্যের (Raw Data) ছকের সাহায্যেও বিভাজন করা যায়।

(১) প্রথমে স্কোরগুলির প্রসার (range) বার করে নিতে হবে। সর্বোচ্চ স্কোর থেকে সর্বনিম্ন স্কোর বিয়োগ করলেই প্রসার পাওয়া যাবে।

(২) এবার শ্রেণীবিভাগের (class-interval) সংখ্যা ও আয়তন নিরূপণ করতে হবে। শ্রেণীবিভাগের সংখ্যা কত হবে তার সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। সাধারণতঃ আমরা বলতে পারি যে এই সংখ্যা 10-এর কম এবং 20-র বেশি হবে না। কিন্তু যেখানে স্কোরের সংখ্যা খুবই কম বা খুবই বেশি সেখানে এ নিয়ম খাটবে না। তবে শ্রেণীবিভাগের মোট সংখ্যা নির্ণয় করতে হলে শ্রেণীবিভাগের বিস্তার দিয়ে প্রসারকে ভাগ করে 1 যোগ করে দিতে হবে।

$$\text{Total No of class-intervals} = \frac{\text{Range}}{\text{Length of class-interval}} + 1$$

শ্রেণী বিভাগের বিস্তার বা আয়তন 3, 5, 10 একক নিয়ে সাধারণতঃ করা হয়। যেমন 3 নং ছকের শ্রেণীবিভাগগুলির আয়তন হল 5.

(৩) এবার স্কোরগুলিকে তাদের শ্রেণীবিভাগ বা class-interval অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজিয়ে নিতে হবে।

(৪) এখন নীচের 4নং ছকের মতো শ্রেণীবদ্ধ করে প্রতিটি স্কোরের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগে একটি করে চেরা (Tally Mark) দিতে হবে। কোন বিভাগের ঘরে 5টির অধিক সংখ্যা থাকলে প্রত্যেক 5টির জন্য 4নং ছক অনুযায়ী 4টি চেরা এবং ঐ চারটি রেখাকে কেটে 1টি কোণাকুণি রেখা টানতে হবে। এতে সহজে গণনা করা যেতে পারে। এবার নীচের ছকটি লক্ষ্য করা যাক :

**No. 4 Table : Tallies**

| Class-interval | Mid Points | Tallies | Frequency (f) |
|---|---|---|---|
| 85—89 | 87 | / | 1 |
| 80—84 | 82 | // | 2 |
| 75—79 | 77 | //// | 4 |
| 70—74 | 72 | ~~////~~ / | 6 |
| 65—69 | 67 | ~~////~~ // | 7 |
| 60—64 | 62 | ~~////~~ ~~////~~ // | 12 |
| 55—59 | 57 | ~~////~~ | 5 |
| 50—54 | 52 | /// | 3 |
| 45—49 | 47 | //// | 4 |
| 40—44 | 42 | // | 2 |
| 35—39 | 37 | /// | 3 |
| 30—34 | 32 | / | 1 |
| | | 50 | 50 |

উপরের ছকটিতে চারটি স্তম্ভ আছে। বামদিক থেকে ধরলে প্রথমটি হল শ্রেণীবিভাগ বা class-interval-এর স্তম্ভ। এতে মোট বারটি শ্রেণীবিভাগ আছে। সর্বনিম্ন স্কোর-এর শ্রেণীবিভাগ সবচেয়ে নীচে এবং ধাপে ধাপে 12টি

শ্রেণীবিভাগ উপরের দিকে উঠে গেছে। শ্রেণীর বিস্তার হল 5' সর্বোচ্চ স্কোর এবং সর্বনিম্ন স্কোরের অন্তর হল $(87-32)=55 \div 5+1=12$টি class-interval.

দ্বিতীয় স্তম্ভ হল মধ্যবিন্দু (Mid-point)। কোন বিভাগের আপাত বা প্রকৃত সীমাদ্বয়ের গাণিতিক গড়কে বিভাগটির মধ্যবিন্দু বলে।

মধ্যবিন্দু নিরূপণ করার সূত্র হল—

Mid-point of the class-interval = lower limit of the class-interval + $\frac{\text{upper limit of the class interval} - \text{lower limit of the class interval}}{2}$.

অথবা, একে এভাবেও লেখা যেতে পারে—

$$X=L+\frac{U-L}{2}$$

মধ্যবিন্দু = বিভাগের নিম্নতম সীমা—

$$+\frac{\text{বিভাগের উচ্চতর সীমা}-\text{বিভাগের নিম্নতর সীমা}}{2}$$

যেমন, 80—84 শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু হবে—

$$=79{\cdot}5+\frac{84{\cdot}5-79{\cdot}5}{2}$$

$$=79{\cdot}5+\tfrac{5}{2}=79{\cdot}5+2{\cdot}5=82$$

তৃতীয় স্তম্ভে শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যখনই একটি স্কোর দেখা গেল তখনই Tally বা ঢেরা দেওয়া হল। যেমন, 30—34 class-interval-এ 30, 31, 32, 33, 34-এর মধ্যে 32 এই স্কোরটি একবার পাওয়া গেছে। সে কারণে একটি ঢেরা দেওয়া হয়েছে। সব ঢেরা পড়বার পর দেখা যাবে ঢেরার সংখ্যা ও পরিসংখ্যানের সংখ্যা এক হবে। উপরিউক্ত ছকে উভয় ক্ষেত্রে সংখ্যা হল 50.

চতুর্থ স্তম্ভে পরিসংখ্যান (frequency) অর্থাৎ একটি স্কোর কতবার আবির্ভূত হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

পরিসংখ্যা-বিভাজনে শ্রেণীবিভাগের উচ্চ ও নিম্ন সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে তিনটি নিয়ম প্রচলিত আছে। পরপৃষ্ঠায় I, II এবং III এই তিন প্রকারে সাজিয়ে দেখান হয়েছে :

No. 5 Table

| I | | II | | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calss-Interval | Fre-quency | Class-Interval | Fre-quency | Class-Interval | Fre-quency |
| 30- 35 | 1 | 29·5—34·5 | 1 | 30—34 | 1 |
| 25—30 | 2 | 24·5—29·5 | 2 | 25—29 | 2 |
| 20—25 | 5 | 19·5—24 5 | 5 | 20—24 | 5 |
| 15—20 | 4 | 14·5—19·5 | 4 | 15—19 | 4 |
| 10—15 | 6 | 9·5—14·5 | 6 | 10—14 | 6 |
| 5—10 | 2 | 4·5—9·5 | 2 | 5—9 | 2 |

উপরের ছকে 20টি ছাত্রের ইতিহাসের নম্বর পরিসংখ্যা-বিভাজনে তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাজান হয়েছে।

প্রথম (I) পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগের বিস্তৃতি বা আয়তন নেওয়া হয়েছে 5; কিন্তু কোন শ্রেণীবিভাগেই উচ্চতম সীমার পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত হয় নি। উদাহরণস্বরূপ 5—10 এই শ্রেণীবিভাগে 5 থেকে 10 বাদে 9 পর্যন্ত সব নম্বরকে নেওয়া হয়েছে। 10-কে পরবর্তী শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় (II) পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগের স্কোরগুলির সীমাগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম পদ্ধতির তুলনায় এটি বেশি স্পষ্ট। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি 5, 4·5 থেকে 9·5 পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং 5 থেকে 10 না লিখে 5-এর নিম্ন সীমা 4·5 এবং 10-এর নিম্ন সীমা 9·5 উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয় (III) পদ্ধতিও প্রথম পদ্ধতির তুলনায় স্পষ্ট। তথ্যগুলিকে দ্রুত এবং যথাযথভাবে সাজানর পক্ষে এই পদ্ধতিই কার্যকর। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে শুদ্ধভাবে দ্রুত ঢেরা (Tally) দেওয়া যায়। এই অধ্যায়ে আমরা শেষোক্ত পদ্ধতিই অবলম্বন করেছি।

**ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পরিসংখ্যা ছক (Cumulative Frequency Table):** ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পরিসংখ্যা ছক বলতে কি বোঝায় তা নীচের ছক থেকে বোঝা যাবে। যে প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে 4নং ছক তৈরী করা হয়েছে, সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই নীচের ছকটি তৈরী করা হল।

**No. 6 Table : Cumulative Frequency Table**

| প্রাপ্ত নম্বর | Cumulative Frequency |
|---|---|
| 34 বা তার নীচের নম্বর | 1 |
| 39 " " " | 4 = (1+3) |
| 44 " " " | 6 = (4+2) |
| 49 " " " | 10 = (6+4) |
| 54 " " " | 13 = (10+3) |
| 59 " " " | 18 = (13+5) |
| 64 " " " | 30 = (18+12) |
| 69 " " " | 37 = (30+7) |
| 74 " " " | 43 = (37+6) |
| 79 " " " | 47 = (43+4) |
| 84 " " " | 49 = (47+2) |
| 89 " " " | 50 = (49+1) |

## ৫। পরিসংখ্যা বিভাজনকে লেখচিত্রে প্রকাশ (Graphic representation of Frequency Distribution):

বর্তমান যুগে সংখ্যাগত তথ্যকে (numerical data) লেখচিত্রে প্রকাশ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রীতি হয়ে উঠেছে। লেখচিত্রে প্রকাশিত হলে সংখ্যাগত তথ্যগুলি স্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে মনের সামনে উপস্থাপিত হয়। এই কারণে পরিসংখ্যা-বিভাজনকে লেখচিত্রে প্রকাশ করা হয়। পরিসংখ্যা বিভাজনের লেখচিত্র তথ্য বিশ্লেষণে সহায়তা করে। এই লেখচিত্র সংখ্যাগত তথ্যকে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করতে এবং সিদ্ধান্ত টানতে সহায়তা করে। সাধারণতঃ চারভাবে পরিসংখ্যা-বিভাজনের তথ্যগুলিকে লেখচিত্রে প্রকাশ করা যেতে পারে।—(১) পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon), (২) আয়ত লেখ (Histogram), (৩) ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পরিসংখ্যা বিভাজন রেখা (Cumulative Frequency Distribution Curve) এবং (৪) ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পরিসংখ্যা রেখা (Cumulative Percentage Curve

or Ogive)। প্রথম তিনটি বর্তমানে আলোচনা করা হবে এবং শেষেরটি পরে আলোচনা করা হবে।

**(ক) পরিসংখ্যা বহুভুজ** (Frequency Polygon)ঃ পরিসংখ্যা বহুভুজ কিভাবে অঙ্কিত করতে হয়, তা বলার আগে গ্রাফ-আঁকার নিয়ম সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

গ্রাফ পেপারে কোন কিছু আঁকতে গেলে আমরা সমগ্র গ্রাফ পেপারটিকে দুটি সরল রেখার (এখানে xox´ এবং yoy´) দ্বারা চারভাগে ভাগ করি।
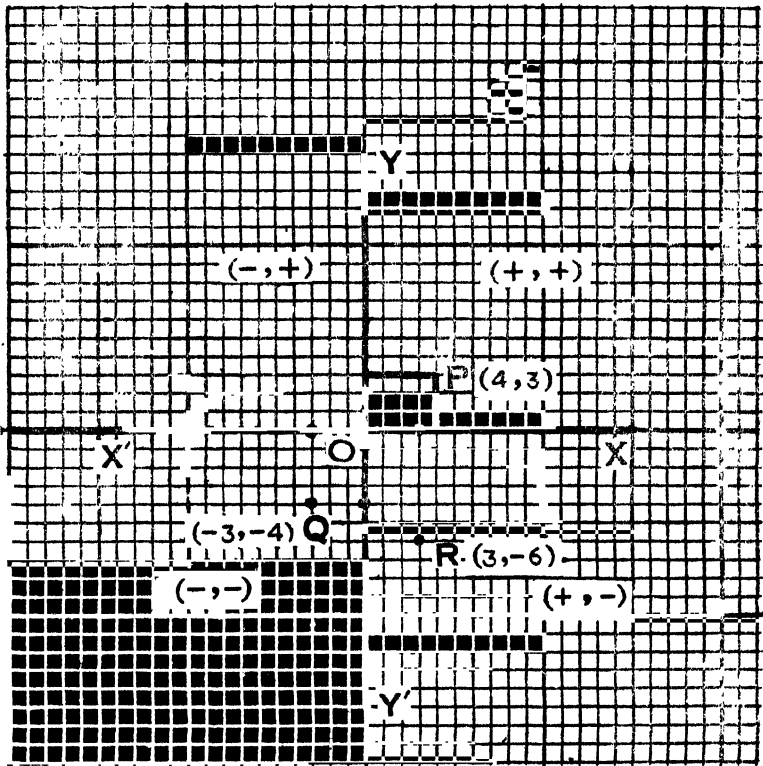
1 নং চিত্র—লেখচিত্র (Graph)

একটি রেখাকে আড়াআড়িভাবে ও আর একটি রেখাকে লম্বালম্বিভাবে অঙ্কন করতে হয়, যাতে রেখা দুটি লম্বভাবে পরস্পরকে একটি বিন্দুতে ছেদ করে।

পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে xox´ রেখাটিকে আড়াআড়িভাবে ও yoy´-টিকে লম্বালম্বিভাবে আঁকা হয়েছে। রেখা দুটি 'o' বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখন গ্রাফ-পেপারে কোন বিন্দু (মনে কর P) পেতে হলে xox´ এবং yoy´ রেখা দুটি থেকে কত ঘর দূরে সেই বিন্দুটি আছে জানলে বিন্দুটির অবস্থান নির্ণীত হবে। সে কারণে বিন্দুটি থেকে xox´ এবং yoy´ রেখার উপর দুটি লম্ব টানতে হবে। লম্ব দুটি xox´ ও yoy´ রেখা দুটিকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখন এই দুটি বিন্দু O বিন্দু হতে কত ঘর দূরে, তা জানলেই P বিন্দুটির অবস্থান নির্ণয় করা যাবে। আমরা প্রতিটি ক্ষুদ্র ঘর বা বর্গক্ষেত্রকে হয় 1 একক, 2 একক বা 3 একক ধরে নিতে পারি। আবার প্রয়োজনমত 1, 2, 3 ইত্যাদি ধরে নিই, যাতে সমগ্র গ্রাফটি গ্রাফ পেপারে ভালভাবে আঁকা যায়; সেইজন্যই প্রায়ই O বিন্দুটি গ্রাফ পেপারে বাঁ দিকে নীচের দিকে ধরে নিই।

O বিন্দু থেকে OX-এর দিকের সব ঘরকে ধনাত্মক (positive) এবং OX´-এর দিকের সব ঘরকে ঋণাত্মক (negative) মনে করি। সেইরূপ O থেকে OY দিকের সব ঘরকে ধনাত্মক ও OY´ দিকের ঘরগুলিকে ঋণাত্মক (negative) ধরি। X ও Y রেখা দুটি O বিন্দুতে ছেদ করার জন্য সমগ্র গ্রাফটি চারটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। ডানদিকের উপরের ভাগটিতে X এবং Y-এর মান উভয়ই হবে ধনাত্মক (+ +), উপরের দিকে বাঁ পাশে দ্বিতীয় ভাগটিতে X হল ঋণাত্মক এবং Y হল ধনাত্মক (— +), নীচের দিকে বাঁ পাশে X এবং Y উভয়ই হল ঋণাত্মক (− −), এবং নীচের দিকে ডান পাশে X হল ধনাত্মক এবং Y হল ঋণাত্মক (+ −), P এই বিন্দুটি, যার স্থানাঙ্ক (4, 3) বসাতে হলে O এই ছেদ বিন্দু থেকে X অক্ষরেখার উপর 4 একক ডান পাশে যেতে হবে, এবং O বিন্দু থেকে উপরের দিকে OY-এর উপরের তিন একক যেতে হবে। তারপর OX এবং OY থেকে (চিত্র দ্রষ্টব্য) বিন্দুর উপর লম্ব টানতে হবে। যেখানে ছেদ করবে, সেটিকেই P বিন্দু বলে ধরে নিতে হবে। অনুরূপভাবে Q যার স্থানাঙ্ক (—3, —4), এবং R যার স্থানাঙ্ক (+3, —6) অঙ্কিত হল। O থেকে X অক্ষরের উপর কোন বিন্দুর দূরত্বকে ভুজ (abscissa) এবং O থেকে Y অক্ষরেখার উপর কোন বিন্দুকে কোটি (ordinate) বলা হয়। যেমন, R বিন্দুর ভুজ হল +3 এবং কোটি হল —6.

**পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন :** নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে একটি frequency polygon অঙ্কিত করা হল। 10 একক নিয়ে এক-একটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু (Mid-point) নিরূপণ করে শ্রেণীবিভাগের পাশে দেখান হয়েছে। XO অক্ষরেখায় শ্রেণীবিভাগ না বসিয়ে শ্রেণীবিভাগের মধ্যমান বসাতে হবে। শেষ স্তম্ভে Frequency দেখান হয়েছে।

**No. 7 Table**

| Class-interval | Mid-Points | Tally | Frequency |
|---|---|---|---|
| 20—29 | 24·5 | //// | 4 |
| 30—39 | 34·5 | ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ | 20 |
| 40—49 | 44·5 | ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ /// | 43 |
| 50—59 | 54·5 | ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ | 70 |
| 60—69 | 64·5 | ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ | 50 |
| 70—79 | 74·5 | ~~////~~ ~~////~~ / | 11 |
| 80—89 | 84·5 | // | 2 |

একটি গ্রাফ পেপারে অনুভূমিক রেখা (Horizental Line) OX এবং উল্লম্ব রেখা (Vertical line) OY নেওয়া হল। OX রেখা বরাবর শ্রেণী বিভাগগুলির মধ্যবিন্দু (mid-points of the class-interval এবং OY রেখা বরাবর স্কোর গুলি (f) বসান হল। পরপৃষ্ঠায় 2নং চিত্রে OX রেখা বরাবর প্রতিটি বর্গক্ষেত্র বাহুকে 2 একক ধরে শ্রেণীবিভাগের মধ্যমানগুলি এবং OY রেখার বরাবর প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের বাহুকে 2 একক ধরে স্কোর বা f-গুলি বসান হল। OX রেখা বরাবর 24·5 থেকে আরম্ভ করে শ্রেণীবিভাগের মধ্য-

বিন্দুগুলি বসান হয়েছে এবং মূলবিন্দু O এবং 24·5-এর মধ্যে OX রেখার উপর // চিহ্ন দিয়ে একটু অংশ কেটে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ হল আঁকায় সুবিধার জন্য OY রেখাকে শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুগুলির নিকট সরিয়ে আনা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণীবিভাগের 'f'কে OX অক্ষরেখার উপর শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুর উপরে বসান হয়েছে। frequency-গুলি নীচের দিক থেকে ধাপে ধাপে যথাক্রমে সর্বনিম্ন স্কোর থেকে ক্রমশঃ সর্বোচ্চ ধাপে পৌছবে—এইভাবে ছকতে হবে।
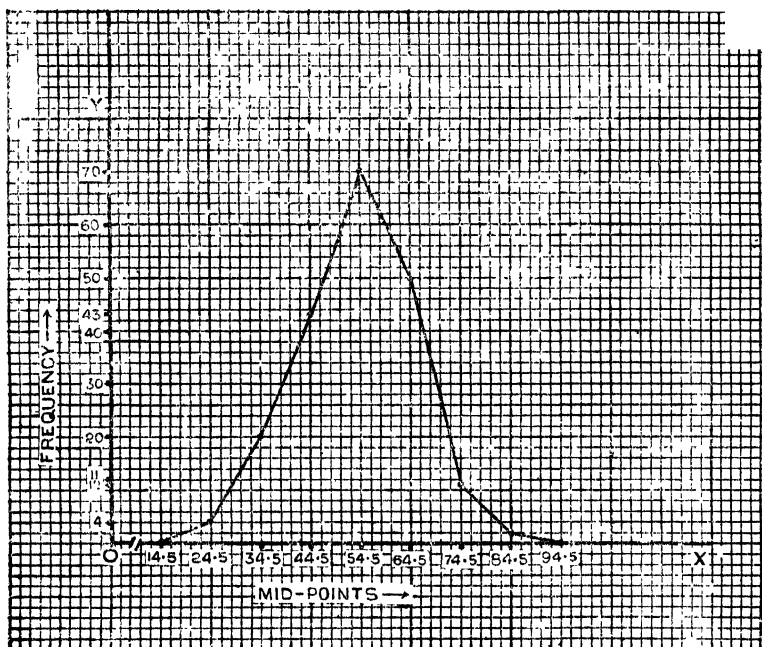
২নং লেখচিত্র—পরিসংখ্যান বহুভুজ ( Frequency polygon )

পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রটিতে দেখা যাবে মধ্যবিন্দু ও তার পরিসংখ্যাসূচক বিন্দুগুলি অর্থাৎ (24·5,4), (34·5, 20), (44·5, 43), (54·5, 70), (64·5, 50), (74·5 11), (84·5, 2) গ্রাফ পেপারে স্থাপন করা হয়েছে। সবকয়টি পরিসংখ্যান (frequency) ছকে নেওয়া হলে প্রথম বিন্দুটির সঙ্গে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় বিন্দুটির সঙ্গে তৃতীয়—এরকম করে সব বিন্দুগুলিকে সরলরেখা দিয়ে যোগ করে দিতে হবে, তাহলেই পরিসংখ্যান বহুভুজটি (Frequency Polygon) পাওয়া যাবে।

পরিসংখ্যাসূচক বিন্দুগুলি সরল রেখার দ্বারা যুক্ত করার পর দেখা যায় যে পরিসংখ্যা বহুভুজের চিত্রটি OX রেখাকে স্পর্শ করেনি। চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য প্রথম মধ্যবিন্দুর বাঁ পাশে ও শেষ মধ্যবিন্দুর ডানপাশে দুটি বেশি শ্রেণী বিভাগ নিয়ে তাদের মধ্যবিন্দু বসাতে হবে। যেহেতু দুটি শ্রেণীবিভাগেরই পরিসংখ্যান বা frequency হবে O, তাদের OX অক্ষের উপরই স্থাপন করতে হবে। এবার এই দুটি বিন্দুর সঙ্গে চিত্রটিকে সংযুক্ত করলেই পরিসংখ্যান বহুভুজটি অনুভূমিক রেখা বা OX অক্ষরেখার সঙ্গে আবদ্ধ হবে; ফলে, পরিসংখ্যান বহুভুজটির আকৃতি সম্পূর্ণ হবে।

**পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon)-এর আকৃতি:** পরিসংখ্যা বহুভুজের আকৃতি যাতে সুষম ও সাদৃশ্য পূর্ণ হয় সেজন্য X এবং Y অক্ষের একক নির্বাচনের দিকে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। Y অক্ষরেখার এককের অনুপাতে X অক্ষরেখার একক যদি বড় হয় তাহলে পরিসংখ্যা বহুভুজটি চ্যাপটা দেখাবে, আর যদি X অক্ষরেখার এককের তুলনায় Y অক্ষরেখার একক বড় হয় তবে পরিসংখ্যা বহুভুজটি অস্বাভাবিক লম্বা আকার ধারণ করবে। এ কারণে একটি সাধারণ নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতি হল বহুভুজের উচ্চতা যেন অধঃভূমির মোট দৈর্ঘ্যের $\frac{3}{4}$ হয় অর্থাৎ 75% বা তার কাছাকাছি হয়। একে 75% নীতি বলা হয়।

**(খ) আয়তলেখ (Histogram):** আরও একভাবে পরিসংখ্যা বিভাজনকে চিত্ররূপ দেওয়া যেতে পারে। পরিসংখ্যা বিভাজনকে আয়তলেখ বা স্তম্ভলেখের (Histogram) দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে। আয়তলেখ অঙ্কিত করার নীতি পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কিত করার নীতিরই অনুরূপ তবে কিছু পার্থক্য আছে। পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের সময় যেমন X অক্ষরেখা এবং Y অক্ষরেখা নেওয়া হয়, এখানেও তাই। এক্ষেত্রেও X অক্ষরেখায় শ্রেণীবিভাগগুলি এবং Y অক্ষরেখায় পরিসংখ্যান বা frequency-গুলি ছকে নেওয়া হয়। আয়তলেখ অঙ্কন করার সময় প্রদত্ত সর্বনিম্ন শ্রেণীবিভাগের নিম্নতর শ্রেণীবিভাগ (the lowest interval than the given lowest class interval) বা প্রদত্ত সর্বোচ্চ শ্রেণীবিভাগের উচ্চতর শ্রেণীবিভাগ (the upper one to the upper most class-interval) নেওয়া হয় না; সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ যে শ্রেণীবিভাগ দেওয়া থাকে তা ধরেই কাজ শুরু করতে হয়।

বিন্দুগুলি ছকবার সময় শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু নেওয়ার দরকার নেই। সর্বনিম্ন শ্রেণীবিভাগের প্রথম প্রান্ত সংখ্যাটি যেমন নীচের চিত্রে 20—29 শ্রেণীবিভাগের 20 সংখ্যাটি (lowest limit of the lowest class interval) থেকে শুরু করতে হবে, তারপর Y অক্ষরেখার পরিসংখ্যান বা frequency গণনা করে বার করতে হবে এবং Y অক্ষরেখায় তাকে স্থাপন করতে হবে। তারপর ঐ বিন্দুটির উচ্চতা পর্যন্ত ঐ শ্রেণীবিভাগের উপর
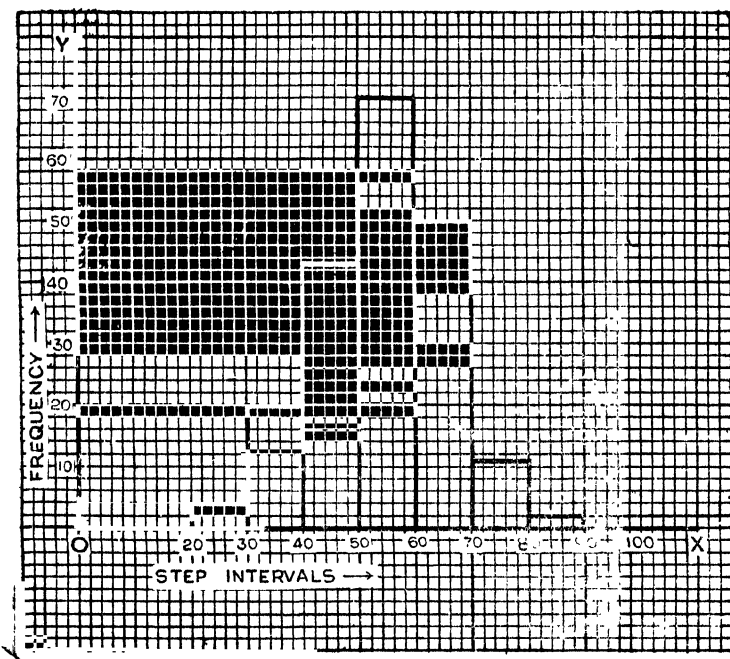
৩নং লেখচিত্র : আয়তলেখ বা *Histogram*

একটি আয়তক্ষেত্রে অঙ্কিত করতে হবে। এইভাবে frequency গণনা করে সব কয়টি আয়তক্ষেত্র অঙ্কন শেষ করতে হবে। প্রতিটি আয়তক্ষেত্রের বিস্তার শ্রেণীবিভাগের দূরত্বের সমান হবে এবং যেহেতু সব শ্রেণীবিভাগের দূরত্ব এক, আয়তক্ষেত্রগুলির বিস্তারও হবে এক। কিন্তু উচ্চতায় পার্থক্য থাকবে, কারণ, প্রতিটি আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা হবে frequency score-এর সংখ্যা অনুযায়ী। উপরের চিত্রটি লক্ষ্য করলে সব বোঝা যাবে।

**(গ) ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পরিসংখ্যা রেখা (Cumulative Frequency Curve):** পরিসংখ্যা বিভাজনের তথ্যগুলিকে ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পরিসংখ্যা রেখার দ্বারা অন্যভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।

**No. 8 Table (Cumulative Frequency Table.)**

| *Class-interval* | *f* | *Cum. f.* |
|---|---|---|
| 80—89 | 2 | 200 |
| 70—79 | 11 | 198 |
| 60—69 | 50 | 187 |
| 50—59 | 70 | 137 |
| 40—49 | 43 | 67 |
| 30—39 | 20 | 2 4 |
| 20—29 | 4 | 4 |
| 10—19 | 0 | 0 |

N = 200

*Cum. f* স্তম্ভটি পূর্ণ করার সময় নীচ থেকে f-গুলি ক্রমান্বয়ে যোগ করে সেই শ্রেণীবিভাগ বরাবর Cum. f বসাতে হয়। উপরের ছকে 20-29 শ্রেণীবিভাগের 29 5 পর্যন্ত 4টি f আছে। তাই Cum. f স্তম্ভে 4 লেখা হল। আবার 20-29 শ্রেণীবিভাগ এবং 30-39 শ্রেণীবিভাগের মধ্যে অর্থাৎ 19'5 (20-এর নিম্ন সীমা) থেকে 39'5 (39-এর উচ্চ সীমা) পর্যন্ত 4+20 =24টি f আছে। তাই 30-39 শ্রেণীবিভাগ বরাবর Cum. f স্তম্ভে 24 লেখা হয়েছে। এইভাবে Cum. f স্তম্ভটি পূরণ করা হয়েছে। মোট f সংখ্যা 200 থাকার জন্য এই ছকের সবচেয়ে উপরে Cum. f হল 200. লেখ-চিত্র অঙ্কনের সুবিধার জন্য 20-29 শ্রেণীবিভাগের নীচের শ্রেণীবিভাগ 10-19 নেওয়া হয়েছে এবং ঐ শ্রেণীবিভাগ বরাবর f স্তম্ভে '0' বসান হয়েছে।

ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পরিসংখ্যা রেখা (Cumulative Frequency Curve) লেখচিত্রে অঙ্কন করার সময় X অক্ষের উপর শ্রেণীবিভাগ এবং Y-অক্ষের উপর সঞ্চয়ী পরিসংখ্যান (Cumulative frequencies) বসান হয়। পরিসংখ্যা বহুভুজ (polygon) অঙ্কন করার সময় আমরা শ্রেণী-বিভাগের মধ্যবিন্দুর ঠিক উপরে Y অক্ষরেখায় ঐ পরিসংখ্যানের (f) অবস্থান ছকে নিই। কিন্তু সঞ্চয়ী পরিসংখ্যা রেখা অঙ্কন করার সময় আমরা প্রতি শ্রেণীবিভাগের উচ্চ সীমার (upper limit) ঠিক উপরে Y অক্ষরেখায় ঐ পরিসংখ্যানের অবস্থান ছকে নিই। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পরিসংখ্যা রেখাটি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে। উপরের ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী

বিভাজন ছক অনুযায়ী সঞ্চয়ী পরিসংখ্যা রেখাটি অঙ্কিত হয়েছে। এই রেখা অঙ্কন করার সময় শ্রেণীবিভাগের উচ্চ সীমার উপরই Cum. f বিন্দু বসান হয়েছে। কিন্তু আমরা সর্বশেষ শ্রেণীবিভাগের নিম্ন সীমা (lower limit)
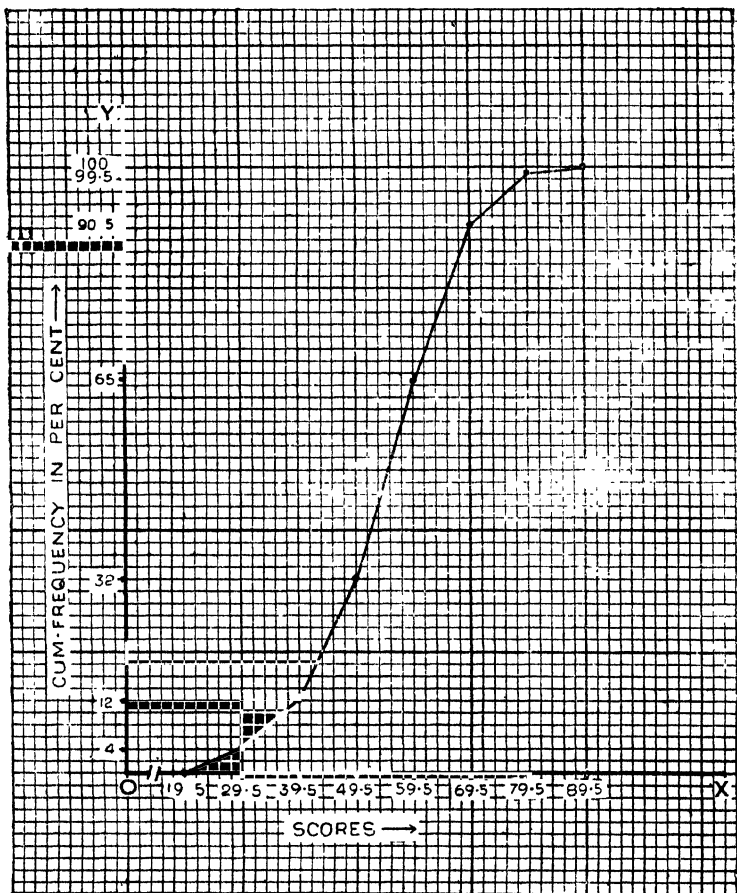
4নং লেখচিত্র : ক্রমযৌগিক বা সঞ্চয়ী পরিসংখ্যা রেখা বা Cumulative Frequncy Curve.

নিয়ে আরম্ভ করেছি। বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের উচ্চতর সীমার দূরত্ব সমান। Y অক্ষরেখার সঞ্চয়ী পরিসংখ্যান (Cum. f)-গুলি ছকা হয়েছে। যখন সব বিন্দুগুলি ছকা হয়ে গেছে তখন তাদের সরলরেখার দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে এবং এভাবে আমরা ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পরিসংখ্যা রেখা অঙ্কন করি।

### ৬। কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ (Measures of Central Tendencies) :

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central Tendency) কাকে বলে ?

পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণলব্ধ অবিন্যস্ত স্কোরগুলিকে পরিসংখ্যা বিভাজনে (Frequency Distribution) সাজাবার পর তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ করা হয়। কোন পরিসংখ্যা বিভাজনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে বোঝায় সেই স্কোর বা মান যেটি সমস্ত বিভাজন বা বণ্টনের (distribution) প্রকৃতি নির্দেশ করে বা যেটি সমস্ত বণ্টনের প্রতিনিধিরূপে কাজ করে (That point which represents the whole of the distribution)। কোন একটি গড় সংখ্যা সেই দলটির কেন্দ্রীয় প্রবণতা প্রকাশ করে। কেন্দ্রীয় প্রবণতা কেন্দ্রীয় অবস্থানের (Central position) সূচক।

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের দুটি মূল্য আছে—(১) প্রথমতঃ, এটি হল 'গড' (average) যা দলের সব কয়টি স্কোরের প্রতিনিধি স্বরূপ এবং (২) দ্বিতীয়তঃ, দুই বা ততোধিক দলের কাজের বৈশিষ্ট্যের তুলনা এর দ্বারা সম্ভব হয়।

এই কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ করার সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি আছে। যথা,—(ক) **গাণিতিক গড়** (Arithmetic Mean বা Mean)। একে শুধু *M* দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। (খ) **মধ্যমান** (Median)। একে '*Md*' দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং (গ) **ভুয়িষ্টক** (Mode) ; একে '*Mo*' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

### (ক) গাণিতিক গড় বার করার রীতি (How to calculate the Mean)।

#### (i) যখন তথ্যগুলি সাজান থাকে না তখন মিন বার করার রীতি (Calculation of the Mean when data are ungrouped)।

যখন তথ্যগুলি সাজান থাকে না অর্থাৎ Ungrouped অবস্থায় থাকে তখন মিন বার করার নিয়ম হল, সমস্ত স্কোরগুলিকে একত্রে যোগ করে যোগফলকে স্কোর (score)-এর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা।

$$\text{সূত্র হল } M = \frac{\Sigma X}{N}$$

[*M* = mean বা গাণিতিক গড় ; N স্কোরগুলির মোট সংখ্যা ; X = স্কোর (score) ; ΣX = স্কোরের যোগফল ]

**উদাহরণ :**

ধরা যাক, একটি পরীক্ষার্থীর 6টি বিষয়ের স্কোর হচ্ছে যথাক্রমে 85, 70, 90, 65, 50, এবং 55.

তাহলে তার নম্বরের Arithmetic Mean বা গাণিতিক গড় হচ্ছে :

$$\frac{85+70+90+65+50+55}{6}=69{\cdot}17$$

(ii) **যখন তথ্যগুলি সাজান থাকে অর্থাৎ Grouped অবস্থায় থাকে তখন মিন বার করার রীতি** (Calculation of the Mean when data are grouped)।

যখন তথ্যগুলি সাজান থাকে বা grouped অবস্থায় থাকে তখন মিন বার করার সূত্র হল :

$$M=\frac{\Sigma fX}{N}$$

[ M=Arithmetic Mean বা গাণিতিক গড ; f=frequency বা পরিসংখ্যান ; X=প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু বা midpoint ; N= frequency-র সংখ্যা এবং $\Sigma fx$-এর যোগফল ]

**উদাহরণ :**

**No. 9 Table**

| Class-interval | X | f | fx |
|---|---|---|---|
| 20—29 | 24·5 | 4 | 98·0 |
| 30—39 | 34·5 | 20 | 690·0 |
| 40—49 | 44·5 | 43 | 1913·5 |
| 50—59 | 54·5 | 70 | 3815·0 |
| 60—69 | 64·5 | 50 | 3225·0 |
| 70—79 | 74·5 | 11 | 819·5 |
| 80—89 | 84·5 | 2 | 169·0 |
| | | N=200 | 10730·0 |

$$M=\frac{\Sigma fx}{N}=\frac{1073{\cdot}0}{200}=53{\cdot}65$$

**কল্পিত গড়ের সাহায্যে গাণিতিক গড় নির্ণয়ের প্রণালী (Calculation by Assumed Mean):**

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক। ধরা যাক, 632 এবং 832-এর গড় নির্ণয় করতে হবে।

**সরল গড় নির্ণয়ের নিয়মানুসারে—**

$$X=\frac{\Sigma X}{N}=\frac{632+832}{2}=\frac{1464}{2}=732$$

**কল্পিত গড়ের সাহায্যে নির্ণয়:** মাঝামাঝি যে কোন রাশিকে গড হিসেবে ধরে নিলে তাকে কল্পিত গড় (Assumed Mean) বলে এবং কল্পিত গড থেকে প্রত্যেক রাশির অন্তরকে পার্থক্য (Deviation) বলে। রাশিবিজ্ঞানে 'd' অক্ষর দ্বারা এই 'deviation'-কে চিহ্নিত করা হয়। এই পার্থক্য ধনাত্মক ( + ) অথবা ঋণাত্মক ( − ) যে কোন রকম হতে পারে।

632 এবং 832-এর গাণিতিক গড় কল্পিত গড়ের সাহায্যে নির্ণয় করতে হবে।

মনে করা হল কল্পিত গড 712

এক্ষেত্রে $\left.\begin{array}{l}632\sim712=-80\\832\sim712=\ \ 120\end{array}\right\}$ কল্পিত গড থেকে পার্থক্য

সুতরাং গাণিতিক গড = কল্পিত গড় + পার্থক্যদ্বয়ের গড

$$=712+\frac{(-80)+120}{2}$$

$$=712+20=732.$$

**সংক্ষেপে গড় বার করার সহজ পদ্ধতি (How to calculate mean by short method):** পরিসংখ্যা বিভাজনের একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

No. 10 Table

| Class-interval | Midpoints X | f | x′ | fx′ |
|---|---|---|---|---|
| 40—44 | 42 | 3 | 4 | 12 |
| 35—39 | 37 | 4 | 3 | 12 |
| 30—34 | 32 | 5 | 2 | 10 |
| 25—29 | 27 | 6 | 1 | 6 |
| 20—24 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| 15—19 | 17 | 3 | −1 | −3 |
| 10—14 | 12 | 4 | −2 | −8 |
| 5—9 | 7 | 7 | −3 | −21 |
| | | N=40 | | 8 |

$M = AM + ci$

= কল্পিত গড়+Correction× শ্রেণীবিভাগের আয়তন বা ব্যাপ্তি।

পূর্ব পৃষ্ঠার তালিকা অনুযায়ী

$$c = \frac{\Sigma fx'}{N} = \frac{8}{40} = \cdot 2$$

$$i = 5$$

$$M = AM + ci = 22 + \cdot 2 \times 5$$
$$= 22 + 1 \cdot 0 = 23$$

**পদ্ধতির ব্যাখ্যা :**

(১) Score-গুলিকে পরিসংখ্যা বিভাজনে সাজাতে হবে।

(২) Score-এর মাঝামাঝি জায়গা থেকে একটি score-কে গড় বলে ধরে নিতে হবে। একে বলা হয় কল্পিত গড় বা Assumed Mean. যে শ্রেণীবিভাগের পরিসংখ্যান (frequency) সবচেয়ে বেশি সেটির মধ্য বিন্দুকেই কল্পিত গড় হিসেবে ধরে নিলে ভাল হয়। ২৩ পৃষ্ঠায় উদাহরণে 20—25 শ্রেণীবিভাগের পরিসংখ্যান সবচেয়ে বেশি। সে কারণে ঐ শ্রেণীবিভাগের মধ্য বিন্দু 22-কে কল্পিত গড় বা AM হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

(৩) $x'$ ঘরটি পূরণ করতে হবে। প্রতিটি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু ও কল্পিত গড়ের অন্তরকে শ্রেণীবিভাগের আয়তন বা ব্যাপ্তি দিয়ে ভাগ করে ফলটি লিখতে হবে। যেমন, 40—44 শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু 42; কল্পিত গড় নেওয়া হয়েছে 22. কাজেই উভয় রাশির অন্তর $(42-22)=20$. শ্রেণীবিভাগের ব্যাপ্তি হল 5. তাহলে $20 \div 5 = 4$ অর্থাৎ এক্ষেত্রে $x' = \frac{d}{5}$. কল্পিত গড় থেকে প্রত্যেক রাশির অন্তরকে Deviation বলে, যাকে 'd' দ্বারা সূচিত করা হয়।

(৪) $fx'$ কলমে $x'$কে f দিয়ে গুণ করে ফলাফল লিখতে হবে। f হল frequency বা পরিসংখ্যান আর $x'$ হল কল্পিত গড থেকে বিভাগের পার্থক্যসূচক রাশি। পূর্ব পৃষ্ঠার উদাহরণে প্রথম ঘরটিতে $3 \times 4 = 12$ $fx'$ কলমে লেখা হয়েছে।

(৫) $fx'$ কলমের রাশিগুলির যোগফল নির্ণয় করতে হবে। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক গুণফলগুলি পৃথক পৃথক ভাবে যোগ করতে হবে। পূর্ব পৃষ্ঠার

উদাহরণটিতে উপরের দিকে ধনাত্মক রাশিগুলির যোগফল (12+12+10+6 +0)=40, আর নীচের দিকে ঋণাত্মক রাশিগুলির {(−3)+(−8)+(−21)}=−32 যোগফল বার করতে হবে। এক্ষেত্রে উদাহরণটিতে যোগফল হয়েছে 8.

(৬) c হল fx´ কলমের সব রাশিগুলির যোগফলকে N (অর্থাৎ মোট frequency ) দিয়ে ভাগ করলে যে ফল হবে সেটি।

(৭) i হল শ্রেণীবিভাগের ব্যাপ্তি। উপরের উদাহরণে শ্রেণীবিভাগের ব্যাপ্তি হল 5।

(৮) c-কে i দিয়ে গুণ করে, তার সঙ্গে AM যোগ করলেই Mean বা গাণিতিক গড় পাওয়া যাবে।

**(খ) মধ্যমমান বার করার নিয়ম (How to Calculate the Median) :** যখন অশ্রেণীবদ্ধ রাশিগুলিকে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট অর্থাৎ মানের ঊর্ধ্বক্রমে বা অধঃক্রমে সাজান হয়, তখন ঠিক মাঝখানে যে রাশিটি থাকে, সেই রাশিটিকেই মধ্যমমান বা Median বলা হয়।

বিজোড় সংখ্যক রাশিকে যদি উপরিউক্ত নিয়ম অনুযায়ী সাজান হয় তাহলে ঠিক মাঝখানের রাশিটি হবে মধ্যমমান বা Median। যেমন,—3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, এখানে মোট 9টি রাশি আছে। কাজেই রাশির সংখ্যা বিজোড়। তাহলে মাঝের রাশি 8-ই হবে মধ্যমমান বা Median. এর উভয় পার্শ্বে সমান সংখ্যক রাশি থাকবে। এক্ষেত্রে উভয় পার্শ্বে 4টি রাশি রয়েছে।

যদি জোড় সংখ্যক রাশি হয় তাহলে মাঝে এমন কোন রাশি পাওয়া যাবে না যার দুপাশে সমান সংখ্যক রাশি থাকবে। সেক্ষেত্রে মাঝের দুটি রাশির গড়কেই মধ্যমমান বা Median ধরতে হবে। যেমন—3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16; এখানে মধ্যমমান বা Median হচ্ছে 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 অর্থাৎ মাঝের দুটি সংখ্যা 7 এবং 8-এর গড়=7·5.

**অশ্রেণীবদ্ধ রাশির ক্ষেত্রে মধ্যমমান নির্ণয়ের নিয়ম** (Calculation of Median from ungrouped data) :

(১) রাশিগুলিকে মানের ক্রম অনুসারে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজিয়ে নিতে হবে।

(২) রাশিগুলির সংখ্যা (অর্থাৎ n) বিজোড় হলে মধ্যমমান হবে $\frac{n+1}{2}$তম রাশিটি।

(৩) রাশিগুলির সংখ্যা (অর্থাৎ n) জোড় হলে মধ্যমমান হবে $\frac{n}{2}$তম এবং $\frac{n}{2}+1$ তম এই রাশি দুটির গড়।

**উদাহরণ :**

**কয়েকটি বিজোড় সংখ্যক রাশি নেওয়া হল।**

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

সূত্র : $\frac{n+1}{2}$তম রাশিটি মধ্যমমান।

এখানে মধ্যমমান $=\frac{7+1}{2}=4$, অর্থাৎ চতুর্থ রাশিটি $=12$ মধ্যমান।

**কয়েকটি জোড় সংখ্যক রাশি নেওয়া হল।**

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

সূত্র : $\frac{n}{2}$ তম এবং $\frac{n}{2}+1$ তম রাশি দুটির গড়।

এখানে মধ্যমমান $=\frac{8}{2}$তম এবং $\frac{8}{2}+1$তম রাশি দুটির গড়।

=চতুর্থ রাশি এবং পঞ্চম রাশির গড়

$=12+13$-এর গড

$=12{\cdot}5$ সংখ্যক রাশিটি মধ্যমমান।

**পরিসংখ্যা বিভাজনে যখন রাশিগুলি সজ্জিত থাকে তখন মধ্যমমান নির্ণয়ের সূত্র** (Calculation of Median from Grouped data in a Frequency Distribution)।

মধ্যমমান নির্ণয়ের সূত্র :

$$\text{Mdn}=l+\frac{\frac{N}{2}-fc}{fm}\times i$$

$l=$যে শ্রেণীবিভাগে মধ্যমমান বা Median আছে তার নিম্নসীমা।

N =মোট পরিসংখ্যান

$fc$ = সর্বনিম্ন শ্রেণীবিভাগ থেকে শুরু করে Median যে শ্রেণীবিভাগে পড়েছে সেই পর্যন্ত '$f$'-এর যোগফল।

$fm$ = যে বিভাগে মধ্যমমান আছে সেই বিভাগের পরিসংখ্যা।

$i$ = শ্রেণীবিভাগের ব্যাপ্তি।

**উদাহরণ :**

No. 11 Table

| Class-interval | f | |
|---|---|---|
| 20—29 | 4 | 67 |
| 30—39 | 20 | |
| 40—49 | 43 | |
| 50—59 | 70 | |
| 60—69 | 50 | |
| 70—79 | 11 | |
| 80—89 | 2 | |
| | N = 200 | |

মধ্যমমানের সূত্রটি—

$$\text{মধ্যমমান} = l + \frac{\frac{N}{2} - fc}{fm} \times i$$

এই সূত্রটি প্রয়োগ করে মধ্যমমান বার করতে হলে নিম্নলিখিতভাবে অগ্রসর হতে হবে।

১। প্রথমে $\frac{N}{2}$ বার করতে হবে। অর্থাৎ মোট frequency বা স্কোর সংখ্যার অর্ধেক কত বার করতে হবে।

২। সর্বনিম্ন class-interval-এর frequency থেকে শুরু করে (উপর থেকে নীচে বা নীচ থেকে উপরে যেভাবে class interval সাজান থাকে) এগোতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই শ্রেণীবিভাগটি পাওয়া যায় যেখানে $\frac{N}{2}$ সংখ্যক স্কোর শেষ হচ্ছে। বুঝে নিতে হবে সেই শ্রেণীবিভাগেই মধ্যমানটি পড়েছে। তারপর সেই শ্রেণীবিভাগের নিম্নসীমাটি বার করতে হবে, সেটি হবে 1

৩। সর্বনিম্ন class interval থেকে শুরু করে 1 পর্যন্ত 'f'-এর যোগফল বের করতে হবে। প্রয়োজনমত উপর বা নীচের দিক থেকে যোগ করে যেতে হবে, যেভাবে class-interval সাজান থাকবে। যেমন, এখানে উপর থেকে যোগ করে দেখান হয়েছে।

এখানে $l=49.5$ ( যে শ্রেণীবিভাগে মধ্যমমান পড়েছে তার নিম্নসীমা )

$$\frac{N}{2}=200 \; ; fc=67; fm=70 \; ; i=10$$

$$\text{Mdn}=49.5+\left(\frac{\frac{200}{2}-67}{70}\right)\times 10$$

$$=49.5+\frac{33}{70}\times 10$$

$$=49.5+\frac{33}{7}=49.5+4.71=54.21$$

**(গ) ভূয়িষ্টক নির্ণয় করার পদ্ধতি** (How to Calculate Mode) :

যখন কতকগুলি স্কোর অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে তখন যে স্কোরটি সবচেয়ে বেশিবার থাকে তাকে ভূয়িষ্টক (Mode) বলা হয়। যেমন, 2, 3, 4, 4 5, 5,6, 7 7 7, 8 8 8 8 8, 9, 10, 11, 11, 12—এই স্কোরগুলির ভূয়িষ্টক (Mode) হল 8, কারণ 8 সংখ্যাটি অন্য সংখ্যার তুলনায় অধিকবার আছে। ভূয়িষ্টক or Mode এক বা একাধিক হতে পারে। যেমন, 2, 3, 3, 3, 3, 4 4 4 4, 5, 6, 8 8 8 8, 9, 10, 11, 11, 12—এখানে 3, 4, 8 প্রতিটি স্কোর 4 বার করে আছে। সুতরাং এই তিনটি রাশিই হল ভূয়িষ্টক।

ভূয়িষ্টক নির্ণয় করার সূত্র হল : Mode=3 Median—2 mean.

No. 12 Table

| Class-interval | X | f | x′ | fx |
|---|---|---|---|---|
| 20—29 | 24·5 | 4 | —2 | — 8 |
| 30—39 | 34·5 | 20 | —1 | —20 |
| 40—49 | 44·5 | 43 | 0 | 0 |
| 50—59 | 54·5 | 70 | 1 | 70 |
| 60—69 | 64·5 | 50 | 2 | 100 |
| 70—79 | 74·5 | 11 | 3 | 33 |
| 80—89 | 84·5 | 2 | 4 | 8 |
| | | N =200 | | 183 |

$$\text{Median}=l+\left(\frac{\frac{N}{2}-f}{fm}\right)\times i$$

$$=49.5+\left(\frac{\frac{200}{2}-67}{70}\right)\times 10$$

$=54.21$ ( বিস্তারিত আলোচনার জন্য ২৬ পৃষ্ঠা দেখ )

Mean = AM + ci

$AM = 44{\cdot}5, \quad c = \frac{\Sigma fx'}{N} = \frac{183}{200} = {\cdot}915$

$= 44{\cdot}5 + {\cdot}915 \times 10 = 44{\cdot}5 + 9{\cdot}15 = 53{\cdot}65$

( কল্পিত গড় কিভাবে বার করতে হয়, তার জন্য ২২ পৃষ্ঠা দেখ )

Mode = 3 Median − 2 Mean = 3 × 54·21 − 2 × 53·65 = 55·33

**৭। কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের বিভিন্ন উপায় কখন প্রয়োগ করতে হয়? (When to use the various measure of central tendency ?) :**

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের জন্য কখন কোন্ উপায়টি অবলম্বন করতে হবে পরিসংখ্যানের ছাত্রদের কাছে তা প্রায়ই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের জন্য অন্যান্য উপায়গুলির তুলনায় গাণিতিক গড় বা Mean-এর ব্যবহারই বেশী প্রচলিত, যেহেতু তিনটি পরিমাপের মধ্যে এটিই বেশি নির্ভুল। কিন্তু কোন্ কোন্ অবস্থায় মধ্যমমান (Median) এবং ভূয়িষ্টক (Mode)-এর প্রয়োগ বেশি কার্যকরী। কখন কোন্টির প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মগুলি অনুসরণ করা চলে।

(i) **কখন গাণিতিক গড় বা Mean -এর প্রয়োগ করতে হয় :**

(১) যখন একটি কেন্দ্রীয় বিন্দুর দুপাশে স্কোরগুলি সমানভাবে অবস্থিত থাকে।

(২) সবচেয়ে নির্ভুল কেন্দ্রীয় প্রবণতা পেতে গেলে অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার তুলনায় Mean-ই সবচেয়ে কার্যকরী।

(৩) অন্যান্য পরিসংখ্যান যেমন, সমক পার্থক্য (SD), সহপরিবর্তনের মান (Co-efficient of correlation) ইত্যাদি নির্ণয় করতে হলে পূর্বেই Mean নির্ণয় করে নিতে হয়।

(ii) **কখন মধ্যমমান বা Median-এর প্রয়োগ করতে হয় :**

(১) যখন বিভাজনের যথাযথ মধ্যবিন্দু (midpoint) অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশতম বিন্দুটি নিরূপণ করতে হয়।

(২) যখন বিভাজনের প্রান্তসীমায় খুব উচ্চমানের বা নিম্নমানের স্কোর থাকে, তখন Mean-টি পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু খুব উচ্চমানের বা নিম্নমানের স্কোর থাকার জন্য Median-এর কোন পরিবর্তন ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ 6, 8, 9, 10, এবং 12 এই সারির Mean এবং Median

উভয়ই 9, কিন্তু যদি 12-র জায়গায় 42 বসান হয় এবং অন্যান্য স্কোর অপরিবর্তিত থাকে তাহলে Median সেই 9-ই থেকে যায় কিন্তু Mean হয়ে যায় 15.

(৩) যখন বিভাজনটি অসম্পূর্ণ থাকার জন্য Mean বার করা যায় না এবং গৃহীত এককটি সর্বত্র সমান কিনা তা জানা না থাকে।

**(iii) কখন ভূয়িষ্টক (Mode) প্রয়োগ করতে হয় :**

(১) যখন খুব দ্রুত এবং আনুমানিক (approximate) কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের প্রয়োজন দেখা দেয়।

(২) যখন প্রদত্ত স্কোরগুলির মধ্যে কোন্ স্কোরটি সবচেয়ে বেশী বার আবির্ভূত হয়, তা নিরূপণ করার প্রয়োজন হয়।

**১০। গড় থেকে পার্থক্য বা বিস্তৃতির পরিমাপ (Measurement of Variability or Dispersion) :**

সংগৃহীত তথ্যের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করা যায় যদি তার প্রতিনিধিস্থানীয় তথ্যটি নিরূপণ করা যায়। গড় হল সেই প্রতিনিধিস্থানীয় তথ্য যার দ্বারা আমরা কোন সমষ্টি বা শ্রেণী সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা করি।
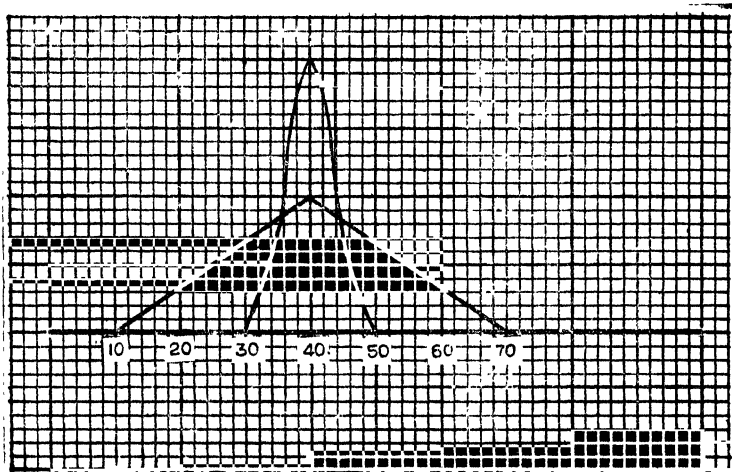
5 নং লেখচিত্র : 50 জন ছেলে ও 50 জন মেয়ের স্কোরের লেখচিত্র

কিন্তু গড়ের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের প্রতিটির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য জানা সম্ভব হয় না। এই কারণে গড় থেকে এর অন্তর্গত মানগুলির পার্থক্য বা বিস্তৃতি (Dispersion) নিরূপণ করা দরকার। শ্রেণীবদ্ধ স্কোরগুলির (f) কেন্দ্রের

দিকে যত বেশি প্রবণতা থাকে, গড়, মধ্যমমান ও ভূয়িস্টক ততই নির্ভুল প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, সে কারণ স্কোরগুলি প্রতিনিধির দুপাশে কিভাবে ছড়িয়ে বা বিস্তৃত হয়ে থাকে তা জানা দরকার। স্কোরগুলির প্রতিনিধি বা গড় থেকে পার্থক্য বা বিস্তৃতি যত কম হবে, ততই তাদের গড় বেশী প্রতিনিধি স্থানীয় হবে। প্রতিনিধির নির্ভরযোগ্যতা তার দুপাশের স্কোরগুলির মানের উপর নির্ভর করে।

ধরা যাক, কোন একটি বিদ্যালয়ে ৫০ জন ছেলে এবং ৫০ জন মেয়েকে একটি বুদ্ধির অভীক্ষা দেওয়া হল। ফলাফল থেকে দেখা গেল মেয়েদের এবং ছেলেদের গড় নম্বর একই, কিন্তু মেয়েরা 30 থেকে 50 নম্বরের মধ্যে পেয়েছে, কিন্তু ছেলেরা 10 থেকে 60 নম্বরের মধ্যে পেয়েছে।

মেয়েদের স্কোরের বিস্তৃতি 20=(50 – 30); কিন্তু ছেলেদের স্কোরের বিস্তৃতি 50=(60 – 10)। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যদিও পূর্বোক্ত স্কোরের গড় সমান তবু মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের স্কোর বেশী বিস্তৃত অর্থাৎ বেশী জায়গা জুড়ে আছে। সুতরাং বিস্তৃতির ধারণা করতে হলে এই বিস্তৃতির পরিমাপের প্রয়োজন।

**বিস্তৃতি পরিমাপ করার নিয়ম:**

বিস্তৃতি চার উপায়ে পরিমাপ করা যায়; যথা—(ক) প্রসার (Range), (খ) গড পার্থক্য (Mean Deviation), (গ) সমক পার্থক্য (Standard Deviation) এবং (ঘ) চতুর্থক পার্থক্য (Quartile Deviation)।

**(ক) প্রসার** (Range): কোন তালিকার সর্বোচ্চ স্কোর থেকে সর্বনিম্ন স্কোরের অন্তরকে (difference) প্রসার বলে। পূর্বোক্ত উদাহরণে মেয়েদের স্কোরের প্রসার (Range) হচ্ছে 50—30=20; এবং ছেলেদের স্কোরের প্রসার হচ্ছে 60—10=50. প্রসারের সাহায্যে অতি সহজে বিস্তৃতি পরিমাপ করা গেলেও, এই প্রণালী খুব সন্তোষজনক নয়। প্রান্তীয় স্কোরের উপরই প্রসার নির্ভর করে। যদি কোন কারণে প্রান্তীয় স্কোর দুটি খুব বেশী বড় বা ছোট হয়, তখন প্রসারের দ্বারা স্কোরগুলির বিস্তৃতি ধরা পড়বে না। মোট স্কোরের সংখ্যা অল্প হলেও বিস্তৃতি পরিমাপের ব্যাপারে প্রসার খুব কার্যকরী হয় না।

**(খ) গড় পার্থক্য** (Mean Deviation): কোন শ্রেণীর স্কোরগুলির গড় থেকে তার প্রতিটি স্কোরের চিহ্ননিরপেক্ষ অন্তর ফলের গড়কে গড় পার্থক্য

(Mean Deviation or MD) বলা হয়। একে Average Deviation বা সংক্ষেপে AD-ও বলা হয়ে থাকে।

**গড় পার্থক্য নির্ণয় করার নিয়ম :**

(১) প্রথমে স্কোরগুলির গড় নির্ণয় করতে হবে।

(২) গড় থেকে প্রত্যেকটি স্কোরের চিহ্ননিরপেক্ষ অন্তর বার করতে হবে।

(৩) অন্তরগুলির যোগ (+) এবং (−) বিয়োগ চিহ্নগুলি অগ্রাহ্য করে, এদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে।

(৪) সমষ্টিকে স্কোরগুলির মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। প্রাপ্ত ভাগফলটিই নির্ণেয় গড় পার্থক্য।

সুতরাং, AD বা MD নির্ণয় করার সূত্র হল।

$$AD = \frac{\Sigma \mid d \mid}{N}$$

d = গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের অন্তর; $\Sigma \mid d \mid$ = চিহ্ননিরপেক্ষ d-এর যোগফল অর্থাৎ প্রতিটি d-কে ধনাত্মক (Positive) হিসেবে গণ্য করতে হবে।

N = মোট স্কোরের সংখ্যা।

**যখন স্কোরগুলি অসজ্জিত অবস্থায় থাকে** (When scores are ungrouped)।

**উদাহরণ—**

4, 6, 12, 18, 20, 24 এই স্কোরগুলির গড পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে।

নির্ণেয় স্কোরগুলির গড় $= \frac{4+6+12+18+20+24}{6} = 14$

এই গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের অন্তর হল $4-14=-10$ ; $6-14=-8$ ; $12-14=-2$ ; $18-14=4$ ; $20-14=6$ ; $24-14=10$ ;

$$AD \text{ বা } MD = \frac{\Sigma \mid d \mid}{N}$$

$$\frac{10+8+2+4+6+10}{6}$$

$$\frac{40}{6} = 6·6$$

**যখন স্কোরগুলি সজ্জিত** (When scores are grouped) **:** যখন স্কোরগুলি সজ্জিত থাকে অর্থাৎ পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে গড় পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে পরপৃষ্ঠায় লিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হবে।

(১) গড় থেকে প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুর অন্তর বার করতে হবে।

(২) পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে স্কোরগুলির গড় নির্ণয় করতে হবে।

(৩) মধ্যবিন্দুর অন্তরগুলিকে যথাক্রমে বিভাগের পরিসংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে।

(৪) গুণফলগুলির সমষ্টিকে মোট স্কোরের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। তাহলে যে ভাগফলটি পাওয়া যাবে সেটিই গড় পার্থক্য।

পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে গড় পার্থক্য নির্ণয়ের সূত্র হল—

$$AD = \frac{\Sigma \mid fd \mid}{N}$$

**উদাহরণ :**

No. 13 Table

| Class-interval | X | f | (X − M) = d | fd |
|---|---|---|---|---|
| 20—29 | 24·5 | 4 | −29·15 | −116·60 |
| 30—39 | 34·5 | 20 | −19·15 | −383·00 |
| 40—49 | 44·5 | 43 | − 9·15 | −393·45 |
| 50—59 | 54·5 | 70 | + ·85 | + 59·50 |
| 60 − 69 | 64·5 | 50 | +10·85 | +542·50 |
| 70—79 | 74·5 | 11 | +20·85 | +229·35 |
| 80 —89 | 84·5 | 2 | +30·85 | + 61·70 |
| | | N=200 | | Σ\|fd\|=1786·10 |

X = মধ্যবিন্দু ; d = গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের অন্তর ; fd = প্রতিটি d-কে f দ্বারা গুণ করা হয়েছে।

Σ | fd | = fd-র চিহ্নিনিরপেক্ষ যোগফল।

Mean = 53·65 (২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

$$AD = \frac{\Sigma \mid fd \mid}{N} = \frac{1786{\cdot}10}{200} = 8{\cdot}93$$

**(গ) সমক পার্থক্য** (Standard deviation) : কোন শ্রেণীর রাশিগুলির গড় থেকে রাশিগুলির পার্থক্যগুলির বর্গসমূহের গড়ের বর্গমূলকে ঐ রাশিগুলির সমক পার্থক্য (Standard Deviation) বলা হয়। গড় পার্থক্য (AD বা MD) থেকে সমক পার্থক্য একটু স্বতন্ত্র এবং গড় পার্থক্যের থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য। সমক পার্থক্যের দ্বারা আরও নিখুঁত ফলাফল পাওয়া যায়। গড় পার্থক্য (AD বা MD) নির্ণয় করার সময় গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের অন্তরকে অর্থাৎ 'd'গুলিকে ধনাত্মক

(positive) হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তার ফলে পরিমাপ নিখুঁত হয় না। কিন্তু সমক পার্থক্য (SD) নির্ণয় করার সময় গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের পার্থক্যকে অর্থাৎ 'd'গুলিকে বর্গ করে নেওয়া হয়। ফলে সব স্কোরগুলিই ধনাত্মক হয়ে পড়ে। এতে 'd' যদি ঋণাত্মক (Negative) হয় তবু $d^2$ করলে তা ধনাত্মক হয়ে যায়। ফলে পরিমাপে আর ত্রুটি থাকে না। SD কথাটিকে, গ্রীক চিহ্ন $\sigma$ (সিগমা)-র সাহায্যে প্রকাশ করা হয়।

**স্কোরগুলি অসজ্জিত থাকলে সমক পার্থক্য নির্ণয় করার নিয়ম (Calculation of SD from ungrouped data):**

(১) প্রদত্ত স্কোরগুলির গাণিতিক গড় (Arithmetic mean) নির্ণয় করতে হবে।

(২) গাণিতিক গড় থেকে স্কোর সমূহের অন্তরগুলির অর্থাৎ 'd'গুলির বর্গ নির্ণয় করতে হবে।

(৩) ঐ বর্গগুলির যোগফলকে স্কোরগুলির মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে।

(৪) ঐ ভাগফলের বর্গমূল (square root) বার করলে, প্রাপ্ত বর্গমূলই হবে সমক পার্থক্য বা SD.

তাহলে স্কোরগুলি অসজ্জিত থাকলে SD নির্ণয় করার সূত্র হল—

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$$

**উদাহরণ:**

এখন অশ্রেণীবদ্ধ কয়েকটি স্কোর নেওয়া যাক 2, 4, 6, 8, 10, 12

প্রদত্ত স্কোরগুলির গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean) $= \frac{42}{6} = 7$.

গাণিতিক গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের পার্থক্য = d

$d = -5, -3, -1, 1, 3, 5$

$d^2 = 25, 9, 1, 1, 9, 25$

N = স্কোরের মোট সংখ্যা = 6

বর্গগুলির যোগফল $[\Sigma d^2] = 25+9+1+1+9+25 = 70$

$$\therefore \sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$$

$$= \sqrt{\frac{70}{6}}$$

$$= 3{\cdot}415$$

**শ্রেণীবদ্ধ স্কোর থেকে সমক পার্থক্য বের করার নিয়ম (Calculation of SD from grouped data) :**

রাশিগুলি যখন সাজানো থাকে তখন সূত্র হল—

$$\sigma=\sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{N}}$$

$\sigma$=SD বা সমক পার্থক্য, N=স্কোরের মোট সংখ্যা, $f$=পরিসংখ্যা, $\Sigma fd^2$=প্রতি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু ও গড়ের (Mean) অন্তর নির্ণয় করে, তার বর্গ করে তাকে $f$ দিয়ে গুণ করে গুণফলগুলির যোগফল।

**উদাহরণ :**

**No. 14 Table**

| Class-interval | X | f | d | fd | fd² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 – 29 | 24·5 | 4 | – 29·15 | – 116·60 | 3398·8900 |
| 30 – 39 | 34·5 | 20 | – 19·15 | – 383·00 | 7334·4500 |
| 40 – 49 | 44·5 | 43 | + 9·15 | 393·45 | 3000·0675 |
| 50 – 59 | 54·5 | 70 | + ·85 | 59·50 | 50·5750 |
| 60 – 69 | 64·5 | 50 | + 10·85 | 542·50 | 5886·1258 |
| 70 – 79 | 74·5 | 11 | + 20·85 | 226·35 | 4781·9475 |
| 80 – 89 | 84·5 | 2 | + 30·85 | 61·70 | 1903·4450 |
| | | N = 200 | | | 26955·5008 |

$\therefore\ \Sigma fd^2=26955{\cdot}5008$

Mean = 53·65

$$\text{SD বা } \sigma=\sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{N}}=\sqrt{\frac{26955{\cdot}5008}{200}}=11{\cdot}6 \text{ (approx)}$$

**ব্যাখ্যা**

এখানে প্রথম স্তম্ভ হল শ্রেণীবিভাগ, দ্বিতীয় স্তম্ভ হল X বা মধ্যবিন্দু, তৃতীয় স্তম্ভ হল $f$ বা পরিসংখ্যা, চতুর্থ স্তম্ভ হল '$d$' বা deviation অর্থাৎ গড় ও প্রতি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুর অন্তর।

[ Mean $=\frac{\Sigma fx}{N}=53{\cdot}65$. ]

পঞ্চম স্তম্ভ হল $fd$=গড় ও প্রতি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুর অন্তরকে $f$ দিয়ে গুণ করে তার গুণফল ;

$fd^2$=$d$ এর বর্গ করে $f$ দিয়ে গুণ।

$\Sigma fd^2$=পূর্বোক্ত $fd^2$-এর যোগফল।

N=মোট $f$ এর সমষ্টি।

**SD নির্ণয় করার সহজ উপায় :**

দীর্ঘ পরিসংখ্যা বিভাজনের '$d$' বা পার্থক্যগুলির বর্গ এত বড় হয় যে সেগুলি নিয়ে কাজ করতে খুব অসুবিধা দেখা দেয়। সে কারণে SD নির্ণয় করার একটা সহজ উপায় আছে।

সহজ উপায়ে SD নির্ণয় করার সূত্র হল—

$$\sigma = i\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N} - c^2}$$

$d'$ = কল্পিত গড থেকে প্রতিটি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুর অন্তর।

$fd'^2$ = $d'$ এর বর্গ করে $f$ দিয়ে গুণ।

$\Sigma fd'^2$ = $fd'^2$ এর যোগফল।

$c^2$ = কল্পিত গড়ের সংশোধনের বর্গ।

N = মোট স্কোর সংখ্যা।

i = শ্রেণীবিভাগের ব্যাপ্তি।

**উদাহরণ :**

**No. 15 Table**

| Class-interval | $X$ | $f$ | $d'$ | $fd'$ | $fd'^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20—29 | 24·5 | 4 | −2 | — 8 | 16 |
| 30—39 | 34·5 | 20 | −1 | —20 | 20 |
| 40—49 | 44·5 | 43 | −0 | — 0 | 0 |
| 50—59 | 54·5 | 70 | 1 | 70 | 70 |
| 60—69 | 64·5 | 50 | 2 | 100 | 200 |
| 70—79 | 74.5 | 11 | 3 | 33 | 99 |
| 80—89 | 84·5 | 2 | 4 | 8 | 32 |
| | | N = 200 | | $\Sigma fd'$ = 183 | $\Sigma fd'^2$ = 437 |

$$C = \text{Correction} = \frac{\Sigma fd'}{N} = \frac{183}{200} = \cdot 91$$

$$i = 10$$

$$\therefore \quad \text{SD বা } \sigma = i\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N} - c^2}$$

$$= 10.\sqrt{\frac{437}{200} - (\cdot 91)^2}$$

$$= 10\cdot \sqrt{1\cdot 3519} = 11\cdot 6 \text{ (approx.)}$$

ব্যাখ্যা :

পূর্বোক্ত পরিসংখ্যা বিভাজনটির 40—49 শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু 44·5-কে কল্পিত গড় বা Assumed Mean হিসেবে নেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে ২৩ পৃষ্ঠায় এই ছকেরই কল্পিত গড় নির্ণয় করা হয়েছে। কাজেই 20—29 এই শ্রেণীবিভাগের d′ হচ্ছে ( 24·5—44·5 )÷10= −2। অনুরূপভাবে সব কটি d′ নির্ণয় করা হল। তারপর $fd'$ নির্ণয় করা হল $d'$কে $f$ দিয়ে গুণ করে। তারপর শেষ স্তম্ভে $fd'^2$ নির্ণয় করা হল $d'$ গুলির বর্গ নির্ণয় করে এবং তাকে $f$ দিয়ে গুণ করে। $fd'^2$-র যোগফল হল 437। এইবার কল্পিত গড়ের সংশোধন অর্থাৎ $c$ নির্ণয় করতে হবে। এর সূত্র হল $\frac{\Sigma fd'}{N}$ অর্থাৎ $fd'$ গুলি যোগ করে মোট $f$-সমষ্টি অর্থাৎ $N$ দিয়ে ভাগ করা, c হল ·91. তারপর $c$-এর বর্গ করে নেওয়া হল।

অবশেষে $\sigma = i\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N} - c^2}$ সূত্রটি প্রয়োগ করা হল। ফলাফল পূর্ব পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে।

(ঘ) **চতুর্থক পার্থক্য** (Quartile Deviation): চতুর্থক পার্থক্য বা Q হল কোন পরিসংখ্যা বিভাজনের স্কোরের 75তম এবং 25তম পার্সেণ্টাইল-এর দূরত্বের অর্ধেক। চতুর্থকগুলি (Quartile) স্কোরের অন্তর্গত কোন স্কোর নয়। এগুলি স্কোরের স্কেলে এক একটি বিন্দু। 25তম পার্সেণ্টাইল বা $Q_1$, স্কোরের স্কেলে প্রথম চতুর্থক, এর নীচে শতকরা 25 জনের স্কোর থাকে। 75তম পার্সেণ্টাইল বা $Q_3$ স্কোরের স্কেলে তৃতীয় চতুর্থক, যার নীচে শতকরা 75 জনের স্কোর থাকে। $Q_3$র উপরে শতকরা 25 জনের স্কোর থাকে। $Q_1$ এবং $Q_3$র বিন্দু দুটি যেই পাওয়া গেল, অমনি Quartile Deviation বা Q-র সূত্রটি পাওয়া গেল। সূত্রটি হল—

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

Q নির্ণয় করতে হলে 75তম এবং 25তম পার্সেণ্টাইল নির্ণয় করতে হবে। মধ্যমমান ( Mdn. ) যে উপায়ে নির্ণয় করতে হয় সেই একই উপায়ে 75তম 25তম পার্সেণ্টাইল নির্ণয় করতে হবে। Mdn. স্কোরের স্কেলে 50তম পার্সেণ্টাইল। তবে Mdn. এর সঙ্গে পার্থক্য হল এই, Mdn. নির্ণয় করার সময় আমরা স্কোরের সংখ্যা অর্থাৎ Nকে 2 দিয়ে ভাগ করি অর্থাৎ

$\left(\frac{N}{2}\right)$। কিন্তু $Q_1$ নির্ণয় করার সময় স্কোরের সংখ্যা অর্থাৎ N এর $\frac{1}{4}$ গণনা করতে হবে এবং $Q_3$ নির্ণয় করার সময় N এর $\frac{3}{4}$ গণনা করতে হবে। কারণ স্কোরের সংখ্যা যদি N হয় তাহলে প্রত্যেক Quartile বা চতুর্থক হবে N এর $\frac{1}{4}$ অংশ, এর থেকে $Q_1$ এবং $Q_3$ নির্ণয় করার দুটি সূত্র পাওয়া গেল।

$$=l+\frac{\frac{N}{4}-Cumf_1}{fq}\times i$$

$$Q_3=l+\frac{3N-Cumf_1}{fq}\times i$$

এখানে $l$=যে ধাপে Quartile পড়ে তার ঠিক নিম্নসীমা

$Cumf_1$= যে ধাপে Quartile পড়ে তার পূর্ব ধাপগুলির $f$-এর যোগফল

$fq$=যে ধাপে Quartile পড়ে সেই ধাপ বরাবর $f$

$i$= শ্রেণীবিভাগের আয়তন বা ব্যাপ্তি।

**No. 16 Table**

| Class-interval | Midpoint | Frequency ($f$) | |
|---|---|---|---|
| 90–94 | 92 | 2 | |
| 85–89 | 87 | 2 | |
| 80–84 | 82 | 4 | |
| 75–79 | 77 | 8 | |
| 70–74 | 72 | 8 | 44 |
| 65–69 | 67 | 13 | |
| 60–64 | 62 | 9 | |
| 55–59 | 57 | 6 | 14 |
| 50–54 | 52 | 5 | |
| 45–49 | 47 | 1 | |
| 40–44 | 42 | 2 | |
| | | N=60 | |

Quartile Deviation বা Q নির্ণয়

(ক) $Q_1$ নির্ণয় করার সূত্র—

$$Q_1=l+\frac{N-Cumf_1}{fq}\times i$$

এখানে $\frac{N}{4} = \frac{60}{4} = 15$

$l = 59{\cdot}5$ (মোট frequency-র $\frac{1}{4}$ অংশ অর্থাৎ 15 যে শ্রেণী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত তার নিম্নসীমা )

$Cumf_1 = 6+5+1+2 = 14.$

$fq = 9,\ i = 5.$

এবার সূত্র-প্রয়োগ করলে

$$Q_1 = 59{\cdot}5 + \frac{15-14}{9} \times 5$$

$$= 59{\cdot}5 + \frac{5}{9}$$
$$= 59{\cdot}5 + {\cdot}56$$
$$= 60{\cdot}06$$

(খ) $Q_3$ নির্ণয় করার সূত্র—

$$Q_3 = l + \frac{\frac{3N}{4} - Cumf_1}{fq} \times i$$

এখানে $\frac{3N}{4} = \frac{180}{4} = 45$

$l = 74{\cdot}5$
$Cumf_1 = 2+1+5+6+9+13+8 = 44$
$fq = 8$
$i = 5$

$$Q_3 = l + \frac{\frac{3N}{4} - Cumf_1}{fq} \times i$$

$$= 74{\cdot}5 + \frac{45-44}{8} \times 5$$

$$= 74{\cdot}5 + \frac{5}{8}$$
$$= 74{\cdot}5 + {\cdot}63$$
$$= 75{\cdot}13$$

এখন Q নির্ণয় করতে হলে—

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$
$$= \frac{75{\cdot}13 - 60{\cdot}06}{2}$$

[ $Q_3$ এবং $Q_1$ এর মানসূত্রে স্থাপন করে ]

$$= \frac{15{\cdot}07}{2}$$
$$= 7{\cdot}54$$

## ৯। পার্সেণ্টাইল এবং পার্সেণ্টাইল মান (Percentiles and Percentile Ranks) :

পার্সেণ্টাইল হল পরিসংখ্যা বিভাজনের স্কোরের স্কেলের এমন একটি বিন্দু যার নীচে শতকরা কিছু স্কোর থাকে। আমরা ইতিপূর্বে Quartile সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, মধ্যবিন্দু পরিসংখ্যা বিভাজনের স্কোরের স্কেলের সেই বিন্দু যার নীচে শতকরা 50 জনের স্কোর থাকে এবং $Q_1$ বা $Q_3$ হল স্কেলের সেই বিন্দু যার নীচে যথাক্রমে 25% এবং 75% স্কোর থাকে। যে ভাবে মধ্যমমান এবং Quartile নির্ণয় করা হয়েছে অনুরূপভাবে আমরা পরিসংখ্যা বিভাজন স্কোরের স্কেলে এমন বিন্দু নিরূপণ করতে পারি যার নীচে 12%, 45%, 83% স্কোর থাকে। এই বিন্দুগুলিকেই পার্সেণ্টাইল (Percentile) বলা হয়। Pp এই প্রতীকের সাহায্যে এই বিন্দুগুলিকে প্রকাশ করা হয়। P বললে সেই বিন্দুটিকে বোঝাবে যার নীচে শতকরা কিছু স্কোর রয়েছে। $P_{12}$, $P_{40}$, $P_{30}$ বললে যথাক্রমে সেই বিন্দুগুলিকে বোঝাবে যার নীচে মোট স্কোরের 12%, 40%, 30% প্রভৃতি স্কোর আছে। Median বা মধ্যবিন্দুর নীচে যেহেতু 50% স্কোর থাকে, সেহেতু Median-কে Percentile হিসেবে প্রকাশ করতে হলে $P_{50}$ প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করতে হবে। অনুরূপভাবে $Q_1$ এবং $Q_3$-কে যথাক্রমে $P_{25}$ এবং $P_{75}$ চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

পার্সেণ্টাইল নির্ণয় করার পদ্ধতিটি Median নির্ণয় করার পদ্ধতির অনুরূপ।

সূত্র হল $Pp=l+\left(\frac{PN-F}{fp}\right)\times i$

**নীচ থেকে উপরে গণনা করে Percentile নির্ণয় করার সূত্র :**

এখন Pp = পরিসংখ্যা বিভাজনের যে শতকরাটি নিরূপণ করতে হবে—যথা, 20%, 30% বা 40% ইত্যাদি।

$l$ = Pp যে শ্রেণীবিভাগে রয়েছে সেই শ্রেণীবিভাগের ঠিক নিম্ন সীমাটি।

$PN$ = Ppতে পৌঁছতে হলে মোট পরিসংখ্যানের ($N$) যে অংশটুকুর প্রয়োজন।

$F$ = $l$ এর নীচে অবস্থিত f এর যোগফল।

$fp$ = যে শ্রেণীবিভাগে Pp রয়েছে সেই শ্রেণীবিভাগের পরিসংখ্যা ($f$)।

$i$ = শ্রেণীবিভাগের ব্যাপ্তি।

**No. 17 Table.**

| Class-interval | f | Cum. f |
|---|---|---|
| 80—89 | 1 | 200 |
| 70—79 | 18 | 199 |
| 60—69 | 51 | 181 |
| 50—59 | 66 | 130 |
| 40—49 | 40 | 64 |
| 30—39 | 16 | 24 |
| 20—29 | 8 | 8 |
| | N = 200 | |

**উদাহরণ :**

ধরা যাক আমরা পূর্বোক্ত পরিসংখ্যা বিভাজনের কয়েকটি পার্সেণ্টাইল নির্ণয় করতে চাই—70%, 40%, 30% ।

**ব্যাখ্যা :**

নীচে $P_{40}$, $P_{30}$, ও $P_{70}$ প্রভৃতির পার্সেণ্টাইল পূর্বোক্ত সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়েছে এবং তার ফলাফল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমরা $P_{70}$-র পার্সেণ্টাইল কিভাবে নির্ণয় করেছি তা বুঝে নিই।

এখানে $Pp$ হচ্ছে $P_{70}$

এখানে $PN$ হচ্ছে 70% of 200 = 140

140 পড়েছে 60 − 69 এই শ্রেণীবিভাগে, সুতরাং এই শ্রেণীবিভাগের নিম্নসীমা অর্থাৎ $l$ হবে 59·4; $F$ হচ্ছে $l$-এর নীচে অবস্থিত সমস্ত $f$-এর যোগফল, অর্থাৎ (66+40+16+8) = 130.

$fp$ হচ্ছে = 51 ( যে শ্রেণীবিভাগে $Pp$ পড়েছে তার $f$ অর্থাৎ 60 − 69 শ্রেণীবিভাগের $f$-টি )।

$i$ হচ্ছে = 10

তাহলে এবার সূত্র প্রয়োগ করে—

$$Pp = l + \left(\frac{PN - F}{fp}\right) \times i$$

$$\therefore\ P_{70} = 59{\cdot}5 + \left(\frac{140 - 130}{51}\right) \times 10$$

$$= 59{\cdot}5 + \left(\frac{10}{51}\right) \times 10$$

$$= 59{\cdot}5 + \frac{100}{51}$$

$$= 59{\cdot}5 + 1{\cdot}96 = 61{\cdot}46.$$

এইভাবে অন্যান্য পার্সেন্টাইল গুলি বার করতে হবে।

$$[40\% of\ 200=80];\quad P_{40}=49{\cdot}5+\left(\frac{80-64}{66}\right)\times 10$$
$$=51{\cdot}92.$$

$$[30\%\ 200=60];\quad P_{30}=39{\cdot}5+\left(\frac{60-24}{40}\right)\times 10$$

$$39{\cdot}5+\frac{9}{10}\times 10$$
$$=48{\cdot}5.$$

**পার্সেণ্টাইল মান (Percentile Rank):** কোন পরিসংখ্যা বিভাজনের পার্সেন্টাইল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। *Percentile* হল অবিচ্ছিন্ন স্কোর সারির মধ্যে এমন একটা বিন্দু যার নীচে নির্দিষ্ট সংখ্যক শতকরা $N$ থাকে। এবার আমরা পার্সেন্টাইল র‍্যাঙ্ক (*Percentile Rank*) কাকে বলে এবং কিভাগে তা নির্ণয় করতে হবে আলোচনা করব।

শতের মধ্যে একটি ছাত্রের নম্বরের সঠিক স্থান (The position on a scale of 100 to which the subjects' score entiles him) হল *Percentile Rank.* কোন বিশেষ ছাত্রের নম্বরের স্থান তখনই উপলব্ধি করা যায় যখন অন্যান্য ছাত্রদের নম্বরের মধ্যে তার স্থানটি কোথায় নিরূপণ করি। *Percentile Rank*-কে সংক্ষেপে *PR* বলা হয়।

*Percentile*-এর সঙ্গে *Percentile Rank*-এর পার্থক্য হল, *Percentile*-এর বেলায় মোট পরিসংখ্যান বা *N*-এর শতকরা হিসেব করে নম্বরটি নির্ণয় করতে হয়। (পূর্ব দৃষ্টান্তে $P_{70}$ নির্ণয় করার সময় 70% *of* 200 (N) = 140 নির্ণয় করা হয়েছে)। তারপর পরিসংখ্যা বিভাজনের মধ্যে সেই নম্বরটি খুঁজে বার করে যে বিন্দুতে পৌঁছই, সেই বিন্দুটি হল *Percentile*। কিন্তু *Percentile Rank* নির্ণয় করার পদ্ধতি ঠিক এর বিপরীত। এখানে ব্যক্তিবিশেষের স্কোরটি দেওয়া থাকে। সেই স্কোরের নীচের স্কোরগুলির শতকরা হিসেব গণনা করতে হয়। যদি এই শতকরা হয় 65, তাহলে স্কোরটির *Percentile Rank* বা PR হবে শতে 65.

**Percentile Rank নির্ণয় করার নিয়ম—**

যখন পরীক্ষার্থীর স্কোর মানের ক্রমানুসারে সাজান থাকে তখন সূত্র হল—

$$PR = 100 - \left(\frac{100R - 50}{N}\right)$$

এখানে *P* হল *Percentile.*

*R* হল *Rank.*

*N* = মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

| পরীক্ষার্থী | স্কোর | স্থান (R) |
|---|---|---|
| জগন্ময় | 90 | 1 |
| হিরণ্ময় | 85 | 2 |
| চিন্ময় | 70 | 3 |
| রণধীর | 65 | 4 |
| বীরেন | 62 | 5 |
| অলক | 55 | 6 |
| জীবন | 50 | 7 |
| অশোক | 48 | 8 |
| নগেন | 40 | 9 |
| পুলকেশ | 31 | 10 |

এখন হিরণ্ময়ের *PR* হবে—

$$100 - \frac{100 \times 2 - 50}{10}$$

$$= 100 - \frac{150}{10} = 85$$

বীরেনের *PR* হবে—

$$100 - \frac{100 \times 5 - 50}{10}$$

$$= 100 - 45$$

$$= 55.$$

পুলকেশের *PR* হবে—

$$100 - \frac{100 \times 10 - 50}{10}$$

$$= 100 - 95 = 5$$

যদি পরীক্ষার্থীর স্কোর মানের ক্রমানুসারে সাজান না থাকে তাহলে *PR* কিভাবে নিরূপণ করতে হবে? ৪১ পৃষ্ঠায় যে ছকটি দেওয়া হয়েছে ( No. 17 Table) তার থেকে 60 এবং 75 স্কোরের *PR* নিরূপণ করতে দেওয়া হল।

সূত্রটি হল—

$$PR=\frac{100}{N}\left[F+\left(\frac{X-L}{i}\right)\times f\right]$$

X = সেই স্কোরটি যার *Rank* নির্ণয় করতে হবে।

$L$ = সেই শ্রেণীবিভাগের নিম্নসীমা যাতে স্কোরটি পড়েছে।

$F$ = যে শ্রেণীবিভাগে স্কোরটি রয়েছে সেই শ্রেণীবিভাগের নীচের সঞ্চয়ী পরিসংখ্যান (cumulative frequency)।

$f$ = যে শ্রেণীবিভাগে স্কোরটি পড়েছে তার frequency.

N = মোট পরিসংখ্যানের যোগফল।

$i$ = শ্রেণীবিভাগের ব্যাপ্তি।

উপরোক্ত সূত্র অনুসরণ করে 60 এবং 75 স্কোরের *PR* নির্ণয় করা যাক।

$$PR\ of\ 60=\frac{100}{200}\left\{130+\left(\frac{60-59{\cdot}5}{10}\right)\times 51\right\}$$

$$=\frac{100}{200}\left\{130+\frac{{\cdot}5}{10}\times 51\right\}$$

$$=\frac{100}{200}\times 132{\cdot}55 \quad =66{\cdot}275$$

$$PR\ of\ 75=\frac{100}{200}\left\{181+\left(\frac{75-69{\cdot}5}{10}\right)\times 18\right\}$$

$$=\frac{100}{200}\left\{181+\frac{5{\cdot}5}{10}\times 18\right\}$$

$$=\frac{100}{200}\left\{181+9{\cdot}9\right\}$$

$$=\frac{100}{200}\times 190{\cdot}9=95{\cdot}45$$

## ১০। ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পরিসংখ্যা রেখা (Cumulative Percentage Curve or Ogive):

ক্রম-যৌগিক পরিসংখ্যা রেখা (Ogive বা Cumulative Frequency Curve) হল ক্রম-যৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজনের লেখচিত্র।

নীচের উদাহরণটির সাহায্যে ক্রম-যৌগিক পরিসংখ্যা রেখা অঙ্কন করার প্রণালী বোঝান হল।

No. 18 Table

| Class-interval | f | Cum f | Cum. percentile f |
|---|---|---|---|
| 80—89 | 1 | 200 | 100 |
| 70—79 | 18 | 199 | 99·5 |
| 60—69 | 51 | 181 | 90·5 |
| 50—59 | 66 | 130 | 65 |
| 40—49 | 40 | 64 | 32 |
| 30—39 | 16 | 24 | 12 |
| 20—29 | 8 | 8 | 4 |

6 নং লেখ চিত্র—ক্রম-যৌগিক পরিসংখ্যা রেখা বা Ogive
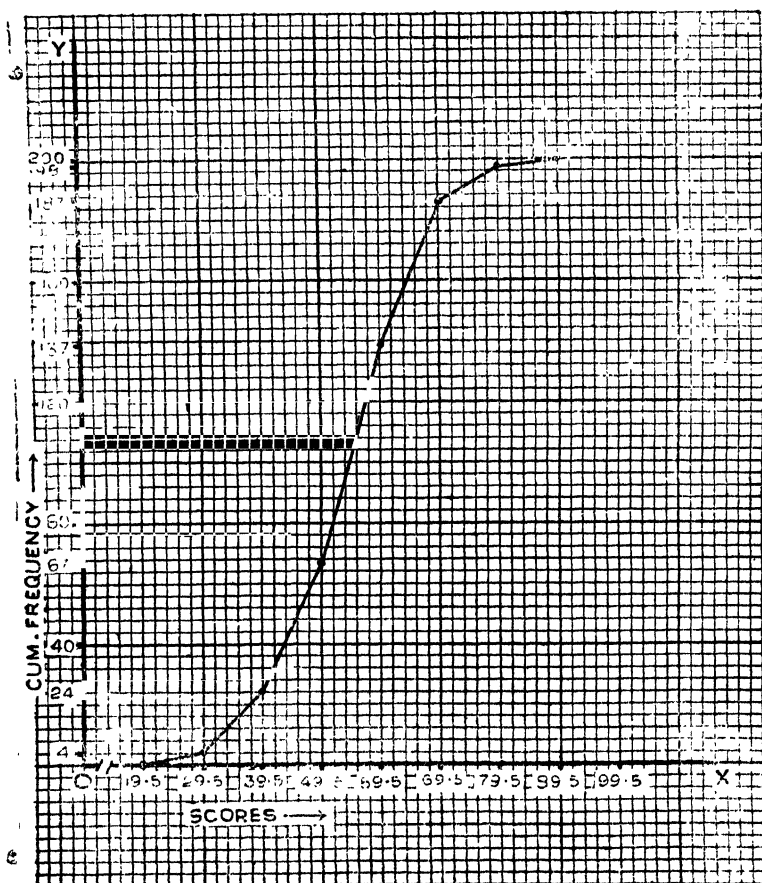
একটি গ্রাফ পেপারে OX অনুভূমিক রেখা এবং OY উল্লম্ব রেখা অঙ্কিত করা হল। OX বরাবর বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্যকে 2 একক হিসেবে গ্রহণ করে নম্বরগুলির উচ্চসীমাগুলি লেখা হল। গ্রাফটিকে সুদৃশ্য করার জন্য শেষ শ্রেণীবিভাগ হতে আর এক শ্রেণীবিভাগ পিছিয়ে সেই শ্রেণীবিভাগের উচ্চসীমা 19·5 লেখা হল। OY রেখা বরাবর Cumulative percentage frequency-গুলি বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুকে 2 একক ধরে নির্দিষ্ট স্থানে লেখা হল। OY উল্লম্ব রেখার দুটি বর্গক্ষেত্র শ্রেণীবিভাগের শতকরা 4· বিন্দু ও 19·5 OX রেখার প্রথম বিন্দু। এইরূপ (29·5,4), (39·5, 12) (49·5, 32), (59·5,65), (69·5,90·5), (79·5, 99·5), (89·5, 100) স্থানাঙ্কবিশিষ্ট বিন্দুগুলি স্থাপন করলাম। গ্রাফটি সুদৃশ্য করার জন্য আমরা (19·5,0) স্থানাঙ্ক বিন্দু স্থাপন করলাম। 19·5 হল শেষ শ্রেণীবিভাগের অর্থাৎ নিম্নতম শ্রেণীবিভাগের উচ্চসীমা। তারপর প্রথম বিন্দু হতে আরম্ভ করে পর পর বিন্দুগুলি যোগ করলে ক্রম-যৌগিক পরিসংখ্যা রেখাটি (Ogive) পাওয়া যাবে।

## ১১। পারম্পর্য বা সহগতি (Correlation) :

দুটি বস্তু বা গুণের সম্বন্ধকে পারম্পর্য বা সহগতি বলে। অনেক সময় দেখা যায়, দুটি বস্তু বা ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় যে একটির মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটলে অপরটির মধ্যেও অনুরূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন, সরবরাহ বাড়লে দ্রব্য মূল্যের হ্রাস ঘটে, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটলে খাদ্যের উৎপাদন বেড়ে যায়। আবার শিশুদের উচ্চতা বাড়লে তাদের ওজন বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তির গুণের মধ্যেও এইরূপ সম্বন্ধ লক্ষ্য করি। যেমন কোন ব্যক্তির সঙ্গীতে দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা দেখা যায়। কোনও ছাত্রের ইতিহাসে দক্ষতা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় অনুরূপ দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় সম্বন্ধ নিরূপণ করার প্রয়োজন আছে। যখন এই সম্বন্ধ পরিমাণগত তখন আমরা পরিসংখ্যানের সহপরিবর্তনের সাহায্যে তা নিরূপণ করার জন্য সচেষ্ট হই, তাহলে দেখা যাচ্ছে, যখন দুটি বা তার অধিক চলের (variables) পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করার প্রায়াজন হয় তখন আমরা পরিসংখ্যানের সহপরিবর্তনের সহায়তা গ্রহণ করি।

পারম্পর্য বা সহগতি দুপ্রকারের হতে পারে—ধনাত্মক (positive) এবং ঋণাত্মক (negative)। চলের গতির উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যদি একটি চলের হ্রাস বা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরটির মধ্যেও অনুরূপ হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে, তাহলে দুটির সম্বন্ধের পারম্পর্য ধনাত্মক (positive) হবে। যদি কোন একটি চলের হ্রাস ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অন্য আর একটি চলের বৃদ্ধি ঘটে বা একটির বৃদ্ধিতে অপরটির মধ্যে হ্রাস লক্ষ্য করা যায় তাহলে দুটির সম্বন্ধের পারম্পর্য ঋণাত্মক (negative) হবে।

**পারম্পর্য বা সহগতির মাত্রা** (Degree of Correlation) :
পারম্পর্য বা সহগতির মাত্রা অনুযায়ী একে দুশ্রেণীতে ভাগ করা চলে—(১) পূর্ণ ধনাত্মক সহগতি (Perfect positive correlation) এবং (২) পূর্ণ ঋণাত্মক সহগতি (Perfect negative correlation)।

যখন কোন একটি চলের পূর্ণ হ্রাস বা বৃদ্ধি অপর চলের মধ্যেও অনুরূপ পূর্ণ হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটায় তখন আমরা পূর্ণ ধনাত্মক সহগতির উদাহরণ পাই। যেমন কোন একটি পরীক্ষার্থী যদি ইংরেজীতে প্রথম হয় এবং অঙ্কতেও প্রথম হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হল পূর্ণ ধনাত্মক সহগতির সম্বন্ধ।

আবার যখন দুটি চলের মধ্যে পূর্ণ সহগতি দেখা যায় এবং একটির বৃদ্ধিতে অপরটির হ্রাস এবং একটির হ্রাসে অপরটির বৃদ্ধি দেখা যায় তখন পাই পূর্ণ ঋণাত্মক সহগতির উদাহরণ। যেমন, রাম ইতিহাস পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে কিন্তু অঙ্ক পরীক্ষার তালিকায় সর্বনিম্ন মানের অধিকারী।

**সহপরিবর্তনের মান বা r নির্ণয় :**

সহপরিবর্তনের মানকে (Co-efficient of Correlation) সাধারণতঃ '$r$' অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। '$r$' নির্ণয় করার নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত পদ্ধতির নাম হল প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি (Product Moment Method)।

## ১২। প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি (Product Moment Method) :

এই পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে পরীক্ষার্থীর প্রতিটি স্কোরের মিন পার্থক্য (Mean Deviation) নির্ণয় করতে হয়। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর দুটি করে স্কোর থাকে, ফলে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর দুটি করে মিন পার্থক্য $x$ এবং $y$ পাওয়া

যায়। এরপর মিন-পার্থক্য দুটিকে গুণ করে নিতে হয়, তাহলে $xy$ পাওয়া যায়। তারপর $xy$গুলির মোট যোগফল $\Sigma xy$ নির্ণয় করতে হয়।

তারপর স্কোর শ্রেণী দুটির সিগ্‌মা বার করতে হয়। যথা, $\sigma x$ এবং $\sigma y$। তারপর দুটির গুণফল ( $\sigma x \sigma y$ ) বার করে মোট সংখ্যা $N$ দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে পাওয়া যায় $N \sigma x \sigma y$। তারপর $\Sigma xy$কে $N\sigma x \sigma y$ দিয়ে ভাগ করলে স্কোর শ্রেণী দুটির $r$ পাওয়া যায়। সুতরাং প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করার সূত্র হল—

$$r = \frac{\Sigma xy}{N\sigma x \sigma y}$$

**উদাহরণ :**

5 জন পরীক্ষার্থীর ইতিহাস ও ভূগোলের স্কোর নেওয়া হল। স্কোরগুলির সহগতির মান ( Co-efficient of Correlation ) বা $r$ কিভাবে নিরূপণ করতে হয় তা দেখান হচ্ছে।

No. 19 Table

| (1) পরীক্ষার্থী | (2) ইতিহাসের স্কোর | (3) ভূগোলের স্কোর | (4) x | (5) y | (6) xy |
|---|---|---|---|---|---|
| রাম | 25 | 32 | 6 | 5 | 30 |
| যদু | 18 | 24 | −1 | 7 | −7 |
| মধু | 14 | 7 | −5 | −20 | 100 |
| শ্যাম | 22 | 30 | 3 | 3 | 9 |
| বিপিন | 16 | 42 | −3 | 15 | −65 |
| | | | | | $\Sigma$xy=67 |

ইতিহাসের স্কোর : 25, 18, 14, 22. 16. [ মিন=19 ]

মিন থেকে পার্থক্য (d)=6, −1, −5, +3, −3

$d^2 = 36, 1, 25, 9, 9$

$\Sigma d^2 = 36+1+25+9+9=80$

$$\therefore \sigma x = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$$

$$= \sqrt{\frac{80}{5}}$$

$$= \sqrt{16} = 4$$

ভূগোলের স্কোর : 32, 24, 7, 30, 42 [ মিন 27 ]
মিন থেকে পার্থক্য $(d) = 5, -3, -20, 3, 15$
$d^2 = 25, 9, 400, 9, 225$
$\Sigma d^2 = 25+9+400+9+225 = 668$

$$\therefore \ \sigma y = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}} = \sqrt{\frac{668}{5}} = 11.6$$

$$\sigma y = \frac{\Sigma xy}{N\sigma x\sigma y} = \frac{67}{5\times 4\times 11.6} = \frac{67}{232} = .28 \text{ ( approx )}$$

**১৫। সারিগত পার্থক্যের পদ্ধতি (Rank Difference Method) :**

প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতি (Product Moment Method) ছাড়াও সহগতির মান নির্ণয় করার আর একটি পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় সারিগত পার্থক্যের পদ্ধতি (Rank Difference Method)। এই পদ্ধতিতে দুটি স্কোরের সারি কোরে স্কোর দুটির মধ্যকার পার্থক্য থেকে সহগতির মান নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিটি খুব চলতি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সম্বন্ধ বার করার আর একটি নাম রো ($\rho$)।

এই পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে পরীক্ষার্থীদের স্কোর অনুযায়ী সারিবিন্যাস করা হয়। আর সর্বোচ্চ স্কোরের অধিকারী ব্যক্তির Rank হবে 1. তার নীচের স্কোরটির Rank হবে 2 ; যদি দুজন পরীক্ষার্থী একই স্কোর পায় তবে তাদের প্রত্যেককে পরের দুই সারির মধ্যবর্তী স্থানে বসান হয়। তারপর প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সারি দুটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়। যেমন, কারও যদি প্রথম স্কোরের Rank হয় 4, দ্বিতীয় স্কোরের Rank হয় 2, তবে তার Rank Difference হবে 2. এই Rank Difference-কে $D$ বলা হয়। D এর যোগফল সব সময়ই শূন্য হবে। তারপর $D$ এর বর্গ করে নিতে হবে। এরপর $D^2$র যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

$\rho$ বার করার সূত্র হল :

$$\rho = 1 - \frac{6\Sigma D^2}{N(N^2-1)}$$

**উদাহরণ :** 12 জন বালকের ইতিহাস পরীক্ষার score ও ভূগোল পরীক্ষার score-এর সম্বন্ধ নির্ণয় করা হচ্ছে :

No. 20 Table

| (1) বালক | (2) Score ইতিহাসের পরীক্ষা | (3) Score ভূগোলের পরীক্ষা | (4) ইতিহাস পরীক্ষার Score-এর সারি | (5) ভূগোল পরীক্ষার Score-এর সারি | (6) পার্থক্য (D) | (7) পার্থক্যের বর্গ $(D)^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | 7 | 8 | 12 | 11 | 1 | 1 |
| খ | 9 | 6 | 11 | 12 | —1 | 1 |
| গ | 11 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| ঘ | 13 | 13 | 7 | 10 | —3 | 9 |
| ঙ | 15 | 23 | 6 | 1 | 5 | 25 |
| চ | 19 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ছ | 22 | 20 | 1 | 3 | —2 | 4 |
| জ | 18 | 14·5 | 3 | 8 | —5 | 25 |
| ঝ | 10 | 15 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| ঞ | 12 | 16 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| ট | 17 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ঠ | 16 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| N=12 | | | | | $\Sigma D=0$ | $\Sigma D^2=78$ |

$$\rho=1-\frac{6\times\Sigma D^2}{N(N^2-1)}=1-\frac{6\times78}{12(144-1)}$$

$$=1-\frac{468}{12\times143}=\frac{103}{143}=\cdot73 \text{ approx.}$$

1নং স্তম্ভে বালকের সংখ্যা দেখান হয়েছে। 2 নং স্তম্ভে ইতিহাস পরীক্ষার স্কোর। 3নং স্তম্ভে ভূগোল পরীক্ষার স্কোর। 'ছ' পেয়েছে সবচেয়ে বেশী স্কোর, 22 ইতিহাস পরীক্ষায়। সেকারণে ইতিহাস পরীক্ষার স্কোরের সারিতে তার Rank হল 1. 'চ' পেয়েছে 19 তাই, তার Rank হল 2. এই ভাবে সকলের সারি করা হল। তারপর ভূগোল পরীক্ষার স্কোর অনুযায়ী সারি করা হল। এখানে 'ঙ' পেয়েছে 23, কাজেই তার Rank হল 1, 'চ' পেয়েছে তার থেকে কম অর্থাৎ 21, কাজেই তার Rank হল 2 ; এইভাবে সকলের সারি করা হল। এবার দুই সারির পার্থক্য বা $D$ বার করা হল। যেমন, ক-এর $D$ হল $(12-11)=1$. খ-এর $D$ হল $(11-12)=-1$ ইত্যাদি। $D$গুলির মোট যোগফল 0 হয়েছে (6নং স্তম্ভে)। 7 নং স্তম্ভে $D$গুলির বর্গ করে সব বর্গগুলি যোগ করা হল। যোগফল বা $\Sigma D^2$ হল 78. এবার সূত্রটি প্রয়োগ করে স্কোরগুলির সহগতির রো বা $\rho$ পাওয়া গেল ·73.

**Raw Score and Point Score :**

পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর উপর বুদ্ধি-অভীক্ষা ও অন্যান্য মানসিক অভীক্ষা গুলিকে প্রয়োগ কোরে, পরীক্ষার ফলাফলকে সাংখ্যমানে প্রকাশ করেন। সাধারণতঃ একে Raw Score বা কাঁচা নম্বর বলা হয়। এই সব কাঁচা নম্বর অর্থহীন, কারণ এই নম্বরের সহায়তায় কোন পরীক্ষার্থী মোটের উপর ভাল কি মন্দ বোঝা যায় না। তাছাড়া, মানসিক অভীক্ষাগুলির সঙ্গে 'পাশ-ফেলের' কোন প্রশ্ন জড়িত নেই।

Point score ( পয়েণ্ট স্কোর ) হল 'Raw score'-এর পরিচিত সংস্করণ। এই পয়েণ্ট স্কোর নির্ণয় করার নিয়ম হল—ছাত্র যে যে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে, সেই সেই প্রশ্নের জন্য প্রাপ্ত score-এর যোগফল নির্ণয় করা। কোন কোন ক্ষেত্রে ভুলের জন্য বা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর না করার জন্য নম্বর কেটে নেওয়া হয়। কি পরিমাণ নম্বর কেটে নেওয়া হবে সে সম্পর্কে একটি সূত্র আছে। সূত্রটি হল : $S=R-\frac{W}{n-1}$ ; n হচ্ছে পরীক্ষার্থীর উত্তরের সংখ্যা।

যখন কাঁচা স্কোরগুলিকে সাধারণ স্কোরে রূপান্তরিত করা হয় এবং যার দ্বারা অন্য পরীক্ষার্থীর সঙ্গে নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীর তুলনা সম্ভব হয় তখন তাকে 'Derived Score' বলা হয়। এই score তিন প্রকারের হতে পারে : (১) কোন শিশুর স্কোরের সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের গড় শিশুর যোগ্যতার তুলনা। (২) কোন শিশুর স্কোরের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রেডের গড় শিশুর সমস্যার তুলনা। (৩) একই বয়সের বা গ্রেডের ছাত্রদের যোগ্যতার পারস্পরিক তুলনা। এই স্কোরগুলিকে বলা হয় Age Score, Grade Score এবং Scale Score. বুদ্ধিগত অভীক্ষার কোন স্কোরকে যেমন মানসিক বয়সে ( MA ) রূপান্তরিত করা যায়, তেমনি কোন শিক্ষা সংক্রান্ত অভীক্ষায় প্রাপ্ত Raw Score-কে শিক্ষাগত বয়সে (EA) রূপান্তরিত করা যায়। ১০ বছরের EA পাবার অর্থ হল দশ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীর গড় যোগ্যতা নিরূপণ করা।

Grade score কাকে বলে? চতুর্থ grade-এর প্রারম্ভে শিক্ষার্থীর গড় কাঁচা নম্বরের সমান কোন শিশুর নম্বর হলে, শিশুটি 4·0 Grade score লাভ করবে। 'Scale Score'-এর বেলায় প্রদত্ত ছাত্রদের বয়স ও গ্রেডের বণ্টন থেকে scale-টি পাওয়া যায়।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে কাঁচা নম্বরের সহায়তায় শিক্ষার্থীর যোগ্যতার ঠিক পরিমাপ হয় না। অন্যান্য শিক্ষার্থীর কাঁচা নম্বরের সঙ্গে তুলনা করলে শিক্ষার্থীর যোগ্যতার কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। এ কারণেই Norm-এর প্রশ্ন এসে যায়। কোন একটি বিশেষ দল বা টাইপের প্রতিনিধি স্থানীয় সংখ্যামান হল Norm (Norm is a representative or Standard value of pattern for a group or type)। পরিসংখ্যানের দিক থেকে এটি Mean, Median বা Mode যে কোন একটিই হতে পারে—যাকে কোন একটা অভীক্ষার প্রতিনিধিস্থানীয় মানরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'Above the norm,' 'below the norm,' খুবই পরিচিত শব্দ। অর্থাৎ কোন শিক্ষার্থীর স্কোর যদি বিশেষ শিক্ষার্থী-দলের প্রাপ্ত নম্বরের গড় থেকে কম হয় তাহলে 'below the norm' এবং যদি বেশি হয় তাহলে 'above the norm' কথাটি ব্যবহার করা হয়। ধরা যাক, 10 বছরের শিক্ষার্থীর একটা প্রয়োগসিদ্ধ অভীক্ষা আমরা প্রস্তুত করতে চাই। ঐ বয়সের প্রতিনিধিস্থানীয় একদল ছেলেমেয়ের উপর ঐ অভীক্ষা প্রয়োগ করে দেখতে হবে তাদের প্রাপ্ত নম্বরের গড় কত। দেখা গেল 10 বছরের ছেলেরা 20টির মধ্যে 10টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। তাহলে এই Raw score-টি ঐ অভীক্ষার দশ বছরের Norm-এ পরিণত হবে।

Norm শিক্ষার্থীর উৎকর্ষের কোন পরিমাপ নয়। Norm হল তুলনা-মূলক দক্ষতা বিচারের পরিমাপক। Norm-এর সাহায্যে গড় যোগ্যতার সঙ্গে কোন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতার তুলনা করা যেতে পারে। এই গড় যোগ্যতা খুব উঁচু বা নীচু বা মাঝামাঝি, norm থেকে তা কিছু বোঝা যায় না।

### Standard Score (প্রমাণ স্কোর):

কোন একজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে যে নম্বর পেয়েছে তার তুলনা-মূলক বিচার কাঁচা নম্বর থেকে সম্ভব নয়। সকল বিষয়ে গড় নম্বরের সঙ্গে ঐ নম্বরের পার্থক্য নির্ধারণ করে তা বোঝা যেতে পারে। এখন কোন শিক্ষার্থী যদি দুটি বিষয়ে গড় নম্বর থেকে বেশি নম্বর পায়, তাহলে ঐ দুটি বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টিতে তার বুৎপত্তি অধিক তা কিভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব? আবার দুটি প্রতিযোগী ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেল যে প্রথম ছাত্রটি দুই

বিষয়ে এবং অন্য ছাত্রটি অপর তিন বিষয়ে দক্ষতা দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ভুল তুলনামূলক বিচার কিভাবে সম্ভব? এসব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র Mean বা গড়ের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের ফলের মধ্যে কতখানি সামঞ্জস্য আছে তা নির্ধারণ করা যায় না। তখন প্রয়োজন হয় 'Standard Score' বা প্রমাণ স্কোরের।

প্রমাণ স্কোর বা 'Standard Score' কোন একটি বিশেষ ছাত্রের যোগ্যতাকে তার দলের অন্যান্য ছাত্রের যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করে।

প্রমাণ স্কোর নির্ণয় করার নিয়ম হল প্রথম দলের শিক্ষার্থীদের স্কোরগুলির সমক পার্থক্য ( Standard Deviation ) নিরূপণ করা। তারপর দলের গড় নম্বরের সঙ্গে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর স্কোরের ব্যবধান নিরূপণ করতে হবে ( চিহ্ন নিরপেক্ষভাবে নয় )। তারপর এই পার্থক্যকে সমক পার্থক্য দিয়ে ভাগ করলে প্রমাণ স্কোর পাওয়া যাবে।

সূত্র হল : Standard Score $= \frac{M-S}{SD}$

অর্থাৎ প্রমাণ স্কোর $= \frac{\text{কাঁচা নম্বর} - \text{গড় নম্বর}}{\text{সমক পার্থক্য}}$

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে Standard স্কোর নিরূপণ করা কিছুটা জটিল ব্যাপার। সেই কারণে কাঁচা নম্বরকে Standard Score-এ পরিণত করার একটা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। একে বলা হয় T-স্কোর বা T-Scale। *W.* A. *Macall* এই পদ্ধতির আবিষ্কারক। T-Scale-এ গড়কে 50 ধরা হয় এবং সমক পার্থক্য 10 ধরা হয়। গড় সকল সময়ই 50, যদি কোন score গড় স্কোরের উপরে থাকে তাহলে স্কোরটি হবে, 50+10=60। আবার গড় থেকে নীচে থাকলে হবে 50−10=40. T-scale-এর সীমা 0 থেকে 100 পর্যন্ত। এর একক হল 1 এবং Mean 50. T-স্কোরের মাপকের বিভিন্ন অংশ সমান।

**Rating Scale :**

আমেরিকার 'Council of Education' এই স্কেলের উদ্ভাবন করেছেন। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের পরিমাণগত পরিমাপ এর দ্বারা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-সংলক্ষণের (traits of personality) বিচার করতে গিয়ে আমরা দেখি তার মাত্রার প্রশ্ন এসে যায়। যেমন, কোন ব্যক্তি অত্যধিক সামাজিক, মাঝামাঝি সামাজিক বা কম সামাজিক হতে পারে। কোন বিশেষ

শিক্ষার্থীর এক একটি বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত পরিমাপ নির্ধারণ করতে পারলে অপর শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাকে তুলনা করা যেতে পারে।

রেটিং স্কেল পদ্ধতিতে কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য স্কেলের ঠিক কোন্ পর্যায়ে তার গুণটি অবস্থিত সেটি পরিমাপ করা হয়। যেমন, 'অধ্যবসায়ী' এই বৈশিষ্ট্যটির রেটিং স্কেল এভাবে তৈরী করা যেতে পারে।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তটি একটি তিন মাত্রার স্কেলের দৃষ্টান্ত। তবে এই স্কেল তিন মাত্রার, পাঁচ মাত্রার, সাত মাত্রার বা কখনও দশ মাত্রারও হতে পারে।

কাঁচা নম্বরের সাহায্যে শিক্ষার্থীর উৎকর্ষের মাত্রা সম্পর্কে কোন ধারণা করা যায় না এবং অপরের সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনাও সম্ভব হয় না, কিন্তু রেটিং স্কেলের সাহায্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে অপরের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

এই স্কেলের অসুবিধা হল পরীক্ষার্থী তার পরিচিত ব্যক্তির কোন গুণ পরিমাপ করতে গিয়ে স্কেলের একটা বিশেষ উপযোগী স্থানে তাকে বসিয়ে দিতে পারেন।

## অনুশীলনী

1. What is the meaning of frequency distribution and how is it arranged from raw data ? Explain with illustration.

2. Tabulate the following 69 Scores into a frequency distribution using an interval of Seven. Begin the first interval with 0

22, 25, 15, 31, 13, 18, 40, 29, 20, 24, 26, 10, 25, 17,
41, 15, 24, 11, 48, 11, 18, 29, 27, 40, 26, 22, 36, 31,
22, 30, 22, 32, 24, 16, 26, 18, 36, 30. 21, 5, 7, 33,
26. 25, 31, 15, 25, 59, 4, 31, 26, 16, 17, 34, 10, 14,
18, 13, 21, 24, 23. 36, 31, 42, 17, 8, 31, 14, 30.

3. Write short notes on : (a) Mean, (b) Median, (c) Mode, (d) Mean deviation, (e) Frequency Polygon, (f) Assumed Mean.

4. Compute the Mean, the Median and the Mode for the following frequency distribution.

| *Scores* | *f* |
|---|---|
| 43·5—44·5 | 2 |
| 44·75—45·75 | 1 |
| 46·0—47·0 | 3 |
| 47·25—48·25 | 6 |
| 48·50—49·50 | 17 |
| 49·75—50·75 | 27 |
| 51·0—52·0 | 52 |
| 52·25—53·25 | 24 |
| 53·50—54·50 | 25 |
| 54·75—55·75 | 8 |
| 56·0—57·0 | 4 |
| 57·25—58·25 | 1 |
| | 170 |

[Ans. Mean = 51·58
Median = 51·572
Mode = 51·463

5. Find out the median from the scores.
16, 18, 12, 9, 30, 20, 25, 6, 10, 40. [Ans. 17]

6. Calculate mode from the following grouped scores.

| *Mid-point* (=*X*) | *Frequency* (=*f*) | *d* | *fd* |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | | |
| 14 | 2 | | |
| 13 | 3 | | |
| 12 | 6 | | |
| 11 | 12 | | |
| 10 | 15 | | |
| 9 | 20 | | |
| 8 | 33 | | |
| 7 | 16 | | |
| 6 | 2 | | |
| 5 | 1 | | |
| 4 | 2 | | |
| | N=110 | | |

[ Ans. 8·1 ]

7. Calculate the Mean by the short Method from the following frequency distribution.

| *Class-interval* | 120–139 | 100–119 | 80–99 | 60–79 | 40–59 |
|---|---|---|---|---|---|
| *frequency* | 50 | 150 | 500 | 250 | 50 |

[ Ans. 87·5 ]

8. Draw a frequency polygon and a histogram from the following frequency distribution.

| *Class-interval* | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 80 – 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *frequency* | 8 | 16 | 40 | 66 | 57 | 18 | |

9. What do you mean by dispersion? What is meant by Range? Explain with suitable examples.

10. What are the measures of variability or dispersion? How would you determine Quartile Deviation?

11. Find the quartile deviation from the following distribution.

| *Class-interval* | *f* | *Cum. f* |
|---|---|---|
| 120—139 | 50 | 1000 |
| 100—119 | 150 | 950 |
| 80—99 | 500 | 800 |
| 60—79 | 250 | 300 |
| 40—59 | 50 | 50 |

[ Ans. 1·1 ]

12. Find the (a) Quartile, (b) Mean deviation and (c) Standard deviation from the following distribution.

| *Class-interval* ( $=X$ ) | *f* (=*frequency*) |
|---|---|
| 195—199 | 1 |
| 190—194 | 2 |
| 185—189 | 4 |
| 180—184 | 5 |
| 175—179 | 8 |
| 170—174 | 10 |
| 165—169 | 6 |
| 160—164 | 4 |
| 155—159 | 4 |
| 150—154 | 2 |
| 145—149 | 3 |
| 140—144 | 1 |
| | N=50 |

[ Ans. Q=8·28
MD=10·04
SD=12·63 ]

13. Find the standard deviation from the following distribution.

| *Class-interval* $(=x)$ | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Frequency* $(=f)$ | | | 0 | | | |
| | | 55—59 | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 |

[ Ans. $\sigma = 11{\cdot}03$ ]

14. Calculate the standard deviation by short method from the following distribution.

| *Class-interval* $(=x)$ | *Frequency* $(=f)$ |
|---|---|
| 50—54 | 3 |
| 45—49 | 4 |
| 40—44 | 5 |
| 35—39 | 8 |
| 30—34 | 10 |
| 25—29 | 6 |
| 20—24 | 4 |
| 15—19 | 4 |
| 10—14 | 3 |
| 5—9 | 3 |

[ Ans. SD $= 12{\cdot}05$ ]

15. Find the percentile ranks of the scores 80 and 95 from the following table.

| *Class-interval* | *Frequency* | *Cumulative Frequency* |
|---|---|---|
| 120—139 | 50 | 1000 |
| 100—119 | 150 | 950 |
| 80—99 | 500 | 800 |
| 60—79 | 250 | 300 |
| 40—59 | 50 | 50 |

16. Define correlation, coefficient of correlation and partial correlation and indicate their uses in educational measurement.

17. Compute the coeffcient of correlation by the rank difference method between the two set of scores given in the following table and comment on the result.

| *Student* | *Marks in History* | *Marks in Mathematics* |
|---|---|---|
| A | 52 | 48 |
| B | 38 | 40 |
| C | 35 | 50 |
| D | 42 | 36 |
| E | 50 | 42 |
| F | 54 | 38 |
| G | 60 | 58 |
| H | 46 | 44 |
| I | 25 | 42 |
| J | 32 | 48 |

18. Find the correlation between the two set of scores given below using the Product Method and Rank Difference Method.

| *Subject* | *Scores* $(x)$ | *Scores* $(x)$ |
|---|---|---|
| A | 40 | 120 |
| B | 36 | 140 |
| C | 43 | 141 |
| D | 48 | 143 |
| E | 45 | 138 |
| F | 58 | 149 |
| G | 23 | 142 |
| H | 45 | 166 |

19. How do you distinguish between raw score and point score ? What is meant by a norm ? How is it calculated from raw scores ? How many kinds of norms are there ?

20. What is standard score ? How is it determined ? What is T-score ? What is its utility ?

21. What is a rating-scale ? Describe briefly the steps you would take in preparing a rating scale. What is its limitation ?

Q. 22. The following marks were obtained by 28 pupils in an arithmetic test :

18, 28, 26, 44, 52, 60, 52, 44. 40, 98, 88, 86, 84, 96, 86, 80, 74, 76, 72, 62, 66, 52, 44, 30, 84, 80, 82, 74, Draw a histogram of frequency distribution and calculate arithmetic mean and standard deviation of the Scores. [ C. U. 1963

**Ans,**

এখানে কল্পিত (A)=66 ধরা হল।

| Scores X | Frequency $f$ | fx | $d' = X - A$ | $fd'$ | $fd'^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 18 | −48 | −48 | 2304 |
| 26 | 1 | 26 | −40 | −40 | 1600 |
| 28 | 1 | 28 | −38 | −38 | 1444 |
| 30 | 1 | 30 | −36 | −36 | 1296 |
| 40 | 1 | 40 | −26 | −26 | 676 |
| 44 | 3 | 132 | −22 | −66 | 1452 |
| 52 | 3 | 156 | −14 | −42 | 588 |
| 60 | 1 | 60 | −6 | −6 | 36 |
| 62 | 1 | 62 | −4 | −4 | 16 |
| 66 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1 | 72 | 6 | 6 | 36 |
| 74 | 2 | 148 | 8 | 16 | 128 |
| 76 | 1 | 76 | 10 | 10 | 100 |
| 80 | 2 | 160 | 14 | 28 | 392 |
| 82 | 1 | 82 | 16 | 16 | 256 |
| 84 | 2 | 168 | 18 | 36 | 648 |
| 86 | 2 | 172 | 20 | 40 | 800 |
| 88 | 1 | 88 | 22 | 22 | 484 |
| 96 | 1 | 96 | 30 | 30 | 900 |
| 98 | 1 | 98 | 32 | 32 | 1024 |
| | N=28 | $\Sigma fx$ =1778 | | $\Sigma fd'$ = −70 | $\Sigma fd'^2$ =14180 |

গাণিতিক গড় (Arithmetic mean) $= \frac{\Sigma fx}{N} = \frac{1778}{28} = 63{\cdot}5$

সমক পার্থক্য (Standard deviation) =

$$\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N} - \left(\frac{\Sigma fd'}{N}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{14180}{28} - \left(\frac{-70}{28}\right)^2}$$

$$= \sqrt{506{\cdot}4 - 6{\cdot}25}$$

$$= \sqrt{500{\cdot}15}$$

$= 22{\cdot}37$ (approx)

Q. 23. The following marks were obtained by forty five students in an examination :

24, 25, 24, 25, 31, 22, 30, 24, 25, 27, 28, 29, 19, 28, 27, 25, 30, 31, 26, 30, 32, 30, 25, 32, 26, 24, 26, 29, 24. 17, 29, 29, 27, 30, 26, 25, 30, 28, 30, 26, 26, 23, 20, 25, 15.

Draw a histogram of frequency distribution and calculate arithmetic mean and standard deviation of the scores.

[ C. U. 1964

Ans.

এখানে কল্পিত গড় (A)=24 ধরা হল .

| Scores x | frequency f | fx | $d'=X-A$ | $fd'$ | $fd'^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 15 | −9 | −9 | 81 |
| 17 | 1 | 17 | −7 | −7 | 49 |
| 19 | 1 | 19 | −5 | −5 | 25 |
| 20 | 1 | 20 | −4 | −4 | 16 |
| 21 | 1 | 21 | −3 | −3 | 9 |
| 22 | 1 | 22 | −2 | −2 | 4 |
| 23 | 1 | 23 | −1 | −1 | 1 |
| 24 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 175 | 1 | 7 | 7 |
| 26 | 5 | 130 | 2 | 10 | 20 |
| 27 | 3 | 81 | 3 | 9 | 27 |
| 28 | 3 | 84 | 4 | 12 | 48 |
| 29 | 4 | 116 | 5 | 20 | 100 |
| 30 | 7 | 210 | 6 | 42 | 252 |
| 31 | 2 | 62 | 7 | 14 | 98 |
| 32 | 3 | 64 | 8 | 16 | 128 |
| | $N=45$ | $\Sigma fx = 1179$ | | $\Sigma fd' = 99$ | $\Sigma fd'^2 = 865$ |

গাণিতিক গড় (Arithmetic mean) $= \frac{\Sigma fx}{N} = \frac{1179}{45} = 26{\cdot}2$

সমক পার্থক্য (Standard deviation) $= \sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N} - \left(\frac{\Sigma fd'}{N}\right)^2}$

$$= \sqrt{\frac{865}{45} - \left(\frac{99}{45}\right)^2}$$

$$= \sqrt{14{\cdot}38} \quad = 3{\cdot}79 \text{ (approx).}$$

**Q. 24.** Find the mean, median and standard deviation from the following distribution of scores.

| Scores | Frequency |
|---|---|
| 21—25 | 3 |
| 16—20 | 7 |
| 11—15 | 16 |
| 6—10 | 12 |
| 1— 5 | 4 |

[ C. U. 1968

Ans. এখানে কল্পিত গড় $(A) = 13$ ধরা হল।

| Scores | Frequency f | mid-pt. X | $d' = X - A$ | $X' = \frac{d'}{5}$ | fx' | fd' | $fd'^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–5 | 4 | 3 | –10 | –2 | – 8 | –40 | 400 |
| 6–10 | 12 | 8 | – 5 | –1 | –12 | –60 | 300 |
| 11–15 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16–20 | 7 | 18 | 5 | 1 | 7 | 35 | 175 |
| 21–25 | 3 | 23 | 10 | 2 | 6 | 30 | 300 |
| | N=42 | | | | $\Sigma fx' = -7$ | $\Sigma fd' = -35$ | $\Sigma fd'^2 = 117$ |

এখানে স্কোরগুলিকে কম থেকে বেশীর দিকে সাজানো হ'য়েছে।

$$c = \text{correction} = \frac{\Sigma fx'}{N} = \frac{-7}{42}$$

$$\text{গড় (Mean)} = AM + ci = 13 + \frac{-7}{42} \times 5$$

$$= 13 - \cdot 17 \times 5 = 12 \cdot 15 \text{ (approx)}$$

$$\text{মধ্যমমানের সূত্র} = l + \left( \frac{\frac{N}{2} - f}{f_m} \right)$$

এখানে $\frac{N}{2} = 21$ এবং প্রথম দুইটি freque ncy'র যোগফল=16, উহা 21 হতে কম। প্রথম তিনটি frequency'র যোগফল=32, উহা 21 হতে বেশী। ∴ মধ্যমমান 11–15 বিভাগে থাকবে। উহার Limit 10·5 – 15·5

তাহলে

$l = 10 \cdot 5, f = 16, \ f_m = 16, \ i = 5$

সূত্রতে বসালে,

মধ্যমমান (Median) $=10\cdot5+\frac{21-16}{16}\times5$

$=10\cdot5+1\cdot56=12\cdot06$ (approx).

সমক পার্থক্য (Standard deviation),

$$\sigma=i\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N}-\left(\frac{\Sigma fd'}{N}\right)^2}$$

$$=5\sqrt{\frac{1175}{42}-\left(\frac{-35}{42}\right)^2}$$

$$=5\sqrt{27\cdot98-\cdot69}$$

$$=5\sqrt{27\cdot29}$$

$=26\cdot12$ (appro )

Q. 25. The following marks were obtained by fifty students in an examination.

31, 13, 20, 31, 30, 45, 38, 42, 30, 30, 30, 46, 36, 2, 41, 44, 18, 25, 44, 30, 19, 5, 44, 15, 9, 13, 7, 25, 12, 30, 6, 22, 24, 31, 15, 6, 39, 32, 21, 20, 42, 31, 19, 14, 23, 28, 17, 53, 2, 21.

Draw a histogram of frequency distribution. Calculate (a) median (b) arithmetic mean and (c) standard deviation of the scroes. [C. U. 1962

Ans. (a) নম্বরগুলিকে মানের ক্রমানুসারে সাজালে দাঁড়ায়—

2, 2, 5, 6, 6, 7, 9, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 17, 18, 19, 19 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 28, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 42, 44, 44, 44, 45, 46, 53.

মানের সংখ্যা 50. সুতরাং $\frac{1}{2}\times50$ তম এবং $\frac{1}{2}(50+2)$ তম সংখ্যাদ্বয়ের গড় মধ্যমমান হবে। এখানে 25 তম ও 26তম সংখ্যা হচ্ছে 25 ও 25. তাহলে—

মধ্যমমান $=\frac{1}{2}(25+25)=25$ (approx).

এখানে কল্পিত গড় (A) $=28$ ধরা হল।

| Scores × | frequency $f$ | $f$× | $d' = × - A$ | $fd'$ | $fd'^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | −26 | −52 | 1352 |
| 5 | 1 | 5 | −23 | −23 | 529 |
| 6 | 2 | 12 | −22 | −44 | 968 |
| 7 | 1 | 7 | −21 | −21 | 441 |
| 9 | 1 | 9 | −19 | −19 | 361 |
| 12 | 1 | 12 | −16 | −16 | .256 |
| 13 | 2 | 26 | −15 | −30 | 450 |
| 14 | 1 | 14 | −14 | −14 | 196 |
| 15 | 2 | 30 | −13 | −26 | 388 |
| 17 | 1 | 17 | −11 | −11 | 121 |
| 18 | 1 | 18 | −10 | −10 | 100 |
| 19 | 2 | 38 | − 9 | −18 | 162 |
| 20 | 2 | 40 | − 8 | −16 | 128 |
| 21 | 2 | 42 | − 7 | −14 | 98 |
| 22 | 1 | 22 | − 6 | − 6 | 36 |
| 23 | 1 | 23 | − 5 | − 5 | 25 |
| 24 | 1 | 24 | − 4 | − 4 | 16 |
| 25 | 2 | 50 | − 3 | − 6 | 18 |
| 28 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 6 | 180 | 2 | 12 | 24 |
| 31 | 4 | 128 | 3 | 12 | 36 |
| 32 | 1 | 32 | 4 | 4 | 16 |
| 36 | 1 | 36 | 8 | 8 | 64 |
| 38 | 1 | 38 | 10 | 10 | 100 |
| 39 | 1 | 39 | 11 | 11 | 121 |
| 41 | 1 | 41 | 13 | 13 | 169 |
| 42 | 2 | 84 | 14 | 28 | 392 |
| 44 | 3 | 132 | 16 | 48 | 768 |
| 45 | 1 | 45 | 17 | 17 | 289 |
| 46 | 1 | 46 | 18 | 18 | 324 |
| 53 | 1 | 53 | 25 | 25 | 625 |
| | N = 50 | Σfx = 1271 | | Σfd' = −129 | Σfd'² = 8523 |

(b) গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean) $= \frac{\Sigma fx}{N} = \frac{1271}{50} = 25{\cdot}42$

(c) সমক পার্থক্য (Standard deviation) :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N} - \left(\frac{\Sigma fd'}{N}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{8523}{50} - \left(\frac{-129}{50}\right)^2}$$

$$= \sqrt{170{\cdot}46 - 6{\cdot}66} = \sqrt{163{\cdot}80} = 12{\cdot}79 \text{ (approx).}$$

**Q. 26.** Indicate the different measures of central tendency. Calculate the mean, median and standard deviation from the following frequency distribution.

| Scores | Frequency |
|---|---|
| 48—52 | 1 |
| 53—57 | 4 |
| 58—62 | 5 |
| 63—67 | 10 |
| 68—72 | 18 |
| 73—77 | 28 |
| 78—82 | 20 |
| 83—87 | 8 |
| 88—92 | 4 |
| 93—97 | 2 |

[ C. U. 1966

এখানে কল্পিত গড় (A) = 70 ধরা হল।

| Scores | frequency f | mid-poidt X | $d' = X - A$ | fd′ | fd′² | $X' = \frac{d'}{5}$ | fx′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48—52 | 1 | 50 | —20 | —20 | 400 | —4 | —4 |
| 53—57 | 4 | 55 | —15 | —60 | 900 | —3 | —12 |
| 58—62 | 5 | 60 | —10 | —50 | 500 | —2 | —10 |
| 63—67 | 10 | 65 | — 5 | —50 | 250 | —1 | —10 |
| 68—72 | 18 | 70 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 73—77 | 28 | 75 | 5 | 140 | 700 | 1 | 28 |
| 78—82 | 20 | 80 | 10 | 200 | 2000 | 2 | 40 |
| 83—87 | 8 | 85 | 15 | 120 | 1800 | 3 | 24 |
| 88—92 | 4 | 90 | 20 | 80 | 1600 | 4 | 16 |
| 93—97 | 2 | 95 | 25 | 50 | 1250 | 5 | 10 |
| | N = 100 | | | Σfd′ = 410 | Σfd′² = 9400 | | Σfx′ = 82 |

$Mean = AM + ci$

$$c = \frac{\Sigma fx'}{N} = \frac{82}{100} = \cdot 82$$

$\therefore \quad Mean = 70 + \cdot 82 \times 5 = 70 + 4\cdot 10 = 74\cdot 10$ (approx)

মধ্যমমান

$$\text{এখানে } N = 100, \quad \frac{N}{2} = 50$$

প্রথম পাঁচটি frequency-র যোগফল = 38, উহা 50 হতে কম। কিন্তু প্রথম ছয়টি frequency-র যোগফল = 66, উহা 50 হতে বেশী। ∴ মধ্যমমান ষষ্ঠ বিভাগে অর্থাৎ 73—77 বিভাগে থাকবে। ঐ বিভাগের limit 72·5—77·5. এই শ্রেণীতে মধ্যমমান পড়বে।

এখন, $\frac{N}{2} = 50.$

$l$ = যে শ্রেণী বিভাগে মধ্যমমান পড়ছে, তার নিম্নসীমা = 72·5

$f$ = যে শ্রেণীতে মধ্যমমান পড়েছে, তার আগের শ্রেণীপর্যন্ত frequencyর যোগফল = 38

$f_m$ = যে শ্রেণীতে মধ্যমমান পড়েছে, তার frequency = 28

$i$ = শ্রেণীবিভাগের ব্যাপ্তি = 5

$$\text{মধ্যমমান} = l + \frac{\left(\frac{N}{2} - f\right)}{f_m} i$$

$$= 72\cdot 5 + \frac{(50 - 38)}{28} \times 5$$

$$= 72\cdot 5 + \frac{\overset{3}{\cancel{\overset{6}{\cancel{12}}}}}{\underset{7}{\cancel{\underset{14}{\cancel{28}}}}} \times 5$$

$$= 72\cdot 5 + \frac{15}{7}$$

$$= 72\cdot 5 + 2\cdot 14$$

$$= 74\cdot 64 \text{ ( approx )}$$

Standard deviation

$$=i\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N}-\left(\frac{\Sigma fd'}{N}\right)^2}$$

এখন $\frac{\Sigma fd'^2}{N}=\frac{9400}{100}=94$

$$\left(\frac{\Sigma fd'}{N}\right)^2=\left(\frac{410}{100}\right)^2=(4\cdot1)^2=16\cdot81$$

$$\sigma=5\sqrt{94-16\cdot81}$$
$$=5\sqrt{77\cdot19}$$
$$=5\times8\cdot8$$
$$=44 \text{ (approx)}$$

**Q. 27.** In a spelling test, the following scores are obtained. Calculate the mean, median and mode, and add your comments.
15, 10, 12, 0, 8, 4, 15, 14, 20, 18. [ C. U. 1970

**Ans.** রাশিগুলোকে সাজানো হল,

0, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 15, 18, 20

এখানে কল্পিত গড়= 12 ধরা হল।

তাহা হলে কল্পিত গড় হতে প্রদত্ত রাশিগুলির পার্থক্য যথাক্রমে

−12, −8, −4, −2, 0, 2, 3, 3, 6, 8

$$\text{গড় (Mean)}=12+\frac{(-12-8-4-2+0+2+3+3+6+8)}{10}$$

$$=12+\frac{-4}{10}=12-\cdot4=11\cdot6$$

মধ্যমমান বের করার নিয়ম :

প্রথম দিক থেকে $\frac{N}{2}$ ও $\frac{N}{2}+1$ রাশিদ্বয়ের গড় হচ্ছে মধ্যমমান। এখানে $\frac{N}{2}=\frac{10}{2}=5$ তম ও $\frac{N}{2}+1=6$তম রাশিদ্বয়। 5তম ও 6তম রাশিদ্বয় হচ্ছে 12 ও 14। তাহলে মধ্যমমান $=\frac{12+14}{2}=13.$

যেহেতু উপরের রাশিগুলিতে 15 অন্যান্য রাশির চেয়ে বেশীবার অর্থাৎ দুবার আছে, অতএব mode 15 হবে।

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central tendency) পরিমাপের সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি আছে। উপরে সেই তিনটি পদ্ধতির দ্বারা তিন রকম ফল পাওয়া গেল। সবচেয়ে নির্ভুল কেন্দ্রীয় প্রবণতা পাওয়া গেল Mean-এ।